শারদীয় সাপ্তাহিক বসুমতী
॥ ১৩৭১ ॥
(চিত্রাধিকারী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে)

শ্রীশ্রীদুর্গা
(উড়িষ্যার দুষ্প্রাপ্য লোকশিল্প)

আজ শরতে কোন্ অতিথি এলো প্রাণের দ্বারে

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সমস্যার অন্ত নেই। অন্ন-বস্ত্রের অভাবে বিপ্লবিত আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্ত বিক্ষুব্ধ। জীবন নিয়ে আমরা সারা বছর ধরে নিরানন্দ [illegible] অঞ্জলি প্রদান করেছি। আ[illegible]

CENTRAL LIBRARY UNIVERS

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয় :	...		...	৩
গল্প : সংবৎ—আংশিক ৩৩৭	...	প্রেমেন্দ্র মিত্র	...	৪
সীমারেখা	...	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	৮
অভিনেত্রী	...	নবেন্দুনাথ মিত্র	...	১৫
আবরণ	...	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	২১
নিষ্কৃতি	...	আশাপূর্ণা দেবী	...	৩৬
সোনার হরিণ থাকলো	...	সুভাষ সমাজদার	...	৫৭
অনবরত-বাগচীর জলযাত্রা	...	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	...	৭৭
একটি আষাঢ়ে গল্প	...	লীলা মজুমদার	...	৮৭
প্রতিচ্ছায়া	...	উশীনর	...	৯৫
সমুদ্র-মন্থন	...	মৈত্রেয়ী দেবী	...	১০২
অভিলাষের বারবিলাস	...	সুশীল রায়	...	১১০
মনের ভিতর ঘর	...	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	...	১৪৫
একটি ত্রেতাযুগীয় প্রেম	...	আশা দেবী	...	১৬১
অরণ্যনিশি	...	সমরেশ বসু	...	১৮৭
উপন্যাস : রাজাবাহাদুর	...	জরাসন্ধ	...	৩১
জল	...	বাণী রায়	...	৬৬

উৎসব-ঋতুতে ভাল বই

বাংলা ইংরেজী গল্প
কবিতার সুনির্বাচিত
সংগ্রহ আর বাছাই করা
শারদীয় সংখ্যার জন্য

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

for

- BLOCK MAKING MATERIALS • PRINTING MACHINES • TYPES • INKS.
- PROCESS CHEMICALS AND OTHER MATERIALS IN THE GRAPHIC TRADE

Selling Agents of Printing Inks for

RAINBOW INK & VARNISH MANUFACTURING Co.

(PRIVATE) LTD.

BOMBAY 7.

•

Distributors:

UNION CARBIDE (India) Ltd.

CALCUTTA-1.

Send your Enquires or ask our Representatives to call

24-1793, 34-4761 & 24-6001 P. O. Box No. 663 Gram: PLENTIFUL

K. N. SEAL & CO.

63, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.

আজ শরতে কোন্ অতিথি এলো প্রাণের দ্বারে

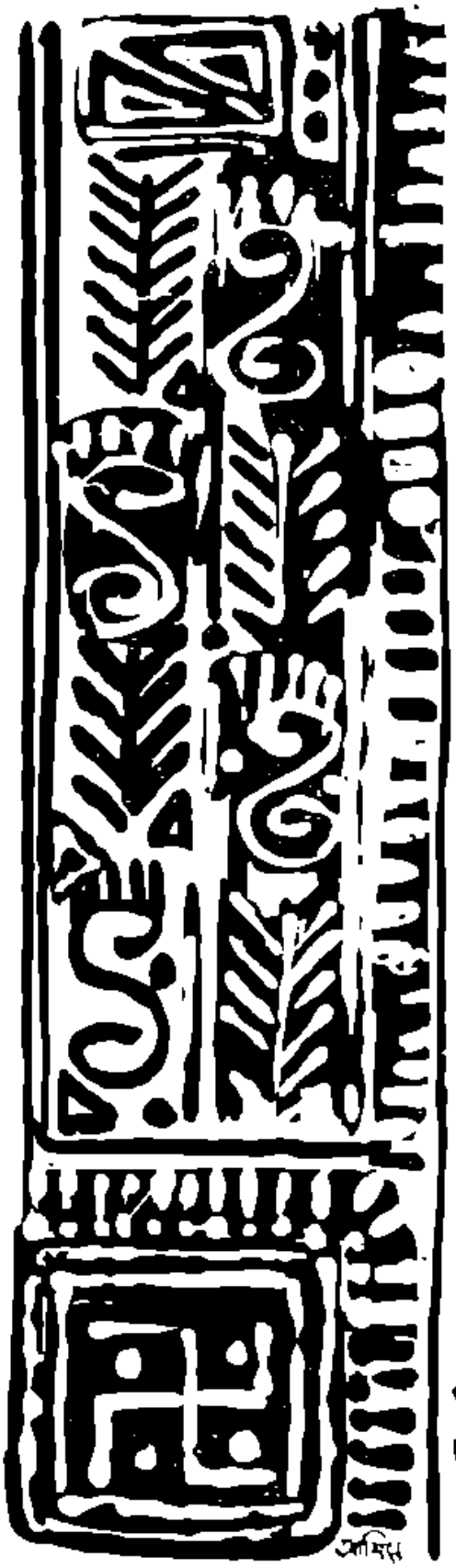

আ

বসুমতী

নূতন গ্রেভেলপিনের বোতামটা টিপল। কম্পনের পরে ঘণ্টা খানেক চোখে ভালোই ঝোঁয়াটে হয়ে উঠল এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্বচ্ছন্দ আলোয়।

স্ক্রীনে ফুটে উঠল অক্ষর লেখা :—অগস্টির ২৭৩ সাল চতুর্থ মাস পঞ্চম দিন ৫২ ঘণ্টা ১৪ মিনিট।

স্ক্রীন থেকেও নির্মল করে একটা রক্তাক্ত আলোর বিন্দু প্রকাশ হতে লাগল সেই সঙ্গে।

সময় হয়েছে ২৭৩ বৎসর অতীত পৃথিবীর।

উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যে কয়টি দেশ প্রকাশ মহাসাগরকে বিস্তৃত করে রেখেছে তাদের অধিবাসীরা অনুসরণে তিন রাত্রি নাম রেখেছে তিমিরের।

সমস্ত মনুষ্যসমাজে এখন এই বিশ্বের রয়ে রয়ে শেষ হয়।

নেভেন টিপে পড়িটা আবার নিভিয়ে দিতে যাচ্ছে এমন সময় মিটার মৃদু হাসি শুনতে পেল। সে কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে নূন লক্ষ্য করে নি।

মিটা হেসে বলল,—'হঠাৎ তারিখ দেখার সখ হল যেন? যেখানে আছি সেখানে তারিখ কি সময়ের ত' সত্যি কোন দাম নেই।'

'তা নেই।—নূন পড়িটা নিভিয়ে দিয়ে বলল,—'তবু পৃথিবীতে এখন ওরা কি করছে ভাবতে ইচ্ছে করে।'

'পৃথিবীতে মানে তোমার নিজের জন্মস্থান তো!' মিটা কৌতুকের সুরে বলল,—'৩৭২ ঘণ্টা মানে পৃথিবীরও নানা জায়গায় ত' নানা রকম। কোথাও সন্ধ্যে হচ্ছে, কোথাও সকাল। আর কোথাও বা মাঝরাত।'

'যে তুমি আমার কোথায়!'—নূনও এবার হাসল,—'আমার নিজের অঞ্চলের কথাই ভাবছি। সেখানে এখন সবে সকাল হচ্ছে। আমাদের শহরে এর মধ্যেই ব্যস্ততা সুরু হয়ে গেছে চারদিকে। যানের উৎসাহ আর সখ আছে তারা 'রেসি' নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। মামদাঁধরের ভোঁ বাজছে অগ্নিদের সুরের মতন। আমাদের 'সাহা' পত্রপাঠের অঞ্চল জানো! বড় বড় সব গোয়ালে যন্ত্রের দলে দুধ দোওয়া সুরু হয়ে গেছে...'

'তোমার বেশ ঘর তেমন করেই মনে হচ্ছে'—বলে মিটা হাসল।

'তা মন তেমন একটু বয়ে যাইনি মানে মাঝে।' নূন গম্ভীরভাবে বলল,—'এই জনবিরলের কাজে শুধু বছরের পর বছর নক্ষত্রমণ্ডলীই চষে বেড়াচ্ছে। নিজের অঞ্চলটা তাই বেশি মিষ্টি মনে হয়।'

'এ কাজে তুমি সুখ পাও না?'—জিজ্ঞেস করল মিটা।

'সুখ নয় পাই উত্তেজনা'—বলল নূন,—'এই উত্তেজনাটুকু না থাকলে এ কাজ কখনও নিতাম না কিন্তু গত বছরটা কয়েকটা বড় একঘেয়ে কাজে কাটলো। ওসব দামুলি কাজ আমার জন্যে নয়। যা আগেই মাপা হয়ে গেছে সেরকম জানা নক্ষত্র আর তার সব গ্রহের বিবরণ শুধু একবার আমার করে যাওয়া, এ তো যে কোনো আনাড়ী দিকদর্শীও পারে। আমি চাই আবিষ্কার কিছু, অদ্ভুত কিছু খুঁজে বার করতে।'

'এবার তো সেই সুযোগই পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে। আমাদের আগে এই নীল তারাটার কোন গ্রহ আছে বলেই কেউ হিসেবই নেয় নি। এখন থেকেই যাতায়াত হোলে যা দেখা যাচ্ছে তাতে গ্রহটা একটু নতুন ধরনের মনে হয়। অন্তত আর দুটী দলের যানেই এরকমের সঠিকভাবে জানা যাবে।'

'তা-ও যাবে কি'!—নূনের স্বরে প্রকাশ হলো,—'শুধু যানে থেকে ওপর ওপর দেখেই এ গ্রহের সব বিশেষত্ব বোঝা যাবে বলে মনে হয় না। খানিক আগে বর্ণালী বিশ্লেষণে কি পেয়েছি জানো? শুধু জল—'

'শুধু জল! সে আবার কি ধরনের? সমস্ত গ্রহটা শুধু জলের তাটা হতে পারে।

'যারে বলেই ত' মনে হচ্ছে। জল ছাড়া অন্য কোনো পদার্থের কোনো প্রমাণ এখনো পাচ্ছি না।'

'আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলীতে তাহ'লে ত' বেশ অসাধারণ কিছু বলে মনে হচ্ছে।' উত্তেজিতভাবে বলল মিটা,—'আমি শুধু এ নক্ষত্রের নাম আলো দেখেই অদ্ভুত ভাবছিলাম। এখনো বর্ণিও শুধু জলের গ্রহ কিভাবে হওয়া সম্ভব ভাবতে পারছি না।'

'বুঝতে আমিও পারি নি—' নূন হেসে বলল,—'তবে তোমের বয়সের আভাস পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছি, ঘণ্টা ঘণ্টার যেন আর তর সইছে না।'

দশ ঘণ্টার বদলে পৃথিবীর হিসাবে প্রায় দশদিন কেটে গেছে। তাদের ছোট হলেও অত্যন্ত মজবুত নক্ষত্র-সন্ধানী মহাকাশযান এখন গ্রহটির কম বেশি এক কিলোমিটার উর্ধ্বে নিষ্কল হয়ে ভাসছে। এই কদিনে রকেট বোটে গ্রহটির এবিক ওদিক তারা কখনো একলা কখনো দুজনে একসঙ্গে বহুদূর পর্যন্ত উড়ে দিয়ে এসেছে, কিন্তু সুদূর

● মহাকাশ সম্বন্ধে বুকেট

জলময় জগৎ ছাড়া, আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারে নি। রকেট বোট থেকে সমুদ্রে ভাসা ফেলে কিছু কিছু জলজ প্রাণীর নমুনা তারা অবশ্য সংগ্রহ করেছে। আশ্চর্যের বিষয় এ গ্রহের বেশির ভাগ প্রাণীর পৃথিবীর কোনো জানোয়ার অক্টোপাস স্কুইড প্রভৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য খুবই বেশি। স্কুইড ও অক্টোপাস জাতীয় প্রাণী এ গ্রহের জলীয় রাজ্যে বিবর্তনের ধারায় মানে শাখায় বিস্তৃত হয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে মনে হয়। জলীয় রাজ্যের এ সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করা ছাড়া গ্রহটির প্রত্যন্ত অঞ্চলেই বিশেষ তারা ইতিমধ্যে নিশ্চিন্তক জরিপ করেছে।

এ গ্রহের আকাশে চাঁদের ছড়াছড়ি। আমাদের পৌরমণ্ডলের বৃহস্পতির সঙ্গে তুলনীয় না হলেও তিনটি বড়ো ও চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট চাঁদও গ্রহটির চারিধারে দিবারাত্রি প্রদক্ষিণ করছে। তাদের ঘোরার বেগও সকলের সমান নয়। এতগুলি চাঁদের আকর্ষণ-বিকর্ষণে এ গ্রহের জলের রাজ্যে সারাক্ষণ তোলপাড় চলছে। আয়তনে এ গ্রহ পৃথিবীর তুলনায় কিছু বড়োই হবে। মাধ্যাকর্ষণের তফাৎ কিন্তু সামান্য। এ গ্রহের সূর্য নীল। তাই জানা গেছে তার নীলাভ কিরণে এ গ্রহেরও সব কিছু নীল। জলজাগ তারা তো এখনো কোথাও দেখে নি, তা দেখা গেলেও তার গাছপালা ও প্রাণীর রঙে নীলের প্রাধান্য থাকবে বলে তাদের ধারণা। বর্ষাদিন কাটাবার পরও এ গ্রহ সম্বন্ধে তার জলময়তা ছাড়া আর কোনো বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করতে না পেরে পিটা সেদিন এখানে আর সময় নষ্ট করার নিরর্থকতার কথাই বলছিল, হঠাৎ নবন নীলের স্বচ্ছ রাজ্যের দিকে চেয়ে যেন চমকে উঠলো। তার তখন একটি রকেট বোটে সেতারের মতো গড়নটিতে একবার উঠল দিতে বেরিয়েছে। সে উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস করলে,—'ব্যাপার কি?'

নবন তখন একদৃষ্টে নীচের নীল জলের দিকে চেয়ে রকেট বোটটাকে নঙর করে এনেছে। উত্তেজিতভাবে সে বললে,—'আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে পাচ্ছো।'

পিটা অবশ্য তার আগে নবনের ইসারায় মাথা হেঁটিয়ে রকেট বোটের বাতায়ন দিয়ে যা দেখবার দেখেছে—বিস্ময়ে সে বললে,—'এ ত' একটা দ্বীপ বলে ছোচ্ছে এ জলের জগতে দ্বীপ আছে নাকি?'

নবন ঘাড়টাকে ঘেরে মুখ তুলে গম্ভীরভাবে বললে,—'কিন্তু এ জানোয়ার এ জলদিন আমরা অন্তত যার তিনেক দেখে ফেলি কি? কোন দ্বীপ কখনো চোখে পড়ে নি।'

পিটা চিন্তিতভাবে বললে,—'তাও ত' বটে, আমি নিজে অন্তত দুবার এ জায়গাটা তন্নতন্ন করে খুঁজে গেছি, এখানে কি হঠাৎ রাতারাতি দ্বীপ জেগে ওঠে? চেহারা দেখে আগ্নেয়দ্বীপ বলেও তো মনে হচ্ছে না।'

'না আগ্নেয়দ্বীপ নয়। কিন্তু গাছের মতো যেগুলো দেখা যাচ্ছে তার বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছ? এখান থেকে ত' মনে হচ্ছে, পাতা বলে কিছু নেই—নবনকে বেশ চিন্তিত মনে হল।

'ওগুলো পৃথিবীর ক্যাকটাসজাতীয় ত' কিছু হোতে পারে—পিটা বললে,—'চলো একবার নেমে দেখাই যাক না।'

পিটা রকেট বোটের উপযুক্ত 'সিজার' টেনে বোতাম টিপে সেই ব্যবস্থাই করেছিল, কিন্তু নবন 'সিজার' আবার তুলে দিয়ে রকেট বোটটাকে আগের মৃদু আকাশযানের শিকেই ঝুলিয়ে গম্ভীরভাবে বললে,—'না, তৈরি না হয়ে এখন ওখানে নামা উচিত হবে না। হঠাৎ ছোপে পড়া এ দ্বীপের রহস্যও আগে একটু ভেদ করে একটু সঙ্গে নিতে চাই।'

'তুমি একটু বেশি সাবধান হচ্ছো না?' —পিটা ঈষৎ শ্লেষভরা সুরে বললে,—'এ দ্বীপে মানুষ আসবার ভয়ের তো কিছু নেই আমাদের আগেকার পিছলগুলো ত' সঙ্গেই থাকছে। তার আরো কিছুটা সময় না পেলে ওখানে নামতে চাই না।'

পিটার আর কিছু ধৈর্য ধরছে না। নবন আগে কিছুটা সময় যাবার পর ও দ্বীপে নামবে বলেছিল, কিন্তু বলতে বেশ অনেক সময়ই কেটে গেছে। গ্রহটির আহ্নিক আবর্তনের বেগ পৃথিবীর তুলনায় কিছু দ্রুত। পৃথিবীর হিসাবে প্রতি আঠারো ঘণ্টায় এ গ্রহটির দিনরাত্রি সম্পূর্ণ হয়। রাত্রি ও দিনে এ গ্রহে অবশ্য খুব বেশি পার্থক্য নেই। অসংখ্য চাঁদ আকাশে থাকায় রঙ নীল সূর্য অস্ত গেলেও চারিদিক বেশ আলোকিত থাকে, সে আলোও অবশ্য নীলাভ; পিটা মনে মনে এ গ্রহের নামকরণ 'নীলাই' করে ফেলেছে। নীলের ইতিমধ্যে

ই'টি দিনরাত্রি পার হয়ে গেছে, কিন্তু ওদের যোটর বোট সেই চাঁদ থেকে ফিরে এসে নূতন মহাকাশযানের সাথে মিলিতে হতে এখনো ছয় ঘণ্টা দেরি। শুধু ওদের নয় বিটার সঙ্গে তার দেখা হয়নি বটে, কিন্তু প্রেরণাদাতার না প্রেরিতের। তিনি তাকে নির্দেশ কি বিশেষ ভাবনায় ফেলে এসেছেন যার কোনো কিছুতে মন দিতে পারে না।

মহাকাশযানের সাথে যে-টুকু কাজ ছাড়া আর কিছু করবার নেই বলে বিটার আরো অনেক সময় আছে। এই নিশ্চেষ্টতা নক্ষত্রলোকের অজানা জগতের বিরুদ্ধে নেওয়ার কাজে মোটেই ভাল লক্ষণ বলে মনে হয় না। এর চেয়ে ঢের বেশি ভাল যদি সে ব্যস্ত থাকত। এই দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা কাজ পেলে, বিশেষ করে নক্ষত্রলোকের অধিবাসীদের সম্বন্ধে সবচেয়ে সাহসী ও বিপজ্জনক মতের সমর্থক হয়ে গেছে বিটা যেন সে অনুভব করেছে, তেমনি উৎসাহিতও হয়েছে। তাদের সঙ্গে মহাশূন্যে কোন দুর্লভ্য ভাগীদার হওয়ার আশায়।

কিন্তু এ কি ঔৎসুক্যতা নয়? তাদের যানে প্রত্যেক সন্ধান করবার এমন অদ্ভুত ঝোঁক পেয়ে থাকতে লাগবটাকিতে ঢুকে নিজেকে বন্দী করে রাখবার কি মানে হয়

সেদিন এতদূরে যেতে হবার সময় নূতন প্রশ্ন তার হৃদয়টা থেকে একটু বেরিয়ে এসে সহজভাবে কয়েকটা কথা বলেছে। সে কথাগুলো অবশ্য প্রায় মনে পড়ছে।

মনে হচ্ছে,—'নক্ষত্রলোকের মানচিত্রে এ পর্যন্ত ও তার এরূপ গ্রহের অবস্থান আমরা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করেছি, এ গ্রহের মোটামুটি বিবরণ সংগ্রহ আমাদের শেষ হয়েছে। কিন্তু এ গ্রহের ব্যাপক ও গভীর সন্ধানের ঝুঁকি শুধু আমাদের দুজনের পক্ষে নেওয়া উচিত হবে কি না বুঝতে পারছি না। এখানকার স্থলভূমির জল ও প্রাণীর যে কটা নমুনা আমরা সংগ্রহ করেছি তা বিচার বিশ্লেষণ করে এবং এ গ্রহের এতগুলি চন্দ্রের প্রভাব ইতিমধ্যে যতখানি সম্ভব গণনা করে আমি এমন একটি প্রশ্নের সমাধান করেছি যার উত্তর এখনো পাচ্ছি না, আমার মনে হচ্ছে নক্ষত্র সন্ধানী আরো দু-একটি দলের সাহায্য নিয়েই এ গ্রহের বিশদ বিবরণ সংগ্রহে নামা উচিত। আমার গবেষণা অবশ্য আরো দু-একদিন আমি চালাতে চাই।'

'তাহলে ও দুটো ঘণ্টাই হয়ত আমার ভুল হবে,'—জবাবে বিটা বলেছে।

'আমার অনুমানে যদি ভুল না থাকে আছাড়ে তা পড়বেনা হলেই আমার বিশ্বাস।'—শুনে হেসেছে বুধ।

'কিন্তু সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ এর তোমার ভাবনার কারণ কি?'

'আমার নক্ষত্রযানী হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা, তার গ্রহ বিবর্তন সম্বন্ধে আমাদের এতকালের সুনিশ্চিত জ্ঞান ও অনুমিতি—' একটু যেন কঠিন করেই বলেছে বুধ। তারপর হেসে নিজের কথাগুলির ভারে লজ্জিত হয়ে যেন বলেছে,—'গ্রহ বিবর্তনের উদাহরণ ও তত্ত্ব তোমাকেও ত' এ কাজে তোমার আগে ভালোভাবে জানতে হয়েছে, সৌভাগ্যে আমাদের নক্ষত্র সন্ধান বিভাগের ইতিহাসও তোমায় জানা। অ্যাটমিক সবচেয়ে তিরিশ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ চন্দ্রলোকে ছাড়া আর কোথাও পৌঁছোতে পারে নি। তার তখনকার রকেটযানে চন্দ্রলোকে ছাড়া আর কোথাও পৌঁছোতে পারে নি। অ্যাটমিক সঁইত্রিশে মানুষ বহুগ্রহে পা দিলো, অ্যাটমিক একচল্লিশে শুরু, অ্যাটমিক পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত সৌরমণ্ডলের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার বেশি আর কিছু আশা করতে পারে নি। অ্যাটমিক সাতাত্তরে হঠাৎ ঘূর্ণায়মানী 'ফোটন' রকেট সার্থকভাবেই নির্মিত হয়। সে রকেটের সাহায্যেও আমরা কাছাকাছি পাঁচ থেকে দশ আলোকবর্ষ দূরত্বের ওয়াণ্ডালির এলাকা ঘুরে এসেছি মাত্র। অ্যাটমিক একশো তিন সাল পর্যন্ত এই ফোটন রকেটের বহুমুখ সম্ভব উন্নতি, আর শুরু ও বন্দরে নতুন উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে রকেট সাজিয়ে বিস্তার ও সংখ্যা বৃদ্ধির বেশি কিছু করা সম্ভব হয় নি। তখন পৃথিবী থেকে বন্দর ও শুরুতে প্রতি ছয়মাস অন্তর একটি ফোটন রকেটযান চলাচল করে। চন্দ্রলোকে ও দুবেলাই যাতায়াত চলছে। অ্যাটমিক একশো তিন সালেই কিন্তু পৃথিবীর সভ্যতা সবচেয়ে বড় ঝাঁড়া কাটিয়ে ওঠে। কল্পনাতীত আকাশ-তত্ত্ব আবিষ্কার ও গণনার সঙ্গে পদার্থ-বৈধী নামে যা প্রচলিত সেই 'অ্যান্টিম্যাটার' বা বিপরীত পদার্থ উৎপাদনের শাসন্য মিলে এমন একটি অবিশ্বাস্য পরীক্ষার দিকে মানুষকে এগিয়ে দেয় যাতে সমস্ত পৃথিবীই ধ্বংস হয়ে যেতে পারত। শুক্র ও মঙ্গলের ক'টি উপনিবেশকেই তাহ'লে মানুষের সভ্যতার কীর্তি বলে বয়ে নিয়ে যেতে হ'ত। যে সাংঘাতিক পরীক্ষার কিছুটা ক্ষতি হলেও শেষ পর্যন্ত তাই সেই থেকেই মানুষ অসীম দূরত্বের অবজ্ঞা করা জয় করবার যন্ত্রগুলির বলে নিজেদের সমস্ত নক্ষত্রলোক এমন কি ভিন্ন নীহারিকামণ্ডলে যাবার শক্তি পেয়েছে।

অ্যাটমিক একশ তিন সাল থেকে একশ সাতাশী পর্যন্ত এই নূতন শক্তি সার্থকভাবে আয়ত্ত করে কাজে লাগাবার পরীক্ষামূলক আয়োজনে কেটেছে। মানুষের এই নতুন দিগ্বিজয়ের ইতিহাসে আশাভোরা উজ্জ্বল হয়। তবুও সব দুর্ঘটনার সমস্ত প্রশান্তি মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ হয়ে গেছে। বিফল হয়েছে অনেক উদ্যোগ ও আয়োজন।

অ্যাটমিক সবচেয় সুরু হবার পর প্রথম রকেটযান নির্মাণ ও ব্যবহারের সময় যেমন হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি জয়-পরাজয়ের উল্লাস ও হতাশা মেশানো এ ইতিহাস।

অ্যাটমিক একশ সাতাশীর পর নক্ষত্রলোক-বিজয়ের নতুন যুগ সুরু হয়েছে বলা যেতে পারে।

আমাদের এ অঞ্চলে নক্ষত্র-সন্ধানী বিভাগ স্থাপিত হয় অ্যাটমিক একশ সাতানব্বই-এ। কিন্তু সত্যি করে ব্যাপকভাবে তার কাজ সুরু হয়েছে এই তৃতীয় অ্যাটমিক শতাব্দীতে।

গত সঁইত্রিশ বছর ধরে আমাদের বিভাগ দ্বারাপথের অনেক অজানা দূরন্ত জেলার বহু উদ্ঘাটন করেছে। ভাবীকালে মানব-সভ্যতা যেখানে প্রসারিত হ'তে পারে এমন অনেক নব সৌরমণ্ডলের উপনিবেশের উপযোগী গ্রহ আবিষ্কার করে সেগুলির তথ্য সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে রেখেছে।

এই সব সন্ধানী অভিযানে অ্যাটমিক যুগের আসেকার একটি আশা কিন্তু অলীক বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিংবা বলা যেতে পারে আরো পূর্বকার প্রায় অন্ধকার যুগের সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত সঠিক বলে এ-পর্যন্ত জানা গিয়েছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান যখন শুধু সাধারণ ও রেডিও টেলিস্কোপের উপরই নির্ভরশীল ছিল সে সময়ে প্রথমে অনেক বৈজ্ঞানিক মনীষীর ধারণা ছিল যে পৃথিবীতে ছাড়া মানুষের মত এত উন্নত শ্রেণীর প্রাণীর বিবর্তন নক্ষত্রলোকের কোন গ্রহে হয় নি। পরে সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণাই প্রচলিত হয়। মানুষের

● গ্রহান্তরে নুন ও পিটা

মত বা তার চেয়েও উন্নত প্রাণী নক্ষত্রলোকের অনেক গ্রহে থাকা সম্ভব। এ প্রত্যাশা প্রথম দুই অ্যাটমিক শতাব্দী ধরেই বাড়তে থাকে।

কিন্তু গত ষাট-সত্তর বছরে মানুষের পর্যায়ের কোন প্রাণী কোন গ্রহে পাওয়া যায় নি। অন্যান্য গ্রহের অস্তিত্ব অন্য নৌমণ্ডলের অনেকগুলি গ্রহেই পাওয়া গেছে, কিন্তু বিবর্তনের অনেক নীচের ধাপে তাদের স্থান। সরীসৃপবর্গ ছাড়িয়ে উভচরী গোধরা পর্যন্ত প্রাণীজগৎ কোনো গ্রহে কোথাও ওঠে নি। একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে প্রাণের বিবর্তন দূর-দূরান্তরের নতুন নতুন সৌরমণ্ডলের গ্রহে ও পৃথিবীর প্রায় অনুরূপ বারবার ঘটেছে। এমন কোন অদ্ভুত অজানা বৈচিত্র্যের সন্ধান কোথাও পাওয়া যায় নি পৃথিবীতে যার আভাসমাত্রও নেই। পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অনুরূপ প্রাণীরা অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় প্রধান হয়ে উঠেছে। যেমন কোথাও পিপীলিকা জাতীয় কীট, কোথাও বা কূর্ম জাতীয় সরীসৃপ নানা শাখায় বিস্তৃত হয়ে এক-একটি গ্রহ অধিকার করে আছে। সে সমস্ত গ্রহই পৃথিবীর মতো স্থলভাগ ও জলভাগে মেশানো।

এই প্রথম এমন একটি আশ্চর্য গ্রহের সন্ধান আমরা পেলাম, স্থলভাগ, যার কিছু নেই বললেই হয়। এই কয়দিন ধরে আমি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এ গ্রহের চন্দ্রবাহুল্যের প্রভাব ও পরিমাণ গণনা করে যাচাই করবার চেষ্টা করেছি। আমাদের মহাকাশযুদ্ধা নেপচুন 'সুপার-কম্পিউটারের' হিসাবে যা পাচ্ছি তা অদ্ভুত। এ গ্রহে স্থলভাগের অভাবের বহুলতার জন্যই হয়েছে। প্রতি আড়াই হাজার বছর অন্তর এ গ্রহের চন্দ্রগুলির এমন এক সংস্থান হয় যাতে মহাপ্লাবনে সমস্ত গ্রহ নিমজ্জিত হয়ে যায়। যে তরঙ্গ সমস্ত গ্রহটিকে ছেয়ে ফেলে তখন ধাবিত হয় তার উচ্চতা ছোট-খাটো একটি পাহাড়ের সমান, স্থলভাগের কোনো প্রাণী তাতে টিকে থাকতে পারে না। এই নিয়মিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই গ্রহের প্রাণীজগতের বিবর্তনের ধারা অদ্ভুতভাবে বদলে দিয়েছে। আমাদের হিসাবে আড়াই হাজার বৎসর খুব বেশি নয়। পৃথিবীর প্রাচীনকালের অধিবাসীর মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের নাম নিশ্চয়ই জানো। তাঁর সময় থেকে আটমিক সংবৎ সুরু হওয়া পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার বছরে পৃথিবীর ইতিহাসে কি সব অসামান্য পরিবর্তনই না ঘটে গেছলো। ভূ-তাত্ত্বিক দিক থেকে কিন্তু আড়াই হাজার বছর একটা নিমেষমাত্র। এই নিমেষই কিন্তু এ গ্রহের প্রাণী বিবর্তনে বিচিত্র এক খেলা খেলেছে বলে আমার বিশ্বাস। আর এখানকার জলজ প্রাণীর সামান্য যে ক'টি নমুনা সংগ্রহ করেছি, আমি এ ক'দিনে যেগুলি যতবার সম্ভব পরীক্ষা করে দেখলাম—সেগুলি শ্রেণির তাপাই কচ্ছপ বা মোলস জাতীয়। মজার কথা এই যে, মূলত সামুদ্রিক হলেও তাদের অনেকগুলির মধ্যে আমি কিছু কিছু স্থলচর প্রাণীর লক্ষণ পেয়েছি এবং বুঝেছি যে, আড়াই হাজার বছর অন্তর নিয়মিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই এ বৈশিষ্ট্যের কারণ। প্রত্যেক প্লাবনের পর কিছুকাল সমস্ত গ্রহটি জলময় হয়ে থাকে। তারপর আবার ধীরে ধীরে স্থলভাগ জেগে ওঠে। আমরা একটি মহাপ্লাবনের ঠিক পরেই এখানে উপস্থিত হয়েছি। স্থলভাগ এখনো জাগতে সুরু করে নি। জাগতে সুরু করার পর শ্রেণিবার জীবজন্তুর জন্যে কিছু প্রাণী সেই স্থলভাগে তার ঘরবাড়ি ঠেঁটে বসে। আড়াই হাজার বছর বাদে আবার যে ঢেউ তাদের ধ্বংস হয়ে যায়। এই ক্ষণিক সমারোহ ও সার্বভৌম ধ্বংসই এখানকার প্রাণীবিবর্তন অস্বাভাবিক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে কটি শ্রেণিস্থানে যে দুরবস্থার প্রভাবের কথা নিশ্চয় জানো। এখানে হয়তো কোন এই নিয়মিত মহাপ্লাবন এখানকার যেন সমস্ত গতি রুদ্ধ করেছে, অন্যদিকে তেমনি উন্নত-শ্রেণীর যেসব কোনো প্রাণীর বিবর্তন শুরু করে ফুরিয়ে গেছে, আমার সন্দেহ হয় যে প্রাণী বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানে আমাদের ছাড়াও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। পৃথিবীর স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী বুদ্ধিতে যথেষ্ট অগ্রসর হলে আমরা আশি যেমন তেমন করে অন্যান্যভাবে এ গ্রহের বিবরণ সংগ্রহ করতে তাই আমি চাই না। সবচেয়ে কাছাকাছি নক্ষত্র স্কানীতের ইঁটিতে আমি তাই খবর পাঠিয়েছি। আশা করছি সপ্তাহ-খানেকের মধ্যেই আরো একটি স্কানী মহাকাশযানে এখানে এসে পড়বে, তখন সম্মিলিতভাবে এ গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা যাবে। যত কৌতূহলই থাক এক সপ্তাহ তাই আমাদের ধৈর্য ধরে থাকা প্রয়োজন।'

(শেষাংশ ১৮৪ পৃষ্ঠায়)

সীমারেখা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

এক

সুন্দর একটি বিকেলে, গঙ্গার ওপর দিয়ে একখানা ছোট ফীমার চলছিল।

নামে ছোট ফীমার হলেও প্রায় তিন-তিনটে পাড়ি। তাদের গলা ফুলে ফুলে ওঠা, দেখলে মনের ভেতর উঠছে, শহরের নীলকান্তি এখনো তার ওপর ফুটে ওঠে নি। বাঁশের চটাগুলো এখনো তালিয়ে রয়েছে, হাওয়ার আর এতটুকু শীতের আমেজ এলে তারা মাথা তুলবে, বাস তুটবে, তারপর চড়া-চড়ার বেলা বলে যাবে।

এখন অবশ্য গঙ্গা। কার্তিকের উদাস। সুদূরের যাওয়ার সোনালি মনের ঢেউ—

ফীমারের স্যালুনে উৎসাহী-ছটা ফেরার ইচ্ছায়; এক-একটা আলতোভাবে নৌকোর ফীমারের জল-তরঙ্গে খানিকটা উথাল-পাথাল নাচানাচি—থেকে থেকে এদিকে ওদিকে ওস্তাদের উল্লাস-ওঠা। পরনের পড়ন্ত নরম রোদে সেরা জলের রঙ পলার মতো ঘন গভীর হয়ে উঠেছে—দু-পাড়ে নিবিড় সবুজ নতুন ধানের বিস্তার। একটা ছপাটি এরোপ্লেন খানিক দূর পর্যন্ত সঙ্গে চলে ধীরে ধীরে অন্যদিকটা জলি ফেনের আড়ালে হারিয়ে গেল, জলের শব্দের সঙ্গে তার আওয়াজটা মিশে অনেকক্ষণ পর্যন্ত অদ্ভুত একটা ঐকতান সুর বাজতে লাগল।

ফীমারের সামনের ডেকে—সৌরভে ফার্স্ট ক্লাশ—আমো কিছু যাত্রীর সঙ্গে আমি আমার বন্ধু মোহনলাল ধরেছিলুম। মোহন নিঃশব্দে পাইপ খাচ্ছিল, আমি গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বসে ছিলুম। এমন সময় বেশ খানিকটা কাছাকাছি এবং উচ্চকণ্ঠ আলোচনা ডেকের অন্যান্য যাত্রীদের সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তুলল।

আলোচনা চলছিল হিন্দী এবং ইংরেজির মিশ্রিত সংলাপে। দুজন বিহারী এবং একজন বাঙালী ভদ্রলোক বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।

গল্প ওঁরা করছিলেন অনেকক্ষণ থেকেই। তিনজনেই একই শহরের বাসিন্দা, পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত এবং রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের জেলাবাসী বলে বেশ গর্বিত। একজন বলছিলেন, এই ফীমারের ক্যাবিনেই যে ঘটনাটা ঘটেছিল সাদাসিধে সরল রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভালো মানুষের মতো চুপ করে বসে রয়েছেন, আর তাঁর

পাশেই স্যুটপরা একটি অভিজাত ব্যক্তি বসে সবাসে সিগারেট খাচ্ছেন এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদের মুখের ওপরে ধোঁয়া ছাড়ছেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখনো রাষ্ট্রপতি হন নি এবং ভদ্রলোক তাঁকে চিনতেন না।

ধোঁয়ায় আলায় অস্বস্তি হলে নিশ্চয় রাজেন্দ্রপ্রসাদও আর স্থির থাকতে পারতেন না। অত্যন্ত বিনীতভাবে, ছোকরা ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন: 'তো সিগ্রেট আপ পীতে হৈ—উয়ো, তো আপ্‌কা হ?'

ধোঁয়ার লোকটির দিকে তাকিয়ে অবাকস্বরে ভদ্রলোক বললেন, 'তো ক্যা—আপ কা?'

উত্তরে আরো বিনীত হয়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদ বললেন, 'সিগ্রেট কব আপ কা হ, তো মুঝে ভি আপ পীনেকে দিজিয়ে। মুঝে কৈসে ভেরে হো?'

হাসির রোল উঠেছিল এবং আমরা দুজনেও সে হাসিতে যোগ দিয়েছিলুম। তারপর ওঁরা বিহার-পার্লামেন্টারি-টান্সপোর্টের কী সব দুর্নীতি নিয়ে আরো গভীর আর ব্যাপক আলোচনায় মন দিলেন। মোহন নীরবে পাইপ টেনে চলল, আমি গঙ্গার দিকে তাকিয়ে মনে মনে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আউড়ে চললুম।

তারপরেই এই নতুন প্রসঙ্গ এবং উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। রাজনীতি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বেহের দুর্নীতি—এসব কিছুই নয়। এবার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো দিকে চলছিল। অর্থাৎ অন্যায়ন্যায়।

একজন বিহারী ভদ্রলোক বলছিলেন, তাহলে ব্যানার্জি, তুমি বলছ যে এগুলো সমস্ত বাজে কথা? কুসংস্কার?

ব্যানার্জি বাধা দেবার জন্যেই নিঃসন্দেহ।

—আমেরিকা থেকে এই যে ডিবার্থ সিমাপ্ট কমিটি এখন ইণ্ডিয়ায় কাজ করছে—এটা জোকোর?

—ভার্মা, নিজে তুমি একজন ডিসিপ্লিন্ড ফ্লায়—ব্যায়ামাদা অধ্যাপক। তুমি খুব ভালো করে জানো যে আমেরিকানরা সবসময় একটা নতুন ধরনের হজুগ চায়, তবা লোকশিক্ষের কবর খুঁড়ে মানবীয় পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে। যে কোনো স্যাম্পলোকের ওপর চড়ে বসে থাকতে পারে, একটানা কথা কইতে পারে, তার প্রতিযোগিতা চালিয়ে যায়। ওদের কথা তুমি ছাড়ো।

—ব্যানার্জি, তুমি ওকালতির সেই পুরোনো ট্যাক্‌টিক্স চালিয়ে যাচ্ছ—যাকে বলে সিক্স ডিস্ ও প্রাউড। কাজের কথায় এসো। পুরুষের যদি না-ই থাকে—তবে সকালের কাগজটা মেলে ধরলেন: এ নিউক্লিয়ার মানে কী? সি-পিস অফ পাতাখানে যে মেয়েটি জন্মালো—যে কখনো তার নিজের গাঁয়ের বাইরে যায় নি, মুখ বুজি ফোটাবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে সে আন্তর্জাতিক ভাষায় কথা বলে? কী করে একটি গাইডলীন ছেলে ঘুমোবার সময় বিছানার পাশে রিভলভার ইংরেজিতে বলে যায়, কাঁটা-চামচে ছাড়া খেতে জানে না—পরিষ্কার ভাষায় কেন বলে সে একজন ইংরেজ এবং কেউও ওয়ার্ল্ড ওয়ারে কেমন করে সে বার্মাফ্রন্টে নিহত হল—তার অ্যাকুরেট ডেস্ক্রিপশন দেয়?

—ওগুলো সব ব্লাফ্।

—তার মানে মিথ্যে!

ব্যানার্জি জবাব দিচ্ছেন না। বৃদ্ধ হেসে একটা সোডা চুরুট ধরালেন।

ভার্মা আরো উত্তেজিত হলেন। বললেন, ব্যানার্জি, তাহলে ওদের কাগজে এই যে বেরিয়েছে, সাউথ ভিয়েতনামে যেসব ব্যাখ্যিক আর বুদ্ধিজীবের ভেতরে নারানারি চলছে—ওও মোনার পাছে মিথ্যে। কারণ যা মোনার অভিজ্ঞতায় নেই, তাই মিথ্যে নয়। কিন্তু সুক মিথ্যে নাই ভিয়ার আমেরিকোকে—ভার্মা হাক্সলেরও বিখ্যাত উক্তিটি আউড়ে সেবটুকু তার সংশোধন করে দিলেন: ইন্ ইয়োর দ মিথ্যেটর্ড।

বিহারী ভদ্রলোকটি বললেন, আমি একটা পার্লামেন্টারি এক্সপিডিয়েন্স বলতে পারি। আমাদের গ্রামের দিকে চালান—একটি জাতিস্মরের গল্প, একটি শেষ হতে না হতে আর একটি বেরিয়ে এল আধার ঝুলি থেকে। শেষ পর্যন্ত ব্যানার্জি ক্ষেপে গেলেন। তর্কে আর পেরে উঠলেন না দেখে মুখে একটুকরো অনুকম্পার হাসি ফোটালেন, তারপর নিঃশব্দে চুরুট টেনে যেতে লাগলেন।

এঁদের আলোচনার আকর্ষণেই বোধহয় সেকেণ্ডক্লাস থেকে এগিয়ে এসেছিলেন একজন মৈথিলী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। পায়ে লাদাখের ঢিলেঢালা চটি, পরনে গরদের ধুতি; গায়ে একটিমাত্র সিল্কের চাদর—তার ভেতর দিয়ে উজ্জ্বল গৌর শরীরে একটি মোটা পৈতে দেখা যাচ্ছিল। চুলের রঙ সাদায় কালোয় মেশানো, বুদ্ধিদীপ্ত চোখে প্রসন্ন কৌতুক জমছে।

মৈথিলীতে তিনি বললেন, কেন ও নিয়ে মিথ্যে তর্কাতর্কি করছেন আপনারা? চলেছেন তো গঙ্গার ওপর দিয়ে। যদি ডুবে যায় তাহলে এবার চিন্তা করবেন। এখন কিছুই করতে হবে না—কারণ ব্রাহ্মণ যাকে নেন, তার পুনর্জন্ম হয় না।

আবার হাসির রোল উঠল, আর সেই সঙ্গে কীরারের পেছনে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। পুরনো চাপা পড়ল আপাতত, যাত্রীরা বালসরে পৌঁছবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কীরার ঘাটে ভেড়বার উপক্রম করছিল।

দুই

অতঃপর মীটারগেজের একটি ট্রেন এবং ব্রডগেজের পরেই আমরা নেমে পড়লুম।

ওদের সেই আলোচনার প্রসঙ্গটাই কিনা জানি না, আমি কিছুক্ষণ সেকেণ্ড ক্লাসে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। নিশ্চিতভাবে জানি, এ নিয়ে আমি কোনোদিন মাথা ঘামাই নি, মধুপুর-গিরিডির আর পথ ছাড়া বিহারের কোনো শহর কোনোদিন দেখি নি—তবু, তবু মনে হতে লাগল এই বয়সে মিছে করে কেন আমি কোথাও চলে যাচ্ছি। সেদিন এখানে ট্রেন ছিল না, একটা উটের গাড়িতে চড়ে সব জায়গায় যেতে হয়েছিল, হয়তো সেই গাড়োয়ান চট করে গাড়িটা থামিয়ে দেখাল হাহাকার করে হিন্দীতে আমাকে বলছে: দেখুন—দেখুন—ঠাণ্ডির কাণ্ড দেখুন—

একটা শুকনো নালার পাশাপাশি চারটে বুদ্ধদেব। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, চৌটের জলে ধুয়ে ধুয়ে তাদের মুখের একটি রেখাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—শুধু শুধু করে নাম্বি উঠে গেছে তাদের ওপর—

অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে মোহনলাল আমার ডাকল: কি রে বিমলেন্দু, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? নামতে হবে যে আমাদের।

সত্যিই তো—ঘুমিয়েই পড়েছিলুম। বাইরে গাছপালার ওপর ঘোর সন্ধ্যা। একটা লিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালের লাল আলো এসে আস্তে আস্তে চলেছে টেনটা পাশের শেষ কামরাটি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাত্রি-সিগন্যাল সাঁজলাল।

মোহনলাল হাসল: কাল সারারাত ট্রেন জার্নিতে খুব কষ্ট গেছে—না! সাড়ে চার্‌টায় বন্ধুরাই খাইয়ে-দাইয়ে শুইয়ে দেব দেবে।

লজ্জা পেয়ে বললুম, না—না, ট্রেনে কাল খুব ঘুমিয়েছি আমি, সেজন্যই তোকে

[illegible] হয়ে [illegible] যেমন একটি [illegible] মেয়ে [illegible]

লাইনে যেতে যেতে ভাবছিলুম, দূর বাঁধের ধারে ট্রেনটা থেমে দাঁড়াল কেন? হঠাৎ একটা অদ্ভুত কৌতূহলে আমি জানালাকে মোটা মেরে করে 'সিগন্যাল'—সেই বড়ো সিগন্যালের দুটো কি একসঙ্গে দেখা যায়?

কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। শুধু মনে হলো, ওদিকের ঢেউয়ের কী একটা উঁচুর শাদা ওপর দিয়ে যাচ্ছে মনে হল—হাজার হাজার জোনাকি শুধু জ্বলছে সেখানে—যেন জোনাকির মেলা বসে গেছে।

আর তৎক্ষণাৎ আমি আর একবার লজ্জিত হলুম। এখানে জোনাকি কেন আসবে? আর তার সঙ্গে আমি জানবই বা কেমন করে? আজ পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা কেউ!

ট্রেন এসে থেমেছে। নেমে পড়লুম আমরা। কুলি মালপত্র নিয়ে গেল বাইরে, একটা রিক্সা করে মোহনলালের বাড়ির দিকে রওনা হওয়া গেল।

বিকেলের মহকুমা শহর—লোকজন বাজার, 'স্বরূপ টকিজ' একটা সিনেমা হাউসে মেরোলে আলো জ্বলছে, ভেসে আসছে মাইক্রোফোনে কিন্তী গানের সুরটুকু।

হঠাৎ আমি চিৎকার করে বললুম, সেই প্রকাণ্ড মেরী তালাওটা গেল কোথায়?

—মেরী তালাও?—মোহনলাল চমকে বললে, মানে?

—এই যে এখানে কোথায় ছিল—বড়ো বড়ো তালগাছ ছিল তার পাড়ের ওপর—বলতে বলতে আমার চোখের সামনে যেমন সব কাঁপসা হয়ে যেতে লাগল—যেন হঠাৎ একটা ভিন্ন সুর হয়েই ছিঁড়ে গেল আচমকা। গাড়িটার ওপর খানিকটা ঘোলা আলো কাঁপতে লাগল। উল্টোদিকে যেতে যে কটা আলো ছেলে একটা লম্বা আসছিল—আমার চোখ দুটো যেন জ্বলতে লিগে।

কিন্তু মোহনলাল আশ্চর্য হয়ে গেল।

—মেরী তালাওয়ের কথা তুমি জানলে কী করে? এখানে এসেছিলে নাকি কোনদিন?

—কই—না তো!—আমি যাদুর মতো উঠলুম।

—ও নামটা তোমার জানল?

—এমনি। হঠাৎ মনে হল।

মোহনলাল অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাইল: কিন্তু এখন যেখানে সিনেমা হাউসটা রয়েছে, ওইখানেই আগে ছিল একটা প্রকাণ্ড দীঘি, তার নাম মেরী তালাও। আমাদের খুব ছেলেবেলাতে মেরেছি, সেটার বয়েস আজই হয়ে এসেছে, সবাই জল আর প্রায় দেখা যায়। তারপর কৌশলের 'স্বরূপ টকিজ' জন্মে গেল, সেকেন্ড সর্দার বাড়ল, অনেক বক্তৃতা করে মিউনিসিপ্যালিটি সেটা বুজিয়ে ফেলল। সে প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু তুমি জানলে কী করে?

বললুম, তাই ভাবছি! আমাদের কেউ হয়তো এক জন্মে-জানমে ছিলেন, তাঁর কাছ থেকেই হয়তো থাকব দীঘির নামটা। মোহনলাল ওটাকে সুবিধে মেরেছিল, হঠাৎ ভাসিয়ে তুলেছে।

মোহনলাল বললে, হয়ও হতে। যেমন পরীক্ষার হলে।... অনেকদিন আগে কিছু পড়েছিলে—মনে হয়েছিল সমস্ত ভুলে গেছি, কিন্তু লিখতে লিখতে অনর্গলেন্ট্রেশন যেই গভীর হল, অমনি কোথা থেকে হারিয়ে যাওয়া জিনিসটা চোখের সামনে এসে হাজির। কেল ইন্ট্রোস্পেক্টিং, না?

আমি বললুম, হ্যাঁ, কেল ইন্ট্রোস্পেক্টিং।

কিন্তু একটা সুখে অস্বস্তি আমার কিছুতে কাটছে না। ক্রমাগত মনে হচ্ছিল, প্রতি মুহূর্তেই কি যেন একটা চেতনার ওপর এসে পড়ছে—যেন চারদিকের সমস্ত আলোকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তবে নিয়ে একটা ছায়ার আবরণ আমার চারদিকে নিবিড় হয়ে আসছে। কতগুলো ছাড়া-ছাড়া বাড়ি, এদিকে ওদিকে গোপ জঙ্গল—তাইমে একটা মাঠ ধু-ধু করছে। লোকালয়ে এসে পড়েছি—উটের গাড়িটা কাঁচা রাস্তা দিয়ে খিশিয়ে ভেজা ঘুলোর গন্ধ ছড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে, কিন্তু তবুও নাকের ভেতরে সেই তিনটে বড়াকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। একটা চাপা আতঙ্কের ওপর অপরিমিত ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠছে—অসহ্য বেঁচে থাকতে ঠগীদের এমন অত্যাচার? থানা—দারোগা—কোতোয়াল—এরা সব কী করে? দাঁতে দাঁত ঘষে আমি বললুম, কতি নেহি—কতি নেহি! এই অত্যাচার থেকে এদের বংশানুক্রমকে উৎখাত করে, তবেই—

—কী বকছ যে বিড়বিড় করে?

মোহনলাল।

আমার চটকা ভেঙে গেল। ইলেকট্রিকের আলোয় ঝলমল করছে। টাঁদিন সো চৌদ্দটি সাল। দূর থেকে রাইফোকোনে সেই গানটা এখনো অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছে। নিশ্চিন্তে লোক চলেছে পথ দিয়ে, বিশ্বাস চলেছে, মোটর আসা-যাওয়া করছে। তোমার ঠগী—কোন্ দূরে ইতিহাসের পাতায় কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তারা।

—কী বকছ বিমলেন্দু।

আমি দু-হাতে চোখ রগড়ালুম। সত্যিই তো—কী হচ্ছে এসব। যাবে যাবে এমন করে আমার বিমুনি আসছে কেন, কেন আমি এমন করে স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছি! কাল রাতে আমি প্রচুর ঘুমিয়েছি, ট্রেনে বিশ্রামেরও ছিল, কোনো অসুবিধে হয় নি—বরঞ্চ সারাটার মাঝখানে আরামটা আগে পর্যন্ত ঘুমের কোনো ব্যাঘাত ঘটে নি। আজকের দিনটাও তো বলতে গেলে বিশ্রামের মধ্যেই কেটেছে, তবু কেন এমন করে আমার চোখ ভরে ঘুমে নামছে।

মোহনলাল জিজ্ঞেস করল, কি হল হে? কথা বলছ না কেন?

আমি জোর করে হাসলুম।

—একটা গানের লাইন আওড়াচ্ছিলুম।

—গানের লাইন?—অবিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে মোহনলাল একবার আমার দিকে চাইল: কতি নেহি-কতি নেহি—এ আবার কি রকম গান?

আমি তখনো স্বপ্নে বললুম, বাঁধবার গান।

—হঠাৎ বাঁধবার কেন?

—আপত্তি আছে?

—না, আপত্তি নেই, কিন্তু ওরকম উদ্ভট হতে এর আগে তোমায় কখনো দেখি নি কিনা।

আমি আমার জোর ফুরে হাসলুম, তবুও কিছু না। মনে হল, যাতে দুঃখ আমার জোক আর কষ্টই হোক, যে-কোনো কারণে আমার বাইওলো ঠিক মতো বশ অবস্থায় নেই। চোখ বুজলুম, কপালের দু-ধারে দুটো শিরা উত্তেজিত হয়ে উঠছে, দপদপ করছে নাড়াটা। মোহনলালই ঠিক বলেছে, আজ রাতে আমার ভালো করে বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

সাইকেল-রিক্সাটা যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছিল। মোহনলালের বাড়ির গেট দিয়ে আবার ঢুকেছিলুম কম্পাউণ্ডের ভেতর। অতএব আলোচনাটা আপাতত এই পর্যন্তই বন্ধ রইল।

তারপর মোহনলালের ছোটভাই রতনলাল বেরিয়ে এল, এল ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, ওর মা এলেন, মোহনলালের স্ত্রী এসে হাসিমুখে দাঁড়ালেন।

● হুইস্কি পেগ

মোহনলালের দুই অন্ধ বাড়ি ছেড়িয়াটির আমি এর হস্তক্ষেপের ব্যাপারে দেখেছি, পরিচয়ের দরকার ছিল না আমি এর নামে প্রশ্ন করতে

ওপর হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বললেন, দুর্দান্ত হয়েছে বিকাশের। ফটো তোলো।

বললুম, ছবি-এবারের ফিল্ম, যে প্রশ্ন কিছু নয়। আসল কথা আমি মোহনলালের বন্ধু।

—তাহি বুঝি চন্দন বাবা এসে-এসো, ভেতরে এসো।

বাবলী অনুরোধ পুরোনো বাড়ি। মোহনলালের ঠাকুর্দা কিংবা এ অঞ্চলের তখনকার উঁচুদরের। প্রচুর পয়সা রেখে গিয়েছিলেন মোহনলালের বাবাও ওকালতিতে পসার জমাতে সুরু করে দিলেন, কিন্তু বড় হতে পারেননি। মোহনলাল আর বড়দাদা কেউই ওকালতির দিকে যাননি, দুজনেই চাকরি। বড়দাদা এখনেই কি-একটা-কি-তে আছে, মোহনলাল করছে এস্টাব্লিশমেন্ট সেকশনে কর্মচারী। এই বাড়িতেই সঙ্গে এক পক্ষ আমার পরিচয় এবং হৃদ্যতা।

বনেদী বড় বাড়িতে আগেকার ঐশ্বর্যের সে ছটা আর নেই, কিন্তু শ্রীহীনও হয়ে যায় বলে মোহনলালের সৌজন্যে ভাটা এখনো পড়ে নি। চাকরের মেয়ে বাবলী-ভবতারিণী, বছরখানেক এসে গেছেন, কিন্তু বিধবা মেয়েমানুষের বড় ঝাঁপি ঠাঁইটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েও এখনো ঝলমলে। ঠাকুর্দার লাগত হয়ে-যাওয়া বাসরঘরটি সবই এখনো প্রায় ঘরে নামানো হয় নি, ঘরে ইলেকট্রিক পাখা ঘুরছে, কিন্তু টানা-পাখার আড়ো এখনো রয়েছে, ইলেকট্রিকের আলো সত্ত্বেও দুটিনটি ঝাড়-লণ্ঠন এখনো ঘরের নিজের জায়গাটিতে। ঘরে কিসে নতুন আর পুরোনোর একটা অদ্ভুত আবহাওয়া। আজোবার দুপরে ভারী ভারী চেয়ার, ওপরে মেহগনীর ওয়ালনেপ টেবিল, প্রকাণ্ড একজোড়া শিংওলা, দরব হরিণের একটা অমোটি, সোনালি বা জলে-ধোওয়া বিবাট এক নক্সাকাটা ওয়াল-মিরর। আর পুরোনো চুন-বালির সেই অদ্ভুত ভিজে ভিজে গন্ধ—এইরকম একটা বাড়িতে পা দিলে যা প্রথমেই মানুষের মানুষকে উৎকণ্ঠিত করে তোলে।

একটা গদী-আঁটা চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে আমার আমাকে ঘিরে সেইরকম একটা ছায়া ঘনাচ্ছিল। মনে হল, টেবিলটার ওপরে কে যেন একটা ছুরোর ফ্রেম এনে রাখল, উগ্র ঝাঁকালো গন্ধ উঠছে তা থেকে, তার কোণায় কোণায় ফেনার বুদ ফুটছে যে যেন গলা নামিয়ে আমায় বলছে, হুইস্কি খারাপ লাগা—'

খারাপ!

চমকে তাকিয়ে দেখি, মোহনলালের স্ত্রী এসে চায়ের পেয়ালা রাখছেন সামনে। মোহনলাল খবরটার শেষ দিচ্ছে আমার কাছে : 'ও ভেল ? খাও

একটা ঝাঁকুনি দিল আমার ইন্দ্রিয়গুলো আবার যার-যার ঘরবাড়ি ফিরে এল। আমি তাদের পেয়ে টেনে নিয়ে হতবাক একটা চুমুক দিলুম ওপরে গরম

(বাকিটা ১৬৬ পৃষ্ঠায়)

ক্যাকটাসের ফুল

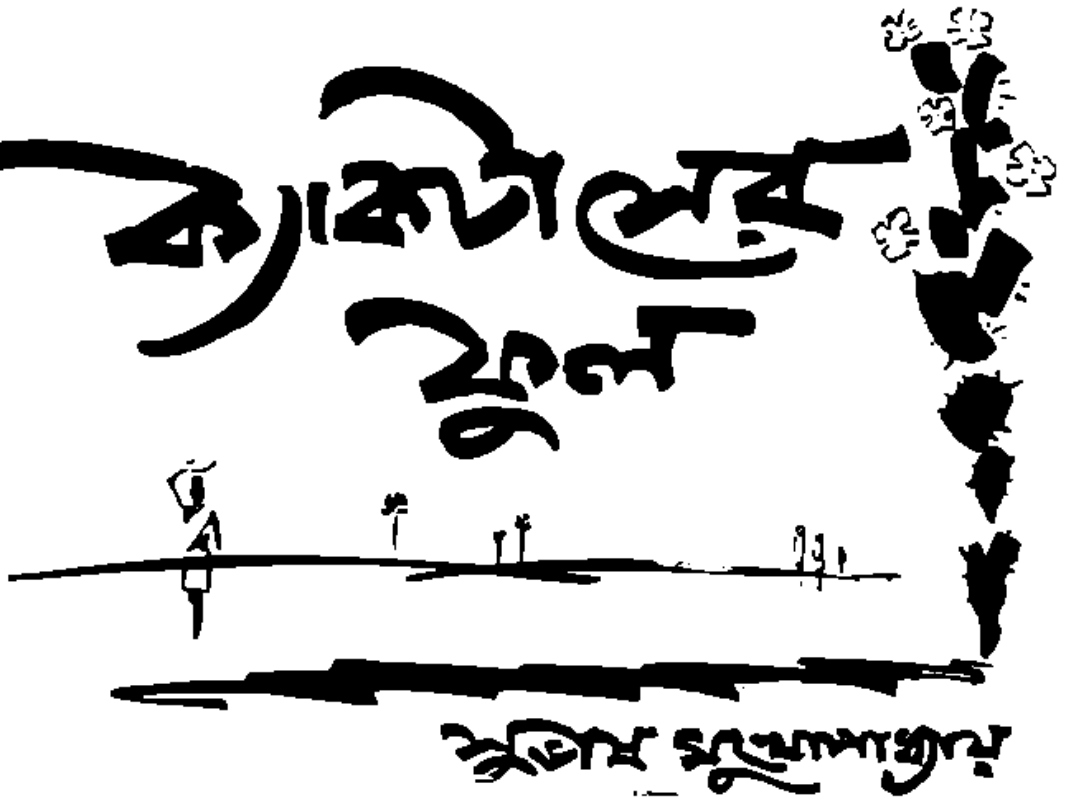

সুনীল মুখোপাধ্যায়

বা[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[

পূজোর রকমারি আজ!

রেডি ফুলঝুরি

চ্যবন পরেছেন কলা লৌহবর্ম

পত্রিকা পড়ছেন
প্রতিটি ছেটো প্রশংসনা

মুখ্যমন্ত্রী বরদাচরণ
পরেছেন
পাকিস্তানী
লুঙ্গী

মরণ সিং এর
পোষাক - বর্মী লুঙ্গী ও কাবুলী চপ্পল

নলজী পেরেছেন
বেবী-ফ্রক

আর,

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী
আজ বহুলন নেহরুজীর
পুরাতন কোটটি!

আমরা দুজনে খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না।

মাত্র তিন-চার ঘণ্টার আলাপে তাঁর আলাপের সুযোগে হয়েছিল বিস্তর। কলকাতা থেকে আমরা ট্রেন ছেড়িয়ে। ভদ্রমহিলা প্রায় সুরু করেছিলেন মাঝরাত্তিরে আর তাঁকে না উঠিয়ে পারা গেল না। ভদ্রমহিলা গজ গজ করতে করতে উঠে বসলেন। আমরাও ছাড়বার পাত্র নই। দুজনের বসবার জায়গাটা ঠিক আলাদা ক'রে নিলাম।

এবার ক্ষেত্রে যা হয়। 'তুমি কত দূর যাবেন' দিয়ে সুরু। তারপর কি ক'রে আলাপ জমে গেল আমরা নিজেরাই জানি না। সঙ্গে খাবার ছিল, আমাদের খাওয়ালেন। খাওয়াওয়া পরস্পরকে করা ছাড়া তখন আর করবারও কিছু ছিল না। কেন না আমরা প্রত্যেকেই পেটুক জাতীয় পেয়েছিলাম, তাতে দুজনের পার্থক্য এক করা যায় না।

আমরা যে কি বলেছিলাম, কিছুই এখন আর মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে: নকশল ইস্কুলের এক বয়স্কা আইবুড়ো মাস্টারনী বক্তব্যের অবতরণ এক টানে ধরিয়ে দেবে এক নিঃশ্বাসে বলে গিয়েছিলেন তাঁর জীবনের কথা। চিরকাল মানে নিজে নিজের হোই সংসার। মার বয়েস হয়েছে, তার ওপর একটা পা নেই। নাওয়ানো খাওয়ানো সবই মেয়েকে করতে হয়। ছাত্রীরা সকলেই প্রতিষ্ঠিত। বৌদিরাও ভাল। মাকে ওঁরা নিয়ে যেতে চান। কিন্তু মেয়েকে ছেড়ে না নড়বেন না। বড়দার মেয়ে সেল বছর বি-এ পাশ করেছে। আজ ছিল ওর পাকাদেখা। ও লিখেছিল—পিসি, তোমাকে কিন্তু আসতেই হবে। কাল এসেছিলাম। আজই ফিরে যাচ্ছি। মাকে একা ফেলে কোথাও কি যাবার জো আছে?

কম্পার্টমেন্টের মধ্যে একটা ঘলা-পাকানো সুরুতা।

চোখ বুঁজলে আজও সেই ট্রেনটাকে আস্তে আস্তে নিঃসাড় লোক ছাড়িয়ে ট্রাফিকের এরোপ্লেনে শুরুকারে মিলিয়ে যেতে দেখি।

বাঁকুড়ায় এবার গিয়েছিলাম অন্য রাস্তায়। দুর্গাপুর থেকে বাসে। ফেব্রুয়ারে মাটিতে পা পাতা যাচ্ছিল না। দুর্গাপুর এখন আর সে দুর্গাপুর নেই। ম্যাটিনি থেকে নেমে দেখি টাউন বাস, কেমন ভাসমান আর ট্যাক্সির মেন ছবির ছুট। সরকারী অফিস-আদালত বক্স-বেরকমের ঘর পাড়ি।

তারপরে খানিকটা তফাতে বকফুলের বাগের আড্ডা। জাংগোটাতে একটা খেরোতের মাখানো। অবেকটা অস্থায়ী আস্তানার মতো চায়ের দোকান। ঝিক্ ঝিক্ করছে কুয়াশা। ওম্ ওম্ করছে মাছি। ঐ চা-ই কিনতে হল।

বাসের মতো এরপাশ বরবারই। বর বসেছে আমার ডানপাশে। বয়েস চল্লিশের ধারে-কাছে। নাকের নীচে গোঁফের গায়ে লেগে আছে আলোর ঝিকমিক। মেঘে মেঘে ফোলবরকে খানাখা বরবাচ্ছে। শুকনোর মত ফোলের ওপর অ্যাটাচিকেসটা দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরা।

রেললাইন পেরিয়ে ব্যারেজ। তারপর ব্রিজ পেরিয়ে একছুটে বড়জোড়া। যেতে যেতে জানলা দিয়ে দেখলাম গ্রামের রাস্তায় ঘুলে ঘুলে চলেছে গাড়ি। এলে দেখলাম সবর।

রাস্তার পাশ বরাবর রং বলছে মাটি। লাল কাঁকর। পাটল ঘড়ের কোঁপরা পাথর। বন্ধ্য মাটি। মাঝে মাঝে তালডাঙা। দুপাশে আমাহার জমল পেরিয়ে চাষের ক্ষেত

মেঘে মেঘে হয় হস ক'রে পেরিয়ে যাচ্ছি মাইল কৌন।

চাষীদের গ্রাম। চায়ের দোকানের সামনে এই গরমে আবণ্ঠ পোশাক চড়িয়ে গরমে হাঁসফাঁস করছে চারটি লোকের ব্যাণ্ড বাজানোর একটি দল। তারপর আবার জমল। শালমহুয়ার বন বন। তারপর মহড়াপুকুর গ্রাম। এখানে কয়লার দোকান। গ্রাম পেরিয়ে আবার জমল। বাঁদিকে চলে গেল পরবাড়িচি।

আবার খানিকটা বন জমল। রাস্তার ধারে ধারে আম জাম কিছু। জমল শেষ হলে তকনো শালী নদী। নদী পেরিয়ে ইটখোলা। মাইল কৌনে চোখ পড়ল। এখনও চোদ্দ মাইল বাকী।

রোদের তাঁব জমল পড়ে আসছে। ঘুমিয়ে চাষের ক্ষেত। সর্ষে আর কলাই। রাস্তার ধারে ধারে লতাকোপ। ঝড় ঝড় কাঁশবনের।

সন্ধ্যে ঝড় গ্রাম ফেলেছোড়। নাবকরা ডালের মিষ্টি মনোহরা। বাঁশবনে পেরাল রাস্তার বড় ওয়েস্ট ফেলল ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের জবকালো সাদ-কেশন। বানকলের শানবাঁধানো চত্বর ঠা-ঠা রোদ্দুরে খান তকোতে দিয়েছে মেয়েরা। বাঁদিকে পেট্রোল পাম্প। মাথার ওপর মাইক্রোফোন লাগিয়ে তিনটী গান বাজাতে বাজাতে উল্টোদিক থেকে এল একটা বিলাতি-বরা বাস। ভাল ক'রে টহর করা গেল না। নিকর বিয়ের পার্টি। আঁকাবাঁকা রাস্তা ঘুরে বনগ্রাম। পর পর অনেকগুলো ইটের দালানকোঠা। খানিকটা জায়গা ঘেরে বাঁ হাতে আবার পাল-তোলের জমল। জমল আর রাস্তার মাঝখানে ফালি ফালি চাষের জমি। বেশির ভাগই পাথুরে ডাঙা।

নাম-না-জানা গ্রাম পেরিয়ে জমল কাছে এসে এল। এবার ছোট ছোট আমাহার বন। ঢেউখেলানো উঁচু-নীচু মাঠ। তালডাঙা আর খোয়াই। মধ্যে মধ্যে ঝিক্ ঝিক্ করছে সরু রাবিফসল। হঠাৎ হঠাৎ একটা ছুটো কবর।

রাস্তার একধারে কাত হয়ে আছে বিপদে-যাওয়া ট্রাক। খাদারে নাগরা-পরা পা ঝুলে চাকনা-খোলা ইঞ্জিনটার মধ্যে হুঁহুস হুঁহুস করছে মাঝবয়সী শিখ ড্রাইভার। ধারে কাছে জনপ্রাণী নেই।

গ্রামে ঢুকবার ঠিক মুখটাতে এক পাড়োয়ান তার বলদ দুটোকে ছোলাসেদ্ধ খুলে খাওয়াচ্ছে। দুইয়ে নাঁড় পুঁটলি পাকিয়ে কাঁচা ছয়ে বসে আছে লাল চেলীপরা বাচ্চা বউ। তার ঠিক পায়ের কাছে পুড়নো হয়ে যাওয়া একটা পোটফোলিও ব্যাগ।

মাটির রং আর লাল নয়। ফিকে। গঞ্জ মত গ্রাম। খড়ো চালা। চা আর পান-সিগারেটের দোকান। জাল দেওয়া বাজের মুখে ঝিঙড়ি বাজিল। তাকে-রাখা চারখিনার পাসিংশো কাঁচি। নম্বর টেনের খালি প্যাকেট।

তারপর আবার সোদরা মাটি। চষা ভূঁই। তাল খেজুর। বাঁকুড়া ঘনিয়ে এল। উঁচু উঁচু আলবাঁধা জমি। গ্রামের ধারে আমবাগান। ছাওয়েল মুখ-বন্ধ পাত্র ঝুলিয়ে গ্রামে গ্রামে সাইকেলে দুধ বিক্রি করছে গয়লার একদল রোগাটী সোয়ালা।

বাস এসে গেল শহরের ভেরায়। বাজারের দিকটা দেখে বিড়ি, চেনানি নোংরা। বিড়ির পাতা আর শুখা তামাকের বড় বড় আড়ত। বড় বড় ব্যবসার অনেকগুলোই অবাঙালীদের হাতে।

শহরের আরেকটা দিক খোলামেলা। সেখানে সরকারী স্কুলের সুযোগ গাংলো বাড়ি।

(শেষাংশ ১৮০ পৃষ্ঠায়)

অভিনেত্রী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

শারদীয় সাপ্তাহিক বসুমতী : ১৩৭১

প্রভাস বলল, 'উঁ, পুরুষের ব্যবস্থা।'

মীরা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'সবকিছু ছেড়ে উঁড়িয়ে দিলেই হয় না। একটু সকাল সকাল উঠে বাজারটা এনে দিলে কি ক্ষেত্র হয় শুনি?'

প্রভাস হাসল, 'এতো মহা ফিচকে এলো। তোমার বুঝি আজ আর অফিস-টফিস নেই? খুব যে নিশ্চিন্তে হাওয়া খেতে বেরুচ্ছ।'

মহু উঠোন থেকে বারান্দায় উঠল। ঘরের সামনে বেশ বারান্দা। জানুয়ারি মাসে ছোট একটু মাদুর পাতা। দেওয়ালে ঘড়িখানা তার পিছনে। সেই ঘড়ির দিকে মীরাদির সতর্ক।

'প্রভাস ডাকলেও মহু একটু ইতস্তত করছে। সে পারতপক্ষে এদের মধ্যে ঢুকতে চায় না। ঢুকলে তার মন বড় হয়ে যায়। ঘরখানি ছিমছাম। ঘরে মানা খাট আছে, একটা আয়নাচাটা আলমারি, চেয়ার, আলনায় রেডিও কৌত পিকচুর এক রাশ ফেলনা ঘরের মধ্যে না আছে এমন জিনিস নেই। মীরাদি নিজেই সুগৃহিণী। একখানা ঘর সর্বাঙ্গসুন্দর করেছে। ইচ্ছা করলেই একখানা স্কুলঘরের ফ্লাট মীরাদি নিতে পারত। তখন খাদি ছিল। এখন আর খাদি নেই। তখন মীরাদি নিল না। তখন বলল, 'ও তে বড় পঞ্চাশের টাকা বাড়িভাড়া দিয়ে যাব কি

এখন কিন্তু ওর দুখানা ঘরেরই দরকার। প্রভাসের রোজগারও বেড়েছে। পার্টটাইম কাজ নিয়েছে। ইনসিওরেন্সের এজেন্সি নিয়েছে। কিন্তু পছন্দসই বাড়ি আর পাচ্ছে না।

প্রভাস বলল, 'আ রে এসো, ঘরে এসো। যে বাদলী দিনা কেন?'

মীরা কড়ার খুন্তি চালাতে চালাতে বলল, 'যা মহু ঘরে গিয়ে বোস। ওত আদর করে ডাকছেন দেখছিস না? তোকে দেখলে ওঁদলোকের কবিতা বেরোয়, গান বেরোয়।'

মহু আরও কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, উঁহু, তোমার খোঁটা শুনতে শুনতে প্রাণ গেল মীরাদি। প্রভাসদা, আপনি মাঝে মাঝে মীরাদিকে কবিতা শোনাবেন, গান শোনাবেন। তাহলে আর আমাদের দুজনের এমন করে খোঁটা শুনতে হবে না।'

মীরা একটু হেসে বলল, 'তোমাদের দুজনের আজ অফিস বটায়? গা ছেড়ে দিয়ে বাড়ি বসেছ তো দাড়িই বাগাচ্ছ। তোর বুঝি আজ আর আপিস-টাপিস নেই মহু?...

মহু বলল, 'না মীরাদি। অন্য আর ইচ্ছে নেই। আজ আমাদের ডিসেটার। ছাতুবেলে দাঁত দিয়ন এক দিনের জন্য। কার্ড চেয়েছিলো। ছখানা কার্ড এনেছি তোমাদের জন্যে।

মীরা একটু খুশি হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমার যা অবস্থা, আমি কি যাব যেতে পারব তাই। কার্ড তোর প্রভাসদার হাতে দিয়ে যা। উনি যদি কোন বন্ধুবান্ধব নিয়ে যান যাবেন।'

মহু বলল, 'কেন মীরাদি, তুমি যেতে পারবে না? তাহলে তো অর্ধেক আনন্দই মাটি।'

মীরা বলল, 'ওই বাকি অর্ধেক নিয়েই এবারকার মত খুশি হয়ে থাক মহু। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। এবার বড় নরম হয়ে পড়েছি।'

মহুর এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না। এবার খেয়াল হল। মীরার চোখে চোখে তাকিয়ে একটু হাসল মহু। এতক্ষণে খেয়াল হল মীরাদির বড় সুখের অসুখ। বাচ্চা হবে। একেবারে আসন্ন অবস্থা। যে কোনদিন নার্সিংহোমে যেতে হতে পারে।

মহু বলল, 'তা হলে কার্ড দুটো আর নষ্ট করে কি হবে। নিয়ে যাই, কি বলেন প্রভাসদা?

প্রভাস তার সাদাকালো মুখখানা মহুর দিকে ফিরিয়ে বলল, 'না না, কার্ড ফিরিয়ে নিয়ো না আর কেউ না যায় আমি তো যেতে পারব। তোমার অভিনয়ের কথা কেবল শুনে এসেছি। কখনো দেখি নি। আজ যখন সুযোগ এল অবশ্যই দেখতে হবে। দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাবে।'

মহু হেসে বলল, 'মীরাদি যাবে না, আপনি একা একা যাবেন? একা যেতে কি ভালো লাগবে আপনার!'

মীরা বাহুর কড়াটা উনুনের উপর থেকে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'খুব লাগবে। একা কি আর যাবেন তোমার প্রভাসদা? অফিস থেকে একটি বান্ধবী ঠিক জুটিয়ে নিয়ে যাবেন দেখো।'

মহু একটু কৌতুক বোধ করল। সে বস্তুত জানে প্রভাসদার তেমন কোন বান্ধবী-টান্ধবী নেই। তবে অনেক মেয়ের সঙ্গেই জানশোনা আছে, অফিসে, অফিসের বাইরে অনেক মেয়ের সঙ্গেই প্রভাসদা হেসে কথা বলেন। কারো কারো সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্পও করেন। বাসস্টপে অনেকের সঙ্গে ওঁকে আলাপ করতে দেখা যায়। বাসেও কোন মেয়ের পাশে বসে প্রভাসদা বিনিময় বসে যান। আলাপে ব্যবহারে মানুষটি খুব সামাজিক। তাঁর সামাজিকতা পুরুষের সঙ্গেও যেমন আছে মেয়েদের সঙ্গেও তেমনি আছে। কিন্তু মীরাদি মেয়েদের সঙ্গে স্বামীর বেশি মেলামেশা পছন্দ করে না। কোন মেয়েই বা করে, কেউ অপছন্দটা চাপা রাখতে পারে, কেউ বা পারে না। মীরাদি পারে না। প্রভাসদা কখন কোন মেয়ের সঙ্গে একটি বেশি কথা বলে তাই নিয়ে দুজনের মধ্যে বেশ কথাকাটাকাটি ঝগড়াঝাঁটি হয়। মহু কোন কোন সময় ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করে। আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। আবার কোন কোন সময় দুঃখও পায়, অত্যন্ত অবশ্যি চোখে হাসতে হাসতে মীরাকে বলে, 'তোমার মত ভয় কিসের মীরাদি! কার এমন সাধ্য আছে তোমার কর্তাটিকে তোমার হাতের মুঠি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়!'

মীরা বলে, 'ছিনিয়ে নেবার লোকের অভাব নেই যে অভাব নেই। তুই তো আর ওদের দিকে দেখিস নে। গেলে বুঝতিস। পুরুষ মানুষ আসলে চোর। সুবিধাবাদী। ওদের চোখে চোখে, হাতে হাতকড়ি বেঁধে না রাখলে রাখা যায় না। ওরা সব মেলে আর একজনকে নিয়ে পালাতে পারে। পুরুষ এমন জাত।'

এ সব কথা নিয়ে প্রভাসের সঙ্গেও মহুর আলোচনা হয়। মীরার সাক্ষাতেও হয়, অসাক্ষাতেও হয়। অবশ্য আলোচনার ধারাটা ধরনটা তখন আলাদা হয়ে যায়।

কৌতুকের বলে মহুর গলায় সহানুভূতি ফুটে ওঠে, 'কেন, সাধ করে এমন দুর্ভোগ তোর করেন, বলুন তো! নিজেও নাজেহাল হন, মীরাদির মনেও অশান্তি আনেন। অনর্থক কষ্ট দেন তাকে। নাইবা বললেন আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে কথা। নাইবা তাকালেন, নাইবা হাসলেন আর গল্প করলেন, তাদের সঙ্গে।'

প্রভাস হেসে বলে, "ওরে বাবা তাহলে জগৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। জল ছাড়া মীন বাঁচে কতক্ষণ? আমার সেই দশা।'

মহু হেসে জবাব দেয় 'আপনার কপালে আরো দুর্দশা আছে।'

কিন্তু মহু আজ মীরাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'তোমার ভয় নেই মীরাদি। প্রভাসদার সাধ্য নেই কোন বন্ধু-টন্ধু নিয়ে যাবেন। আমার মাকে পাঠাব ওঁর সঙ্গে। পাহারাদার হয়ে পাশে বসে থাকবেন। এদিক-ওদিক

ওকাতে পর্যন্ত পারেন না। সেই 'ভালো প্রডাকসন' আপনি যদি কখন আমার মতো সুস্থ দিতে পারেন। মনে আমার অভিনয় পর্যন্ত হেসে নি। হেসে ঘুমোবার-ফুরসৎ হয়ে ওঠে নি। ঘুমে নয়ন ওঠে ভেটে নিয়ে যাবে?'

প্রডাক্ট বলল, 'কেন তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পার না?'

বহু বলল, 'না প্রডাকসন। মেকআপ-টেকআপ নেওয়ার জন্যে আমাকে তো খানিকটা আগেই যেতে পড়তে হয়। তাছাড়া এক-এক ছবির এক-এক রকমের নিয়ম, এক-এক রকমের অবস্থা। কোন কোন ছবিতে শিটিংয়ের আগের দিনের রাত দুটো দুপুরটা আগে দিয়ে বসে থাকতে হয়।'

মীরা বলল, 'তাহলেই তো মেকআপের ওপরে এরকমের অভিনয় করিস প্রীন-রুমে বসে আর এক রকমের অভিনয়। সুবিধেই তো হয় তাতে।'

বহু বলল, 'তাই বুঝি ভাবো মীরাদি? যাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে। আপনাকেও যেতে দেরি করিয়ে দিলাম প্রডাকসন। যাবেন কিন্তু, কার্ড নষ্ট করবেন না।'

দুখানা কার্ড প্রডাকসনের হাতে রেখে বহু বেরিয়ে এল।

দুই

অভিনয় শেষ করে নিজেকে ফিরতে বহুর রাত প্রায় এগারটা হল। বহুদের ক্লাবের একটি-দুটি ছেলেই ট্যাক্সি করে বহুকে পৌঁছে দিল। আরো দু-একজন অভিনেতা-অভিনেত্রী পথে নেমে গেলেন সবাই বলল, 'বহু, তোমার পার্টটি কিন্তু আজ বেশ হয়েছে।'

ছেলে দুটিও তাই বলতে লাগল। 'বেশ হয়েছে বহুদি, আপনার অভিনয় আজ খুব ভালো হয়েছে। খুব হাততালি পেয়েছেন আপনি।'

বহু বলল, 'তোমরাও দিয়েছিলে তো?'

একটি ছেলে বলল, 'আমাদের হাত যে জোড়া তালি দেওয়ার কি আর জো ছিল।'

শহরতলি এই রাত্রে নির্জন হয়ে পড়েছে। বড় রাস্তা দিয়ে দু-একখানা বাস মাঝে মাঝে চলছে। দোকানপাটগুলি বন্ধ। রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। বহুর বরাবরই গভীর রাত্রে ট্যাক্সিখানা পাওয়া শিউরে গাড়ি চুকবে না

ট্যাক্সি পেয়ে বহু গভীর নিশ্চিন্তের সঙ্গে সীটে হেলান দিয়ে বসতে লাগল।

বাইরে কি রকম ঠাণ্ডা পড়েছে কোন্নগরের বাড়ির কথা ভাবছিল। শিউলিতলাটা রোদের দেখে কি রকম বড় হয়ে উঠেছে এতে শিউলির গন্ধও যেমন তীব্র হয়, অনেকটা হাসনাহেনার গন্ধের মতো।

অভিনয় ভালোটি হয়েছে, হাততালিও পেয়েছে বহু প্রথমের দৃশ্যটি নিজেও বেশ সুখ্যাতি করেছেন অন্য সবার মনটা কেমন যেন ভার হয়ে আছে যেতে কেউ মন নি মন প্রডাকসনও মন নি, বহু ভাবতে লাগল। অভিনয় শেষ হবার পর

● কার্ড যেন প্রডাকসন হাতে দিয়ে

কাছে এসে ঠেলে ঠেলে [illegible] অপেক্ষা করছিল [illegible] চোখ এড়ায় নি। সে একটু-চুপ্‌কি হেসে বলেছিল, 'কি গো মশাই ওরকম করছিস?'

মধু বলে নি, হেসে বলেছিল, এরকমই চলছে।'

সুলতা যদি ভুল বোঝে তো বুঝুক। তেমনই ভয়ের নয়, মধু তার একজন হিতৈষী বন্ধুর অভাবই আশঙ্কা করছে। ১খানা পা.জন ম'ন একটু অন্যরকম সুরে আলাপ পায় তো পাক।

কিন্তু সেই বন্ধুর মুখও আজ আর দেখতে পেল না মধু। যে অপরিচিত দর্শনের ইঙ্গিতাভাস পেয়েছে ইতিমধ্যে। কিন্তু একটি পরিচিত মুখের হাসি দেখার সুখ মধুর ভাগ্যে আজ আর ঘটে নি। শুধু আজ কেন অনেকদিন ঘটে নি। কোনদিন আর ঘটবে কিনা কে জানে।

কত নার্ভাসনেস কে এক্ষুণি ধুয়ে দিলেন। অতি বৃদ্ধা বিধবা মা। মুখে একটিও বলিরেখা, মাথার চুল সব পেকে গেছে। কিন্তু সেই লম্বা চুল তিনি ছোট করে ছেঁটে ফেলেন নি। সেই চুলের বোঝার জন্যে চোখদুটি আরো করুণ দেখায় সুনয়নীর বাইরের ঘরের আলো জেলে তিনি ডেকে বললেন, 'আয়।'

মধু বাইরে দাঁড়িয়েই বলল, 'কি হল মা? তোমার যে কেউ খেলে না। আমি ভেবেছিলাম তোমার জন্যে অন্তত আধবাটি রেখে দিয়েছিলাম।'

সুনয়নী বললেন, 'ভিতরে আয় সব বলছি।'

মধু গম্ভীরভাবে ঘরে ঢুকল।

বেডরুমের ছোট একখানা তক্তপোষ। তাতে মায়ের বিছানা পাতা। খান দুই চেয়ার, তার একটিতে বসে মধু বলল, 'কি হল তোমাদের?'

সুনয়নী বললেন, 'বলছি। খিয়েটারের কাপড়-টাপড় ছাড়। হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে-টেয়ে নে। তারপর বলছি। অমনার মত এমন কোন কথা নয়।'

'অত ভণিতা করছ কেন। কি হয়েছে বলেই ফেল না।'

মধু এবার ধমক দিল তাকে।

সুনয়নী তক্তপোষের একপাশে বসে বললেন, 'ভাবই তো ভেবেছিলাম। প্রভাসও আজ পাঁচটার আগেই অফিস থেকে চলে এসেছিল। আমার সঙ্গে দেখা করে বলে গেল, বাসুদা আপনি তৈরি হয়ে থাকুন। মেয়েরা সব আপনাকে নিয়ে যাব। আমার তৈরি হতে আর কতক্ষণ লাগে। কাপড়খানা বদলে নিলাম। এসে আছি তো আছিই। তারপর তুমি ঘুমিয়ে পড়ে মেয়েদের।'

'অমনা-টমনা?' মধু জিজ্ঞাসা করল।

'না, মনঃক্ষুণ্ণ নয়। প্রভাস অফিস থেকেই মানুদের পাড়ায় যাবার উঠল। সে ওকে নিয়ে যাবে। ভয়ে ওকে ডাকে নি।'

'ওই সকলকেও তো জেনে কিছু বলেছিস না।'

'আগে শোন, ঘরে গেয়ে আমি সোজা ওদের ঘরে। প্রভাসকে বললাম চ্যাম্পি তাকো। বইটই নিয়ে যাও, নার্সিংহোমে। সেখানে তো সব ঠিকই আছে। প্রভাস বেরিয়ে গেল। ওই সময় ট্যাক্সি পাওয়া কি সোজা? আনতে আনতে দেরি হল। তারপর বইটই নিয়ে শ্যামবাজারে নার্সিংহোমে চলে গেল প্রভাস। আমি ওদের ছেলেকে আগলে রইলাম।'

মধু বলল, 'বীরাদি কি নার্সিংহোমে ভর্তি হয়ে গেছে? বাচ্চা-টাচ্চা হয়েছে নাকি কিছু?'

সুনয়নী একটু হেসে বললেন, 'আগে শোন, তবে তো। বীথি আর ঘণ্টা খানেই প্রভাস বইটই ফিরিয়ে নিতে এসেছে। ডাক্তার বলেছিলেন এখনো কিছু হবে না।'

মধু বলল, 'তা'হলে ফলস পেইন।'

সুনয়নী বললেন, 'কি জানি বাপু। ওরাই বলতে পারে। আমি তো বাপু ওর শরীর-টরির কিছু খারাপ দেখলাম না। অমন বাবাই বা উঁচে কেন তাও কিছু বুঝলাম না।'

একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে মধু গম্ভীরভাবে বলল, 'আমি সব বুঝেছি মা।'

সুনয়নী বললেন, 'বুঝিসই যদি, তাহলে কেন ওদের সঙ্গে বাধাবাধি করতে যাস। আর যাস নে। নিজের মনে নিজে থাকবি। আর কারো কাছে যাবি নে।'

মধু বলল, 'তুমি জল খাবার-টাবার কিছু খেয়েছ।'

'না।'

'তুমি খেয়ে নাও। আমি কিছু খাব না মা। কাপড়টা ছেড়ে আমি শুয়ে পড়ব। শরীরটা ভালো লাগছে না।'

সুনয়নী এগিয়ে এসে ছেলের পিঠে হাত রাখলেন। তারপর একটু হেসে সস্নেহে বললেন, 'এত অভিমান কেন রে তুই? পরের ওপর রাগ করে না খেয়ে থাকবি?'

মধু আবার ধমক দিয়ে উঠল, 'এর মধ্যে আবার রাগারাগির কি আছে মা? তুমি যখন তখন আমাকে বড্ড জ্বালাও।'

সুনয়নী বললেন, 'পোড়াকপালি, জ্বালাবার তোর আর কেই বা আছে?'

মা খাইয়ে না দিয়ে তাকে ছাড়বেন না। সারারাত বক বক করবেন। মিথ্যে ঘুমাবেন না, মধুকেও ঘুমাতে দেবেন না।

মধু তাই আসছি বলে নিজের ঘরে ঢুকল। পাশেই আর একখানা ঘর তার আছে। মায়ের ঘরের চেয়ে ছোট। এ ঘরে তার তক্তপোষ, বইয়ের সেল্ফ। তাকের ওপর প্রসাধনের টুকিটাকি জিনিস। দেয়ালে একটু বড় একখানা আয়না। সেই আয়নায় মুখ দেখলে মধু। মুখের মেকআপ সব ওঠে নি। মধু হাসল। আজ ছোট একটি প্রণয় উপাখ্যানে অভিনয় করতে হয়েছে মধুকে। নায়িকা নয়। নায়িকার রোল সে কোনদিনই পায় না। কালো ছোট খাটো চেহারায় হিরোইন কি মানায়? হিরোইনের নন্দের ভূমিকাটি তার ছিল। কলহাটে ননদ। দাদার সঙ্গে কলহ করে, বউদির সঙ্গে কলহ করে। কিন্তু দাদার একটি যে বন্ধু আছে, তার সঙ্গে কলহ করে না। গোপনে গোপনে তার সঙ্গে ভাবি ভাব। উপাখ্যানটি বিয়োগান্ত নয়। বন্ধুটি দূর দেশে গেল চাকরির জন্যে। কিন্তু যাওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল। যাওয়ার আগে বউদির সেই কলহাটে ননদের জীবনকে মধুর করে দিয়ে গেল।

মধু আলনা থেকে নীলপেড়ে আটপৌরে সাদা ধোপের শাড়িখানা পেড়ে নিয়ে বাথরুমে ঢুকল। খানিকবাদে মুখ হাত ধুয়ে বেরিয়ে এল।

মা তাঁর ঘরেই আসন পেতে খাবারের থালা সাজিয়ে বসে আছেন। যেদিন থিয়েটার থাকে সেদিন আর মধুকে তিনি রাঁধতে দেন না। নিজেই রাঁধেন। এখনো মধুর চেয়ে ভালো রাঁধেন মা। রুটি কি লুচির সঙ্গে ডালটা ভালোবাসে মধু। ডালের সঙ্গে ডাল, নিরামিষ তরকারি, মাছের ঝোল, আর একটু মাছের টকও রেঁধেছেন মা। মাছের টক কেন ভালোবাসে মধু।

কিন্তু আজ খেতে খেতে মাকে ধমক দিল, 'এই রাত্রে এত পদ করতে গেলে কেন বলতো।'

সুনয়নী বললেন, 'কি আর এমন করেছি বা? না খেলে কি শরীর থাকে।

(বেয়াল্লিশ ১৭৪ পৃষ্ঠায়)

চৈতন্যজীবনে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃন্দাবনলীলার রাধাকৃষ্ণপ্রেমের নিগূঢ় তাৎপর্য চৈতন্যদেবের বাস্তবজীবনে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। যুগের অতীত যুগের অলক্ষ্য অন্তর্দৃষ্টির চক্ষুলোক যেখানে স্বচ্ছন্দবাধ সৃষ্টি করিত, একান্ত ভক্তিসাধনার আবেগ যেখানে ঐহী-অনুভূতির ঘাত-বিঘাতে জীবনশিল্পের ইঙ্গিতে অমর হইয়া উঠিত, বাঙলার ষোড়শ শতাব্দের ঐতিহাসিক দিবালোকে চৈতন্য-জীবনে, তাহা বিশেষ উপাদানের সাহায্যে, পরিচিত জীবনবৃত্তের নূতন আবেষ্টনে তাহাই পুনর্রচিত হইয়াছে। বস্তুজীবনের এইরূপ ঐতিহাসিক রূপান্তর, দিব্য প্রেমের এইরূপ অভাবনীয় বাস্তব-সঙ্গতি এক শ্রীচৈতন্যের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল। বৃন্দাবনের ভাবরাজ্য, প্রেমতত্ত্বের নৈগম-সরলতা ও মুগ্ধ আত্মবিস্মৃতি, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের একদিকে স্বয়ংসিদ্ধ, অপরদিকে সহজ-মধুর রূপের রোমাঞ্চিত অনুভব যেন কোন্ সাধনে ইতিহাসের তাড়নায়, প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতা ও অপ্রাসঙ্গিকতা, নাগরিক সমাজের চক্ষুর্বিক্ষেপ ও কটাক্ষবিদ্যার অভিজ্ঞতা কাটিয়া প্রাণার্দ্রিক নবদ্বীপের পথে-ঘাটে ভূপরিক্রমা, ভাগ্যবিপর্যয়ের শুষ্ক-শীর্ণ তটভূমিতে নবরসপ্লাবিত করিয়াছে।

বৃন্দাবনের ভাবনিষ্ঠ হৃদয়কুঞ্জে যে পরিজ্ঞাতবৃত্তান্ত বিকশিত হইয়াছিল, নবদ্বীপের ইতিহাসের প্রখর রৌদ্রতাপে তাহাকে নূতন করিয়া রোপণ করিতে গিয়া প্রক্রিয়া ও প্রকৃতির কিছু অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যে রাধাকৃষ্ণপ্রেম অন্তরঙ্গতর হইয়াও বাহিরের দিকে নানা ভাবা-প্রভাব সৌন্দর্যাহরণ করিয়াছিল, যাহা পূর্বরাগ-অভিসার-মান-বিরহ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবসঞ্চারিবৃত্ত হইয়া নাটকীয় পরিণতিতে মুখ হইয়াছিল, যাহা মধুরের বন্ধনা ও মুগ্ধ সৌন্দর্যবোধের বিচিত্র প্রসঙ্গে ঘনীভূত কবিতা অর্জন করিয়াছিল, তাহা এখন স্পন্দনহীন অন্তর্মুখী হইয়াছে, বহিরঙ্গ বিস্তার অন্তরঙ্গে আত্মসংহরণ সংকুচিত হইয়াছে। লীলাবৈচিত্র্য ভাবাবেগস্তব্ধতায়, দিব্যোন্মাদের বাস্তব বিস্মৃতিতে আত্মসংহরণ করিয়াছে।

সর্বাপেক্ষা গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে রাধা-কৃষ্ণের যুগ্ম সত্তা এক অখণ্ড-অদ্বিতীয়তায় বিলীয়মান হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব একাধারে রাধা ও কৃষ্ণ এই যুগল ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার প্রত্যহমান পার্থক্য ভাবের লীলাবিলাসের অন্তর্হিতরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। বৃন্দাবনের রাধাদর্পণে যে ভাবসত্য রূপরসগন্ধের বৈচিত্র্যে আত্মনিরীক্ষণ করিয়াছিল, নবদ্বীপে সে রাধাদর্পণের অভাবে তাহা অন্তর্মুখতার বহির্বিমুখ নিস্তব্ধতার প্রতীয়মান হইল। পুরুষ, নাম, অঙ্গগন্ধ, বিরহ প্রভৃতি ভাবেন্দ্রিয়ের বহিঃপ্রকাশের মধ্যেই যখন ভাবের পরিচয় সীমাবদ্ধ। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের ঐতিহ্য ও মানসিক বিকাশের মধ্যেই তাহাকে অন্বিষ্ট করিতে হইবে। বিশেষতঃ চৈতন্যের বিশ্বপ্রেমে নবদ্বীপচেতনাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তাহার প্রেমিকার প্রত্যক্ষতা হইতে অন্তর্দৃষ্টির দেহহীন সৌন্দর্য ও বিশ্বোত্তীর্ণের অনির্দেশ্যতায় ব্যাপ্তি হইয়াছে। রাধাকে তিনিই সৃষ্টি করিয়া, একদিকে [illegible] কবিতাটিকে তাঁহার স্বরূপসত্তা করিতে, অন্যদিকে বৈষ্ণব দর্শনের তাঁহার দার্শনিক তাৎপর্য [illegible] পরোক্ষ প্রেরণা দিয়াছেন। তিনিই রাধাভাবে চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া [illegible] রাধার প্রেমরসলীলা পরিবর্তে [illegible] নূতন ব্যঞ্জনা পাইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুভব করা যায়।

সাধারণ লোকের পক্ষে কল্পিত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্ব কিরূপ চিত্তবিভ্রমের সৃষ্টি ও সম্পূর্ণ অন্তর্মুখীতাবে চৈতন্যদেব তাহার আদর্শ স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। বৃন্দাবনলীলার আদর্শের অনুকরণ প্রায় সম্ভবও নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে। অবশ্য মহাজন পদকর্তারা ও দর্শনতত্ত্ববিদেরা বৃন্দাবন ও বৃন্দাবনলীলার পরিচয় বর্ণন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের রচনার মধ্যে নবদ্বীপের তৎকালীন সমাজ ও প্রকৃতি-পরিবেশের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয় না। বৃন্দাবনের নিত্যলীলা রোমন্থনমুখর অতীত পর্যন্ত অনুভবের বর্তমান আছে ভক্তসাধকের

[illegible]
[illegible]
[illegible]

সাধন করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণ বাঁহাকে হইতেছে বিশ্ব-সংসারের সারাৎসার হইতে পারে

কৃষ্ণ তাঁহার অন্তর্নিহিত মধুর এই দিব্য প্রেমের বিশ্বব্যাপক বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার বাঁশী কৃষ্ণকে ছাড়া আর কোথাও যায় নাই।

পূর্ণ ভগবান প্রীতি দান করিতে পারেন নাই, সেইজন্য শ্রীচৈতন্য তাহা সন্ধান করিয়াছেন। তিনি বহু ভক্ত-ভাবুক হৃদয়কে নিজেই এই মধুর রসের উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ভাগবত ও পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা তাঁহার বিচিত্র ঐশ্বর্যময় জীবনের একটি অংশ মাত্র। ইহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে ও অস্পষ্ট আভাসে মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে কৃষ্ণের জীবনে ইহাই যে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়, কৃষ্ণচরিত্রের ইহাই যে সার্থকতম সৌন্দর্যসৃষ্টি এরূপ কোন ইঙ্গিত কোথাও সুস্পষ্ট নয়। ভাগবতে রাধা অনুপস্থিতা ও তাহার প্রসঙ্গোল্লেখ একেবারে প্রচ্ছন্নপ্রায়। অপরদিকে প্রত্যক্ষজ্ঞান-ভিত্তিরূপে ইন্দ্রিয়-রহিত মাত্র মনের সূক্ষ্ম ও কুহক সাহায্যে নামরূপের প্রবেশাধিকার পূর্ণভাবে তাহাদের 'মনের কোন স্বীকৃত অর্থ নাই এবং ঐ বর্ণনাও ভক্তলীলার্থবহির্ভূত। নীরব দ্রষ্টা মাত্র, চৈতন্যদেবের অনুভূতিতে এই বিবরণ-সংকুচিত ও একেবারে বর্জন, আবেগ বিহ্বলতা ও ব্যক্তিত্বের বহুমূল্যে সজীব। জয়দেব বহুচতুরতায় ও বিদ্যাপতি কবিত্বপূর্ণ, ভক্তিবিগলিত ও মানবিক আবেগের মূর্ছনের দ্বারা এই তত্ত্বমূলক নীরবচিত্রে রং ও রসের সংযোজনা করিয়াছেন। তাঁহারা রাধাকে প্রাকৃত নায়িকারূপে বর্ণনা করিয়া উহারই মধ্যে মাঝে মাঝে অপ্রাকৃত আবেশ-মুহূর্ততার সঞ্চার করিয়াছেন ও তাহার চারিদিকের পরিবেশে নানা ভাবসঙ্কেতের মায়াজাল বুনিবার পরিচয়ের ইঙ্গিত বিস্তার করিয়াছেন। আমের ক্ষুদ্র শিলালিপি জীবনগ্রন্থের পাতায় কোথাও বর্ণবিন্যাসে মুখর হইয়াছে। সখীরা আর বৃন্দাবনীর আসবাব মাত্র নাই, হাস্য-পরিহাসে, সরস টীকা-টিপ্পনীতে, নায়িকার মনের কথার সহিত সহমর্মিতায়, প্রেমলীলার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণিনী হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণসখাদের মধ্যে অন্তত একজন 'মধুর সাধারণ গোপন প্রেমের সহযোগীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। বলরামের সহিত যদি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে তাঁহার প্রতিরূপ নিত্যানন্দের তুলনা করা যায়, তবে সন্দেহই পরবর্তীদের

তাঁহার স্তরের পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের নির্দিষ্ট চরিত্রমূর্তির দৃঢ়তর কাঠামোর সাথে সম্পর্কের পূর্বাপেক্ষা কঠিন শ্রীরাধা-কল্পনার পটভূমিতে যে দিব্য প্রেম গৌরব প্রেমের উপযোগী সঙ্কল্প ছিল তাহার অনেকটা বর্জন অনুসরণ ও প্রকাশ করিয়াছে।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যের কাব্যাভক্তপ্রেমটি তাঁহার অন্তর্মুখিতার গভীরে আবর্তিত হইয়া আরও বৈশিষ্ট্যের উপযোগী সাজ করিয়াছে। তিনি যে নবীন রসের রসজ্ঞমণ্ডলীর অধিনায়ক সেখানে সাংসারিক সম্বন্ধে অবস্থিত ছিলেন তাহা তাঁহার রস বাসনাকল্পের সহিত সাধারণতন্ত্রের আলোচনার রূপকারত্বের অর্ধ-প্রচ্ছন্নতার রক্ষিত হইয়াছে। মধুর রস তাঁহার নিকট সরল রসের প্রেম, কেবল ইহাতে যে সকল পরবর্তী রসের গুণাদি সংক্রান্তিত হইয়াছে তে জন্য নয়: ইহার মধ্যে এমন একটি নিগূঢ় উপাদান আছে যাহা ভাবসংস্করণের সর্বস্তরে-সংলগ্ন। কান্তাপ্রেমের দুরুহগাহতা ভাবসংস্কার আনন্দরহস্যের অতল গভীরে পৌঁছিবার প্রত্যক্ষ পথ। সুতরাং বিভিন্ন আরাধনা-পদ্ধতির মধ্যে ইহা 'একে বাহ' নয় বা শুধু 'একে হয়' নয়, সর্বস্ব পরমতম উপলব্ধির সাধন। ইহার মধ্যে এমন অনুভব-রোমাঞ্চ রহস্যের দ্বার প্রকাশযোগ্য নয়, নিগূঢ় ধ্যানযোগনের দ্বারা উপভোগ্য। সেইজন্যই রামানন্দ যখন 'পহিল হি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল' এই সাধনতত্ত্বটি আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ভাবীবিতোর মহাপ্রভু গোপন মন্ত্রের পবিত্রতা-ভয়ের আশঙ্কায় দুই কম্পিত হস্তে তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহারা প্রেমকে কেবল হৃদয়ের আর পাঁচটা বৃত্তির মত আর একটা বৃত্তি মনে করেন, তাঁহারা ইহার মধ্যে কোন অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেন না, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের এইরূপ আচরণের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজিয়া পাইবেন কি না সন্দেহ।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যের যে পরিচয় আমাদের হিসাবের পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার যে প্রেমধর্ম আমাদের জনসাধারণের চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহার পুণ্য নাম যে অন্ত এই পাঁচ শত বৎসর কীর্তিত ও অভিনন্দিত তাহা তাঁহার রাধাকৃষ্ণপ্রেমের আস্বাদনের জন্য নয়, তাঁহার 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্রপ্রচার ও রাধাসহ বিতরণের জন্য। রাধাকৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব তিনি শিখাইয়াছেন বৈষ্ণব পদাবলী-কীর্তনে ও বৈষ্ণবধর্মগ্রন্থেতাকিকে। সাধারণ লোকে তাঁহাদের মধ্যমে লীলাকীর্তনের আস্বাদন করিয়া ও তাঁহাদের মধ্যে দিয়া বৈষ্ণবতত্ত্ব ব্যাখ্যা বুঝিয়া এই দিব্য প্রেমের উৎসের সন্ধান পাইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই সমস্তরূপ না জানিয়া ও লীলাকীর্তনের সুর ও ভাবমাধুর্যে অভিভূত না হইয়া কেবল নাম-সঙ্কীর্তনের প্রবর্তক ও প্রেমধর্মের প্রচার-কার্যেই চৈতন্যদেবকে জানে। তিনি ও নিত্যানন্দ কলিহত জীবকে পাপ হইতে উদ্ধার করার মহৎ ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়া সমগ্র মানবের অন্তর্মুখ ভক্তি-প্রীতি অর্জন করিয়াছেন। এই পাপ নামমন্ত্রের সহিত রাধার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিশেষ দেখা যায় না। গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমস্থলে ত্রিবেণী স্নানের সঞ্চিত্রিত ধারা হইতে রাধা-যমুনার ধারাটি অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই তারকব্রহ্মনামের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন রাধা-ভাব ভাবিত, অন্তরঙ্গ, সহযোগী শ্রীগৌরাঙ্গ। সুতরাং ইহা তাঁহার অন্তরে অন্তঃশীলা ভক্তির ধারাই চির-প্রবহমান ছিল। প্রাকৃত লোকে রাধাপ্রেমকাহিনী বুঝিবে না বলিয়াই রাধাকে তিনি তাঁহার নামপ্রচার হইতে সযত্নে করিয়া অন্তরে গোপনে রাখিয়াছিলেন। যে কারণে তিনি নিজ ভক্তের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের বৈতসত্তার স্বতন্ত্র প্রকাশকে সঙ্কুচিত প্রকাশে সহজ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই কারণেই সাধারণ লোকের বুদ্ধিগম্য হইতে রাধাপ্রেমের সুস্পষ্ট উল্লেখকে বর্জন করিয়া উহার নিগূঢ় শক্তিকে পরোক্ষভাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ঐ যুগের অপূর্ব শক্তি চৈতন্য ও নিত্যানন্দের দীক্ষায় ভিতর দিয়া বহু পাপীর জীবনে আশ্চর্যভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। রাধাভাবদ্যুতি সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেই ঐ নিগূঢ় শক্তি নামমন্ত্রে নিহিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সুতরাং দেখা যায় যে আজীবন রাধা-ভাবাবিষ্টতার রাধাপ্রেমবিহ্বলতা তত্ত্বদর্শী, কান্তাপ্রেম-বীলাসের মাধুর্যরস শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা আস্বাদ করিয়া উহাকে প্রেমনিরপেক্ষ, নামকীর্তন বৈদ্যুতিপূর্ণ এক তারক মন্ত্রে পরিণত করিয়া জনসাধারণের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনে নিয়োজিত করিয়াছেন। নারীসংসর্গবিরাগী ব্রহ্মচারীর দ্বারা দিব্যপ্রেমলীলার আস্বাদনক্রিয়ার তার ছায়, দিব্যপ্রেমের মূর্তিমন্ত্রে রূপায়ন, নামের মধ্য দিয়া নামীর রসসম্ভোগ অন্যান্য জগতের একটি অসাধারণ ব্যাপার। শ্রীচৈতন্যের বহিরঙ্গরূপে কৃষ্ণের ছায় এই মন্ত্রে মহাভাবরূপিণী ভক্তিদেবীর অদৃশ্য প্রভাব আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে।

(শেষাংশ ১৮০ পৃষ্ঠায়)

আবরণ

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

এমন যে ঘরের কাপড় ঘরও ছেড়ে দাঁড়ি
ঘরও ছেড়ে মধুর ভোলা রাখেন।

এক কবি ঘোষে ঘোষে ঘোষে
করল। কিন্তু সেই সাধারণের
দেখবে না, ভাবতেই সকল ঘরের ঘরেরই
মনে সন্দেহ উঁকি দিলেই সন্তুষ্ট নাই

কোনো ঘরে সন্দেহের কণা নেই, অন্ধ
উঠেই এমন একেবারে পল ছাড়ার মনে কী
নেহাৎই ঘরকন্নার পান ঘরেও প্রতিক্ষণা
ঘরবে না। এ স্বভাব, ঘুঁচবে
আর মনে ঘুঁচতে গেলেই কবিতা নই

চাঁদের টেবিলে ঘরে ঘরের কাপড় তুলে

ঘরে ঘরে ঘরের
ঘরও ঘরের ঘরেরই
ঘরনাচরের। ঘুঁচবে ঘরের কাপড় অবিরাম

অবাকই হয়ে গেছে যেন এত 'ভিড়'। কেন, দু-চারটে ছবি-সুদ্ধ ভদ্রলোকের ঘরে 'সঙ্গ' কী যেন নেই হয়! ঘরে ঘরে ঢোকে, ছবি ছাপলে দু'টো তো অন্তর্ধান হয় না।

'ঐ কে—মারছে!'

'কে আবার মরল?' আতঙ্কে দুর কালো ঘরে তুলল ভাবতী।

প্রবীর হাসল। বলল, 'ঐটা শারীরিক মৃত্যু নয়, নৈতিক মৃত্যু।'

'সে আবার কী।'

'মানে একটা পাপের কথা।'

'যাক, তোমাকে আর চেঁচিয়ে বলতে হবে না, আমি পড়ে নেব।'

'তুমি যে কত পড়ে নেবে তা আমার জানা আছে। শেষে আমাকেই বলবে, ওগো, বার করে দাও না কোনখানটায় বেরিয়েছে। তার চেয়ে মুখে মুখে শুনে নিলেই নিশ্চিন্ত।'

'আমার সবকার নেই ও সব ছাই পাঁশ কথা শুনে।'

চা ও খাবারের ট্রে শেষ করে ধবধবেটিকে— মানে ধবধবে প্রবীর। মেজে-মেজের ইতস্তত করছে একটু খোঁজবার করল। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে ফস একটা বই নিয়ে। মাঝের দিকে চোখ রেখে কিন্তু মন পড়ির দিকে। শাড়ি আটটা বাজতেই উঠে পড়ল।

যেমন হবে হয় তেমনি। সবজান্তা মুখের মত একটা সিগারেট পর্যন্ত বেশি শেষ না।

স্নান করে ধবধবেটি পোশাক পরল। পোশাকেও নতুন কোনো চাকচিক্য আনল না। রোজ যেমন আজও তেমনি। শাড়ি ট্রাউজার আর টাই। হ্যাঁ, টাইটাও পুরোনো।

ভাবতী এখন বাবার ঘরে, তাই নিশ্চিন্ত হয়েই আলমারি খুলে এক বাণ্ডিল টাকা নিলে প্রবীর। যখন একা ভাবতী দেখতে পেল না তখন উপর-উপর সবকিই আগের মত নিখুঁত হয়ে রইল। কোনো ত্বরা নেই, আবেগ নেই, অযথা গাম্ভীর্যও নেই। ভাবতের মত হৈ-হৈও করছে না, চোখের মত পালিয়েও বেড়াচ্ছে না। যে কোনোদিনের আপিস যাওয়া আর আপিস ফেরার মতই সহজ।

তারপর এখন বাবার টেবিলে গিয়ে একটু বসতে হবে। ব্রেকফাস্টের মত কিছু খেয়ে নিতে হবে। ভাবতীই সব ঠিকঠাক করে রেখেছে। কখনো এখন সংসারের কাজে ঘুরে-ঘুরে যাবে, কখনো বা চলমান ঘটনার অপেক্ষায় কাছে এসে দাঁড়াবে। তখন যদি কথা বলতে গিয়ে চোখে-চোখ হয়ে যায়! আর চোখে-চোখ হলেই যে হাসতে হবে বা একটু ইশারা করতে হবে তার কী মানে আছে! একেবারে সেবাদের দিকে না তাকিয়ে খাবার প্লেটের দিকেই নজর রেখে বেশ ভদ্র ভাবে কথা বলা চলে। আর, এ খাওয়া তো বড় জোর পাঁচ-সাত মিনিটের ব্যাপার।

আজ খাবার টেবিলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াবার সুযোগই পেল না ভাবতী। প্রবীরই তাকে পেতে দিল না, যেহেতু সে কোনো কথাবার্তা বলল না, না, একটুকরো মেহ্ চেয়েও নয়। নিজেকে গুটিয়ে উঠে পড়ল তাড়াতাড়ি।

মোটকথা, আকারে ইঙ্গিতে আভাসে প্রতিধ্বনিতে প্রবীর ভাবতীকে জানতে দিল না যে সে জানে, সে মনে করে রেখেছে।

যেমন উদাসীন তেমনি উদাসীন।

যেখানে আশা নেই সেখানেই তো বিস্ময়টা ভালো জমে। আর কে না জানে সমস্ত রসের মধ্যে বিস্ময়টাই প্রবল।

কে জানে ভাবতী হয়তো নিজেই ভুলে আছে। যেখানে স্মৃতি পর্যন্ত নেই সেখানে তো আসে নাটক।

তবু নিজে যেন যার তেমনি বেরিয়ে গেল প্রবীর।

একটু সকাল-সকাল ফিরো, সিনেমায় যাব কিংবা বড়জোর বাপের বাড়ি—এমন কিছুও ইঙ্গিত এল না। তার মানে, ভাবতীরই মনে নেই; কিংবা হয়তো ভাবছে, উঃ, উনি আবার মনে করে রাখবেন, বাবা নেই তার মাথাব্যথা!

সত্যি গত বছর মনে ছিল না প্রবীরের। তার আসে বছরও নয়। এত ভাবনার মধ্যে হঠাৎ—একজন স্ত্রীলোকের জন্মদিন মনে রাখা যায়? তারও আসে-আসে বছর ভাবতী নিজেই তোড়বেলা হাসিমুখে এসে বলেছে, আজ আবার জন্মদিন, এই তোমাকে একটা প্রণাম করি। গত দু'বছর যে কি দুর্মতি হল, প্রবীরের গাম্ভীর্যের পরীক্ষা নেবে ঠিক করল। বলা বাহুল্য দুবারই ফেল করল প্রবীর। দুবারই নিদারুণ কথা শোনাল ভাবতী। আগে হাতি পাঁচ পা দেখায় দেখে শুঁড় গুটিয়ে নেয়। জানা গেছে কত তোমাদের ভালবাসা।

এবার ভুলবে না জন্মদিন আগে থেকেই সংবাদ করেছে প্রবীর। ডায়রিতে দাগ দিয়ে রেখেছে। ইস্কাবনের মত বারে বারে তুপ করেছে ভাবতী।

অথচ আজ এখন তার বেরোবার বেশ গড়-গড় বাবোর মতই এবারও সে অবহেলাকারী।

কিন্তু ভাবতীটা মনে রাখার মধ্যে ভাবতীরও দায়িত্ব আছে, তাই সেটা নিয়ে বিশেষ বেশ পেতে হয় না। তাছাড়া সেটার মধ্যে একটা স্মৃতির ঘাম আছে, দুজনেই ঘাম সমান সাক্ষী। কিন্তু জন্মদিনটা কী? সেটার মধ্যে তো কোনোই অতীত নেই। ভাবতীর সেই অস্ফুট কৈশোরটি নেই, নেই যা যৌবনের সেই প্রথমদিকের ফুল ও ফল সকালগুলি। এখন জন্মদিন কথা মানেই বয়স বাড়ার খবর নেওয়া। মৃত্যুর বছরটা ধরিয়ে তালিকা দিয়ে রাখা।

তবু মানুষের মন মানুষেরই মন। মাঝে মাঝে সজাগ স্নেহের মধ্যে চায় জেগে উঠতে।

সজোরে ধবধবেটি আপিস থেকে বেরুল প্রবীর। চৌরঙ্গি পাড়া থেকে একটা ভালো দেখে শাড়ি কিনে নেবে। তারপর সন্ধ্যাবেলা যা হয়ে, নিরিবিলিতে, ধবধবেটি যখন ভাবতী নামিনের সৌকুমার্যে মুগ্ধ হবে তখনই প্রবীর বলে উঠবে, 'কি আশ্চর্য, তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি কি একটা দারুণ ঘটনা—'

বলে হাসতে-হাসতে বলবে শাড়িটা তার গায়ের উপর মেলে ধরবে।

আসল জিনিস দেওয়ার নয়, মেলে ধরায়।

আর বড় বিস্ময় এই উদ্যানে।

ভাবতীকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে এই বিস্ময়ব্যাপারটাই ঘটত না। সমস্ত কবিতাটাই গদ্য হয়ে যেত।

তা ছাড়া এক মোজনেই সে তার পছন্দ সীমাবদ্ধ রাখতে এখন মনে হয় না। তখন এই শাড়ি খুঁজতে গিয়েই পার্ক স্ট্রিট ছেড়ে চলো মার্কেটে, তারপর চলো মার্কেট থেকে আমাদেরই পাড়ার দোকানে। এমনি অনর্থক ছোটাছুটিতে জন্মদিনটাই ছিঁড়ে কর্দাকাই হয়ে যাবে।

ক্রসিং-এর উপরে নামী দোকান। ফুটপাথ ছেড়ে পাশেই গাড়ি রেখে ঢুকল প্রবীর, আর এক মুঠো টাকা নিয়ে প্রথম কাঁক থেকেই একটা সুন্দর শাড়ি বেছে বার করে কিনে নিল। তারপর বাড়ে চড়িয়ে যাব করে দিতে মোটে সময়!

দরজা খুলে গাড়িতে উঠতে যাবে প্রবীর দেখল কিয়াস্কের পাশে একটা মেয়ে ফুলে। হাতে ঝুড়ি।

'আরে, বেলা না?' আশ্চর্যতা চেপে সম্ভাষণ করল প্রবীর। গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করেই জোর দিল: 'তুমি তোমাকে?'

মুখ টিপে একটু হাসল মেয়েটা। বললে, 'এইখানে দাঁড়িয়েছিলাম।'

'তাদিয়ার গাড়িটা তখন লক করে যাই নি, অনায়াসে তাই উঠতে পারলে। উঠে ভালোই করেছ। নইলে কে দেখে ফেলত, কি ভাবত তার ঠিক নেই।'

'কী আবার ভাবত!' মেয়েটা স্পর্ধার ভাব দেখিয়ে বললে, 'লোকের ভাববাকে কে কেয়ার করে!'

'তা তো ঠিকই।' অদ্ভুত লাগে ছিল প্রবীর: 'আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে গাড়িতে করে বেড়াব তাতে কার কী বলবার আছে? গাড়ির বাবত ট্যাক্স তো আর কম দিই না, কি বলো?' মেয়ের দিকে তাকিয়ে প্রবীর একটু হাসবার চেষ্টা করল: 'তারপর, রেবা, কেমন আছ?'

'ভালো। আপনি?'

'ভালো। এখন তো রীতিমত ভালো। তারপর তোমার বাবা-মা কেমন আছেন?'

'আচ্ছা, আপনার ভুল হচ্ছে না তো? আমি কি রেবা?'

'তুমি রেবা নও? ওহো, আমার নামটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। তুমি শিপ্রা—শিপ্রা—তাই না? দু'অক্ষরের একটা নদীর নাম—পদ্মা, তিস্তা, না, গঙ্গা—বলো না কি নাম?'

'আমার অনেক নাম। যার যা খুশি ডাকে।' ঘটনাটা ঘুলল, আবার বড় করল রেবা: 'নামে কি এসে যায়?'

'ঠিক বলেছ, নামে কিছু আসে যায় না। হোয়াট ইজ ইন এ নেম? ইট-কাঠে মোহ-সভ্যতের শহরের মতো হঠাৎ একটা নদী খুঁজে পেলে তার নামের জন্যে মনটা কাঙাল হয়ে ওঠে। বলো না, কি নাম?' কণ্ঠস্বরে প্রায় অনুরাগ এনে ফেলল প্রবীর: 'যার যেমন খুশির ডাক—সেই নাম নয়। বাবা-মা তোমাকে যে নামে ডাকে—'

'বাবা-মা তো খুকু বলে ডাকে।' হেসে উঠল রেবা।

'ও, হ্যাঁ, তা তো ঠিক। খুড়ো বাপের নাম তারাবুমার আর তার বুড়ি মেয়ের নাম খুকু। ওটা ছেড়ে দাও। স্কুল-কলেজে কি নাম ছিল?'

'আহা, স্কুল-কলেজে কোনদিন পড়েছি নাকি?'

'যা, স্কুল-কলেজে না পড়লেও তো মানুষের একটা নাম থাকে।'

'কলাম না, কোনো ঠিক নেই, যে যখন যা বলে ডাকে।'

'তোমার অবশ্য পুরুষ তো একজন আছে। সে তোমাকে যে নামে ডাকে তাই তোমার আসল নাম। বলো, কী নাম সেটা?'

'রেবা।'

'যা, খুব সুন্দর!' প্রবীর একটু নড়ে-চড়ে বসল: 'দিনের বেলায় কী করে?'

'সেলাইয়ের টিউশানি করি।'

'সেলাইয়ের টিউশানি?' তোমার সেলাইয়ের ডিগ্রোমা আছে?'

'আছে।'

'তা হলে তুমি তো ম্যাট্রিক পাস। তাই নয়?'

রেবা ছটফট করে উঠল। বললে, 'আমি যে ডিগ্রোমা পেয়েছি সেটা কোনো ইস্কুল থেকে নয়।—'

'আহা, হলেই বা নয় ম্যাট্রিক। ভালোই তো। আমি তো তোমার নাম শোনেই গিয়েছি—অন্তরঙ্গ নাম। তোমার স্কুল-কলেজের নামে আবার দরকার নেই। তুমি আমার রেবা, আমার নদী—তাই যথেষ্ট। কী বলো, তাই নয়?'

তরল চোখে হাসল রেবা। বললে, 'কিন্তু আমি বলছিলাম—'

'কিন্তু আমি বলছিলাম কী, তোমার খুব সাহস।'

'সাহস না থাকলে কি আপনার পার্কিনা গাড়িতে উঠে বসি?'

'সে না হয় অন্তরঙ্গের গাড়ি। উঠলেই বা। কিন্তু আমি বলছি দিনের আলোয় ভদ্রলোকদের অন্তঃপুরে গিয়ে সেলাই শেখানো অন্তরঙ্গ সাহসের কাজ। হ্যাঁ, তোমাকে প্রশংসা করতে হয়। জীবনের ব্যাপারে সাহসই আমাদের একমাত্র মূলধন। আর, সত্যি কথা বলতে কী, এই সাহসই তোমাকে এত সুন্দর করেছে, প্রবীণ করেছে। কিন্তু আমি বলছি কী, ভদ্রলোকদের কেউ তোমাকে চিনে উঠতে পারে না?'

'কী করে পারবে!' কিসের মোহে রেবা আবার দ্বিধা কাটাল। বললে, 'যাদের বাড়িতে টিউশানি করি তারা সব বিরক্তিবিষ, তাদের কি কার গাড়ি আছে? তাদের গাড়ি না চড়লে তারা চিনবে কেন? তা ছাড়া দিনে আমার অন্তরঙ্গ চেহারা, অন্তরঙ্গ সাজগোজ। তখন আমি নম্র লাজুক বিনয়ী।'

'যা, সবসময় অভিনয়ের প্রয়োজনে।' বাহুবা রেবার নতুন করে বললে প্রবীর, 'তুমি কী করবে? সেলাইয়ের টিউশানিতে ফুলোর না বলেই তোমাকে বাতে কিছুক্ষণের জন্যে অভিনয়িক হতে হচ্ছে। কী বলো, তাই না? যে লোক তোমাকে পুরোপুরি চিনতে পারে না তার আবার অভিনয়িক! যে ভুলে তার আবার চিন হয়ে গোলা! যাই বলো, অভিনয়ের এই সম্পর্কটা কিন্তু সমাজ-সম্পর্কের বাইরে, একটা সম্পূর্ণ জগতের ব্যাপার। ভালোবাসার নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। এ সেই ভালোবাসা।'

দুষ্টু ছেলের হাসল রেবা। বললে, 'কিন্তু, দেখুন, রাত হয়ে যাচ্ছে—'

'না, না, এখুনি রাত কী! আমি বলছিলাম, কলেজটা কি আজ বন্ধ যায় না? আমারও তো কলেজ বন্ধ যায় ইচ্ছে করলে।'

'ইচ্ছে করলে?' ঈষৎ তপ্ত হল রেবা: 'আপনি জানেন না কে ইচ্ছের, সমস্ত ইচ্ছের শত্রু কে। কে ইচ্ছের শত্রু—'

'আমি জানি। কে ইচ্ছের শত্রু দারিদ্র্য। তবু—'

'শুধু নামটাই জানেন, চেহারাটা জানেন না।' দুঃখের কথা ভেবে নিয়ে বলতে উঠল রেবা: 'তবে যতো 'তবু' নেই, 'কিন্তু' নেই—হাতের বইগুলো খুলে আবার বন্ধ করল: 'শুনুন, আমি এবার যাব।'

'বেশ তো, চলো, তোমাকে তোমার বাড়ি পৌঁছিয়ে দিই।' প্রবীর রেবার মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করল: 'তোমার বাড়ি তো বেলেঘাটায়?'

'না, বাড়ি পৌঁছতে হবে না, এখানেই নামিয়ে দিন।'

'সে কী, কিসে কী করব?'

'যেমন করে এসেছি, বাসেই ট্রামেই ফিরে যাব।'

'যা, একটুও তো বেমানান হবে না: চলো বোনো বেস্টুরাঁতে যাই, 'শুনু খাই দুজনে। খেতে-খেতে গল্প করি।'

বিনয়ী নুয়ে হাসল রেবা। বললে, 'আমি গাড়ি থেকে নামি না।'

'গাড়ি থেকে নামো না মানে?'

'মানে গাড়িতেই থাকি। ঘরে ঢুকি আমি ঘরের মেয়ে নই, গাড়ির মেয়ে।'

'গাড়ির মেয়ে!' প্রবীর আবার বাহুবা রেবার মত করে বললে, 'সুন্দর নামটা তো! আগের দিনে যেমন 'ঙায়ার মেয়ে' ছিল তেমনি গাড়ির মেয়ে। তার মানে তোমার বসবাস সমস্ত গাড়িতে।'

'হ্যাঁ, হোটেলের মেয়ের চেয়ে আমি অনেক স্বাধীন।' গর্বের ভার আনল রেবা: 'অনেক পাওয়ার।'

'নিশ্চয়। তোমার শুধু অন্তরঙ্গ হয়ে বেড়ানো।'

'তাই আমার কিছু বেশি।'

'কত?'

'আপনার তা শুনে কাজ নেই।' কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রেবা: 'আপনি শুধু— আপনার গাড়িটা দয়া করে দিয়ে দিন।'

'যদি হাতে অনেক থাকে?'

'আমারও তো অনেক অসুবিধে।'

'আর যদি কম থাকে?'

'অসুবিধে কম হবে।'

'আমাকে কম ঠকাবে না তো?'

'না, আপনাকে কম ঠকাব না। আপনি তো জানেন, ভালোবেসে কথা বলেছেন।'

'আমার ভালোবাসার অবস্থাটা দেখ।' প্রবীর অসহায় মুখ করল: 'আমার দু হাত কিন্তু ব্যস্ত আর মুখ সিগারেটে। আচ্ছা, রেবা, তুমি সিগারেট খাও?'

'না।'

'ছুঁয়ে করো?'

'ছিঃ! ওসবে আমার দরকার কী! গাড়িতে ওসবের অবকাশই বা কোথায়? আমার শুধু একটু ভালো আর নেশা ধরানো।' রেবা, ভ্রূ-নিম্ন চোখে তাকাল রেবা: 'আপনার ওসব অভ্যেস নাকি?'

'হোক না কখনোই যদি, দরকার কী। তোমাকে ভীষণ ভালো লাগছে, এই তো যথেষ্ট বল।' প্রবীর প্রায় গদগদ হল: 'রেবা, তোমাকে বাগাই তো সিনান, কমবেশি কী হল তুমি কানো আর তোমার ভাগ্য জানে, কিন্তু বলো, আবার দেখা হবে?'

'আপনি ঐ ক্রসিং-এ দাঁড়াবেন গাড়ি নিয়ে, অমনি সন্ধের সময়, আমি ঠিক করে আপনার গাড়িতে উঠে পড়ব।'

'আমার কি নেবে?'

'কি না নিলে পেট চালাব কী করে? বাবা-মা ভাই-বোন নিয়ে সাতটা প্রাণী, সবক'টার একলা আমার উপর। শুধু তো খাওয়া-পরাই নয়, রোগের চিকিৎসা, ইস্কুলে পাঠানো আর সবশেষে বাড়িভাড়া। মোট কত টাকার দরকার হিসেব কেললেই পাগল হয়ে যেতে হয়।'

'না, না, কি নেবে বৈ কি। যেখান থেকে যা পারো হেতেনুতে নেবে।' প্রবীর আরম্ভ করল: 'তোমার টাকাই ওরা একদিন জুয়ে নিয়েছিল আবার সেই টাকাই তুমি ফিরিয়ে নিচ্ছ। আমার তো মনে হয় তোমার সঙ্গে আমার ভালোবাসা আরো যত বন হবে ততই আমার ইচ্ছে হবে তোমাকে আরো বেশি দিই, আরো বেশি দিই—'

'আপনার যত উদার কজন? ভালোবাসা বন হলে আমারও ঠিক সেই তখন ইচ্ছে হবে, আরো ছাড়ি, গাড়ি ছেড়ে ঘর নিয়ে যাই। বই', স্পষ্ট হাত বাড়াল: 'ব্যাগটা দিন।'

'দিচ্ছি। দিলেই তো নেমে চলে যাবে, আর দেখা হবে না। আচ্ছা, গাড়িটা ফেল করে আসল প্রবীর: 'এখন যদি কেউ হয়, টাকা বা ব্যাগ নিতে রাজি না, তখন কী হয়?'

'তখন চেঁচাই।' ছলের মত সরল গলায় রেবা বলল, 'বাঁচান-বাঁচান হয় তুলি। তাতেই কাজ হয়।'

'কী হয়? তোমার ছলের লোক এসে ধরে ফেলে?'

'আমার বলে কোনো লোক নেই, আমি একলাই অপারেট করি। গাড়ি থেমে থাকলে পথের লোক এসেই ধরে, জনতালোটা তাড়াতাড়ি হয়—'

'গাড়ি চালু থাকলে?'

'তখন হল্লা ওঠে। রাস্তার গাড়িই পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু অতদূর যেতে দিই না। লালবাতি দেখে গাড়ি থামলে জানলা খুলে দেখানেই নাটক সুরু করে দিই—'

'কিন্তু ধরো, শুধু যদি কেউ জোরজার করে তোমাকে কলায় নিয়ে যায়?'

'নিজে নেবে, তুমি তত্ত্বকারের আছে কী।' এতটুকুও নড়বাস না রেবা, নিরস্ত নির্লজ্জ মুখে বলল, 'আমার কেস তো আমি ছাড়ব না, বড়জোর একটা কাউন্টারকেস হবে। কেস তো তবু হোক কোর্ট হোক আমার কেসটা তো শেষ পর্যন্ত থাকবেই। ওসব আমি ভেবে রেখেছি। ভদ্রলোকই অমুবিধেয় পড়বেন। আমার খোয়াবার কিছু নেই, কিন্তু এক-কান-কাটাদেরই বেশি ভয়। তাদের স্ত্রী-পুত্র সমাজ আছে, কারবার আছে, মানসম্মান আছে, আর থাক-থাকে আমার কেস থেকে আমি যখন একচুলও নড়ছি না, তখন একটা রফানিষ্পত্তি হবেই, আর তত দেরি হবে তত জানবেন আমার মুনফাটা তারি হবে। কিন্তু, যাই বলুন, আপনি তারি দুষ্টু, স্নেহভরা চোখে তাকাল রেবা: 'আমার বস্ত্র দেরি করিয়ে দিচ্ছেন—'

'না, না, এই দিচ্ছি তোমাকে।' প্রবীর গাড়ি থামাল আর ট্রাউজার্সের পকেট থেকে ব্যাগটা বার করবার চেষ্টায় শরীরটাকে বেঁকাতে না বেঁকাতেই দু হাত দিয়ে রেবার দু হাত শক্ত করে চেপে ধরল আর চিৎকার করে উঠল: 'এই একটা রেবে। এই একটা রেবে।'

নতুন জায়গায় এ নিরীহ বাড়িটা যে একটা থানা হতে পারে কল্পনা করতে পারত না কেউ। চিৎকার শুনে বেটে-খাটো দু-তুটো কনস্টেবল বেরিয়ে এল।

রেবা উদ্ভ্রান্তের মত বিবর্ণ মুখে বলল, 'আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দিন—'

'আমার পার্ক-করা গাড়িতে উঠে পরে আমাকে ব্লেক মেইল করতে চাইছে—প্রবীর ধীরের মত বলল।

কোথায় লাগল, কোথায় লাগল, কোথায় কাউন্টার-কেস। থানার ও-সির ঘরে একটা টুলের উপর মুখ নিচু করে বসে রইল রেবা।

ও-সি বললে, 'সাহেবান বিবরণ সব ঠিক-ঠিক বলো। ওঁওতা দিলে, বুঝতে পাচ্ছ, তোমারই বিপদ বাড়বে।'

রেবা নিরুত্তর মুখে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল। পরে বলল সব ঠিক-ঠিক।

'একজন ইনস্পেক্টর যাবে, দেখবে সব তেরিফাই করবে।' ও-সি তার দেখাবার মত করে বললে।

তারপর মেয়েটার হাত তুলে নিল। নিল বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ।

না, কেস কিছু হয় নি। শুধু একটা চেষ্টা। ঠিক চেষ্টাও নয়, শুধু একটা সম্ভব। মনিব্যাগও নেয় নি। পকেটে হাতও দেয় নি। চেঁচিয়ে কোনো কলস র‍্যাকিটজেসানও করে নি। শুধু পাশ ঘেঁসে বসেছে।

ও-সি রসিকতা করতে চাইল, বললে, 'মেয়েটা প্রেমিকাবাদী।'

পরে থাকাল প্রবীরের দিকে, 'কী বলেন ছেড়ে দিই।'

'তাছাড়া আমার কী।'

'তোমাকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিচ্ছি।' রেবার উপর ঝুঁকে উঠল ও-সি। বললে, 'ভবিষ্যতে সাবধান হবে। হ্যাঁ, ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ কারুরই যায় না, শেষ পর্যন্ত থাকে। আর দারিদ্র্য, দারিদ্র্য সমস্ত পাপের সমস্ত ক্রাইমের এজুহাত হয় না। যাও, ছেড়ে দিলাম। লক্ষ্মী মেয়ের মত বাড়ি চলে যাও।'

কিন্তু কী করে যাবে? যেখানে বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে সে জায়গা এখান থেকে বহুদূর। তাছাড়া রাতও এখন অনেক। একা একা হাঁটা-পথ ধরলে হয়তো বা ওরাই এখন শিকার হতে হবে। কোনো ক্লিপ বা ভ্যান এখন মজুত নেই থানায়। অগত্যা প্রবীরকেই তার গাড়িতে করে বয়ে নিয়ে যেতে হল।

ও-সি বললে, 'দাঁড়ান, সঙ্গে একটা কনস্টেবল দিয়ে দি।'

কনস্টেবল পিছনের সিটে রেবার পাশে বসতে যেতেই রেবা নেমে এসে প্রবীরের পাশেই বসল।

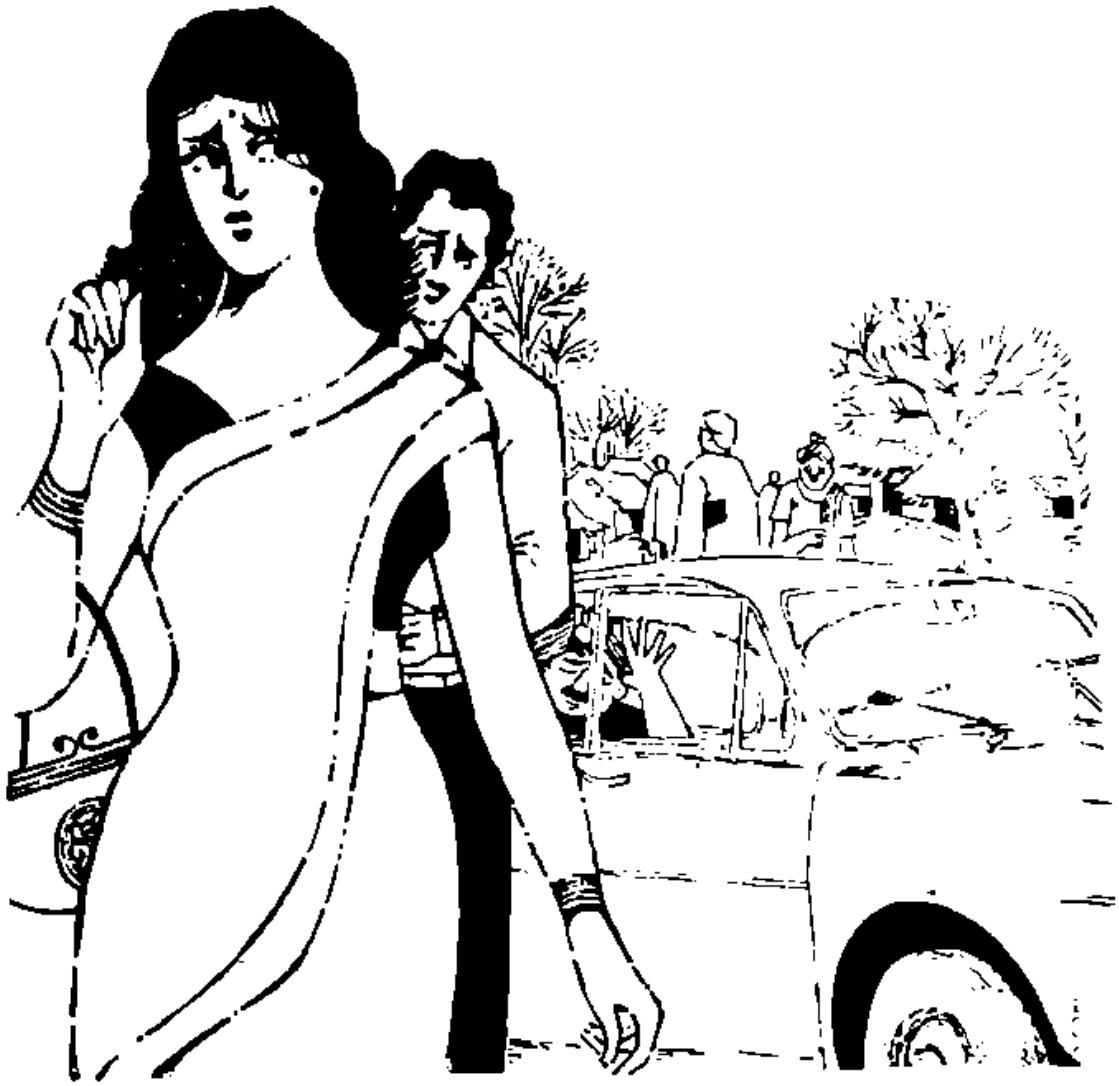

● 'কিন্তু সেদিন আপনাকে পাব কোথায় ?'

আর তক্ষুনি প্রবীর গাড়ি চালাল।

হাসল, 'কনস্টেবলটার বোধ নেই। ও ভেবেছে যে আসামী তার পালাই ওর পক্ষে উচিত। এ ভালোই হল, ও স্টেশন থেকেই ওয়াচ করতে পারবে। কিন্তু আমি ভেবে অবাক হচ্ছি তুমি ঐ নিরাপদ আশ্রয়টা ছেড়ে আবার আমারই পাশে ঠাঁই নিলে।'

রেবা কথা কইল না, রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

রেবার ওপরের কথাই মনে পড়ছিল : ভবিষ্যৎ কারুরই বলা যায় না, শেষ পাতা থাকে।

তাই শেষ পর্যন্ত প্রবীর বলল, 'প্রহসনটা দেখ। কোথায় কনস্টেবলটা গাড়ি চালাবে, আমরা স্টেশনের গেটে বসব— তা নয়, আমরা গাড়ি চালাচ্ছি আর কনস্টেবল স্টেশনের গেটে হাত নেড়ে হুইসিল উড়িয়ে যাচ্ছে দিগ্‌বিদিক। আগে থুকুর খুঁজে এখন আমরা খুঁজছি।'

মাটির পাত্রে ধারণ একটা ফল যত বড়ো আছে : শরীরে একটা রেখা পর্যন্ত নেই।

ওর নির্লিপ্ত নিরাসক্ত গলির মধ্যে দুজনে রেখে, কিন্তু স্পৃষ্ট হয়ে ওঠে না মাটির প্রোপটার দিকে মুখ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে।

মনিব্যাগ থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে তার হাতে গুঁজে দিল প্রবীর

রেবার চোখের নোটটা দুটি চুঁতে ভেসে গেছে। রিল না বরং মুঠোর মধ্যে ঝকড়ে ধরে রইল। শুধু কিছু পরেও টাকাটা যেন টাকাই।

নয়,
ফলা
নিশ্চয়
।
শেষ পাতা
প্রবীর
'কিন্তু
মিনিট আগে
কনস্টেবলের গাড়ি
প্রবীর গাড়িতে স্টার্ট দিল

বৈপরীত্যে পৌষপার্বণ

অন্নদাশঙ্কর রায়

"দেশের মাঝে মন মুক্তি, বলেছেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ কেউ ও কর্মযোগী, 'জগতের সেরা সাহিত্যিকরা কিন্তু কখন নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন।

আমরা সাহিত্যিকরা যে কিছুই করছি নে তা নয় আমরা আমাদের নিজের নিজের ভেতর থেকে বিশ্ব বলা বাহুল্য সেটা সবের ভেতর নয় আমরা গল্প-উপন্যাসের মধ্যে কবিতার মধ্যে কবিতার মধ্যে। ভেতরের কথাটুকুই। আমরা কিন্তু না করে চুপ করে বসে থাকলে প্রকাশকরা ভেতরে ডাকেন, সম্পাদকরা ভেতরে ডাকেন, দুএকটা আসর হতো, পাইকার পাঠোর অভাবে পড়াশুনা বন্ধ করে দিতে হতো। আমরা দেশের সংস্কৃতিকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছি, বলতে বিধি নে।

সংস্কৃতি ভেতরে বাটি নিয়ে বাঁচে না। আমার উপরেও আরো কিছু চাই। সেটার সবসময়ে এক হয়ে দেশে সংস্কৃতি দেশে দেশে নানা ইতিহাসে দেখা যায় নানা সময়ে নানারকম হয়েছে। সাহিত্যিকেরা সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি, সঙ্গীতকারেরা সঙ্গীত সৃষ্টি করেন নি, চিত্রকরেরা চিত্র সৃষ্টি করেন নি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তত একটা প্রমাণ একেবারে ফাঁকা। সম্ভবত সেখে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল না, কৃষিও শিল্প সকলের অভাব পূরণ করছিল না, সুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাচ্ছিল, পান্তা আনতে সুন। সাহিত্যিকরাও হা অন্ন হা অন্ন করে রাজারাজড়ার দরবারে কাব্যালের মতো ঘুরছিলেন। তাবলেই বা কখন, লিখবেনই বা কখন!

সাহিত্যিকরা যদি কোনো মতে সাহিত্যের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন তাহলে আর কিছু না হোক অন্তত এইটুকু হবে যে, ইতিহাসের একটা অধ্যায়ে নাম করবার মতো-কিছু সাহিত্যকীর্তি থাকবে। নয়তো একটা যুগ একেবারেই ফাঁকা যাবে। দেশের প্রাণশক্তি অত সহজে নিঃশেষ হবে না, লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেলেও কোটি কোটি মানুষ বেঁচে থাকবে। কিন্তু দেশের সৌন্দর্যবোধ যদি সাহিত্যের অভাবে শুষ্ক হয় তা হলে একপুরুষ কি দুপুরুষ পরে সাহিত্যের সঞ্জীবনের ও অনুপ্রাণনার কাজ কঠিন হবে।

আমাদের প্রথম কর্তব্য সৌন্দর্যের প্রতি, সাহিত্যের প্রতি। জননীর প্রথম কর্তব্য যেমন সন্তানের প্রতি। একে অবহেলা করে অন্য কোনো কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়। হাত বিশ্রী যে সেজন্যে ভাতের হাতা নয় সাহিত্য ছেড়ে দেশের কাজে যিনি ঝাঁপ দিয়েছেন দেশ তাঁদের কাজকেই বা মনে রেখেছে! কী জন্যেই বা মূল্য দিচ্ছে! সাহিত্যে স্থির থাকলে চলতো তাঁরা দেশের সাহিত্যিক সম্পদ বাড়িয়ে দিয়ে যেতে পারতেন।

তবে সাহিত্যিকরাও নাগরিক, নাগরিক-হিসেবে আর সকলের মতো তাঁদেরও কিছু কর্তব্য আছে। দেশ বিপন্ন হলে দেশরক্ষার কাজে সবাইকেই হাত পড়ে। কে সাহিত্যিক কে সাহিত্যিক নন সেটা তখনকার জন্যে গৌণ হয়। আপৎকালে মুখ্য হয় সকলের নাগরিক কর্তব্য। এদিক থেকে বিচার করলে আপৎকালে সাহিত্যিককেও এমন কিছু করতে হয় যা ঠিক সাহিত্যের কাজ নয়।

কিন্তু সেটা যদি তখনকালের না হয়ে দীর্ঘকালের হয় তা হলে সাহিত্যের ক্ষতি অনিবার্য। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সাহিত্যিক যদি সাহিত্যচর্চা না করে অন্য চর্চা করেন তা হলে তাঁর লেখার হাত নষ্ট হয়ে যায়। যেমন গাইয়ের গলা বা নাচিয়ের পা। যে সঙ্কট অল্পদিনের তার জন্যে নাচ গান কবিতা স্থগিত রাখা চলে, কিন্তু যে সঙ্কট দীর্ঘমেয়াদী তার মাঝিয়ে ওসব স্থগিত রাখা মানে সমস্তটাকে বন্ধ করা, লেখক ও পাঠকসাধারণকে বঞ্চিত করা।

এখন কথা হচ্ছে আমাদের আজকের এই সঙ্কট কি স্বল্পকালের না দীর্ঘকালের? এটা যদি সাময়িক একটা উৎপাত হয়ে থাকে তবে সাহিত্যিক এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সমাজের উপকার করতে পারেন, তাতে তাঁর নিজেরও উপকার। কিন্তু এটা যদি দুএক মাসের মধ্যে মিটে না যায় তা হলে তিনি তখনকার এই নিয়ে সমবেক্ষণ করবেন! তাতে কার কি উপকার! আজকের জগতে অর্থনীতির যেমনটাচ থেকে সাধারণ সাহিত্যিকের রক্ষা নয়। বড়ো বড়ো অর্থনীতিজ্ঞরাই হাল পানি পাচ্ছেন না। তাঁদেরও নানা মুনির নানা মত। বিপরীত মতও দেখতে পাওয়া যায়। অর্থনীতি না হয় কোনো মতে আয়ত্ত করা গেল, কিন্তু প্রশাসনের লোকটি সামলানোর উপায় কি আমাদের হাতে? প্রশাসন এমন একটা যন্ত্র যাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হলে সব সময়ে তার পিছনে লেগে থাকতে হয়। বাইরের লোক তা পারে না। তাকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

বাইরে থেকে যতদূর অনুমান করতে পারি অর্থনীতির দিক থেকে ভুলভ্রান্তি ঘটেছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের দিক থেকে বিশৃঙ্খলা। যখন প্রশাসনব্যবস্থার ভিতরে ছিলুম তখন দেখেছি কর্তারা চান ইয়েসম্যান। যে সব কথায় 'হাঁ-জী', 'হাঁ-জী' বলবে। যেটা সম্ভব নয় সেটাকেও বলবে সম্ভব। যেটা সঙ্গত নয় সেটাকেও বলবে সঙ্গত। যারা 'না-জী' বলবে তারা পাজী। তাদের যেমন করে হোক তাড়াতেই হবে। তারা যদি পদত্যাগ করে তা হলে আনন্দে ছবির লুট পড়ে যায়। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর যেভাবে প্রশাসনকে বাস্তবতাবর্জিত করা হয়েছে তার প্রতিশোধ তুলছে বাস্তব। সেক্রেটারিয়াটের

বাইরের বাস্তব। মন্ত্রিমণ্ডলীর বাইরের বাস্তব। রাজা ক্যানিউট ও তাঁর সভাসদদের চলুন মানতে চাইছে না সমুদ্রের ঢেউ। সে তো আর ইংরেজ-ম্যান নয়।

বাস্তবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে হলে মফস্বলে বসবাস করতে হয়। কিন্তু মন্ত্রী হলে দিল্লী কিংবা কলকাতা হয় যাবো-যাবের ক্ষেত্র। মাঝে মাঝে একবার বেড়িয়ে আসা ছাড়া জনগণের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ ঘটে না। অন্তত পাঁচটি বছর তো জনগণের কাছ থেকে অনুপস্থিত থাকা হচ্ছেই, কারো কারো বেলা পাঁচ হয়ে দাঁড়ায় পনেরো। মন্ত্রীদের তদারকিবাস করে যাঁরা তাঁদের কাছ তাঁরাও অনেক সময় কলকাতার বা দিল্লীতে কাটান। কারো কারো অধিষ্ঠান রাজধানীতেই। নির্বাচনকেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু সভার সময় বা ভিন তৈরির সময়। সরকারী কর্মচারীরাও যে বাস্তববিচ্যুত হবেন তাতেই বা অবাক হোবার! আগেকার দিনে কোনো কর্মচারীকেই তিন বছরের বেশি কলকাতায় বা দিল্লীতে রাখা হতো না। আজকাল দিব্যি এবছর কলকাতা বা দিল্লীতে বদলি হন তিনি সাধারণত সেখান থেকে বদলি হন না। মফস্বলে ফিরে যাবার রেওয়াজ উঠে গেছে। হয় দিল্লাবোধে নয় নোটরযোগে কয়েকশটা চক্কর দিয়ে আসার নাম বাস্তবের নাড়িতে হাত রাখা নয়। যেমন কিছু হাজার লোকের সভায় বক্তৃতা দেওয়া নয় বাস্তবের ব্যক্তির স্পন্দন অনুভব করা।

যাদের উপর ভার দিয়ে দেশের লোক নিশ্চিন্ত তাঁদের ক'জনেরই বা দেশের বাস্তব অবস্থার উপর 'গ্রিপ' আছে! স্বাধীনতার আগে ছিল। তারই জের চলেছে এতকাল। রামরাজ এই সমস্যার একটা সমাধান চেয়েছিলেন। রামরাজ পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতিকদের বাস্তবের অভিমুখীন করা। দিল্লীর বা কলকাতার অভিমুখীন যেন অল্প কয়েকজনই হন। আর সকলে মফস্বলের অভিমুখীন। ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কি? যাঁরা সরকার থেকে সরে গেছেন তাঁরাও সরকারকেই ঘিরে ঘিরে ঘুরছেন। জনগণকে নয়। পাঁচটা বছরও তাঁরা বাইরে থাকবেন না। তা হলে বাস্তবজ্ঞান হবে কি করে? বিমানে বা মোটরে ঘোরাফেরা করে?

আমরা আজ যা দেখছি তাকে বলতে পারি ক্রাইসিস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ। কলকাতা দিল্লী প্রভৃতি স্থানের বাতাবরণ থেকে বিধায়কটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাওয়া ও ব্যর্থ হওয়া। আঁধারে একটার পর একটা ঢিল ছোঁড়া চলেছে। কোথাও হেতে পারে এক আধটা। কিন্তু আঁধার তাতে ঘায়ে না। ঢিল ছোঁড়াও থামবে না। কারো সৌভাগ্য কারো সর্বনাশ! এই যে পৌরসভা এটা দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে ভয় হয়। তা বলে কেউ মনে করেছেন এটা বিপ্লবের পূর্বলক্ষণ তাঁরা অকারণে আতঙ্কিত বা আশান্বিত। গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। লোকের গায়ের জ্বালা জুড়োবার জন্যে নির্বাচনের বৈতরণী থাকতে লোকে কেন প্রাবন কামনা করবে? তার নামও তো কেউ করে না।

বিপ্লব হেইসব দেশেই ঘটে যেসব দেশে গণতন্ত্র নেই কিংবা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। আমাদের দেশে গণতন্ত্র আছে। তা হলে প্রশ্ন উঠছে, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কি জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বা সেই পথে চলেছেন? তাই যদি হতো তবে জবাহরলাল যখনি যেখানে যেতেন তখনি তাঁকে দেখতে জনযাত্রায় ভিড় হতো না। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণের পর কোটি কোটি মানুষ আত্মীয়বিয়োগের শোকে মুহ্যমান হতো না। তিনি নেই, কিন্তু তাঁর আসনে যিনি বসেছেন তিনিও জনগণের বিশ্বাসভাজন। সেখানে লোকপ্রতিনিধিদের উপর লোকের আস্থা আছে সেখানে বিপ্লবের কথা ওঠে না। আস্থা যদি চলে যায় তবে সবচেয়ে নির্বাচন করলে অপর একজন লোকপ্রতিনিধি অধিকসংখ্যকের ভোটে রাষ্ট্রপরিচালনার ভার নেন। জোর করে সরী দখল করতে হয় না।

কিন্তু সময়মতো নির্বাচন যদি না হয়, নির্বাচনকে যদি একটা না একটা অজুহাতে বারবার পেছিয়ে দেওয়া হয়, নির্বাচনের নিয়মগুলো যদি পাকিস্তানের মতো বদলে দেওয়া হয়, গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে যদি ভোট আদায় করা হয়, অন্যান্য দলের প্রার্থীদের যদি ধরে ধরে জেলে দেওয়া হয় তা হলে নির্বাচনের ফলাফলের উপর জনগণের কোনো আস্থা থাকে না। দক্ষিণ আমেরিকায় এর দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু বিপ্লব হলেই যে লোকে পরমার্থ পায় তাও নয়। বিপ্লবের পর ক্ষমতা যাদের হাতে পড়ে তারাও জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে; এরকম দৃষ্টান্তও দেখা যায়। এদের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র যেমন একটা মুখোশ বিপ্লবও তেমনি একটা মুখোশ। জনগণ যে তিমিরে জনগণ সেই তিমিরে।

সংসদের ভাবে গণতন্ত্রকে টিকতে চাই ও সংসদকে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা। অন্যথায় আবার নির্বাচন।

তার মানে যেসবই করতে হবে তার জন্য নির্বাচন বারবারে ও নির্বিঘ্নে হবে। নতুন একদল অসৎ লোক এসে পড়ে ক্ষিপ্রাবার হবার ভয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়াটা বন্ধ করবেন না, কিংবা তার নিয়ন্ত্রণভার বন্ধুকে দেবেন না। তা যদি তাঁরা করেন তবে সেটাও হবে বিশ্বাসঘাতকতা।

অন্যান্য দেশের ইতিহাসে তারও নজীর আছে অসৎ একদল লোক এসে সহজে ক্ষমতাচ্যুত করতে কেউ চায় না। হয় পরীক্ষার বারবার হয় পরিস্থিতি বৈপ্লবিক আকার নেয় পরিস্থিতির সুযোগ যে ক্ষমতাধরেই নেবেন এমন কোনো ঐতিহাসিক নিয়ম নেই। সুযোগসন্ধীরাও নিতে পারেন। সাম্প্রতিক নেপালের মিলিটারি ক্যুটেইনিং একটিমাত্র দেশে দেখা গেছে বিপ্লবের উপর ভরসা দিয়ে যাঁরা দেশেদেশান্তরে আসেন তাঁরা জানেন না যে তাঁদের পিছনে ঘাতক আসছে হয়তো কালো বিপ্লব হাতে, তার নয়তো সম্পূর্ণ একরকম। সেটাও অবশ্য অমর নিখুঁত নয়। সেটাও অবশ্য অমর চুনায় নয়। একদিন না একদিন গণতন্ত্রকেই ফিরে আসতে হবে।

কিন্তু গণতন্ত্রেরও একটা প্রশ্ন আছে। সে কেবল সুশাসন নয়, সে সুশাসন। মোগল বাজার যে দুটো বছর ঘুমন্ত হলো তার কারণ যেসব সংসদস্য ছিলেন সুশাসক। ইংরেজ বাজত্বও যে দুটো বছর ঘুমন্ত হলো তারও কারণ ইংরেজ সংসদস্যরা ছিলেন সুশাসক। তাঁরা ভালো করেই জানতেন যে তাঁরা দেশপ্রতিনিধি নন, দেশের সম্পত্তি ভোগ করতে হলে সুশাসনই তাঁদের একমাত্র নিরাপত্তা। তাঁরা গায়ের জোরে ছিলেন না, জেনেশুনেই ছিলেন এই মূল সূত্রটি বশ। তাঁরা তাবেদারদের ঐক্য বিরোধিতেন, আইন আদালত গড়েছিলেন, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা গড়েছিলেন, বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা দিয়েছিলেন ও আধুনিক জগতের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন বলেই এতকাল ছিলেন।

কিন্তু সুশাসনের চেয়ে বড়ো কথা হলো স্বশাসন। পরের ছেলে সন্তানও হলে তাকে তার ইচ্ছামতো চলতে দেওয়াই ভালো। সে হয়তো বিপথে যাবে ও সম্পত্তি খোঁয়াবে

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

দরখাস্ত

সৈয়দ মুজতবা আলী

এইমাত্র বরেণ্যদিন পূর্বে ঐতিহাসিক ঘটেছে। আমার এক বন্ধুপুত্র কঠোর তেরোটি বছর কঠোর করার পর ডিগ্রি-ফিগ্রি চাকরী ঢুকেছে। ঈদের দিন এসেছে। তাই আমি তাকে কাগজ হাতে তুলে দিলুম, তার তোমাকে দিয়ে আনন্দের আর প্রয়োজন নেই। কেটে পড়।

ছ'সাত বছর পর চাকরী থেকে মুখ ফেরানো হয়তো অসম্ভব নয়। কারণ অভিজ্ঞতা দ্বারা আমি জানি, কোনো কর্মচারীকে কোম্পানির অর্থ ছ'সাত বছর ধ্বংসের পর তাকে বরখাস্ত করা হয়। ঠিক তেইশবছর আমার এক চাকরী-বন্ধু তাঁর সিল্কের ওয়েস্টকোটের পকেটে আমার তাকিয়ে বলেছিলেন, আমাদের দেশে ছোট ছেলেদের ছ'বছর ধরে কাঁদতে দেয়া হয়। আমি ঐ উত্তর দিয়ে প্রতিবাদ করেছিলুম, 'তবে আমাদের ছোট শিশুকে না কেন?'

আমি শুধালুম, 'কিসের থেকে?'

তবে আঙুল দিয়ে দক্ষিণের রাস্তার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ যে, ওর সঙ্গে পঁচিশটি বৎসর ধরে ঘাড়ে ঘাড়ে লেগে থাকলে কি মুক্তি পাবো না?'

উদাহরণটাও শুনেছি। এক ইংরেজকে শুধিয়েছিলুম—বিয়ে করতে যাবার ঠিক আগের দিন—ওদের বিবাহিত জীবনের কাহিনী শোনাতে বললেন, 'বিয়ের চোদ্দ বছর পর এমন দিন থেকে একটুখানি সান্ত্বনার কড়া কথা বলতেই সে তার দুটি একটি উপরের দিকে তুলে বললে, 'ভগবান! তবে কি আমাদের চোদ্দজনের সেবা হল সেষ?' ইংরেজ একটু থেমে বললেন, 'ঐ আমার আরেল হয়ে গেল। এরপর আর একখানা বাড়ি পর্যন্ত কাড়ি নি।' তারই কিছুদিন পর তাঁর বন্ধুর সন্ধান চাওয়ায় আমি তাঁকে বলেছিলুম, 'চৌদ্দ তলায় প্রমোশন পাওয়া তো সোজা কথা নয়। তাদের ছয় হাজার ফাইল নাড়াচাড়া করে খাটে তারই মধ্যে সন্ধান করি।' ইংরেজ বললেন: সঙ্গে সঙ্গে সন্ধানটা একটি বটিও ঘাইয়ে দিয়ে

এ বছরে আমাকে চার বৎসর ধরে ধরে শুনিয়েছেন আমাদের বন্ধুবর্গ—তখন অবশ্য বিশেষ তাগিদের সময়টা আমাদের—তুমুলের এ স্থানটার সাক্ষ্য হয়ে, 'এর প্রথম ছাপা এত ভাল দেখে মনে হয়,

এবং দুই একটা ভুল থাকে বিয়ে যায়

অভিজ্ঞতা চীনদের সংস্থানে দেখেছেন পক্ষ নেওয়া ছাড়ে, 'এর প্রথমের বয়স্থ থাকে সম্পাদক দোষ দেখায়

দেশ ছেড়ে বছর ধরে বন্ধুদের সম্পাদক তথা প্রকাশককুল আমাকে দোষ দেখাবার চেষ্টা করেছেন। আমি যেন নির্দোষ বিশ্ব এবন তাঁরা আর আমাকে ছাড়তে চান না: উত্তম শারেস্তা-প্রাপ্ত বরেণ্যকে ফেলবে

[illegible]

[illegible]

এমন সময় বেয়ারাদের বন্ধ হয়ে গেল। আমাকে [illegible] তাঁরা আমার ডাক নাম [illegible] তাঁরা

CENTRAL LIBRARY

দিয়েছেন নিশ্চয়ই। কাউকে লাভ দেখে মুগ্ধ [illegible] দেখেন আপনি। তবুও [illegible] করে দি।

মাত্র কিছুদিন পূর্বে সত্যেন্দ্র ঈশ্বিনি কাঁচাতে বেরিয়েছে, ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পর তাঁর একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে যাতে আছে 'অন্-একেডেমিক আই এডমিট—তাই বইটা ছুঁই নি।'

এরপর যেসব পূর্বপরিচয়ে নিছক অর্থের জন্যই 'লাভস্টরি গ্রন্থ' তাদের নাম করতে গিয়ে বাল্জাক্, ডিকেন্স, স্কট, টলস্টয়ের নাম করেছেন।

এই প্রবন্ধটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন মিঃ কার্টার। তিনি তারপর আপন বক্তব্য জুড়েছেন, 'কিন্তু এখানেই থেমে যাওয়া কেন?' বহুলোকের লেখা যাঁরা পড়ে থাকেন তাঁরাই নাম করতে পারবেন, তা জনসনও একবারে মূর্খচূড়ামণি ছিলেন না; 'নিতান্ত গাড়োল (blockhead) ভিন্ন অন্য কেউ অর্থ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে লেখে না'—এই ছিল সেই মহাপুরুষের সুচিন্তিত অভিমত।

অবশ্য তার প্রেরও বহু পাওয়া যে টাকার জন্য লিখেও টাকা কামাতে পারেনা না।

আমি তা জনসনের পদধূলি হওয়ার মতও স্পর্ধা রাখি নে; অতএব তাঁর মত কটুভাষণ আমার মুখ দিয়ে বার হবে না, অর্থাৎ যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে লেখে, সেই অপরাধী যে পাঠক, যে সম্পাদক তা আবিষ্কার না করে শুধু বলবো অর্থের জন্য লিখেছি, নিছক টাকার জন্য।

জনসন বলেন যখন উইলসটাক তখন ওকলের রবীন্দ্রনাথ আমাকে একদিন বললেন, 'এবার থেকে তুই লেখা ছাপাতে আরম্ভ কর। আর দেখ্, লেখাগুলো আমাকে দিয়ে যাস। আমি ব্যবস্থা করবো।'

আমার অর্থাভাব তিনি জানতেন; তাই অত্যন্ত আমার হাত দিয়ে কেউ যেন তামাক না খায়, অর্থাৎ আমাকে exploit না করে। তিনি একরা উত্তমরূপেই জমিদারী চালিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু কটেজপ্রেতে দিন চলে যাচ্ছিল তাই বাজেরীকে বানরীর মত বাসরা পরিয়ে ঘরে ঘরে নাচাতে হল না। এটি বিদ্যাসাগর মশাই দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন অত্য দত্ত উদ্বরস্যার্থে কিং কিং না ক্রিতে মহা। বানরীর বাজেরীং নর্তয়ামি গৃহে গৃহে ।।)।

'আমি শান্তিনিকেতন ছাড়ি ১৯২৮-এ। ১৯৩৮-এ শুক্রবারকে প্রণাম করতে এলে তিনি জানতে চাইলেন, আমি কোনো লেখা ছাপাচ্ছি না কেন? উত্তরে কি বলেছিলুম সেটা আর এখানে বলে কাজ নেই।

কাজেকর্মে চলে গেল ১৯৫১ পর্যন্ত [illegible] (অর্থাৎ তেতাল্লিশ বছরের; শরৎ ইটস-স্টার্ভড্) বই ছাপা হয়ে গেল তখন; সেটা খুবই উল্লেখ করবার।

পরেরটা না হলেও পৃথিবীর অন্তত শেষ অপূর্ব, ফ্লবার্টকে ক্রুসটোনি বলছেন, 'আমি ছেলেবেলা থেকেই জানতুম, অর্থের প্রয়োজন আছে। কিন্তু দেখলুম, এক অপূর্ব কম্পাস করা ভিন্ন অন্য কোনো এলেম আমার পেটে নেই। সেই করে টাকা হয়েছে যথেষ্ট। এখন আর কাজকাম করবো কোন্ দুঃখে!' খ্যাতির মধ্যগগনে, যৌবনে, তিনি ঐই অপূর্বকাটি ছাড়েন। তারপর তিনি বোধহয় আরো দুটি অপূর্ব তৈরি করেন—নিতান্ত বাধ্য হয়ে, প্রায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য, ও আরেক বার একজনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য।

ফ্লবার্টের তুলনায় আমি কীটস্য কীট। কিন্তু আমি দেখলুম, ঐ এক দুই লেখা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে পরদা কামাবার মত বিদ্যে আমার ব্রেন-বাক্সে নেই। আশ্চর্য, তারপর একটা চাকরী পেয়ে গেলুম। কাজেই লেখা বন্ধ করে দিলুম। চাকরী ইস্তফা দিলুম। বের করলুম। বের চাকরী। বের করলুম। বের চাকরী, বের—ইত্যাদি।

আমার লেখা অল্প লোকেই পড়েন, আমার জীবন এমন কিছু একটা নয় যা নিয়ে লোকের কৌতূহল থাকতে পারে। তবু যাঁরা নিতান্তই 'নোজী' (স্পীকটেন্—নোজীপার্কার) তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন, যখন আমার চাকরী থাকে, তখন আমি লিখি না।

একবার ক্লাসে ডোকবার পূর্বে প্রশ্ন ছিল; 'তোমার জীবিকা নির্বাহের উপায় কি?'

উত্তরে লিখেছিলুম, 'বিনামিন অব্দর অব্দর চাকরী বিজাইন দেওয়া (রিজাইনিং জব্, জব্ টাইপ্ টু টাইপ্)।'

ফরাসী ওস্তাদ, 'তাহলে চলে কি করে?'

বলনুম, 'তুমি রেজিগনেশনগুলো দেখো; আমি জব্গুলো দেখছি।'

● 'তাহলে চলে কি করে?'

পেটের দায়ে লিখেছি, মশাই, পেটের দায়ে। বাংলা কথা। যেচ্ছায় না লেখার কারণ—

১। আমার লিখতে ভাল লাগে না। আমি লিখে আনন্দ পাই নে।

২। এমন কোনো গভীর, গূঢ় সত্য জানি নে যা না বললে বসুন্ধরা কোনো এক মহাবৈভব থেকে বঞ্চিত হবেন।

৩। আমি সোসাল রিফর্মার বা প্রফেট নই যে দেশের উন্নতির জন্য বই লিখব।

৪। খ্যাতিতে আমার লোভ নেই। পেটুই হয়েছে, সেইটেই প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে। নাহক লোকে চিঠি লিখে জানতে চায়, আমি বিয়ে করেছি কি না, করে থাকলে সেটা প্রেমে পড়ে না কোড ম্যারেজ, যে রকম কোড ম্যারেজ, খুন হয়—অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন ঠিক করে দিয়েছিলেন কি, না?—শব্দবের সঙ্গে আমার আবার দেখা হল কি, না, 'চাচাটি' কে, আমি আমার বউকে ভালই কি না—ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং কেউ কেউ আসেন আমাকে দেখতে। এখানকার বাকৃসিদ্ধি নক্সালরা, সুধীরঞ্জনকে দেখার পর আমার মত ঘটোৎকচ-টাকে একনজর দেখে নিতে চান। কারণ কলকাতার কেবার ট্রেন সেই বিকেল পাঁচটায়; ইতিমধ্যে আর কি করা যায়। এবং এসে যাঁহিনত হতাশ হন। ভেবেছিলেন দেখবেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মত সুপুরুষ গৌরবর্ণ নাতিবৃদ্ধ এক তরুণ লীলাকমল হাতে নিয়ে সুদূর মেঘের পানে তাকিয়ে আছেন; দেখেন যাঁধিপোতার গামছাপরা, উর্ধ্বার্ধ অনাবৃত, বক্ষে তাল্লুকের মত লোম, মাথা-জোড়া টাক—দুনরুক্ষ হ্যাবড়া হ্যাবড়া মুখ, সাতদিন দেউরি হয় নি বলে মুখটি অবনত,—হাতলভাঙা পেয়ালায় করে চা খাচ্ছে আর বিড়ি ফুঁকছে!

আমি যাঁতিবত নোটিশ দিয়ে লেখা বন্ধ করেছি। গত বৎসর যে-মাসে আমি 'দেশ' পত্রিকা মারফৎ সেটা জানিয়ে দিয়েছিলুম। কেউ কেউ আপত্তি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন—তাঁদের স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছি। তারপরও দু-একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ধারণ শোধের জন্য।

আর কখনো লিখব না, একথা বলছি নে। চাকরী পেলেই লিখব। খেতে পরতে তো হবে।

রাঙা বাহাদুর

জরাসন্ধ

॥ এক ॥

কোনো প্রসিদ্ধ মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ অধ্যাপক একবার আমার জেল 'পরিদর্শন' করতে এসেছিলেন। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনি বুদ্ধিদর্শন। দু'দুটো 'ডক্টরেট' ডক্টর—ক্রিমিনোলজী এবং সিনোলজী। অর্থাৎ একাধারে অপরাধতত্ত্ব ও চীনবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ। আমার চাকরির তখন শেষ হপ্তা চলছে। যত জেল খুরে এবং যেটুকু 'বিশেষজ্ঞ' আখ্যা না পেলেও অভিজ্ঞতার খাতে মোটা সঞ্চয়ের দাবী করতে পারি। সম্ভবত সেই কারণেই কারাবিভাগের কর্তারা তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমিও যেন কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম, সরকারী শিক্ষাগারে যার নাম হচ্ছে অর্থাৎ তৈরি হয়ে যাওয়া। এই জেলে বসে অর্থাৎ কোনো দেশের কারাগারে আমার এই শেষ।

কিন্তু বন্ধুবান্ধব আমাকে কী ভাবতে বিদেশে বসবাসে। নিজেও কোনো পণ্ডিতী প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করছেন না, আমাকেও তার সুযোগ দিচ্ছেন না। তাঁর বহুপঠিত সমাজ দু'চারটি বক্তৃতা দেবার পর, তখন দিন দেখেই 'ফরওয়ার্ড' চলে গেছেন। 'প্রাইভেট রেডিওর'। যার মধ্যে কয়েকটির নাম হল

এবং যাহাতে বিবরণের কিছিৎ থাকে) ছেয়ে নিয়ে, তার থেকে বেছে বেছে কতগুলো নমুনা সংগ্রহ করে তাদের সঙ্গে দেখা-শুনো, আলাপ-সালাপ শুরু করলেন।

কোন্ মানুষে তিনি ভাঁতি, ঘৃণা, ক্রোধ ও তাদের ঘর্ষ ছেড়ে করে 'অপরাধী' নামক প্রাণীর প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছে যেতেন, সেখান থেকে কেমন করে কি তথ্য সংগ্রহ করতেন, সেসব কথা এখানে আলোচ্য নয়। দুঃস্বপ্নের উপর আমার জেলে কাটিয়ে এখান থেকে কি অভিজ্ঞতা নিয়ে গেলেন, যাবার আগে তাঁকে শুভেচ্ছাস্বরূপ যে কথাটি বলেছিলেন, সেইটুকুই আমার বক্তব্য। তিনি বলেছিলেন, 'যাকে জাত-ক্রিমিনাল বলে, আপনার এখানে একটাও পেলাম না। আফসোস এখানে থাকি কেন, যে-কটা ইণ্ডিয়ান দেখে যুরোপ—তারা সব খুনিখিম—সবগুলিই তাদের সেরা বড় কর।'

'জাত-ক্রিমিনাল' বলতে তিনি বোধহয় বোঝাতে চেয়েছিলেন—'ক্রাইম' যাদের ধর্ম এবং প্রকৃতি হঠাৎ একদিন চৌকের মাথায়, আবেগের বশে কিংবা প্রতিহিংসার তাড়নায় খুন করে বসে, যাদেরকে দেখবার জন্যে দল বেঁধে ভাগাভাগি হয়ে এল, সকল কোকে অবাকিত দৃষ্টান্তাকে পেছে কাঠগড়ায় দিটিয়ে দিল, কিংবা অপরের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কিছু টাকাকড়ি অপহরণ করে যা চাক দিল—এই জাতীয় অপরাধীকে তিনি, 'ক্রিমিনাল' বলে যে একটা জাত আছে, তার মধ্যে ফেলতে চান নি। তাঁর মতে তারা সব 'অ্যাক্সিডেন্টাল অফেন্ডার।' আসল ক্রিমিনাল তারা, 'ক্রাইম' যাদের ধ্যান জ্ঞান সাধনার বস্তু, নক্ষত্রপট সন্ধান কিংবা অত্যাশ্চর্য জীবনদর্শন।

'এদের যাদের দেখলাম', বলেছিলেন অধ্যাপক, 'তাদের বেশিরভাগই অবস্থার দাস, যা কিছু করেছে, লোভে বা বিপাকে পড়ে, কিংবা জীবিকার প্রয়োজনে। তার পেছনে জীবনের কোনো গভীর প্রেরণা নেই। সত্যিকার ক্রিমিনাল কর্মযোগীর মত নির্লিপ্ত, নিষ্কলঙ্ক। উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা গাছে, কিন্তু সেটা অদ্ভুতাত নয়, অনেক সময়ে ওটা নিজের মনকে তোলাবার প্রয়াস। আসলে 'ক্রাইম' তার কাছে এক রকমের 'আর্ট ফর আর্ট'। নিছক সৃষ্টি, ইচ্ছা ক'রে যে করে, তা নয়। ভিতর থেকে কে একজন ঠেলে এগিয়ে দেয়। না ক'রে উপায় নেই।'

সেদিন তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ রাজাবাহাদুরের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। হয়তো তার কারণ অধ্যাপক যাদের সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, তাদের সঙ্গে তাঁর কোথায় যেন মিল আছে। কিংবা হয়তো, এমনিই মন যখন কি ভাবে, কেন ভাবে তার কি কোনো হেতু আছে? থাকলেও তাকে খুঁজতে যাওয়া নিছক বিড়ম্বনা। সে সব 'কেন'র পিছনে না ছুটে, যে লোকটিকে সেদিন মনে পড়েছিল, তার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয়ের বলবার চেষ্টা করি।

রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা আমার চাকরি-জীবনের প্রথম অধ্যায়ে। তখনো জেলের চাল-চাল, আইন-কানুন পুরোপুরি রাপ্ত হয় নি। কয়েদীদের ও কারাকর্মীর ভিড়ের যে দুস্তর ব্যবধান, সেটা ঠিক বজায় রাখতে পারি নি। 'প্রেজেন্স' হিসাবে এই মানুষটিকে দূরে রাখা দরকার তার চেয়ে একটু বেশি কাছে এসে পড়েছিলাম। তার প্রধানতম কারণ বোধহয় তাঁর রূপ। নারীসুলভ ত্রিবিধেশে রূপের যে একটি সর্বজনীন আবেদন আছে, রাজাবাহাদুরকে দেখেই সেটা প্রথম অনুভব করেছিলাম। অনুপমনীয় অঙ্গ-সৌষ্ঠব। দীর্ঘ উন্নত দেহ, প্রশস্ত ললাট আয়ত চক্ষু। তাঁর এবং রাজপুত্রদের দিকে চেয়ে মনে হয়েছিল, 'বৃদ্ধত্ব' ও 'অভিজাত্য' বলে যে দুটি শব্দ কালিদাস ব্যবহার করে গেছেন, তার মধ্যে কোনো কবিজনোচিত অত্যুক্তি নেই। আর একটা কথা মনে হয়েছিল। এ দেহের প্রতিবেশীর শোভাকে ছাড়িয়ে গেছে সম্ভ্রম, সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে উঠেছে আভিজাত্য। গিবনিরা বলেছিলেন, 'হাইনেস রাজাবাহাদুর—Every inch an aristocrat! আমাদের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ডার জোন্স-এর উপর ভার পড়েছিল ওঁকে সেল্-এ পৌঁছে দেবার। ফিরে এসে বলেছিল, Bloody Mountain. ভাষা ও প্রকাশের ভঙ্গীটা কিঞ্চিৎ অমার্জিত হলেও, একবাক্যে এর চেয়ে যথার্থ পরিচয় বোধহয় আর হতে পারত না।

রাজাবাহাদুর খুন-মামলার আসামী। হাইকোর্টে। অব্যবহিত উপায় বিষপ্রয়োগ। কিন্তু তার প্রক্রিয়া অদ্ভুত ও অভিনব। বিষ সংগ্রহের সুদীর্ঘ এবং জটিল ইতিহাস অনুধাবন করতে গিয়ে পুলিস যে সব তথ্য উদ্ধার করেছিল, তার থেকে চিরবহমান মানব-মনের একটি অনাবিষ্কৃত গোপনকক্ষের সন্ধান পাওয়া যায়। সবটুকু তখনো উন্মোচিত হয় নি। যেটুকু দৃশ্যমান, তাতেই আমরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। একজন মানুষকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে আর একজন মানুষের কি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, তার রূপায়ণে কি গভীর অভিনিবেশ, কি দুর্জয় নিষ্ঠা, কি ধৈর্যহীন সাধনা! শুধু তাই নয়। যে মস্তিষ্ক সেই শুভ চক্রান্তের প্রতিটি খুঁটিনাটি পরিচালিত করেছে, যে হাত দিয়ে শাণিত ফুটবুদ্ধি প্রতি মুহূর্তে তীব্র করে রেখে দেছে, তা দিয়ে অনায়াসে আর একটা হত্যা ছিনিয়ে আনা যেত। আর এখানে সেই বিপুল প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য ছিল একটিমাত্র নিরীহ মানুষের প্রাণটুকু কেড়ে নেওয়া।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, এই হত্যাযজ্ঞের অন্তর্নিহিত প্রেরণা সেই চিরন্তন ধাত্য-লোলুপতা, ক্ষমতা ও বিত্তের অধিকার-লিপ্সা, অনাদিকাল থেকে ছোট-বড় রাজপরিবারে যা বহু রক্তাক্ত পিশাচলীলার ইন্ধন যুগিয়ে এসেছে। তাই যদি হয়, সেই ঈপ্সিত বস্তুটিকে অনায়াসে আয়ত্ত করার পথে এখানে তো কোনো বাধা ছিল না। যাকে হত্যা করা হল, সে তো স্বেচ্ছায় তার সুখ স্বাস্থ্য ও বাসিন্দা থেকে নিঃশেষে সরে দাঁড়িয়েছিল। উনিশ বছরে পা দিয়েই সাবাস্ত মালোহারায় বিনিময়ে তার অংশের সমস্ত সম্পত্তি ছোট ভাইকে লিখে দিয়েছিল। পৈতৃক প্রাসাদে বাস করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত রাখে নি। সব ছেড়ে বেরিয়ে চলে এসেছিল। ব্যক্তিগত ব্যবহারের দু-চারটি তুচ্ছ জিনিস ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে আনে নি। কোলকাতার এক অখ্যাত গলির ছোট ভাড়া-বাড়িতে লেখাপড়া নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল। ফিরে চায় নি। ফিরবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিল; যাতে করে, তার কোনো উত্তরপুরুষ, সুদূর ভবিষ্যতে, সে যা ছেড়ে দিয়ে চলে এল, তারই দাবী নিয়ে সেই প্রাসাদের দ্বারে গিয়ে দাঁড়াতে না পারে।

উত্তরাধিকারের পথে জটিল দুনিয়ার জিনিস সে নিজে আসতে বাধ্য হয়েছিল। একটি পিতার আসলের ভৃত্য, গঙ্গাচরণ, আর একটি তারই মুখের ভাক—'ছোটবুবার'। প্রথমটি তাকে ছাড়ে নি, দ্বিতীয়টি সে অনেক ধকাধকি করেও ঝাড়তে পারে নি। ঐ বাবুটুকু ছাড়া 'খুনাবন্ধের' আর কোনো নিদর্শন তার জীবনযাত্রার কোনোখানেই দেখা যায় নি। স্বভাবে নিরলস নিরীহ, নির্বিরোধ সরল ও অমায়িক। চালচলনে অতিশয় সাদাসিধে। বই ছাড়া আর কোনো নেশার বালাই নেই। বন্ধু-সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে

যোগাযোগ অতি ক্ষীণ। বেচুর ছিল, তার জন্যে স্বার্থের সংঘাত ঘটবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও দেখা যায় নি. সে যে কোনো দিন কিংবা আক্রোশ বা বিদ্বেষের পাত্র হয়ে দাঁড়াতে পারে, একথা কে ভেবেছিল?

তবু তাকেই একদিন আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হল। আকস্মিকভাবে নয়, তার পিছনে কি বিপুল আয়োজন! কেনই একই প্রশ্ন আবার আসছে। এত প্রয়োজন ছিল এই ছেলেটিকে খতম করে দেবার? কি উদ্দেশ্য?

সে প্রশ্ন আজও অনুচ্চারিত। আবার কাছে অবীমাংসিত হয়ে রয়েছে। পুলিশ কিংবা আদালত সেই নিগূঢ় সত্যে পৌঁছতে পারে নি। হয়তো মনস্তত্ত্ববিদ হয়তো এর উপরে কিছুটা আলোকপাত করতে পারেন। কিন্তু তাঁকেও স্বীকার করতে হবে, 'এটা হয়, এই পর্যন্ত জানি, কেন হয় তা জানি না।'

আমার বেচুর আবিষ্কার, তার মূল-সূত্র রাজাবাহাদুরের নিজের উক্তি। দীর্ঘদিন পরে যখন তাঁর খনিজ সাহিত্যে আসবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তখন একদিন কথাচ্ছলে বলেছিলেন। মনে আছে সেদিন আবিষ্কারের উল্লাসে আমি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম। এত চেষ্টা, এত লাভ-সাধনা, এত দীর্ঘদিনের গবেষণা ও অনুসন্ধানে যা কেউ পায় নি, আমি তাই পেলাম। কলম্বাসের চেয়েও আমি ভাগ্যবান। তারপর যেমন যেমন বেড়েছে, জীবনে অনেক কিছু দেখেছি এবং অনেক কিছু, যা খেয়ে খেয়ে অনেক কিছু শিখেছি, তখনই মনে হয়েছে, রাজাবাহাদুর সেদিন যা বলেছিলেন, তার জন্যে কপটতা হয়তো ছিল না, কিন্তু সেইটাই যে সত্য তা-বিষয়ে কি নিজেই নিশ্চিন্ত ছিলেন? আমার মনে হয় ছিলেন না। উকিল, ডাক্তার, পুলিশ এবং আমাদের মত তিনিও একজন অনুসন্ধানী মাত্র। নিজের মনের ভিতরটা হাতড়ে দেখতে গিয়ে ঐ উত্তরটা পেয়ে গিয়েছিলেন। শেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকের ভিলেন ইয়াগো যাকে মাঝে নিজের কাছে তার চিন্তা ও আচরণের একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছে। সেই সম্পর্কে একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক বলেছেন—motive hunting of a motiveless malignity আমার মনে হয়েছে, কথাটা রাজাবাহাদুরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এটাও motive hunting ছাড়া আর কিছু নয়। নিজের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়কে খুঁজে বের করবার চেষ্টা। আত্মানুসন্ধান। তাছাড়া হয়তো কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না। নিছক নিষ্কর্মের অ্যাডভেঞ্চার, কিংবা আর কিছু।

তবু রাজাবাহাদুরের সেই স্বীকারোক্তি আজ আর আমি গোপন রাখতে চাই না। যথাসময়ে প্রকাশ করব। তার আগে আরো কিছু বলবার আছে। বিশেষ করে আর একজনের কথা—যার বিষয়কর প্রতিভার সুষ্ঠু-সংযোগ ঘটলে রাজাবাহাদুরের পরিকল্পনা সার্থক হতে না। সে একজন তরুণ ডাক্তার। নাম—মনন নিশানাথ লাহিড়ী।

নিশানাথ-মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র। সেখানে তার প্রধান অবদান বিলম্ব ছিল জীবাণুতত্ত্ব। বেরিয়ে এসে তাই নিয়েই গবেষণা সুরু করেছিল। অবৈজ্ঞানিক চিন্তার মিশে সুপ্রাচীনকে কিন্তু মহাশক্তির নারীস্বাটের সন্ধান। উপযুক্ত সহায় ও সুযোগ পেলে এই তরুণ বিজ্ঞানী মানব-কল্যাণের এই বিশেষ ক্ষেত্রে চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের কৃতিত্ব রেখে একদিন বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, সে বিষয়ে তার অধ্যাপকেরা নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিন্তু কোথেকে আসবে সেই সুযোগ! কে হবে সেই সহায়! নিজের সঞ্চিত কিছুই ছিল না বরং পাঁচ জনের কাছে ধার করে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ বাপ-মা, অপরাও ভাইবোন, স্ত্রী ও একটি শিশু সন্তান তার কাঁধে এসে চেপেছিল। নিশানাথ লিখেছিল, 'বিদাই-এর বিলাস তাকে ছাড়তে হবে। লাবরেটরী ছেড়ে নামতে হবে রোজগারের বাজার।

সে পথও সহজ বা সরল নয়। অমনভাবে দিনে চাকরি মেলা দুষ্কর। আর প্রাকটিস্? তার পিছনেও অনেকখানি প্রস্তুতির প্রয়োজন। সেই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আনুকূল্যের আশা নিয়ে নিশানাথ একদিন হাজির হল তার ছিটেবটী বুকস্বী এবং প্রাক্তন ডাক্তার মুস্তফির কাছে। মুস্তফি নামী ডাক্তার এবং রাজাবাহাদুরের গৃহচিকিৎসক। লাহিড়ী যখন গিয়ে পৌঁছল, তিনি তখন বেরোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বললেন, গাড়িতে ওঠো। নিশানাথ সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকাতেই যোগ করলেন, চল না? বলে, নোলা নিয়ে গেলেন রাজাবাহাদুরের দরবারে। মোটামুটি একটা ক্লিনিক বিষে ডিস্পেনসারি সাজিয়ে বসবার মত কিছু সাহায্য, বিনিময়ে একটা চাকরি—এর বেশি কোনো প্রত্যাশা মুস্তফির মনেও ছিল না। কিন্তু ভাগ্যচক্রের কি আশ্চর্য বিবর্তন! 'ছেলেটির প্রতিভার পরিচয় পাবার পর রাজাবাহাদুরের বদান্যতা আরো অনেক-খানি প্রসারিত হল। সহকারী গৃহচিকিৎসকের হিসাবে একটা মাস-মাইনের চাকরির ব্যবস্থা তখনই হয়ে গেল। রাজাবাহাদুরের বিনীত মৃদু স্বরে মুস্তফিকে বললেন, আমাদের পরিবার, আত্মীয়-পরিজন, জাতি-গোষ্ঠী, নোক-লস্কর নিয়ে পরিবারটি তো অনায় ছোট নয়, স্যর! কারো না কারো একটা কিছু রোগই প্রায় লেগে আছে। সব ব্যাপারে আপনাকে ঘরে টানাটানি—তার চেয়ে এ ভালোই হল। উনি একবার করে ঘুরে যাবেন। যেমন যেমন প্রয়োজন বোঝা গিয়ে আপনি তো রইলেনই।

এটা গেল প্রাথমিক বন্দোবস্ত। পরের পর্বটাইই আসে। বিজ্ঞানীর মন নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাবার মত একটি সুসজ্জিত লাবরেটরী। রাজাবাহাদুর বাজাকিকে ডেকে তখনই একটা নোট টাকার তেড়া ছিঁড়ে জোড়া দিতে বললেন এবং নিশানাথের দিকে ফিরে বললেন, এটা শুধু স্যর। আনুষঙ্গিক আর আনুষঙ্গিক যা কিছু দরকার তাঁর ফর্দ করে ফেলুন। রাসায়নিক বা বিলাতি-এর সঙ্গে আর যা যা প্রয়োজন, তার একটা লিস্টি করে ফেলুন। কোনো রকম টানাটানি করবেন না। যেখানকার যে-টা সেরা, কিনিয়ে নেবেন। টাকার জিনিস আপনাকে ভাবতে হবে না। আমার ম্যানেজার এসব বিষয়ে আছে। লিস্টিটা তার কাছে পাঠিয়ে দেবো। নিজে তদারক করে সংগ্রহ করে সাজানোর ওপর পাকা ব্যবস্থা করিয়ে একেবারে সঙ্গে নিয়ে আসবে। কি বলেন স্যর? এইটাই ভালো ব্যবস্থা নয়? ও-সব জিনিসের জিনিস, সবকিছু নিজে নাড়াচাড়া না করলে পরেই কোনোটা খারাপ হয়ে যেতে পারে।

শেষ কথাগুলো ডাক্তার মুস্তফির উদ্দেশে। তিনি আবেগের সুরে বললেন, আমি আর কি বলবো, রাজাবাহাদুর? বলবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনার এই বদান্যতা—

—এই দেখুন; আপনিও যদি অমন করে বলেন স্যর, তাহলে তো বড় মুস্কিল। দান-টান কিছু নয়, ভবিষ্যৎ মুস্তফি। একবাশ পড়ে পাওয়া টাকা; ব্যাঙ্কে বসে বসে পচছে। একটা ছেলে নেই যে, তার জন্যে রেখে যাবো। একটা মাত্র ভাই, সেও তো কেমন বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেল। কি হবে টাকা দিয়ে? তবু যদি এই রকম একটি প্রতিভাবান ছেলেকে একটু দাঁড় করিয়ে যেতে পারি, শুধু ওর নয়, দেশের, দশের মঙ্গল হবে। এই সুযোগটুকু যে

আপনি চলবেন কি করে? তার চেয়ে বরং আপনার কাছে একটা ... আচ্ছা, তাহলে ঐ কথাই রইল তো? তোমাকে কিন্তু তাই আমি 'তুমি' বলেই ডাকবো।

—নিশ্চয় নিশ্চয়, তুমি বলবেন বৈকি? সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন ডাক্তার মুখুজ্যে। একেবারে ঘরোয়া হয়ে ওঠা আমার ধাতে।

—তবু ভাল যে দূর, আপনার উপযুক্ত ছাত্র।

সাধারণের মধ্যেই ইউরোপ থেকে অনেকটি সঙ্গ-আধিকার নিয়ে ফিরে এসে পৌঁছল। একেবারে আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত হল ডাক্তারখানা। রাজাবাহাদুর একদিন এসে দেখে গেলেন। নিশানাথ খুবই কাজ করছিল। রাজাবাহাদুরকে সন্তর্পণে অভ্যর্থনা করে একটি একটি করে প্রতিটি যন্ত্রের সৃষ্টি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দিয়ে নিজে কি কি দিয়েছে বুঝিয়ে বলতে লাগল। সব বলার পর বললেন, কোথাও ফোকর ছুটি নেই তো? যা চেয়েছিলে, সব পেয়েছ?

—তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছি রাজাবাহাদুর। আশীর্বাদ করুন, যেন সেই পাওনার গৌরব রাখতে পারি।

রাজাবাহাদুরের কণ্ঠস্বর ও বাক্যভঙ্গীর মধ্যে একটি অবজ্ঞাচ্ছিত্ত কিন্তু সবটাই সর্বদাই শোনে আছে। যেন তাঁর ঐশ্বর্যের তুলনায় এবং যার বাহক এই বিশাল সেইটির জন্য তিনি সকলের কাছেই লক্ষিত। ব্যবহার ও কথাবার্তার মাধুর্য দিয়ে ঐ ত্রুটি যন্ত্রকে যতখানি আড়াল করে রাখা যায়, তারই চেষ্টা। নিশানাথের মত একান্ত আত্মিজনের কাছেও তাঁর দুর্বলতার সীমা নেই। তার কথার অন্যান্য লক্ষ্য পেয়েছেন এমনিভাবে হাসতে মিষ্ট কেটে মাথা নেড়ে বললেন, না না; ও কথা বলো না, তোমাকে আশীর্বাদ করবার মত স্পর্ধা আমার নেই। প্রার্থনার তাতেরা জানাই। তুমি অনেক বড় হও, আমাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল কর, এই প্রার্থনা করি।

ঘন্টা দেড়েক কেটে যাবার পর নিশানাথ তার গবেষণার এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছল, যেখানে বিশেষজ্ঞের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়া আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। হেমন ব্যক্তি এদেশে অত্যন্ত দুর্লভ। দু একজন যাঁরা আছেন, তাঁরা বড় ক্ষেত্রে ব্যস্ত। ঐ বিশেষ গবেষণার উপযোগী কোনো সাহায্যের তখন কোলকাতায় নেই। পাঁচশো মাইলের একটি প্রসিদ্ধ ইনস্টিটিউটে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। উপায় কিন্তু সাহায্য করবে যত বিদেশী বিজ্ঞানীও আছেন কজন। কিন্তু সেখানে অপেক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার। অত্যন্ত নাজুক যোকের জোবালো সুপারিশ চাই। ডাক্তার মুখুজ্যের মত বিরক্ত করা যায়? তাঁর সময় কতখানি টিকবে, তাই বা কে জানে? কেন্দ্রিজ ফিরে সুযোগ্য লেখা দিলেও আর্থিক প্রশ্নটা আরো বড়। অনেক টাকার দরকার।

এখনকার খরচ,—অতদিন থাকতে হবে ঠিক নেই—তার উপরে কোলকাতার সংসারের ব্যবস্থার। অর্থাৎ চাকরিটি খোয়ানো চলবে না।

রাজাবাহাদুরের কাছে কথাটি কেমন করে পাড়া যায়, এইসব যখন ভাবছে, হঠাৎ তাঁর কাছ থেকে ডিনারের নিমন্ত্রণ এসে পৌঁছল। উপলক্ষের উল্লেখ নেই। অনেক সময়েই থাকে না। বিনা উপলক্ষে যখন-তখন বন্ধুবান্ধব এবং আশ্রিত-পরিজনদের তুষ্টিবিধানে আপ্যায়িত করা তাঁর একটা বিলাস।

কিন্তু এবারে, নিশানাথের লক্ষ্য করল নিশানাথ, নিমন্ত্রিত সে একা। খাবার যেখানে দেওয়া হল, সেটাও ভোজনশালা নয়, সদর ও অন্দরমহলের মাঝামাঝি রাজাবাহাদুরের নিজস্ব গোপনমহলের একটি ছোট ঘর। তিনিও বসলেন অতিথির মুখোমুখি। মাঝখানে টেবিলের উপর খাবার সাজানো। উপকরণ যথারীতি; অর্থাৎ বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের অভাব নেই। অভাব পরিবেশকের। সেই অবকাশে চোখের ইসারা-ইঙ্গিত 'বয়' বা ওয়েটারদের কোনোও দেখা গেল না। রাজাবাহাদুর তাঁর সেই নিজস্ব মধুর হাসির সঙ্গে মৃদু কণ্ঠ মিলিয়ে বললেন, বরফ-সরম দেখে তুমি নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে গেছ?

নিশানাথ অস্বীকার করল না—তা একটু হয়েছি।

রাজাবাহাদুরের মুখে সেই হাসিটি মিলিয়ে গেল, কিন্তু তার ঘিরে রেখাগুলো লেগে রইল। কয়েক মুহূর্ত বিরতির পর বললেন, অনেকদিন থেকে ভাবছি, একটা বেলা দুজনে একসঙ্গে বসে খাবো। সেখানে আর কেউ থাকবে না; এমন কি বয়-বেয়ারার উৎপাত পর্যন্ত না। তোমার মেটি ভালো লাগবে, আমি নিজে হাতে পাতে তুলে দেবো। ম্যানটা খুব অবিশ্বাস; কি বল?

নিশানাথ বোধহয় একটু বেশি অভিভূত হয়ে পড়েছিল; সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না। রাজাবাহাদুরও সেজন্যে অপেক্ষা করলেন না। বললেন, কিন্তু গোড়াতে কাজটা খুব সোজা বলে মনে করেছিলাম, এখন দেখছি—তা মোটেই নয়। এই, এই পদার্থটি—কি এটা? বোধহয় চিংড়িমাছের মালাইকারী—এটিকে পাতে চালতে গিয়ে ডিসশুদ্ধ মাছি একেবারে তোমার কোলের উপর উপুড় করে ফেলি, ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে বল দেখি?

বলে, হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর তোয়ালেটা একটু টেনে গোছগাছ করে বসে নিয়ে বললেন, নাও, এসো। আরম্ভ তো করা যাক। তারপর তোমার সিল্কের পাঞ্জাবির কপালে যদি চিংড়িমাছের ঝোল তখন লেগে থাকে, কে খাওয়াবে বল?

খেতে খেতে যে-সব কথাবার্তা চলল—রাজাবাহাদুরই চালালেন—তার বিন্দু ছাড়া একটি মুহূর্ত অন্যরকম; তার ফলে লাজিকীর মধ্যে প্রথমে যেটুকু অস্বস্তিকর লেগে ছিলেছিল, কাটিয়ে উঠতে দেরি হল না। নানা প্রসঙ্গের পর কিসের একটা সূত্র ধরে রাজাবাহাদুর হঠাৎ বলে উঠলেন, তোমার কাছে আমার কিন্তু একটি প্রার্থনা আছে, নিশানাথ।

—প্রার্থনা! ডাক্তারের কাঁটা-চামচে যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল।

—হ্যাঁ; প্রার্থনাই বলবো। সে জিনিস আর কারো-কাছে চাওয়া যায় না, আর কেউ তা দিতেও পারবে না।

—এ শুধু আমাকে লজ্জা দেওয়া, রাজাবাহাদুর। আপনার কোনো কাজে যদি কখনো লাগতে পারি, নিজেকে ধন্য মনে করবো—এ কথাও কি আপনাকে বলে দিতে হবে? কিন্তু এমন কি জিনিস থাকতে পারে, যা আমি আপনাকে দিতে পারি, কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না।

—তোমার কাছে তা অতি সাধারণ, কিন্তু আমার কাছে অমূল্য।

মুহূর্তকাল থেমে ডাক্তারের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন রাজাবাহাদুর। তারপর যোগ করলেন, আমাকে কিছুটা স্নেহের ভার জোগাড় করে দিতে হবে।

লাজিকী কাঁটার খোঁচে একটা কি মুখে তুলতে যাচ্ছিল। সবশুদ্ধ ছিলের উপর পড়ে গেল। বিস্ফারিত চোখ দুটো

রাজাবাহাদুরের মুখের উপর রেখে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে চাপাগলায় তাঁরই কথাটা শুধু আউড়ে গেল—স্নেহের জন্যে!

রাজাবাহাদুর সহজ সুরেই বললেন, আমার বিশেষ দরকার।

—ও নিয়ে আপনি কি করবেন?—প্রশ্ন নয়, আরেকদফা বিস্ময়প্রকাশ।

রাজাবাহাদুর সজোরে হেসে উঠলেন। পরক্ষণেই কুঞ্চিত চোখে লাহিড়ীর দিকে চেয়ে বললেন, তুমি না একজন প্যাথলজিস্ট? হাজার রকম রোগের বীজাণু ঘাঁটাই তো তোমার কাজ। রোগের নাম শুনেই ভয় পেয়ে গেলে?

কথাটা বোধহয় জীবাণু—বিজ্ঞানীর অভিমানে আঘাত করল। সোজা হয়ে বসে আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলল, আজ্ঞে না; ভয় পাই নি। জিজ্ঞেস করছিলাম, ও রকম মারাত্মক জিনিস আপনার কি কাজে লাগবে।

—মারাত্মক কাজেই লাগবে—তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন রাজাবাহাদুর—সেটাও তোমাকে জানাতে বৈ কি? কিন্তু তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না। আর ছুটো গোলাও নাও। দাঁড়াও, আমি দিচ্ছি।

চামচে করে খানিকটা গোলাও ডাক্তারের প্লেটে তুলে দিতে দিতে বললেন, আবদুল কিন্তু রাঁধে ভালো, ওর ঠাকুর্দার বাবা নাকি জাহাঙ্গীর বাদশার খানা পাকাত। মুরজাহান খুশি হয়ে তাকে একটা সোনার বৈজেল দিয়েছিলেন। সেটা অবিশ্যি নেই।

নিশানাথের জোড়নস্পৃহা চলে গিয়েছিল। তবু পাছে দুর্বলতা ধরা পড়ে তাই আপত্তি করল না। একটু-একটু নিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়াও করতে হল। এই ভাবান্তর রাজাবাহাদুরের নজরে পড়লেও তিনি আর ও নিয়ে পীড়াপীড়ি করলেন না।

ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল থেকে প্লেগ তখন বিদায় নিয়েছে। পুনরাক্রমণের সম্ভাবনাও নেই। সুতরাং কোনো স্যাম্পলেটজাত তার জীবাণু নিয়ে কারো গবেষণা করবার কথা নয়। করলেও লাহিড়ীর সে ধরণ জানা নেই। এই কথাই যে সে বলবে, রাজাবাহাদুর অনুমান করেছিলেন এবং তার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। উত্তরে বললেন, এখানে সুবিধে হবে না তা জানি। তোমাকে একটু কষ্ট করে বাইরে যেতে হবে। বাইরে মানে বেশি দূরে নয়, রেলের মধ্যেই—

বলে, পশ্চিমভারতের সেই প্রসিদ্ধ ইনস্টিটিউটের নাম করলেন। লাহিড়ী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ওরে বাপ রে, ওখানে আমাকে ঢুকতে দেবে কেন?

—দেবে না মানে? দেখবে।

রাজাবাহাদুর উঠে গিয়ে পাশের কোন্ একটা কামরায় ঢুকলেন। মিনিটখানেক পরে লোহার সিন্দুকের ভারী পাল্লা খোলার শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই একখানা খাম হাতে করে বেরিয়ে এসে ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে বললেন, পড়।

খামের মুখটা খোলাই ছিল। ভিতরকার চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ডাক্তার প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, ওরা রাজী হয়ে গেছে! আর তো আমাকে এরা কিছুই বলেনি।

—বলবার সময় আসে নি বলেই বলেন নি। চিঠিটাও সবে দুদিন হল পেয়েছি।

লাহিড়ীর মুখে আর কথা সরল না। আজ কার মুখ দেখে তোর উঠেছিল? সে জানে আরো কত আশ্চর্য অপ্রত্যাশিত ঘটনা তার জন্যে সঞ্চিত হয়ে আছে! প্রতিটির মধ্যেই তার ভাগ্যলক্ষ্মীর ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। যা ছিল তার একান্ত অন্তরের অব্যক্ত কামনা মাত্র, এক অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ যার সন্ধান পর্যন্ত পায় নি, তিনিই অনায়াসে তার সকল হুসাহসের সমস্ত আয়োজন করে রেখে দিয়েছেন। এ সুযোগ সে অবহেলা করবে না। তার গবেষণার বিষয় অবশ্য প্লেগ নয়। তবু একে অবলম্বন করেই যাত্রা সুরু করা যাক। অত বড় প্রতিষ্ঠানের সিংহদ্বার একবার যদি খোলা পাওয়া যায়, তার পর সে নিজের শক্তিতেই করে নিতে পারবে। শুভখনি আত্মবিশ্বাস তার আছে।

রাজাবাহাদুরের কাজ নিয়ে যাবার সব চেয়ে বড় সুবিধা হল—এখানকার চাকরিটি বজায় থাকবে। অন্তত সে ছাবী করা চলবে। তার নিজের প্রয়োজনে যদি ছেড়ে হত, মুক্তির সুপারিশ পাওয়া যেতেও, —তাতেও সন্দেহ ছিল—চাকরির আশা ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তার মানে, যাওয়া হত না। এতবড় একটা সাফল্যের স্বপ্ন চিরদিন আকাশ-কুসুমই থেকে যেত। আজ তার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

ডাক্তার যখন এইসব দিনগুলো ভেবে দেখছিল, রাজাবাহাদুর নিঃশব্দে তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলেছিলেন। যখন দেখলেন, ঘোঁটুকু চৌপ ফেলা হয়েছে, ব্যর্থ হয় নি, তখন বাকীটুকু খেলবার আয়োজন করলেন। বললেন, এদিকের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। ম্যানেজারকে বলে দিচ্ছি, ওখানে তোমার যতদিনই লাগুক, মাইনে পুরো মাইনের ছুটি বলে গণ্য হবে। মাসে মাসে তাকিয়ে আমারই লোক দিয়ে উপরি রোজার সাহেব হাতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। তার ওপরে যদি কখনো কিছু দরকার হয়, আমাকে এসে জানালেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করে দেবে। বেয়ারাকেও সেই কথা বলে। আমাকে যেন কোনোরকম সঙ্কোচ না করবে।

বলতে বলতে তাঁর মুখের উপর একটা গাম্ভীর্যের ছায়া ঘনিয়ে উঠল। কিছুক্ষণ নতমুখে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। আবার যখন সুরু করলেন, গলাটাও ভারী শোনাল। যেমনি নরম্যুয়ে বললেন, কোনোদিন মুখ ফুটে না বললেও এবার তুমি নিশ্চয়ই জানো নিশানাথ, তোমাকে আমি নিজের ছেলের মতোই ভালবাসা করে দেখি। সে ছেলেটা যৌবনের মদ ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল; তবুও আমার মনটুকু ভাঙল না, একটা বিদ্বেষও পর্যন্ত করল না, তারপর আমার মন ফিরাবার জন্যে কতো কাণ্ড যে করেছিল। সে যে নিজে থেকে ফিরে এসে ধরা দেবে, স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। তোমাকে ঠিক তাকিয়ে দেখা যে আমার নিজেরই স্বপ্ন—থাক, সে কথা। ও, আর একটা ছোট্ট কাজ বাকী রয়ে গেছে।

বলে তখনই ব্যস্ত হয়ে উঠে গেলেন। পাশের ঘরে আলমারি সেই লোহার সিন্দুক খোলা এবং বন্ধ করবার আওয়াজ। যখন বেরিয়ে এলেন, হাতে একখানা বিলের আকৃতির কাগজ, ডাক্তারের সঙ্গে যার পরিচয় আগে অনেকবার ঘটে গেছে। এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা রেখে দাও।

কাগজের অঙ্কটা চোখে পড়তেই লাহিড়ীর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল—পাঁচ হাজার টাকা? তবু হাত না বাড়িয়ে অনেকটা নিস্পৃহকণ্ঠে বলল, কি ওটা?

রাজাবাহাদুর সরাসরি তার জবাব না দিয়ে বললেন, যে পরিমাণ ফতি তোমার করিয়ে দিলাম, অর্থ দিয়ে তার পুরণ হয় না। সে চেষ্টাও আমি করছি না। এটা এমনিই—বলে কর, ভ্রাতৃপ্রতিমের দক্ষিণা। আমার ঠাকুর হলে হয়তো একটা গ্রাম দান করে বসতেন। সে তুলনায় এ তো কিছুই নয়। নাও।

লাহিড়ী দুহাত বাড়িয়ে চেকখানা গ্রহণ করল এবং নত হয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বলল,

(শেষাংশ ১২৩ পৃষ্ঠায়)

নিষ্কৃতি

আশাপূর্ণা দেবী

পূর্ণ [illegible] থেকে নেমে এসে আজও সেই [illegible] সঙ্গে নিয়ে গেল বিমল। যা দেখে, এখন [illegible] আসনে বসে থাকা শান্ত স্নিগ্ধ সন্ত আর [illegible] মধ্যেই মিলে মিশে হয়ে উঠল।

হোক, হোক, প্রভাত, তবু এই একই সন্ত এরই সঙ্গে। একদিনের তরে জেনেও সেটাকে ভোলা যায় না, ভোলা যায় না।

বলল যে পুজো করে নেবে অনেক, সেটুকু অন্তরে অন্তরে ছিল বেঁধে যে সময়ের ঠিক সেই সময়ে নেবে

[illegible] বেঁধে পড়েছিল। চোখদুটো [illegible] ফাটল ধরে ধরে ভাসল, মোহের মোহ, ঠাকুর দেবতায় [illegible] মানুষের বেশী, তার উপর [illegible]।

যে যাক, বয়সটাই এখন না, ইচ্ছা থাকলে অমন অনেক বয়স বয়ে যায়, পিছুলেরও [illegible] আসে। বিয়েতেনটুইও দেখবার মত।

তা হয়তো বলেও ছিলাম তাকে সেই ঠাকুরঘরেও বলা যথেষ্ট বলাও নিয়েছে। ওকে পরে উঠল হয়ে গেছে বলা যায়। সেই চব্বিশ বছর বয়স থেকে এ চল্লিশ পর্যন্ত ও যার হাতে ঘরের ভার তুলে দিয়ে এসেছে, তাকে অবাধেই বলা যায়। কিন্তু দুঃখের

এখন এখন অবশ্য নিজে একেবারেই [illegible]।

[illegible] স্নান সেরেই 'পুজোর ঘর' ঢুকবে, ঘরের বড় দরজা ছিল বন্ধ। [illegible] খুব ওকটা ডাকেই

এই দুঃখিনীর ঘরানার লোকের তো তবে উপরেই ছিল বিশ্বাস, সেদিন যাদুমণি মাত্র বছর চারেকের ছোট ভাইটিকেও সেই বৃদ্ধ নিজে মানুষের নিয়ে আসলে এসেছে বলবে [illegible] মাত্র চার পাঁচটা বছর এই অত্যন্ত জীবনযাপনে ঢের পড়েছিল, নতুন আর এই দুঃখিনীর স্থানে দেখে'ছল বলল, নতুন আর এক সংসার।

তবু মেয়েদের মাঝে মাঝেই নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রেখেছে, মেয়েদের 'বিধি ব্রত' শেষ হলে [illegible] মাসিক পরীক্ষার পরের দীর্ঘ অবকাশটা পুরোপুরিই কাটিয়ে এসেছে মেয়েদের বিদেশ-ভাঙাইবাড়ির কাছে পৌঁছাতে।

তারপর তো ঘরে ঢোকে নিজেই ঝিকে এল আবার পুরনো বোঝে।

তা সেই চিরকালের দায়িত্বগুলোও অবশ্য অনিবার্য নিয়মে বলবার উপরই আসছে এসে বর্তাচ্ছে, ধীরে ধীরে অজান্তেই।

[illegible] ওই পুজোর ঘরে যাবার অবশ্য হয়তো না তখন তখন।

সন্ধ্যার দিকে সাহেবের কাজ থেকে ফিরে ঘরে আসতেন, তখনও বেয়ারা বেরিয়ে যেত, আর বাবার জন্যে চেয়ার আসবের বন্ধুরা এসে হাজির হতো, সিগারেট তখন যেন মেয়েদের মনে হতো বজবজ।

শুধু এই সন্ধ্যেবেলাই নয়, এই পৃথিবীতেও।

তখন, সেই অর্ধেকটা ঘরময় সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে চুপচাপ বসে থাকতে বজবজ।

আলো জ্বলতো না, বেশীর ভাগদিন আকাশে মেঘ থাকতো বলে সন্ধ্যেটা তাই তাড়াতাড়ি পড়ত না। জানলাগুলো সিল্কের মতো খুলে, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারদিকেই। উত্তর জানলার ধারটা যেন লুটোপুটি খেতো, আর একলা বসে সেই জানলাটাই ধরে দাঁড়াবার জন্যে এসে নিজে পায়ে কিনা তাই ভাবতে চেষ্টা করতো বজবজ।

সেই উদাস এলোমেলো। পাহাড়ী পাহাড়ী সুরে ভরা ঘর।

সেই পাহাড়ী সুরের ছক ভেঙে যেত হঠাৎ হঠাৎ তাদের আড্ডার হাসির হুল্লোড়? আর হঠাৎ হঠাৎই মনে হতো বজবজের তার মা মাথা গোড়ন করতেন হয়? পলেবো! ঘোলো? না বাবারও আগে দেখি। সেই তখন থেকে আসছে ওরা। বাবার ওই বন্ধুরা। বাবার মন তাল করতে:...আচ্ছা এই এত এত বছর ধরে ওরা এইভাবে হাসছে? ওদের কি তবে বয়স বাড়ে না!

বাবার কথাটার কথা মনে পড়ে না বজবজের, বাবার বন্ধুদের কথাই মনে পড়ে।

কিন্তু আশ্চর্য, বজবজ বাবার ওই বন্ধুরা সবাই চলে গেলেন, বজবজ বাবাই যেন ঠাঁই নিয়ে উপরে চলেন।...

ঘরের ভিতরে ঘরের আলো সমস্ত ছোটছে ঠা, হঠাৎ বোঁপোঁ হাতে কিছু না—

কখন বেয়ারাটা ঘর বজবজ ছেড়ে চলে বলতো—অত পরে-পরে খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন বাবা? যা আছে খুলবে হলে এসেই বোনার সোফাতে বসবে।

বাপ বলতো, তোমেন কি আমার যেন ছেলে?...একটুমাত্র যা বলবে, সোফে

যাতে বাইরে কেউ টু শব্দটি করতে না পারে।...তখন আর চারের দুই-একজন। মনে মনে বলছে, —'তোমার জন্যেই তো তোকে বাইরে বসিয়েছিল বাবা।' মনে মনে বলছে। মুখে বলছে না।

আসল কথা—অতি সুন্দরী সম্পর্কে এই ভয় ছিল বন্দনার। 'অতি সুন্দরী না পায় ঘর' এ প্রবাদ যে মজ্জাগত।...সেই অবধি অবিশ্যি অতি সুন্দরী জোটে নি তবে একজনকে রূপসীই বলা চলে বৌকে।

কিন্তু এ তিনটা সেই বৌয়ের পদার্পণ তো রেখে রেখে শোনেও না ভদ্রলোক। পাকা দেখার পরদিনই হাঁটু অবধি পড়লেন, আর ক'দিন পরেই—

বন্দনা নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'দেখ সোনু, বাবা যদি নিজে হাতে করে—'আশীর্বাদ' করে না যেতেন, কখনো ওই মেয়েকে ঘরে আনতাম না আমি। ওর 'পর' ভাল নয়।'

সোনেন অবশ্য 'পর অপর' মানে না, তবু সোনেনেরও নিশ্বাস পড়েছিল, কিন্তু ঘরে আনা না-আনার প্রশ্ন আর ওঠে নি। বাপের মৃত্যুর ছয়মাস পরে বিশেষ ব্যবস্থায় সপিণ্ডীকরণ সেরে নিয়ে বিয়েটা দিতে হয়েছিল।

বোধ হয় ওই বিয়েটার পর থেকেই, সকালবেলাও পুজোর ঘরে ঘণ্টা বাজছে বন্দনা। তা সেও তো হতে গেল ক'বছর। তবু সকালে বন্দনার হয় না, সকালে বহুবিধ ব্যঞ্জন কাজের চিন্তা মনকে পিছু থেকে টানে, তাড়াহুড়িই লেগে আসে বন্দনা। অবিরল ঘাকে সন্ধ্যায়।

সোনেন বন্ধকদের অফিস থেকে ফিরবে বলে অফিসে বেরোবার দরকার হয় না এখন আর, তার চা-জলখাবার—খাওয়ার সময়টাও উপস্থিত না দিলে চলে। হয়তো বা সে বেলাই বাজনীয়। তাই এই সন্ধ্যাটায় অনেকক্ষণ বসে থাকে। এখনো কি অন্ধকারে বসে সব জানালা খুলে দিয়ে উধাও হওয়ার মধ্যে পাহাড়ী-পাহাড়ী ঘাস খুঁজতে চেষ্টা করে বন্দনা?

কে জানে। বোঝা যায় না। এখন তো ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে রেখে, এ দিকের জানলাটাও বন্ধ করে দেওয়ার অভ্যেস হয়ে গেছে, ছোট্ট একটা ঝরনার শব্দ ঠেসিয়ে যাবার জন্যে।

বন্দনার বাঁচার বাড়ির ঝরঝরে ঘরে একদিন খুঁজে নিয়ে আলাদা করে এইখানে তুলে এনে রেখেছে সে। তা ছাড়া দক্ষিণের জানলা ঘেঁষে বন্ধ একটা মানুষ উঠেছে যাদের যেন হারাতে চোখের পথ বন্ধ করেছে।

কিন্তু সে নিয়ে কোনোদিন কোনো অভিযোগ তোলে না বন্দনা। ওই ম্যানেজারটা ওকে পর পেনেন বলেছিল, দিদি তোমার পুজোর ঘরে একটা ফ্যান লাগালে তো এবার বিশেষ দরকার; নইলে কোনদিন না কোনদিন ঘর বন্ধ হয়ে মরে যাবে।'

বন্দনা সংক্ষেপে বলেছিল, 'পাগল!'

'ওসব একটা টেবল ফ্যান—'

'আরে বাবা না!'

সোনেনের বৌ ইন্দ্রাণী হেসে উঠে বলেছিল, 'পুজোর ঘর তো কৃষ্ণ-সাধনেরই জায়গা বাবা, সেখানে আর ওসব কেন? তোমার সবই অধিকন্তু!'

বন্দনা কিন্তু এই হাসির কথাটার উত্তর দেয় নি সেদিন, চলে গিয়েছিল নিজের কাজে। টেবল-ফ্যানটা অবশ্য হয় নি। সোনেনও ভুলে গিয়েছিল।

তা সোনেন কি আর চিরদিন সব মনে রাখবে? সব মনে রাখবার দায়িত্ব নেবে? পাঁজীতে কবে বলবে আজ একাদশী, কবে বলবে আজ জন্মাষ্টমী, সেই সব ছেলে-মানুষী—কথা? দিদির ঘরের জানলা আটকে বাড়ি উঠেছে বলে দিদির গরম হওয়ার মত একেবারে সাধারণ একটা কথা?

সে হয় না। সেটা-হওয়াতে, যাওয়াটা আছি। কৃত্রিমতা। তবে সমগ্র সমস্যাটা তো ঘিরে রেখেছে সোনেন দিদিকে। আজো বন্দনার পছন্দতেই সংসার চলছে, বন্দনার নির্দেশেই লোকজন খাটছে। বন্দনাই জানে কোন বেলা কি রান্না হবে, কোন দিন কি বাজার আসবে, বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত এলে ওদের আপ্যায়নের সীমাটা কতখানি বিস্তৃত করতে হবে, আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ির কাজে কর্মে নাম বজায় রাখতে কোনখানার যান কোথায় কোন ঘুঘুয়ে তুলতে হবে।

বন্দনাই জানে কোন চাকরটাকে রাখা উচিত, কোন ঝিটাকে ছাড়ানো উচিত। বন্দনাই জানে অমের খাকে কতটা মাইনে দিতে হবে।

সংসারে যার যেন ক'সের তেল লাগে, ক'খন করলা, সেকথা সোনেন তো দূরস্থান, ইন্দ্রাণীও জানে না।

জানবার চেষ্টাও করে না।

জানে দিদি করবেন।

দৈবাৎ বন্দনা বাড়ি না থাকলে, কি পুজোর ঘরে থাকলে, বামুনঠাকুর যদি এসে আধেরের জানলা উঁকিটা জেনে যাচ্ছে, বৌদি কি হলে কেমন কি রান্না হবে—।

ইন্দ্রাণী হাত উল্টে যেন উড়ে বলে, 'আমি? আমি বাবা তোমাদের ওসবের কিছুই জানি না। উঁহুনে করলা ভেলে যদি থাকো।'

যদি চাকরটা দৈবাৎ ওই হুকুমের অবকাশে সৌদির কাছে আবদার জানাতে আসে, 'দুটো'র জন্যে একটু ছুটি দেবেন বৌদি?'

ইন্দ্রাণী সিটের ওঁচার ভঙ্গীতে বলে, 'হুকে কর বাবা, আমি ওসবের মধ্যে নেই। সেবে তোমাদের দিদিমণি এসে যাঁসি দিন তোমায়।'

চিরকেলে বনেদী বাড়িতে বারোমাসে তেরো পার্বণের ঘটা লেগেই আছে, আছে লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, মনসা, মাসে মাসে সত্যনারায়ণ, তার সব কিছু ব্যবস্থাপনাই বন্দনার।

অবশ্য সৌরভের আনন্দটিও বন্দনার জন্যেই থাকে...পুজোয় 'আশীর্বাদী নির্মাল্য' আগে বন্দনার হাতেই দেন পুরোহিত।

প্রকৃত কথা সংসার-চক্রের এই মূলকেন্দ্রে আজও প্রায় নতুন বনের ভূমিকাতেই আছে ইন্দ্রাণী।

বাড়ির মধ্যে শুধু নিজের শোবার ঘরটিতে ছাড়া আর কোনো ঘরে মাসান্তে ক'বার পা ফেলে ইন্দ্রাণী, সেটা বোধহয় আঙুলে গুণে বলা যায়। জীবনতরী পদ্মদিঘির গতিতে তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে। যত দিন যাচ্ছে, তত আরো বেশি সাজতে শিখছে আরো বেশি প্রয়োজনীয় হচ্ছে। হচ্ছে, তার কারণ অনেক জায়গায় যাচ্ছে। অনেকের সঙ্গে মিশছে।

একটা বিষে ছেয়ে যাচ্ছে তার, তাও-যেন গায়ে বয় না। [illegible] ছেলেকে সেই মেয়েটা যাকে বিয়ের [illegible] খায় ঘুনায় পিছিয়ে যাচ্ছে।

বন্দনা বলে 'তোর বাবাকে আমি এই রকম করে বাগিয়ে করেছি খুকু; ঘাইরেছি ঘুম পাড়িয়েছি, ভুলিয়েছি—'

ইন্দ্রাণী শুনতে পেলে বলে 'ওমা! তবে যে তুমি বাবা-চাকরের ঘরের ছোট-বউ।'

বন্দনা হেসে বিষে বলে, 'তাই তো। যা বলো তা কি আর ভুল। সেই চার বছরের সিনিয়রিটি নিয়েই দিদির বহিমা দেখাতে ছাড়ি নি।'

'ভালই হয়েছে' ইন্দ্রাণী হেসে বলতে হয়, 'আপনার যখন অভ্যাসই আছে, ওঁকেও ভেড়া করে বাগিয়ে করে নেবেন। যেমন ওর বাপটাকে করেছেন।'

কথাটা বন্ধনার কানে খুব অপ্রিয়মধুর লাগে না, তবু প্রায় হেসেই বলে 'বাজাই খাট ওকে কেন আমি মানুষ করতে যাবো?'

'তা' জানে না ওটাও মানুষটান!'

বন্ধনা চুপ হাসেন্দ্রে. 'যা তা বল কেন যে? কিছু কি মুখে আটকায় না?'

মন হাল্কা থাকলে 'ইন্দ্রাণী', মন ভার থাকলে 'যে'!

ইচ্ছে করে বলে না, অজান্তেসাধেই বলে।

কিন্তু 'ইন্দ্রাণী'টা, কি খুব বেশি বলে?

ফিরের সেবকার সেই 'পরা' 'অপরার' প্রেরটা কি কোথাও ফিঁদে আছে? মনের একান্তে? তাই আসে যে স্নেহ-সমুদ্র উথলে হয়ে আপেক্ষা করেছিল সোনেনের যৌবের জন্যে, সেটা ওই কাঁটায় এসে ঠেক খায়?

না কি ইন্দ্রাণীর ওই বেপরোয়া অবচ 'খুকী খুকী' ভাবটা ওই ঠেক খাওয়ার জন্যে দায়ী?...

অবশ্য এমন কিছুই নয়।

হাসি গল্প, মেয়েটাকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ সবই আছে।

সংসার-চক্রের যেটি প্রধান তেল সেটি তো প্রচুর পরিমাণেই আছে।

কলকাতার একেবারে সেরা সেরা পাড়ার বন্ধনারও বাবা যে ভাড়াটে বাড়িগুলি বানিয়ে রেখে গেছেন, তার উপস্বত্বেই অনায়াসে অক্লেশে চলে।

এই সমস্ত কিছুরই হিসেবপত্র বন্ধনার হাতে। বাবার আমল থেকেই আছে। সোনেন কোনদিন জানতেও চায় নি, কত আয়, কত ব্যয়। বন্ধনা সর্বময়ী কর্ত্রী।

এই প্রাধান্যের সিংহাসনে বন্ধনার স্থান। আশ্চর্য, তবু বন্ধনা আজকাল প্রায় ঠাকুরের সেই রূপোর সিংহাসনটাই টেনে নামিয়ে কাছে বোসে। নিরিবিলিতে অনেকটা সময় নিয়ে মেয়ে চাকরকে কষ্টতে বসে।

আর এখন মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে অনেকগুলো দিন তো [illegible]তে কাটিয়েছিল সে, অনেকগুলি ভাবনা সে ভাবনে কেন একটা শিশুর পদস্পর্শ পড়ে নি।...

চল্লিশ বছর বয়সে [illegible] তখন ভাবতো 'ভাগ্যিস'। ভাগ্যিস[illegible] একা আমি নিয়ে। তা নইলে? উঃ কী ঝামেলা, কী ঝামেলা! সে কথা এখন কী অদ্ভুতভাবেই ভুলে গেছে বন্ধনা। ভুলে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেই 'ভাগ্যিস'টা তাই এই চল্লিশ বছর বয়সে একটা না-পাওয়া ঐশ্বর্যের বিরহবেদনায় উতলা হয়ে ওঠে এক একদিন।

এই রকম দিনে বাক্সপত্রের আলমারি ঘেঁটে সেই বিরাট 'মানসনটাকে ঠেলে বার করে দিতে ইচ্ছে করে বন্ধনার।...যেমন অদ্ভুত বর্ণবিন্যাস করেছিল! ওকে গালি দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

তারপর মনকে অন্ধকারে ডুবিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। আস্তে আস্তে সেই উত্তেজনা মন্থর হয়ে এল, স্নিগ্ধ হয়ে এল, নত্র গভীরতায় পরিণত হয়ে উঠল।

নিজেকে এতটি পূজার ফুল মনে হ'ল।

সেই মনটি নিয়ে নেমে আসছিল বন্ধনা, নীচের তলার কুয়াটা বোধ করি বিস্মৃত হয়েই।

তাই নীচের তলায় পা ফেলা মাত্র মনটা তীব্র একটা মোচড় খেয়ে ফুল থেকে বিষ হয়ে উঠল।

নীচতলা মানে মোতলা।

বাড়িটা মোতলাই।

একতলায় দারোয়ান, ভাঁড়ার ঘর, বাওয়ার ঘর, বৈঠকখানার ইত্যাদি করে অনেকখানি বিস্তৃত।...পোতলায় তাদের মাথা ছুঁয়ে শোবার ঘর, বসার ঘর, আরো অনেক ঘর।

হাতে ওই একটাই।

ছাদের থেকে নেমে এসে সানন্দেই যে ঘরটা চোখে পড়ে সেটাই হচ্ছে সোনেন-ইন্দ্রাণীর শোবার ঘর। সবচেয়ে বড় সবচেয়ে হাওয়াবার।

সবচেয়ে সাজানোও।

কিন্তু কী বিশ্রী। কী কুশ্রী।

কী ভুল করেই রেখে যায় ওরা ঘরটাকে যেরোবার সময়। যেটা বন্ধনার একেবারে অরুচিকর।

যেমেবানুষ, যৌবানুষ, তার কাজের মধ্যে একটা শোভনতা থাকবে না? শালীনতা থাকবে না? রাচ্চুশির কী এতটা লীনা থাকবে না?

আঙুলজ্বা চোখে দেওয়ালটার উপর আর একবার চোখটা বুলোয় বন্ধনা...যেমন ঘরের সীলিঙের কোলানো দু' ডুটা আলোই জ্বলে যাচ্ছে চড়া পাওয়ারের বাল্বকে অবহেলন করে; আর সেই প্রখর আলোয় ইন্দ্রাণীর ইতস্তত শাড়িখানা নির্লজ্জের মত নেজের লুটিয়ে পড়ে আছে। পড়ে আছে ছেড়ে রাখা ব্লাউজ সায়াটা. সায়া ঘরে ছড়িয়ে আছে মুঠো মুঠো পাউডার. বাড়িতে চলে ফিরে বেড়াবার চটি জোড়াটা দরজার কাছে উপুড় হয়ে পড়ে, আর যতগুলো শিশি কৌটো টিউব তুলির সদ্ব্যবহার করে সেজে সে নিজের মুখে ছবি আঁকতে। সেগুলো খাটের বিছানার উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে।

অথচ ঘরে 'বাহুর প্রবাস' ক্লেসিং আয়না আছে, আছে তার ড্রেসিংটেবিল সমিধার চৌকী। যেখানে যা যাবার সবই নিখুঁত নিয়মে সাজানো আছে এ বাড়িতে। তবু ইন্দ্রাণী সারাঘরে ছুটোছুটি করে গেছে, শাড়িগুলো আলনায় না রেখে ঝুলিয়ে রাখে খাটের বাজুতে। সোফার পিঠে।... ব্যবহৃতগুলো পায়ে ঠেলে ফেলে রাখে বিভিন্ন জায়গায়।...

মেয়ে বড়দের বন্ধনাটার ভো বেড়েছে বন্ধনা নিজেই। সেগুলো যেখানে ইচ্ছে সেখানে। সারাদিন ঘরে বসে কাটাবে। আর সোনেন বাড়ি ফিরলেই চোখে কানে দেখবে না আর। ভেবেতে পারলে হয়।

বন্ধনার ইচ্ছে করে নেমে এসে সোনেনকে একটু দেখে, ছুটে কথা বলবে। তার নেয়ে কি কি গুণপনা শিখছে। তাকে শোনাবে, আর মাঝরাতে বসে বসে 'বড্ড হাত কাঁপল না বাপু।'

কিন্তু প্রতিদিন নেমে এসে এই দৃশ্য আগুনজ্বা চোখে দেখে একলায় নেমে যেত বন্ধনা, আর আরও খানিকটা আগুন হল।

অথচ নতুন কিছুইতো নয়।

এ ধরনের অবস্থা তো [illegible] এই ঘাটে অন্তত প্রায়ই থাকে।

তবে কি সারদা সোনেনের মেয়েটাকে কোলে পেলে চাপড়ে চাপড়ে খুব পাড়াবার চেষ্টায় ব্যস্ত, নতুন কি ঝীপা ঘরাঘরের বরফার পা ছড়িয়ে বসে ঘুঁটুনী ঠাকুরের সঙ্গে রহস্যালাপে মগ্ন, কিংবা ভাঁড়ার ঘরে চাকর-বাবু চৌকীতে পা তুলে ভুকুর উপর 'রহস্যরোমাঞ্চ' রেখে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় অবস্থিত এবং ঘুরে চাকর গণেশটা বাজারে গুটি গুটি নেয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

দারা সংসারটা যেন পতির কোল চাহিয়ে নিশ্চিন্তভাবে স্বামীর ঘরে নিশ্চর হয়ে গেছে।

বোস, বোসই পূজোর ঘর থেকে নেমে এই দৃশ্য দেখে বন্ধনা।

এই হাড়-পোড়ানো চোখ-জ্বালানো দৃশ্য। এছাড়া আর কি দেখবে? সংসারের সবস্ত ভাবতে আর কে আছে যে, তারা বাড়িটাকে গুছিয়ে করে রাখবে?

সংসারে লোক নেই, 'লোকজন' আছে একগাদা। বন্ধনার বাবার ব্যবস্থা এটা।

তিনি বলতেন, 'তবু ওরাই নয়ত গুছিয়ে করবে, ওরাই যাবে রাখবে ভোগ করবে।

● তোর চোখটা যে বেরুল···।

ক্ষ,
হেসে ফেলেই, তার
উঠেছিল। এবং
কারো সেদেনের
'তার, বাঁচাটা যে বিন-
'তার ভাবের বাঁ হয়ে গেছে, পঞ্চাশেরদার
তোরা তেবেছিলি? বাঁচে না ঘনঘন
করে।'

ইন্দ্রাণীর সতাই ব্যাপারটা তেমনের ভোর
এতক্ষণ নি, তবে সে নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথাও করে
নি, শুধু চুপ করে বসেছিল, 'তা' নাম ছুটো
মানুষের তোমার এই একটি ব্যক্তিকে কত
আর ভাগাভাগি করে তোমা যাবে? যাবার মত
আছে তার তার আছে বলার হয় ব্যক্তিত।'

তাদের আড্ডাতে তোলোকনই
থাকত তেমন না তেমন, আজ একটুক পরে
তাই তাদের আড্ডার দৃষ্টিভঙ্গীই বদলে গিয়েছিল এবং।

ইন্দ্রাণীর বক্তব্য শেষ
হতেই তোড়েরা উপস্থিত
এর হবার তো ভাবতো না, মন 'খা খা' করলে
ওই তাদের আড্ডা 'হাসতো। কিন্তু
তোর তো কে সঙ্গ নেই—'

এবারে মধ্যবিত্ত হাতে তেমনের কাছেই
চাইছে ইন্দ্রাণী, হেসে বলে উঠেছিল, 'তা
ঠিক, দিনের দুঃখের কাছে পঞ্চাশ হতেই হবে
তোমাকে। তোমার তো আর বৌ মরে নি,
তবে কি করে—'

এবার বক্তব্য অবতরণ না করে ওর
দিকেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেনে বলেছিল, 'হ্যাঁ সেই
কথাই বলছি বৌ...তুমিই বলছি,—'তবে
কি করে?' কি করে এমন 'পালাই পালাই'
করে তোমরা? তোমাদের এই একটা বাজে
অভ্যেস, সেটাও তো তোমাদের আচরণে ধরা
পড়ে নি।'

'আমাদের তোমার?'

ইন্দ্রাণী তেসে পড়েছিল, 'ওটা তো
আপনার আমি তো ঠিক করে রেখেছি
কথা বলতে গিয়ে আমাদের 'আমরা-আমরা'
বলতে তোমার।'

বক্তব্য আর কথা বলে নি
বক্তব্য এই ব্যাপারটায় সাংঘাতিক
হয়ে গিয়েছিল

(বাকীটা ১২০ পৃষ্ঠায়)

শিকার প্রসঙ্গে

রণজিৎকুমার রায়

আজকের প্রবন্ধের অবতারণার গোড়ায় আমার একটু মুখবন্ধের প্রয়োজন অনুভব করছি। কয়েকদিন আগে এই পত্রিকার সম্পাদিকার অত্যন্ত অনুরোধে এক অসতর্ক মুহূর্তে আমার নিজের শিকারের অভিজ্ঞতা সম্বলিত একটি লেখা তাঁর পত্রিকার পাতাগুলি সাজাবার জন্যে দেবো বলে কথা দিয়ে ফেলি। প্রতিশ্রুতি দেবার সময়ে খেয়াল হয় নি যে, শিকার সম্বন্ধে লিখতে হলে শুধু শিকার সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা থাকাই যথেষ্ট নয়—পাঠকমনোগ্রাহ্য করে সেই অভিজ্ঞতার কাহিনীকে কাগজে-কলমে রূপ দেবার দুরূহ কৌশলও অনেকটা আয়ত্ত থাকা চাই। এই দ্বিতীয় কৌশলটি যে প্রথমটির চেয়ে অনেক বেশি কঠিন—অন্তত আমার ক্ষেত্রে—তা' অবশ্য বলম হাতে নেওয়ামাত্র দফায় অনুভব করছি, কারণ এ-বিষয়ে কুশলতা অর্জনের সাধনা জীবনে এর আগে আর করা হয় নি। সুতরাং প্রতিশ্রুতি রক্ষার ফলে এই উদ্যম শেষ পর্যন্ত পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হবে কিনা সেই দুর্ভাবনা নিয়েই আজকের এই লেখা পাঠকগোষ্ঠীর কাছে নিবেদন করছি—আমার এই অনভিজ্ঞ প্রয়াস প্রকৃত শিকারের মনোরঞ্জন করতে পারবে কিনা সে বিচার তাঁদেরই বিবেচনা-সাপেক্ষ রইলো।

এই সূত্রে আরেকটা কথা গোড়াতেই বলবার আছে। 'শিকার' কথাটি শিকারী-মহলে অনেকখানি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রকৃত এবং শুদ্ধ 'শিকার'কে যদি অনুসরণ করলে 'স্পোর্ট' বা খানাখোঁচার মতন ছোট পাখী থেকে বিশালকায় গুণ্ডা হাতী পর্যন্ত বহু রকমের পশু এবং পাখীর শিকারেই শিকারীকে তাঁর কৌশল এবং অভিজ্ঞতার কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়। অনেকের হয়তো এরকম ধারণা থাকা অসম্ভব নয় যে প্রকাণ্ডকায় এবং বিপজ্জনক জানোয়ারের শিকারেই সব-চেয়ে কঠিন এবং তাতেই শিকারীর যথার্থ মান নির্ণয় হয়ে থাকে,—কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। অনেক কৃতী এবং বিখ্যাত শিকারীই ছোট-বড় সবরকম শিকারেই সমান উৎসাহ এবং আনন্দ অনুভব করেছেন, কারণ প্রত্যেক রকম শিকারেই তাঁদের অনুচালনার দক্ষতা এবং জীবজন্তুর স্বভাব ও গতিবিধি সম্বন্ধে জ্ঞানের চরম পরীক্ষা দিতে হয়েছে। স্বনামধন্য শিকারী স্বর্গত কুমুদনাথ চৌধুরী মহাশয়কে অনেক শুধু কৃতী বাঘ-শিকারী বলেই জানেন—তিনি যে 'স্নাইপ' শিকারেও অসামান্য দক্ষ ছিলেন এবং এই ছোট পাখীর শিকারকে অনুশীলনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা বলে মনে করতেন, তা বোধ হয় অনেকেরই জানা নেই।

আমার একদল বন্ধুদের মধ্যে দুজন বিশিষ্ট শিকারী আছেন—এঁরা উভয়েই বিদেশী শেয়ার—যাঁরা দুজনেই বহুসংখ্যক হাতী, বাঘ এবং অন্যান্য বহু জানোয়ার শিকার করেছেন। এঁরা বাঘ বা হাতী শিকারের চেয়ে 'স্নাইপ' শিকারে অনুশীলনের দক্ষতা এবং শারীরিক পরিশ্রমের পরীক্ষা অনেক বেশি সফলার বলে মনে করেন এবং এই শিকারে আনন্দও যে কোন অংশে কম নয়, এই ধারণা পোষণ করেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতা এবং অভিমতও তাঁদের অভিমত সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। কিন্তু পাখী বা অন্য ছোট জন্তুর শিকারের কাহিনী বাদ দিলে সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করবে কিনা সন্দেহ—তার কারণ, শিকারের প্রকৃষ্ট

স্বরূপ এবং আনন্দের সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত নই। বিশেষ, বিশেষ করে ইংরিজী ভাষায় এই সব ছোট বন্য শিকার (Small Game Shooting) সম্বন্ধে এত দুর্বিপাক এবং মনোজ্ঞ সাহিত্য গড়ে উঠেছে, যা রসাস্বাদনে উচ্চ পর্যায়ে পড়ে। সে-রকম সাহিত্যপ্রেমী বাংলা ভাষার আজও যেন হুঁয়ে ওঠে নি, তার কারণ সম্ভবে আজ কোনো আলোচনা করবো না। আমার নিজেরও এই ধরনের লেখার অভিজ্ঞতা এতই সীমিত যে, এই অভাব অবশ্য হয় তবুও কোনোকালে যে আমার দ্বারা সম্ভব হবে, এরকম আশা করাই অসঙ্গত। সুতরাং আজকের প্রথম প্রচেষ্টায় বাংলা দেশের সাধারণ পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক হতে পারে এই রকমের অন্য কোনো শিকারের কথাই লিখবো স্থির করেছি।

এই প্রসঙ্গে আগে একটা সাবধান উচ্চারণ করা দরকার। আমি যতদূর জানি, বাংলা ভাষায় শিকারের কাহিনী লিখতে হ'লেই তাতে রোমাঞ্চকর, প্রাণসংশয়কর, হৃদ্‌কম্প-কারী ঘটনাবলীর অবতারণা করতে হয়, তা' না হ'লে সে-সব কাহিনী পাঠকের মনঃপূত হয় না। কারণ এরকম প্রায় স্বতঃসিদ্ধভাবেই মেনে নেওয়া হয়েছে যে, শক্তিশালী এবং বিপজ্জনক জন্তুকে শিকার করতে গেলে শিকারীকে সবসময় অবশ্য সাহসে প্রাণসংশয়ের মধ্যে অন্তত একটা সাধন করতে হবে এবং তাছাড়া শিকারীরা এই রকম অযাচিত অভিজ্ঞতার চড়া উত্তেজনার স্বাদ গ্রহণের জন্যেই এই সব সাংঘাতিক আনন্দের খোঁজে যেতেন। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই সেরকম নয়। শিকারে যত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তার প্রায় সবগুলিই শিকারীর অনভিজ্ঞতা, অবিবেচনা, অসতর্কতা, অপরিণামদর্শিতার ফলেই ঘটে থাকে; স্বৈরবিহার প্রত্যাশা হ'বার মধ্যে বাহাদুরীর কিছুই নেই। অভিজ্ঞ প্রকৃত শিকারীরা শিকার করেন—ক্ষিপ্রগতি, শক্তিমান এবং অব্যর্থবিক্রমে প্রাণনাশে সক্ষম, জন্তুর স্বাভাবিক সতর্কতা, ক্ষিপ্রতা অথবা প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে নিজের বুদ্ধি, ধৈর্য, অভিজ্ঞতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং লক্ষ্যভেদের নিপুণতার কঠিন পরীক্ষা নেবার জন্যে—অকারণে প্রাণসংশয়কর বিপদকে ডেকে আনবার জন্যে নয়। এই প্রতিযোগিতায় তাঁদের নিজের সঙ্গে চরম আত্মপরীক্ষায় যেতে, সফল হলে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির সঙ্গে কতকটা আত্মপ্রসাদও লাভ হয়। এরকম শিকারের জন্য যখন কোনো অভিজ্ঞাকারী নরখাদক পশু হয়, তখন এই আত্মপ্রসাদের স্বকীয়তাই সত্যিকারের সন্তোষের কারণ হয়। যার শুধু শিকারী নাম কেনবার জন্যে এবং সেই উপলক্ষে 'ট্রফি' বা শিকারের বিজয়চিহ্ন সংগ্রহ করবার জন্যেই শিকার করে থাকেন, আমি তাঁদের প্রকৃত শিকারের অন্তর্গত নিশ্চয়ই শিকারী বলে মনে করতে পারি না। এই ছোট অথচ কতকটা ঝিমিয়ে নিয়ে হাতী শিকারের কথাই লিখবো—আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যে চতুর্থটি হাতী শিকারের ঘটনা, কতকটা উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়, তার থেকে আজ দুই অঙ্কের পাঠকদের কাছে পরিবেশন করছি। আশা করি এজন্যে কেউ দুঃখপ্রকাশ করবেন না যে, আমি এই ঘটনা-গুলিকেই আমার শিকার-জীবনের শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞতা বলে মনে করি।

প্রথম যে শিকারটির কথা বলবো তার ঘটনাকাল ১৯৫১ সনের অক্টোবর মাস। আমি ঐ বছর জুলাই মাসে তখনকার স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হ'য়ে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় যাই। ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর তখন বছর তিনেক আগে স্বর্গত হয়েছেন, তাঁর নাবালক পুত্রের (বর্তমান মহারাজের) অভিভাবকরূপে রাজমাতা মহারাণীই তখন রাজ্যচালনা করছেন। আগরতলায় যাবার আগেই আমি খবর পেয়েছিলাম যে, সেখানে প্রতি বছর শীতকালে বন পাকবার সঙ্গে সঙ্গেই দু-তিনটি বড় গুণ্ডা হাতী জঙ্গলের দক্ষিণে যে পাহাড় এবং বনাঞ্চল আছে সেখান থেকে নেমে এসে শহরতলীর ধানক্ষেতে হানা দেয়।

তার মধ্যে, বিশেষ করে একটি হাতীর সম্বন্ধে নানারকম রোমাঞ্চকর ভয়ের কাহিনী আগরতলায় পৌঁছে অনেকের কাছ থেকেই শোনা গেল। এই হাতীটি খুব বিরাট দেহ এবং সুদর্শনদন্তধর এবং একজোড়া মোটা এবং সুন্দর গড়নের দাঁতের বাহারও ছিল তার। দাঁতের ঐ বিশেষ গড়নের জন্যে সেখানকার লোকে তার নাম দিয়েছিল: 'পালঙ্গাতী' (ত্রিপুরার প্রচলিত ভাষার 'পালঙ্গ দাইত্যা')। বছর কয়েক আগে স্বর্গীয় মহারাজা এই হাতীটিকে ধরে তাঁর শিলঘাম অঞ্চলে কয়েদ করতে চেষ্টা-ছিলেন এবং সেই প্রচেষ্টায় তাকে ফাঁদ লাগিয়ে ধরাও হয়েছিল একবার। কিন্তু তার শক্তি এতই বেশি যে ফাঁদ আটকে তাকে রাখা সম্ভব হয় নি—প্রাণপণ চেষ্টায় ফাঁদের বাঁধন ছাড়িয়ে সে পালিয়ে যায়। কাঁদের খুঁটি তার পেছনের পায়ে বেঁধে বলে গিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুক

হেলান দিয়ে খুব অবসন্ন ভাবে শুয়ে থাকে। এই রকম সুযোগ পেয়ে সৈনিকেরা নিজেরাই তাকে মারবার লোভ সম্বরণ করতে পারে নি—তাদের সাধারণ বন্দুক যে হাতী মারবার জন্যে উপযুক্ত নয়, এ কথা বোধ হয় তাদের জানা ছিল না—এবং বন্দুকধারী সৈনিক তার মাথার পাশে গুলী চালায়। বোধহয় আচমকা ঢোট লাগার জন্যেই গুলী খেয়ে হাতীটি প্রথমে মাটিতে পড়ে যায়, কিন্তু পরমুহূর্তেই লাফিয়ে উঠে এতো তাড়াতাড়ি গভীর জঙ্গলের ভেতরে অদৃশ্য হয় যে, তাকে আবার গুলী করবার সুযোগই পাওয়া যায় নি।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে আহত হাতীকে অনুসরণ করতে সাহস না পেয়ে সৈনিকেরা তখন নিজেদের কুড়িয়ে খুশি হয়ে বাড়ির পথ ধরে,—কিন্তু জঙ্গলের কিনারায় ঠিক পৌঁছেছে এমন সময় সেই গুণ্ডা হাতী অকস্মাৎ একপাশ থেকে বিকট গর্জন করে বড়ের মতন তাদের উপরে এসে পড়ে। তার বাচ্চার এবং পাজরে দাঁতের প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে বেচারী পোষা হাতীটি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং মাহুতটি ছিটকিয়ে কিছুদূরে একটি ঝোপের মধ্যে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং এই দৈবক্রমেই তার প্রাণরক্ষা হয়।

সৈনিক দুজনে মাটিতে পড়েই পালাবার চেষ্টা করলে হাতী শুণ্ড করে তাদের একজনকে ধরে ফেলে এবং পা দিয়ে মাড়িয়ে তার দেহটা থেঁতলিয়ে দিয়ে তাকে মেরে ফেলে। এই বীভৎস কাণ্ডের সময়ে পোষা হাতীটি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে কিন্তু গুণ্ডা হাতী তাকেও দাঁতের আঘাতে শেষ করে রেখে।

এই ঘটনার পোনেরোতে মধ্যে অন্য সৈনিকটি গুণ্ডার নজর এড়িয়ে বনের বাইরে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং প্রাণপণে দৌড়ে শহরে ফিরে এসে ঘটনার খবর জানায়। মাহুতটি ঝোপের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকায় বাঘমুখো গুণ্ডার নজরে পড়ে নি, নইলে তার মৃত্যুও সেদিন অবধারিত ছিল। পোষা হাতীটি এবং একজন সৈনিককে মেরে ফেলে গুণ্ডা হাতী সেখান থেকে চলে যাবার পরই তার জ্ঞান হয়—সে তখন নিঃশব্দে চুপি চুপি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে প্রাণপণে দৌড়বার লোকালয়ে ফিরে এসে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং পরে হাসপাতালে তিন সপ্তাহ চিকিৎসার পর স্বাভাবিক সুস্থতা ফিরে পায়।

উপরোক্ত ঘটনার পর এই হাতীটিকে মারবার জন্যে আর কোনো শিকারী পাওয়া যায় নি। শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে আমার পূর্ববর্তী ডেপুটি অন্য এক উপায় স্থির করলেন। এই হাতীটির একটি অভ্যাস ছিল, সন্ধ্যেবেলায় পাহাড় থেকে নেমে বাংলোতে সেটহয়ে যান থেকে বনের ফোরেস্টদের কাছেই মহারাণীর পিলখানার হাতির চেয়ে মেয়েদের হাতিনীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার জন্যে এবং সারারাত সেখানেই কাটিয়ে সকালবেলায় আবার পাহাড়ের জঙ্গলে ফিরে যেতো।

গুণ্ডার এই পরিচিতির সুযোগ নিয়ে তাকে মারবার উদ্দেশ্যে ত্রিপুরার সৈন্যবাহিনী থেকে কয়েক রাইফেলধারী সৈনিক এবং একজন 'ক্রেন' মেশিনম্যান্ চালককে তার হুকুম কাছাকাছি পিলখানার চারদিকে ঘিরে বৃত্তাকারে বসিয়ে রাখা হলো এক অন্ধকার রাতে,—এই গুলী করে যে, মৈত্রীবিধার করে গুণ্ডা হাতী যখন সকালবেলায় জঙ্গলের দিকে ফিরবে তখন যে পথেই যাক, কোন না কোন একজন সৈনিকের নজরে সে পড়বেই এবং তখন তার সতর্ক চীৎকার শুনেই একদঙ্গে সবগুলো রাইফেল এবং মেশিনগান গর্জিয়ে তাকে ধরাশায়ী করা হবে। মেশিনগানটিকে হাতীর পাহাড় থেকে আসবার সোজা পথটির একপাশেই একটু আড়াল করে বসানো হয়েছিল। সেদিন রাতেও গুণ্ডা হাতী অন্ধকারের আড়ালে যথারীতি পিলখানার পৌঁছেছিল,—অন্য হাতীদের চঞ্চলতা এবং আওয়াজে তা টের পাওয়া গেল,—তখন প্রহরী সৈনিকেরা সবাই উত্তেজিত হয়ে রাতের অন্ধকার কাটাবার প্রহরগুলি গোনা হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হাতীর তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির কথা তাদের কারুর জানা ছিল না; পিলখানার সবকিছু মিটে গেলে বনে যাবলে হাওয়া বেশিক থেকেই চলুক, লুকোনো মানুষের গন্ধ যে হাতীর নাকে পৌঁছোবেই, সেকথা কারুর খেয়ালে আসে নি। তাই এক মর্মন্তুদ পরিণতিতে এই প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটলো।

রাত শেষ হবার আগেই ক্রুদ্ধ হাতী নিঃশব্দে মেশিনগান চালকের পেছন থেকে এসে শুঁড়ের একঘায়ে তাকে মেরে ফেলে এবং মেশিনগানটি চুরমার করে দিয়ে বিকলোল্লাসে তীব্র চীৎকারে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে সরে পড়লো; অন্ধকারে অন্য কয়জন রাইফেলধারী তাকে দেখতেও পেলো না, শুধু তার হিংস্র গর্জন শুনে কাঁপতে কাঁপতে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিয়ে ভোর হলে মৃত সৈনিকদের এবং তাদের কামানটি নিয়ে ফিরে এলো।

আমি ত্রিপুরায় যাবার কিছুদিন আগেই এই ঘটনাটি ঘটে,—তারপর থেকে এই হাতীটিকে মারবার সমস্ত চেষ্টাই বন্ধ থাকে। ফলে এমন অবস্থা হয়েছিল যখন শুনলাম যে, এই হাতীর অবিরামের পরিণামে উত্তরকাল শহরের দক্ষিণাঞ্চলের সমস্ত ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে জনশূন্য হয়ে পড়েছে এবং স্থানীয় অধিবাসীরা সবকিছু বন্ধ করে সাময়িক নিজের নিজের বাড়ির ভিতরেই কাটাচ্ছে। শহরের ঐ অঞ্চলেই একটি টিলার উপরে আগরতলার 'বীরবিক্রম কলেজ' এবং টিলার নীচে প্রায় লাগি নাইল দূরে সেই কলেজের হস্টেল ছিল। সেখানকার ছাত্রদের প্রাণভয়ে সন্ধ্যে-বেলা বাইরে বেরোনো এবং শহরে সিনেমা দেখতে যাওয়া ওরে দিতে বাধ্য হলো। এই নিয়ে বিস্তর আলোচনা এবং কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশও চলেছিল, কিন্তু অবস্থার কোনো সুরাহা হয় নি।

আমি যখন ত্রিপুরায় পৌঁছেই তখন কিন্তু এই পরিস্থিতি ছিল না, কারণ শীত শেষ হয়েই হাতীটি আবার যথারীতি শহরের সান্নিধ্য ছেড়ে দূরের পাহাড়ে চলে গিয়েছিল। আমার পূর্ববর্তী ডেপুটির কাছ থেকে আমি এই সব বৃত্তান্ত জানলাম। তিনি আমার নিকটে উৎসাহের কথা জানতেন, তাই আমাকে বললেন যে, এই হাতীটিকে যদি আমি কোনরকমে মারতে পারি তাহলে আগরতলার শান্তিরক্ষা খাতায় অনেকখানি সুনাম হয়ে যাবে স্থানীয় অধিবাসীদের কৃতজ্ঞতার জন্যে,—অবশ্য যে চেষ্টায় কৃতকার্য না হতে পারলে যে আমার নিকটের সব চিরকালের মতনই মিটে যেতে পারে, সে সম্ভাবনার ইঙ্গিতও না করে পারেন নি।

আমি আগরতলায় পৌঁছাবার পর প্রথম মাসখানেক গুণ্ডা হাতীর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নি এই সময়টা আমি কাজকর্ম নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম, কারণ তখন ত্রিপুরার কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্ভুক্তির সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে; ১৫ই অক্টোবর সেই অন্তর্ভুক্তির তারিখও স্থির হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে আমাকে রাজধানি যেতে হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান এবং আসামের চীফ সেক্রেটারীদের নিমন্ত্রিত মানিক বৈঠকে যোগদান করবার জন্যে। সেখান থেকে বোধ হয় ১১ই কি ১২ই অক্টোবর আগরতলায় ফিরে এসেই দেখি হুলুস্থুল ব্যাপার।

আমার অবর্তমানে 'পালঘাতী' হঠাৎ অজ্ঞাত কারণে আবার ফিরে এসেছে এবং দুর্গাপুজোর সময়ে প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা থেকেই শহর চড়াও হয়ে শহরের

প্রবেশপথের পাহারায় যে ইংরেজটি ছিল তাকে ঘুষ দিয়ে হাত করে ফেলেন। সন্ধ্যেবেলায় ঝিম হয়ে থাকা হাতীদের একজন যাতে রাতের আঁধারে হাতীর দেহে ঘা দিয়ে তাকে জাগিয়ে তোলে সুপারিন্টেন্ডেন্টের বাবার সেই পরিকল্পনা, সহজ হাতীটি দেখে দেখে এসে তাকে ঘায়ের ভয়ে ভীত করে। ছেলেটি প্রাঙ্গণের ছুটে সুপারিন্টেন্ডেন্টের বাবার ঢুকে পড়ল, হাতীও তাকে তার ঘরে বাইরের বাঁশের বেড় ভেঙে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে। বাড়ির লোকেরা তখন সবাই একসঙ্গে সাহায্যের জন্যে রাতের খাওয়া সারছিলেন; তাঁরা ভয়ে চেঁচামেচি করতে থাকলে হাতীটি ধাক্কা মেরে তাঁদের খাবারের বড় থালটি ভেঙে দিয়ে খাদ্যের অক্ষিকের বেড়াও ভেঙে ফেলে চলে যায়।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আগরতলার এই অঞ্চলের অধিকাংশ বাড়িই বাঁশের বেড়া এবং চাল দিয়ে তৈরি, শুধু মেঝেগুলি ইঁট দিয়েই পাকা করে গাঁথা। তার পরদিনই সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রাণভয়ে সপরিবারে আগরতলা ছেড়ে তাঁর দেশের বাড়িতে চলে গেলেন। (তখন পুজোর ছুটি চলছিল)। কেবল ভীতসন্ত্রস্ত ছেলের মুখে বাড়ি যাবার সুযোগ না থাকায় তারা হস্টেলেই বিনা অভিভাবকে পড়ে রইল। এই ঘটনার দু-একদিন পরেই হস্টেলের একজন ছাত্র রাত প্রায় একটার সময় তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একটু প্রাকৃতিক প্রয়োজনে হস্টেলের দেয়াল ঘেঁষে বসেছিল,—এখানকার হস্টেলের ভেতরে কোনো বাথরুম নেই বলেই,—হঠাৎ ফোঁস করে একটা শব্দ শুনে সে মাথা তুলে দেখলো, ঘরের কোণের দেয়াল থেকে হাতীর শুঁড় ঠিক তার মাথার ওপরেই সাপের ফণার মতন উঁচু হয়ে আসছে। ছেলেটি মাথা নীচু করেই ঘরের বেরোনর দরজাটির একটি খোলা জানালা দিয়ে একলাফে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং চীৎকার করে আর সবাইকে জাগিয়ে দেয়। হস্টেলের বাড়িটি একতলা হলেও খুব মজবুত, মোটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে শক্ত করে আটকানো চওড়া চওড়া বাঁশের বেড়ায় তৈরি; তার ঢালু আটচালা ছাদের কিনারা এমন নীচু এবং ঘরগুলির দরজা এমন আয়তনের যে, হাতীর পক্ষে তার বিশাল দেহ নিয়ে কোনো কামরার ভেতরে ঢোকাই সম্ভব ছিল না। কিন্তু বয়স্কদের হাতী সম্বন্ধে তার চেনা ছাড়ে নি,—জানালার কাছে মাথা এনে ছেলেটির কামরার ভেতরে শুঁড় ঢুকিয়ে দিয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে চৌকির হাতের বাঁকে ধরবার জন্যে ঘুরাঘুরি চেষ্টা করেছিল; কেন শেষ তাকে ধরতে না পেরে মনের আক্রোশে দেওয়ালের গায়ে শুঁড় দিয়ে কয়েকটা প্রচণ্ড আঘাত করে; কিন্তু তাতেও সেই মজবুত বাঁশের দেওয়াল ভাঙতে না পেরে অবশেষে চলে যায়। হস্টেলের ওপরের চালটি নীচু থাকায় হাতী মাথা দিয়ে তার নীচের দেওয়ালে ধাক্কা মারতে পারে নি, নইলে সেদিন কি ঘটতো তা বলা যায় না।

আমি আগরতলায় ফিরেই কলেজের প্রিন্সিপালের কাছ থেকে এই সব ঘটনা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ এক চিঠি পাই, তাতে তিনি অবিলম্বে ছাত্রদের নিরাপত্তার জন্যে এই শুণ্ডা হাতীকে মারবার ব্যাপারে সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এই চিঠি পাবার অব্যবহিত পরে ছাত্রেরাও নিজেই তাদের দুর্দশার কাহিনী জানাবার জন্যে দলে আমার সামনে হাজির হ'লো। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, এই ঘটনার পর হাতীটি কলেজ অঞ্চলে আর আসে নি বটে—তবে কে কোনদিনই আবার দেখা দিতে পারে, এই ভয়ে তারা ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছিল। আমি তাদের আশ্বাস দিলাম যে, ত্রিপুরার বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ অনুষ্ঠানটির ভারটা নিয়ে সেলে আমি নিজেই হাতীটি মারবার ব্যবস্থা করবো,—এর মধ্যে হাতীটি কোন সময়ে আবার দেখা দিলেই তারা যেন অবিলম্বে আমাকে খবর পাঠায়।

ছাত্রেরা চলে যাবার পর মহারাণীর শিকারখানায় খবর দেওয়া হলো কয়েকজন অভিজ্ঞ মাহুতকে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। মাহুতেরা বেশিরভাগ সময়ই পোষা হাতীর সঙ্গে বনে-জঙ্গলে ঘোরাফেরা করে বলে বুনো হাতীদের স্বভাব-চরিত্র এবং গতিবিধি সম্বন্ধে তারাই সবচেয়ে বেশি জানে, তাই আমি ঠিক করলাম—তাদের সঙ্গে আলোচনা করে ঐ শুণ্ডা হাতীর নাগাল পাবার একটা উপায় বার করা। আমার হুকুম পেয়ে দুজন বিশ্বস্ত মাহুত আমার সঙ্গে এসে দেখা করলো। এদের একজনের নাম আহর আলি (বোধ হয় ওদের আলির অপভ্রংশ),—যে দুর্গমনীয় ত্রিপুরার একজন বৈনিক এবং একটি পোষা হাতী 'পালরাজা'র আক্রমণে মারা যায়, সে সেদিন সেই পোষা হাতীটির পিঠে ছিল—সুতরাং এই শুণ্ডা হাতীর বিরুদ্ধে তার স্বাভাবিকই প্রতিহিংসার আক্রোশ ছিল। অন্যজনের নাম ওসমান, সে মহারাণীর খাস হাতীর মাহুত ছিল, সে আমাকে বিস্তর আফশোষ করে জানালো যে, আমি সঙ্গে থাকবার সময়ে ঐ শুণ্ডা হাতীটা একরাত্রে পিলখানায় ঢুকে মহারাণীর সবচেয়ে প্রিয় এবং বহুমূল্য একটি হস্তিনীকে পেটে দাঁত বসিয়ে সিধে মেরে ফেলেছে। যেহেতু সে সময়ে পতিনী ছিল বলেই বোধহয় শুণ্ডা হাতীর দৃষ্টি হবার চেষ্টা পছন্দ করে নি, তাই রাগে ক্ষেপে গিয়ে ঐ নিরীহ হাতী নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করেছে।

ওসমানের সঙ্গে আলাপ চলবার সময়েই মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাছ থেকে ঐ ঘটনার বিবরণ নিয়ে এক চিঠি এলো, তাতে মহারাণীর অনুরোধ জানানো হয়েছিল, যেন অবিলম্বে ঐ অত্যাচারী হাতীকে মারবার ব্যবস্থা করা হয়। আমি হাতীর মাহুতদের বললাম যে, শুণ্ডা হাতীর নাগাল পেলেই তাকে আমি নিজে মারবার চেষ্টা করবো, কিন্তু তাদের আমাকে সঙ্গে নিয়ে শুণ্ডার খোঁজে পাহাড়ের ভেতরে ঢুকতে হবে। আমার এই প্রস্তাবে মাহুত দুজনেই প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলল যে, জঙ্গলে ঐ হাতীর খোঁজে গেলে সকলেরই মৃত্যু অনিবার্য, কারণ সেই মস্তীর জঙ্গলে তার নিজের এলাকায় তাকে আমরা দেখবার আগেই সে আমাদের দেখে ফেলবে এবং তারপর সামনা-সামনি লড়া না দিয়ে লুকিয়ে পেছন পেছন অনুসরণ করে অতর্কিতে আক্রমণ চালাবে। তাদের মতে রাত্রিবেলায় যখন হাতী শহরে হানা দেবে তখনই শুধু তাকে বাগ মানান এবং সে চেষ্টায় তারা আমাকে সাহায্য করতে রাজী আছে। তাদের কথা শুনে আমি প্রথমে একটু নিরাশ হয়ে পড়লাম, কারণ রাতের অন্ধকারে অনিশ্চিত গতিবিধির হাতীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হওয়া সহজ নয় এবং অন্ধকারে তার অবয়ব লক্ষ্য করে নিভুলভাবে গুলী চালানোও সমান কঠিন হবে। কিন্তু পাহাড়ের অচেনা জঙ্গলে মাহুতদের সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে একাকী চেষ্টা করে সেই হাতীর নাগাল পাওয়া অসম্ভব, তাছাড়া আমার সরকারী কাজ অবহেলা করে অনির্দিষ্টকাল সেই দুর্গম পাহাড়ে ঘোরাফেরা করবার মতন অবসরও আমার ছিল না।

সুতরাং ঠিক হলো, সারাদিনের কাজের পর সন্ধ্যে হবার মুখেই আমি প্রত্যেক দিন কলেজ

হকৈলের কম্পাউণ্ডের দেউড়ির বাইরে অপেক্ষা করবে, সঙ্গে থাকবে হাতীর টিকিট টিকিট নিয়ে আমার পেছনে হকৈলের ঘোড়াগুলো যেন থাকবে, যাতে বিপদে পড়লে তারা হকৈলের কামরার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। এই হকৈলের ঠিক সামনে দিয়েই একটি কাঁচা মাটির রাস্তা পাহাড় থেকে নেমে ছোট একটি নদী পার হয়ে কলেজ টিলা বেঁয়ে ঘুরপথে চলে এসে হকৈল পার হয়ে পিলখানার দিকে চলে গিয়েছিল—তাতে হাতীটি এই রাস্তা ধরেই পিলখানার যাওয়া-আসা করতো। আমাদের 'প্ল্যান' হলো, ঐ পথ দিয়ে নেমে এসে কলেজ টিলার নীচের ধানক্ষেতে ধান খাওয়ার লোভ করে হাতী যখন পিলখানার যাবার পথে হকৈলের সেতুর সামনে এসে পৌঁছোবে, তখন আমার ইঙ্গিত পাওয়ামাত্রই একজন লোক তার হাতে ধৃত বড় টর্চের আলো হাতীর মাথার ওপরে এমনভাবে ফেলবে, যাতে সেই আলোর রশ্মি কাঁধের ওপর দিয়ে আমার রাইফেলের ওপরেই পড়ে। তাহলে নিশানা করবার জন্যে রাইফেলের ব্যাক-সাইট (নিশানা করবার চিহ্ন) দেখতে আমার অসুবিধে হবে না।

আমি মাহুতদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এই হাতীটি টর্চের আলোর ওজ্জ্বল্য না সহ্য করতে পারলে, সে শুঁড় তুলে ফোঁস ফোঁস করে ভয় দেখাবে। এই কথা শুনে আমার আরও সুবিধে হলো, আলো ফেলার লোক হাতীর দিকে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করলে, তখন আমি সহজেই তাকে মাথার মাঝখানে গুলী করবার সুযোগ পাবো। যে জায়গাটিতে বসবার জন্যে আমরা মনস্থ করেছিলাম, সেটি রাস্তা থেকে মাত্র পাঁচগজ দূরে, কিন্তু সেজন্যে আমি আশঙ্কার কোনো কারণ দেখি নি বলে মনে করি নি, কারণ রাস্তাটি হকৈল কম্পাউণ্ড থেকে তিন-চার ফুট নীচু ছিল। হাতীরা লাফাতে পারে না, সুতরাং রাস্তা থেকে কম্পাউণ্ডে উঠতে হলে তাকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে, তার জন্যে অন্তত দু'সেকেণ্ড সময় লাগবে, তাছাড়া কম্পাউণ্ডের চারধারে একসারি কাঁটাতারের একটি বেষ্টনীও ছিল, সেটাকে ডিঙিয়ে আসতেও হাতীর আরো এক সেকেণ্ড সময় লাগতে পারে বলে আমি আশা করছিলাম,—এই তিন সেকেণ্ড সময়ই নিশানা করে গুলী চালাবার পক্ষে আমার যথেষ্ট বলে মনে হয়েছিল। এর চেয়ে বেশী দূরে থাকতে হলে হকৈলের বারান্দায় বসতে হতো, তাতে বারান্দার নীচু চালের জন্যে হাতীর শুঁড়ের সবখানি [illegible] নজরে না আসতে পারার সম্ভাবনা ছিল, তাছাড়া হাতীর মাথার অনেক পেছনে দুরূহ ছোট মস্তকে ঠেক করবার জন্যে তার চোখ এবং কানের ছিদ্রের অবস্থান দেখে মুহূর্তমধ্যে যে নিখুঁত নিশানা করা দরকার, বেশীদূর থেকে রাতের অন্ধকারে তাও সম্ভবপর হতো না।

১২ই থেকে ১৭ই অক্টোবর পর্যন্ত ত্রিপুরার মহারাজ সরকারের অন্যান্য উপলক্ষে নানারকম অনুষ্ঠান এবং নতুন ব্যবস্থা-সংক্রান্ত অনেক কিছু কাজ থাকায় আমার হাতীর জন্যে চেষ্টা করবার কোনো অবকাশ পেলে নি। (১৭ই অক্টোবর থেকে আমি এই নতুন রাজ্যের প্রথম চীফ্ কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলাম।) এই সব কাজের চাপ একটু কমলে আমি ১৮ই অক্টোবর অফিসের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে সন্ধ্যে ৬টার সময়ে কলেজ হকৈলে গেলাম এবং সেখানে ছজনের সঙ্গে গল্প করে এবং তাদের ওপর রাত্রি নিখুঁত দিয়ে রাতের খাওয়া সেরে সাড়ে৮টা নাগাদ সেখানে ঘাঁটালাম—কিন্তু সে রাতে হাতী এলো না। তার পর দিন সন্ধ্যে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত হকৈলে প্রতীক্ষা করে হাতীর দেখা না পেলায় ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে—কারণ রোজ রোজ রাত জেগে ঘাঁটানো সম্ভব ছিল না। হাতী কোনোদিন দেখা দেবে কি না বলে পরে জানানো যাবে। হাতীটি সাধারণত সন্ধ্যের

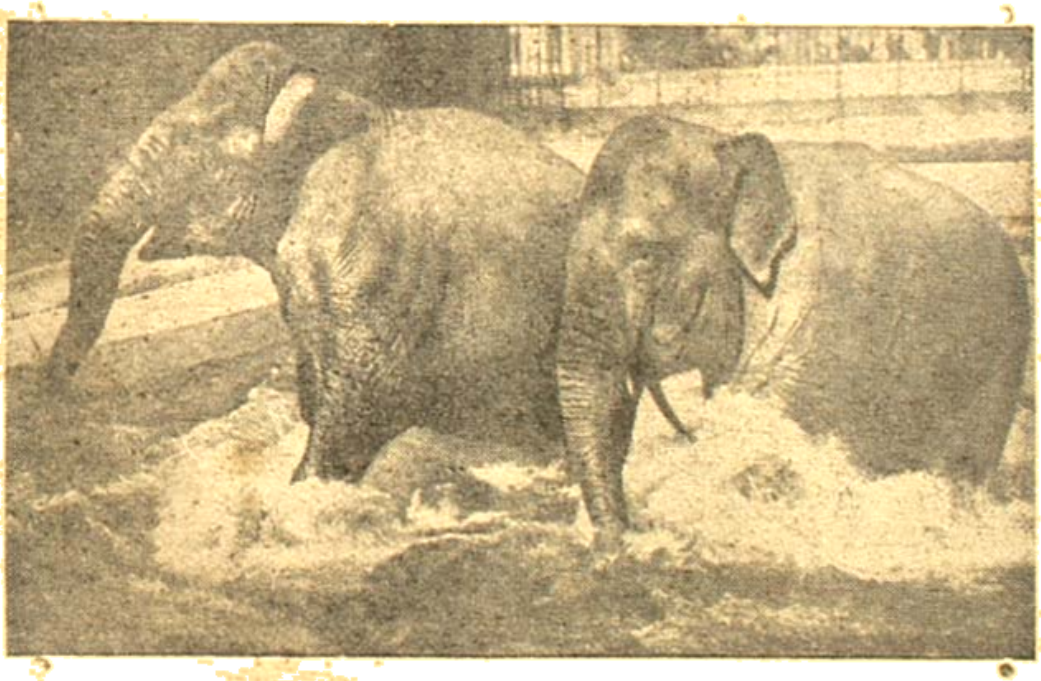

রাজবাড়ির পিলখানার হাতীও প্রাণ অস্থির হয়ে পড়েছে
বন্য হাতীটির অতর্কিত আক্রমণে।

পরই এসে যোগ—যার এই অঞ্চলের জঙ্গল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বহু বছর ধরে। সব দিক বিবেচনা করে আমার যে শিকারের পরিকল্পনা প্রথমেই নিষ্ফল হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। কয়েকটি হাতী ইতিমধ্যে অনেক দূরে চলে গেছে। তাদের পিছু নেবার মতো সময় আমার হাতে ছিল না। দ্বিতীয়তঃ অনেক দলছাড়া হাতী ফিরে এসে আবার পরিচিত জঙ্গলে ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু আমি যখন গুণ্ডা হাতীকে মারতে যাবো তখন সেই হাতীটি যে সেই সময়েই সেখানে থাকবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তৃতীয়তঃ যে হাতীগুলোকে চরবার জন্যে ছেড়ে দিয়ে মাহুত ফিরে গেছে তাদের সন্ধান করা অসম্ভব। কারণ তারা কোথায় চরতে যাবে তার কোনো ঠিক নেই। এই সব কারণে আমি স্থির করলাম যে, যে হাতীগুলোকে মাহুতেরা ফিরিয়ে নিয়ে গেছে তাদের মধ্যে থেকেই গুণ্ডা হাতীটিকে খুঁজে বার করতে হবে। এই সিদ্ধান্তে আসবার পর আমি আর দেরি করি নি। পরদিন সকালেই ভোর পাঁচটায় ঐ অঞ্চলের সমস্ত গৃহস্থদের আমাদের হাতী মারবার আয়োজন সম্বন্ধে জানিয়ে দিয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো, তারা যেন হাতী এসে তাদের ভাতাবাদ জন্যে কোনো গোলমাল না করে, শুধু একবার চীৎকার করে হাতী আসবার খবর আমাদের কানে পৌঁছে দেয়।

সেদিনই 'লাকটোডাঁর' অত্যাচারের আরেকটি ঘটনার খবর শোনা যায়। ছ'জন চাষীস্ত্রীর কাছ থেকে আমার সঙ্গে দেখা করে জানানো হলো যে, তাদের তিন সন্তানকে তারা ঐ হাতীর পাল্লায় পড়ে কোনরকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। সেদিন বিকেলে কাজ শিকারের পর ফেরে সময় এই অভিযোগের তদন্তে গিয়ে দেখি: যে ঝোপের মধ্যে হাতীটি হঠাৎ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসায় শেষোক্ত মহিলাকে ধাক্কা দেয়। আশে পাশের ঝোপঝাড়ে কাপড় এবং অন্যান্য জিনিসের পোঁটলা ছিল: সেগুলো নিয়ে মেয়েরা মাঠে কাজ করতে গেছে—তারা হাতী কাছে এসে পড়লে পোঁটলা-পুঁটলী ফেলে দিয়ে ছুটতে থাকে। ঐ পোঁটলাগুলোর জন্যেই তাদের প্রাণ রক্ষা পায়, কারণ হাতী কাছে এসে পরীক্ষা করে পোঁটলাগুলোকেই পায়ে মাড়িয়ে এবং শুঁড় দিয়ে ছুঁড়ে আছড়িয়ে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়ে দেয়—সেই সময়ে মেয়েরা ছুটে পালিয়ে কাছাকাছি লোকজনের বাড়িতে পৌঁছে যায়। আমি ঐ লোকগুলির দুর্ঘটনায় সহানুভূতি জানিয়ে আশ্বাস দিলাম যে, এইবারে হাতী যখন আবার দেখা দিয়েছে তখন শীঘ্রই সিদ্ধান্ত করা পড়বে।

সেদিন (২১শে অক্টোবর) সন্ধ্যেবেলায় চতুর্থবারের জন্যে আমরা হাতীর আগমন প্রতীক্ষায় কলেজ হস্টেলের কম্পাউণ্ডে গিয়ে বসলাম। সেদিন আমার সঙ্গে মাহুত ছাড়া আরো একজন সঙ্গী ছিলেন—তিনি আমার আত্মীয় এবং পরে বিবাহসূত্রে আত্মীয় মনোরঞ্জন বরুচৌধুরী। মনোরঞ্জন ঐ সময়ে আসামের কাছে বেড়াতে এসেছিলেন, আমার হাতী মারার একটা প্রস্তাব শুনে তিনিও আমার সঙ্গী হবার জন্যে বিশেষ জেদ করেছিলেন, কোনমতেই তাঁকে ঠেকানো গেল না। তাঁকে সঙ্গে নেবার একটু অসুবিধেও ছিল, কারণ তিনি সঙ্গে কোনো অস্ত্র আনেন নি। আমার রাইফেল ছিল একটি প্রিয় Winchester ·375 Magnum ছাড়া আরো একটি ভারি বিলিতী দোনলা ·450/400 রাইফেল ছিল, এই দ্বিতীয় রাইফেলটি শেষরাত বাঘ শিকারের জন্যেই ব্যবহার করা হতো বলে তার জন্যে শুধু softnosed, অর্থাৎ নরম সীসের গুলীর টোটাই ছিল, হাতী মারবার উপযোগী hardnosed টোটা তার একটিও ছিল না। মনোরঞ্জন কিন্তু কিছুতেই আমার অসুবিধে শুনলেন না, তাঁর বক্তব্য হলো যে, হাতীকে মারবার জন্যে গুলী আমিই করবো, কিন্তু যদি আমার প্রথম গুলী লেগে না পড়ে সিংহ হাতী আমাকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে তাহলে তিনি ঐ soft-nosed টোটা দিয়েই তার মাথায় একসঙ্গে দুটি গুলী চালিয়ে তাকে একটুক্ষণের জন্যে রুখতে বা ফেরাতে পারবেন, যাতে আমি আমার ম্যাগাজিন (magazine) রাইফেলের বোল্ট (bolt) টেনে দ্বিতীয় গুলী ভরে মারবার একটু বেশি সময় পাই।

এই সতর্কতার বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ বহু বছরের অভ্যাসের ফলে আমি আমার magazine রাইফেলটি এক সেকেণ্ডের মধ্যেই অনুরূপ টোটা ভরে আবার চালাতে পারি এবং সবসুদ্ধ তাতে পাঁচটি গুলী থাকায় যে কোনো জন্তুর আক্রমণ ঠেকাবার পক্ষে তা' যথেষ্ট—কিন্তু মনোরঞ্জনের আগ্রহাতিশয্যে তাঁকে সঙ্গে নিতেই হলো। মনোরঞ্জন মাহুতের সঙ্গে আমার পেছনের বারান্দায় বসলেন, ঠিক হলো ভগবান তাঁকে আলো দেখাবে আর আমরা আলি আবার জন্যে উঠে দাঁড়াবে।

সেই সন্ধ্যাটির কথা আমার জীবনে ভোলবার নয়—প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জিনিসও যেন 'কিরিওগ্রাফের ছবির মতন স্মৃতিপটে অম্লান ছাপ রেখে গিয়েছে। সেদিন ষোলর অমাবস্যার রাত ছিল, নির্মেঘ আকাশ কালো মখমলের চাঁদোয়ার মতন অন্ধকার পৃথিবীকে ঘিরে নেমেছে, তার গায়ে অসংখ্য তারা হীরের টুকরোর মতন ঝলমল করে জ্বলে সেই অন্ধকারকে এক উজ্জ্বল তরলতা দিয়েছে—সেই স্বচ্ছ অন্ধকার যেন ঠিক

পুরোপুরি নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নয়, গাছপালা ঘর বাড়ি সব যেন কালোর মোড়া ছায়াছবির মতন নজরে পড়ছে। আমরা চুপ করে বসে আছি—সময় যেন খুব মন্থরগতিতে নিঃশব্দ নদীর মতন বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ প্রায় সাতে সাতটার সময়ে বনেজ টিলার ওপারের পাহাড়ি নদীর কাছ থেকে দশর চীৎকার ধ্বনি শোনা গেল—'হাতী বাহ, হাতী বাহ।'

আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন সোজা হয়ে বসলাম, রাইফেলটি তুলে আবার দেখে নিলাম টোটা ঠিকমতন ভরা রয়েছে কিনা এবং পেছনে আমার আদিবাসী সাথীকে আবার বুঝিয়ে দিলাম, হাতী কোনখানে এসে পৌঁছোলে ও আলো ফেলবে। তারপর প্রায় দশ-পনের মিনিট সব চুপচাপ, আমি মাটির ওপর উঁড়ি মেরে বসে আছি—যাতে নীচে থেকে হাতীর শরীর আকাশের গায়ে স্পষ্ট করে দেখা যায়, শুধু সবুজের চাপা নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ দেখলাম, ছায়ার মতন নিঃশব্দে প্রকাণ্ডকায় হাতী প্রায় ঢুলকী-চালে প্রৌঢ়া ঘোড়ার বেগে আমার বাঁ দিক থেকে চলে আসছে, আমাদের সামনের রাস্তা ধরে।

হাতী যখন আমার ঠিক সামনে পৌঁছোতে দু-তিন গজ মাত্র বাকী তখন আমি কাঁধে রাইফেল ওঠালাম, যাতে ঠিক সামনে পৌঁছোনো মাত্রই তার ডান কানের মধ্যে দিয়ে গুলী চালাতে পারি,—কিন্তু আমি রাইফেল ওঠানো মাত্রই আমার আদি আমার সঙ্কেতের অপেক্ষা না করেই তার পাঁচ সেলের টর্চের তীব্র আলো হাতীর মাথায় ফেললো। হাতী তখনো আমার ঠিক সামনে না পৌঁছোনোয় তার মাথা কানের মধ্যে দিয়ে আড়াআড়িভাবে মগজে গুলী ঢোকবার জন্যে ঠিক লাইনে ছিল না, একটু বাঁ দিকে কতকটা কোণাকুণিভাবে তার মাথা পেলাম—সুতরাং প্রচলিত temple shot নেবার জন্যে তার ডান চোখ এবং কানের ছিদ্রের মাঝখানে যে সামান্য নীচু গর্তের মতন জায়গা থাকে, সেইখানে নিশানা করে ট্রিগার চাপলাম। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই টর্চের চোখ-ধাঁধানো আলো সহসা অত কাছ থেকে তার চোখে লাগায়, হাতীটি ঠিক লাট্টুর মতন বিদ্যুৎবেগে তার বাঁ দিকে ঘুরে গিয়েছিল, আমার আঙুল ট্রিগারের ওপরে এঁটে বসবার আগেই। আমার গুলী যখন সশব্দে ছুটলো তখন হাতীর মাথা বাঁ দিকে অনেকখানি হেলানো হয়ে গেছে, সুতরাং বুঝতে পারলাম যে গুলী তার কপালের বাঁ দিক ভেদ করে বেরিয়ে যাবে, মগজ না ছুঁয়ে। গুলী লাগবার সঙ্গে সঙ্গেই হাতী এক বিকট চীৎকার করে উঠলো এবং আমি দাঁড়িয়ে উঠে একলাফে একেবারে তাদের বেড়ার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম তাকে দ্বিতীয় গুলী মারবার জন্যে, কিন্তু সেই মুহূর্তেই আমার আদি তার সেরে উঠে নিশ্ছিদ্র চীৎকার করতে সুরু করলে—'হুজুর কিত্যা আছেন, হাতীতে মাইরা ফেলাইব।'

হাতী তখনো পেছন ফিরেছে পালাবার জন্যে; আমি সেই অন্ধকারেই তাকে আন্দাজ করে গুলী চালাতে লাগলাম, কিন্তু আমার ঠিক সামনেই একটা ছোট ঝোপের গাছের কোণ তাদের বেড়া ঘেঁষে থাকাতে তার পেছনে হাতীর মাথা আড়াল হয়ে গিয়েছিল এবং আমার ছেড়ে ছুটগুলোর নীচের রাস্তার দিকানোর জন্যে তার ছুঁচালো ও নিশানার লাইনের নীচে পড়ে গিয়েছিল,—তাই আকাশে একটু উপরে এবং পেছনে কয়েকজনের অবস্থান আন্দাজ করে তার শরীরের বাঁ পাশে গুলী চালালাম। গুলী খেয়ে হাতীটি উর্ধ্বশ্বাসে তাদের বেড়ার ওপাশের রাস্তা ধরে ছুটতে লাগলো; আমিও প্রাণপণে তাদের বেড়ার কিনারা ধরে কম্পাউণ্ডের সীমানা বরাবর ছুটতে লাগলাম তাকে আরেকটা গুলী মারবার চেষ্টায়, কিন্তু সাহেবরা কেউই আর আলো না দেখানোয় সেই অন্ধকারে আর হাতীকে নজর করতে পারলাম না, কারণ আমি দাঁড়িয়ে পড়ায় হাতীকে আর নীচে থেকে আকাশের গায়ে ছায়াছবির মতন নজর পড়ছিল না, দূরের পাহাড়ের অন্ধকার পটভূমিটের সঙ্গে তার কালো দেহ মিশিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। আমি যতক্ষণ বেড়ার গা ঘেঁষে ছুটছিলাম ততক্ষণ সমানে চেঁচিয়ে সবাইকে টর্চ ফেলতে বলছিলাম, কিন্তু আমার কথা সেই প্রবল উত্তেজনার সময়ে বোধহয় আমার সঙ্গীদের কারোরই চোখে নি। খানিক দেখেশুনের মধ্যেই আমার বেড়ার সঙ্গে ছোটার কাঁটাতারের তীব্র স্পর্শ পেয়ে এক ঝাঁকুনি লেগে যেতে গিয়ে বুঝলাম কম্পাউণ্ডের উত্তর সীমায় পৌঁছে গেছি, আর এগোনো চলবে না,—এদিকে হাতী অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে ছুটে মিলিয়ে গেল নদীর পথ ধরে। এতোদিনের প্রতীক্ষা, এতো ভেবে চিন্তে আয়োজন এবং সব মুহূর্তে এতো প্রচণ্ড চেষ্টা করেও হাতীকে মারতে না পারায় আমার মনের অবস্থা তখন বর্ণনার অতীত—ক্ষোভে এবং হতাশায় সমস্ত রাত বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করলাম, তারা দু-দুটো বড় টর্চ হাতে থাকতে আলো না দেখিয়ে কেন শুধুই—'হাতী যেদিকে গেলো' বলে চীৎকার করছিল। তাদের কিন্তু মোটেই লজ্জিত বা অপ্রস্তুত হতে দেখলাম না, বরং তারাই উল্টে আমাকে অনুযোগ করতে লাগলো যে প্রথম গুলীতে হাতী তখন হয়ার শব্দে ছুটে তার পাঁচ-ছ' হাতের মধ্যে গিয়ে দ্বিতীয়বার গুলী করা আমার পক্ষে খুবই সুবিধেজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবং তারপর হাতীর পাশাপাশি চাঁদের গন্ধ দৌড়োনো চলন অবিবেচনা শুধু আমাদের দুজনেই দৃষ্টি এড়ায় নি, তাদের মধ্যে কয়েকজন বিরক্ত হয়ে সবাইকে বলেছিল যে, ঐ সময়ে ঠিকমতন আলো ফেলে আমি দ্বিতীয় বা তৃতীয় গুলীতেই হাতীকে মেরে ফেলতে পারতাম, শুধু তাদের অসময়ের ভয়ের জন্যেই এমন সুযোগ নষ্ট হলো।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার প্রথম গুলীর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও গুলী চালান নি কেন—তিনি তখন স্বীকার করলেন যে, হাতীকে অত কাছে পেয়ে এবং তার চীৎকারটি অত অল্প সময়ের মধ্যে অত তাড়াতাড়ি তেজবাতীর মতন ঘটে যাওয়ায়—তিনি রাইফেল তুলে নিশানা করবার সময় পান নি, এমন কি গুলী করবার কথাও তাঁর তখন মনে আসে নি,—তিনি তখন শুধু ওদের বিপদের সম্ভাবনার কথাই ভেবে পড়েছিলেন।

যে ঘাড়-উঁচু বাঁশঝাড়ের ঘেরে আমরা টর্চের আলোয় হাতী পালাবার পথ ধরে নদীর কিনারা পর্যন্ত গিয়ে দেখেছিলাম—হাতী নদী পার হয়ে ওপারের পাহাড়ের ঢালুতে উঠে গিয়েছে—পরের দুদিন অনেক জায়গায় বিস্তর রক্ত পড়তে দেখে, এবং এক জায়গায় মনে হলো যেন কাদায় বসে রক্ত ছড়ানো হয়েছে। কিন্তু রক্তে কোনো মারা ঘোরার চিহ্ন না দেখে বুঝতে পারলাম যে, দ্বিতীয় গুলী কখন যেন বুকে লেগে বোধহয় পেটের কাছে দুটোর কাছে কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেঁদা করে ও ফোঁড় হয়ে গিয়েছে—দুদিনেই রক্ত পড়া ভক্ষ গুলী যে তার শরীর ভেদ করে চলে গিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। তখন মনে একটু আশা হলো যে, গুলী যদি peritonium ভেদ করে থাকে তাহলে তখনই না পড়লেও পরদিনই রক্তক্ষয়ে হাতী শেষ পর্যন্ত খুব সম্ভবই মারা যাবে। সুতরাং সেদিন অন্ধকারে নদী

পার হয়ে খুঁজতে যাওয়া অসম্ভব জেনে আমরা মনোরঞ্জনের আস্তানায় ফিরে বাকিটুকু কিরে গেলাম।

তার পর তিন সপ্তাহ বেরিয়ে আমরা হাতীটির চলে যাবার রাস্তায় ফিরে গাছেদের জঙ্গলে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আহত হাতীর সন্ধান পেলাম না। বনের প্রায় তিন মাইল ভিতরে দুটি টিলার মাঝখানে একটি বন বাঁশের জঙ্গলের কাছে পৌঁছে মনে হলো আহত হাতীটি বোধহয় তার ভিতরে ঢুকিয়ে আছে। মনোরঞ্জনকে সেই বাঁশের জঙ্গলের এক দিকায় একটি গোল হাতীর উপরে বসিয়ে রেখে আমি অন্য দুজনকে নিয়ে সেই বাঁশের জঙ্গলটি ঘুরে দেখে আসতে গেলাম, কারণ মাহুতরা অনুমান করছিল তা'হলে আমার সামনেই খুব সম্ভবত সে পড়বে, আর যদি আমার হাতীর চলার শব্দ শুনে সে বাঁশবন থেকে বেরিয়ে পালাতে যায় তাহলে মনোরঞ্জন সামনে থেকে আওয়াজ করে তাকে আবার ফিরে ফিরিয়ে দিতে পারবেন। আমি যখন বাঁশের জঙ্গলটি প্রদক্ষিণ করে মনোরঞ্জনের দিকে অনেকটা এগিয়েছি তখন হঠাৎ পর পর দুটি রাইফেলের আওয়াজ শুনলাম এবং হাতী আমার দিকে ফিরবে মনে করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তার জন্যে অপেক্ষাও করলাম। কিন্তু সম্ভাবিত সময়ে যখন হাতী আমার কাছে এলো না, এগিয়ে গিয়ে মনোরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করে কি ঘটেছে জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি জানালেন যে, হাতীটিকে তিনি হঠাৎ তাঁর সামনেই একটি বাঁশঝাড়ের পেছনে মাত্র গজ দশেক দূরে দেখতে পান—হাতীকে অত কাছে দেখে তাঁরা একটু শঙ্কিত হয়ে তাঁদের হাতীটিকে শিছু হটিয়ে আরো গজ-তিরিশেক পেছনে নিয়ে দাঁড় করান। তখন সেই গুণ্ডা হাতী তাঁদের দিকে আর না এগিয়ে পাশ কাটিয়ে সেই বাঁশবন ছেড়ে বেরিয়ে তেতরের গভীর জঙ্গলের দিকে রওনা হয়। তাই দেখে মনোরঞ্জন তার ডান কাঁধের উপর দুটি গুলী আওয়াজ করেন। কিন্তু confused গুলী খাবার হাতী তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ করে নি, সে ছুটে গভীর বনের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যায়—অনুপযুক্ত গুলী নিয়ে মনোরঞ্জন আর তার পেছনে যাওয়া ঠিক হবে মনে মনে করেন নি। আমি তখন আহত হাতী যেদিকে গিয়েছিল সেই পথে কতকটা এগিয়ে খোঁজ করলাম। কিন্তু সেই গভীর জঙ্গলে তার পায়ের বা রক্তের চিহ্ন না পাওয়ায় কিছুক্ষণ পরেই তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা ছাড়তে হলো। তখন দ্বিতীয়বার মনে লক্ষ আনন্দের আর হতাশা নিয়ে আস্তানায় ফিরে এসে সিদ্ধান্ত নিলাম, যেন ঐ বন অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে খবর দেওয়া হয় এই হাতী সম্বন্ধে—এবং কোনো জায়গায় তার মৃতদেহ দেখতে পেলে যেন অবিলম্বে তারা রক্ষীদের এসে খবর দেয়।

এর পরের দিনই আমাকে আস্তানার বাইরে সফরে যেতে হয়; কয়েকদিন পরে ফিরে এসে খবর পেলাম যে, আস্তানা থেকে প্রায় মাইল আট-দশ দূরে দুর্গম পাহাড়ের ঢেউয়ে একটি ছোট পাহাড়ি ঝরনার কাছে একটি জোয়ান মদ্দা হাতীটির মৃতদেহ দেখা গিয়েছে—সেই বস্তির অধিবাসীদের একজন এই খবর এনেছে। আমি তখনই ওজবান বাহাদুরকে হাতীর পিঠে চড়ে এই খবরের সত্যাসত্য যাচাই করে আসতে বললাম। সে বিকেলবেলায় ফিরে এসে জানালে যে, খবর সত্যি এবং মৃত হাতীটি 'লালঝাণ্ডা'ই বটে। তার পর দিন আমি নিজেই কয়েকজন মুটিয়ের সঙ্গে নিয়ে সেইখানে গেলাম এবং স্বচক্ষে দেখে চক্ষু-কর্ণের সার্থক করলাম। সেখানে, যেমন মনে করেছিলাম, আমার প্রথম গুলীটি তার মাথার ডানদিকের রগের কাছে ঢুকে আড়াআড়ি ভেদ করে বাঁ দিকের কপালের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে, নজরে লাগে নি; আর দ্বিতীয় গুলীটি বাঁ দিকের পাঁজরের পেছনে ঢুকে এক্টোড-ওপ্যেক হয়ে শরীরের ডান দিক দিয়ে বেরিয়েছে—এই গুলীটির আঘাতেই রক্তক্ষরণ হয়ে যে হাতীটির মৃত্যু হয়েছে তা' বেশ বোঝা গেল। মনোরঞ্জনের মারা গুলী দুটি চেপটিয়ে গিয়ে তার ডান কাঁধের চামড়ার নিচে ইঞ্চি মাত্র নীচে আটকিয়ে ছিল, তাতে তার কোনো বিশেষ ক্ষতি হয় নি। হাতীটি সত্যিই দেখবার মতন ছিল—প্রায় দশ ফুট উঁচু, শরীরটি অত্যন্ত বিশাল এবং পুষ্ট এবং মাথাটি সেই শরীরের অনুপাতেও বিশাল বড়—এই গড়নের হাতীকে 'মুখরা বাঁধ' বলা হয় এবং হাতীর এই গড়নই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। হাতীর দাঁত দুটি সামনের দিকে সমানভাবে বাড়ানো—যে জন্যে তাকে 'লালঝাণ্ডা' নাম দেওয়া হয়েছিল। জানাগত ব্যবহারে তার আগা দুটি অনেকটাই ক্ষয়ে গিয়েছিল বলে লম্বায় বেশি নয়, কিন্তু নিখুঁত গড়ন এবং দৈর্ঘ্যের তুলনায় খুব মোটা। দাঁত দুটিকে মুটিয়ের সাহায্যে কেটে বার করা হলো। কিন্তু শরীরে ততদিনে দুর্গন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে পায়ের নীচের অংশগুলি আর নেওয়া চললো না। দাঁত দুটি পরে মেপে দেখা গেল—ডান দিকেরটি লম্বায় চার ফুট দু' ইঞ্চি এবং মেড় সাড়ে ইঞ্চি, বাঁ দিকেরটি লম্বায় চার ফুট আড়াই ইঞ্চি এবং মেড় সাড়ে সতের ইঞ্চি,—ওজন দুটি মিলিয়ে বিরাশী পাউণ্ড বা পুরো এক মণ।

এই হাতীটিকে মারবার পর থেকে আশ্রতলায় হাতীর সম্রাস কিছুদিনের মতন কেটে গিয়েছিল এবং গ্রামের আশঙ্কার ব্যাপক অন্য আর কখনো ঘটে নি।

এই ঘটনার কয়েকমাস পরে কিন্তু আশ্রতলায় আরেকটি হাতীর জন্যে এক নতুন রকমের উৎপাত সুরু হয়েছিল, যদিও দুর্ধান্ত 'লালঝাণ্ডা'র সন্ত্রাসরাজত্বের তুলনায় তা' কিছুই নয়। এই হাতীটিকেও আমার শেষ পর্যন্ত মারতে হয়েছিল ১৯৪০ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে—সেদিন সেই শিকার উপলক্ষে আমি যেমন সঙ্কটে পড়েছিলাম, আমার সমস্ত শিকার-জীবনে সেরকম আর দু-একবারের বেশি ঘটে নি। শুধু এই বিশেষ ঘটনার কারণের জন্যেই এই দ্বিতীয় হাতীটি শিকারের ঘটনাও আজকের কাহিনীতে লিখছি।

এই কাহিনীর নায়ক যে হাতীটি, সেটি একটি একাঁতওয়ালা অল্পবয়সী জানোয়ার—মাত্র পাঁচিশ বছর বয়সেই কিন্তু সে দশফুট দু' ইঞ্চি উঁচু হয়ে উঠেছিল, যদিও শরীরে তখনো পূর্ণ বয়সের পুষ্টতা এবং ওজন লাগে নি। হাতীটির স্বভাবও বিশেষ ক্রুদ্ধ ছিল না; সে অনেকটা শাকখোরালীর মতন রাতের বেলায় সারা শহরের পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতো আপন মনে, মানুষকে, কখনো আক্রমণ করতো না। তাছাড়া অনেক সময়ে সকালবেলাও শহরের মধ্যেই দেখা যেতো পাহাড়ে ফিরে যাবার আগে, তখন লোকেরা সরাই হয়ে তাকে পথ ছেড়ে দিতো। কখনো কখনো তাকে বেশি কাছে দেখা গেলে অবিশ্যি একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হতো; আমার পূর্ববর্তী ফরেস্টার একদিন তাকে সকাল সাতটায় তাঁর সরকারী বাংলো 'ফুলকুন' প্রাসাদের বাগানে বোটার স্যারেঙ্গের টিক পেছনেই দেখতে পেয়ে একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে, প্রায় তখনই দেওয়ানীতে ইস্তফা দিয়ে আশ্রতলা ত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলেন।

(সেষাংশ ১০৪ পৃষ্ঠায়)

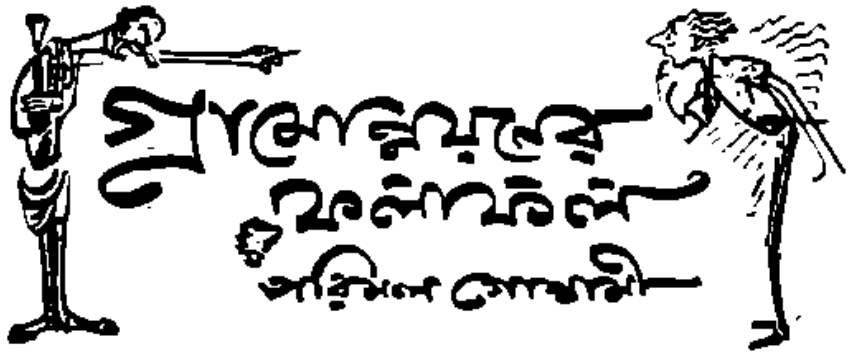

রেলগাড়িতে চলেছিলাম। যাত্রীবহুল গাড়ি। কোনোরকমে একটু যে বসবার জায়গা পেয়েছিলাম এই যথেষ্ট।

পাশের এক যাত্রী একটু মুখর। তিনি এলাপ-সেলাপের আলাপ জমাবার চেষ্টা করলেন।

কোথায় চলেছেন, মশায়?

জানালাম নাম বললাম।

শুনে তিনি চমকে উঠলেন। ওরে বাপ রে! সে তো অজ পাড়া-গাঁ সেখানে জমিদারি আছে বুঝি?

আজ্ঞে না। সেখানে একটা সভা হবে, সেই সভায় কিছু বলতে হবে আমাকে।

এ কথায় যাত্রীটি আমাকে ভাল ক'রে আর একবার দেখে নিলেন। বললেন, তবে সন্ধ্যায় যাচ্ছেন যেন? সভা কি রাত্রে?

না, সভা কাল বসবে।

বেশ আছেন মশায়রা। এ কাজে বেশ খাতির পাওয়া যায়। স্টেশন থেকে সবাই আপনাকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যাবে, তারপর রাজার হালে খাওয়া-দাওয়া।

না, সে সব কিছু না। স্টেশনে একটি লোকও আসবে না। সে কথা আগেই ঠিক করা আছে। অজ পাড়া-গাঁ—আগেই তো বলেছি। ওরা শহুরে চাল এখনও শেখে নি।

গ্রামেও সভা! মশায়, আজকাল যেখানে সেখানে সভা, সভার ঠেলায় অস্থির। কাজের বেলায় কিছু না, খালি বক্তৃতা।

সে কথা ঠিক।

তবে চলেছেন কেন? গ্রামের কি উন্নতি হবে বক্তৃতা দিয়ে? কি বলবেন সেখানে?

সে অনেক কথা। প্রতি বছর একবার ক'রে বলি। বলব, তোমরা গ্রামের উন্নতি করো। কচুরিপানা ধ্বংস করো।—কুয়ো খোঁড়ো। চাষে বেশি মন দাও। ফসল বাড়াও—এই সব আর কি।

বাজ গল্প

কিছু কাজ হয় তাতে?

পাগল হয়েছেন? ওরা যদি কিছু করবে তবে আর সভায় ডাকার কি? কিছু করবে যে, সে ক্ষমতা তাদের কোথায়? পকেট কোথায়? তারা বক্তৃতা শুনে শুধু হাততালি দেবে। বলবে, বাঃ! বাঃ! লোকটা বলে ভাল।

শহরেও তো তাই হয়, মশায়! নিজের ওখানে বক্তৃতা দেবে হাজার কি করবে তারা?

যেমন ছিল তেমনি থাকবে। তেমনি না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে, দিন কাটাবে। আর শহরে এসে বলে চাকরী নেবে এই কথা বলতে দিনরাত। তবু যাচ্ছি কেন, জিজ্ঞাসা করবেন তো?—যাচ্ছি, এ একটা নেশা কিন্তু এ ছাড়া আমার পক্ষের কথা। যাদের কাছে বক্তৃতা দেব, তাদেরও তো জীবনে কিছু সাধ-আহ্লাদ আছে। ওরা অজ পাড়া-গাঁয়ে সিনেমা-থিয়েটার দেখতে পায় না। তার বদলে ওরা বক্তৃতা শুনবে, শুনে তারি খুশি হবে। এই খুশিটুকু ওদের জীবনে দরকার। প্রত্যেকের জীবনেই অর্থহীন অনেক কিছু চাই-ই, বুঝলেন না?

ভদ্রলোক আমার কথায় কেমন যেন মনে মেলেন। ওঁর কথার প্রতিবাদ করতে বেশ অভ্যস্ত। তা আর করলেন না। আমার সম্বন্ধে হতাশ হলেন তিনি। আর কোনো কথাই হল না। আমারও ভাল লাগছিল না অকারণ কথা বলতে।

যথাসময়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা। স্টেশন থেকে বেরিয়ে মিনিট দশেক চলবার পর দেখলাম, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক পথের পাশে জলে পড়ে আর্তনাদ করছেন। বলছেন, পতিতপাবন, আমাকে বাঁচাও। ওঁর পাশে একজন মহিলাও রয়েছেন। মহিলাটি কিন্তু বিব্রত।

মহিলা বলছেন, আমি তখন টের পেয়ে এ পাশে সরে গিয়েছিলাম কেঁচো এই ভদ্রলোক এখানে পড়ে আছেন, উঠতে পারছেন না। ওঁর কোমরে ব্যথা—অসহ্য—একটু চলতে হাঁটাহাঁটি বেড়ে গেছে। আমি কি করব, তাই ভাবছি। এমন অবস্থায় ওঁকে ফেলে যাওয়া যায় না। আপনি এসে ভালই হল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, আপনার কিছুই করতে পারবেন না, আমাকে এইভাবে থাকতে দিন, যখন যমে ধরে তখন উঠব। এখন এক পতিতপাবন ছাড়া অন্য কারো সাধ্য নেই আমাকে তোলে এখান থেকে।

আশ্চর্য কাণ্ড! এ কথা শেষ হতে না হতে পতিতপাবন এসে হাজির হলেন এবং এসেই বললেন, তুমি আমাকে ডাকছিলে?

সে-ও আশ্চর্য ব্যাপার। পতিতপাবনের সঙ্গে একটা ছড়ি ছাড়া বাস্তব জীবনেও এমন ঘটে না কি!—একেবারে অদ্ভুত কাণ্ড!

প্রৌঢ় ভদ্রলোক ওঁকে দেখে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। আমরা দুজনে ভয়ে ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম। প্রণাম জানাতে ভুল হয়ে গেল। ভাগ্যিস পতিতপাবন-ছাড়িয়ে, এমন তো এদের কখনও শুনি নি।

যেন একটা নাটকীয় দৃশ্য। প্রাচীন গ্রীক নাটকে এমন হ'ত আগে। মানুষের অসাধ্য কোনো অঘটনের মুহূর্তে যন্ত্রের সাহায্যে মঞ্চে কোনো দেবতাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। সেই অলৌকিক দেবতা এসে সব ঠিক করে দিতেন। ও কি তাই?

পতিতপাবনের আবির্ভাবেই পতিত ভদ্রলোককে চকিতে দেখে নিলাম ভাল ক'রে। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি কোট। অতিরিক্ত সিল্কের চশমা কেন যানি বলেই বোধ হ'ল।

মহিলার মুখে কোনো কথা নেই, তাঁর স্তম্ভিত ভাব দেখে ভয় হচ্ছিল, আবার আর

একটা চুমুক দিল চায়ে
নোটবুকটা দাও।

পণ্ডিতমশাই পণ্ডিত ভদ্রলোককে ডিক্টেশন করাবেন, আমাকে সাহায্য করতে বলা।

তুমি লাইব্রেরীতে ঢুকে যখন পণ্ডিতকে উদ্ধার করি, তখনই তো তুমি আমার প্রেমে পড়ে যাও। তাই তো?

বেশ হয় তুমি ভাবো। আচ্ছা তুমি কি কি পাস করেছ? বি.এ. অনার্স?

সে অনেক কথা, পণ্ডিতমশাই। বহু ডোনেশন দিয়েছি—বহু, মানে অনেক লাখের। অনেক টাকা আমার উপরে উপর্জন করেছি, মানে অনেক লাখ।—এই হল সার কথা। এখানে পণ্ডিতকে যদি উদ্ধার করতে পারি।

তোমার সব কথাই কি এমন হেঁয়ালি?

না পণ্ডিতমশাই। তবে 'ডিটেলে' বলতে গেলে রাত ভোর হয়ে যাবে। সে সব মোদ্দাকথা নয়। কেন জানেন? সে সব তাবড় তাবড় লোকের কথা। শুনতে শুনতে দেখা ঘুমিয়ে পড়বেন। তার চেয়ে তো সংক্ষেপে সবই জানতে পারা। আমি একটা 'সামারি' বলছি শুধু।

হুঁ। আচ্ছা, পণ্ডিত করেছে কে?

আমি নিজেই নিজেকে পণ্ডিত করেছি পণ্ডিতমশাই।

তা'হলে আমাকে উদ্ধার করতে চাও? আমি কি তোমার চাকরি? তুমি নিজে পণ্ডিত হয়েছ, নিজে ওঠ।

তা তো চেষ্টা করছি, স্যারের। কিন্তু আপাতত আমি একেবারে জমিতে পণ্ডিত।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কাউকে তোলা আমার কাজ নয়। তুমি অন্য কাউকে ডাক। এই তো দুজন তোমার সামনেই রয়েছেন।

এ কথা শুনে আমি এগিয়ে গিয়ে পণ্ডিতমশাইকে বললাম, আপনার কথার এইটুকুনি 'কনট্রাডিকশন' হচ্ছে না কি? একটুখানি পরস্পর বিরোধিতা?

মহিলাটিও আমার কথা সমর্থন করলেন।

পণ্ডিতমশাই দুজনকেই চোখ করে বললেন, যুক্তিশাস্ত্র আওড়াচ্ছ যে বড়। কলেজে-পড়া বুঝি?

মহিলা বললেন, কিন্তু পরস্পর বিরোধিতা থাকবে কেন আপনার কথায়? আপনার নাম পণ্ডিতমশাই, অথচ পণ্ডিতকে উদ্ধার করতে আপত্তি?

পণ্ডিত ভদ্রলোক বললেন, ঐ যেখানে তো পণ্ডিতমশাই, এরা দুজনেই আবার বিদেশ। নিজের এঁরা তোমার ঐ পরস্পর বিরোধিতা লক্ষ্য করেছেন।

আমি বললাম, পণ্ডিতমশাই ডাক শুনেই আপনি লাফ দিয়েছেন, কাছে এসেছেন, তবে কেন তর্ক করছেন? এ নাম তো আপনি স্বীকার করে নিচ্ছেন। পণ্ডিতমশাইকে পণ্ডিত লোকেই ডেকেছেন। তা না হলে আপনার নাম পণ্ডিতমশাই হবে কেন? ও নামের মানে কি?

মানে তোমরাই জান। আমাকে সবাই ঐ নামে ডাকে, তাই সাড়া দিই। কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয়?

প্রমাণ হয় যে, তুমি পণ্ডিতকে উদ্ধার করবে বলেই ঐ নাম নিয়েছ।—চলুন পণ্ডিত ভদ্রলোক।

তোমার মতলবটা কি বে বাপু?

পণ্ডিত ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম প্রিয়গোপাল চাটুজ্জে।

পণ্ডিতমশাই আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আর তোমার নাম কি হে ছোকরা? তুমি বড্ড ফড়ফড় করছ।

মহিলা প্রতিবাদ করে বললেন, আপনার আমাকে উদ্ধারে মন হচ্ছে না। অতএব এর জোরে 'ডিভোর্স' হতে পারে।

ও' তুমি তবে এর ডাক শুনেই এসে গিয়েছ? নইলে এতখানি নীতিবোধ তো সহজে দেখা যায় না। তাছাড়া আবার উঁচু-নীচু কি? মনের ভাব প্রকাশের ওটা একটা মাধ্যম মাত্র। যে পক্ষে যে ভাব প্রকাশ হয়, সেইটেই সে ভাব প্রকাশের উপযুক্ত শব্দ। বাংলা সাহিত্যেও তো দেখছি। আগে যে সব শব্দ ব্যবহার করলে লোকে লজ্জা পেত, এখন তা চালু হয়ে গেছে। কত অশ্লীল ভাষা ব্যবহার এখন প্রশংসা পাচ্ছে। আমি তো শুধু 'ফড়ফড়' বলেছি। কে দুষের যা, তা হবেতেই হবে।

মহিলা বললেন, যা নিজেরই তা নিজেরই বিকৃত। কিন্তু সে কথা থাক। আপনার কাছ কি পণ্ডিতকে উদ্ধার করা নয়?—তবে তর্ক করছেন কেন? তর্ক করা কি আপনার উপযুক্ত হচ্ছে?

আমি তর্ক করছি এজন্য যে তোমরা নামের মানে খুঁজছ। নাম নামই। কারো নামেরই কোনো মানে নেই। তোমার কি নাম হে ছোকরা?—এবারে বলবে কি?

আমার নাম ধ্রুবনাথ।

কার ধ্রুবনাথ?

আমাদের নামের কথার কথায় অর্থ করা যায় না। মানুষের সমাজের এটাই নিয়ম। কিন্তু স্বর্গীয় সমাজে তো আর তা নয়। সেখানে প্রত্যেকের নামের অর্থ আছে—বিশেষ করে পুরুষদের। এমন কি জন্ম মিনিটের মধ্যেই আপনাদের নাম রাখা হয় সেখানে। অতএব আপনার পণ্ডিতমশাই নামও তাৎপর্যপূর্ণ।

তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এ নাম তোমরা অনুমান করে নিয়েছ। কারণ, তোমাদের ধারণা, আমি পণ্ডিতকে উদ্ধার করতে পারি। মাটিতে পড়ে তোমরা, আর তুলে দেব আমি, মজাটা বেশ নয়। এমন আশা তোমরা কর কি করে? 'লাফিত'-মশাই বললে কিছু হয় না। অন্তত যারা পণ্ডিতকে তুলে দিতে পারে। কিন্তু যেখানে নিজে পণ্ডিত, সেখানে আমার কোনো গরজ নেই। অকারণ আমি পণ্ডিতমশাই হতে যাব কেন? আমি তোমাদেরই মতন একজন।

মহিলা বললেন, বুঝলাম, আপনি না হয় উঠে যেতে পারেন, কিন্তু পরমহংসের পরমহংসো তো আপনিই করে গেছেন?

পণ্ডিতমশাই বললেন, না জেনে কিছুই বলা উচিত নয়। প্রত্যেক কাজে প্রমাণ চাই। কেন এ রকম মনে হচ্ছে যে, এ সব আমি করেছি?

আমাদের ধারণা।

না, ভুল ধারণা ওটা। যেমন তোমাদের কোনো ইচ্ছা এর মধ্যে নেই, তেমনি আমারও কোনো ইচ্ছা এর মধ্যে থাকতে পারে না। পরীর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমরা সবাই জন্মেছি বিবর্তনের নিয়মে। অতএব যা কিছু ঘটছে, সবই তোমাদের অনুমান। আসল সত্য তোমরা জানতে পারবে না, আমিও পারি নি।

মহিলা বললেন, আমাদের জেনে দরকার নেই। আমি শুধু—

পণ্ডিতমশাই বাধা দিয়ে বললেন, তোমার নামটি কি, শুনি?

মহিলা চমকে উঠে দু'পা পিছিয়ে গেলেন। বললেন, আপনার মুখে এমন ভাষা? ছি ছি। আমি চুঁড়ি?

ভাষার কথা এ সেই হয়ে গেছে। তোমার নাম বল।

আমার নাম ধরিত্রী বসুমদার।

এ নাম শুনে কিন্তু আমি চমকে উঠলাম। পরিচিত নাম। ইতিহাস তো তা হলে আমারই সতীর্থ। কাল যে সভা বসবে তার সভানেত্রী ইনি। তখন বিদ্যুতের আলো এত বেশি বলে আর একটি মানুষের কথা উজ্জ্বল হয়ে ফুটল। পণ্ডিত ভদ্রলোক যে

বলেছেন, তাঁর নাম প্রিয়গোপাল চাটুজ্জে। উনি এ গ্রামে বহুদিন আসেননি, এখন যেতে বলিনি। আমরা সবাই এক সঙ্গে যাব।

পণ্ডিতমশাই বললেন, হরিহরী তোমার নাম। জানে মাটি। বহু পড়ুয়া কিন্তু ঐ মাটিতেই। আচ্ছা আমি চলি।

প্রিয়গোপাল তাড়াতাড়ি বললেন, তা'হলে পণ্ডিতমশাই, আমার উদ্ধারের কোন আশা নেই!

আমার হাতে তো অস্ত্র নেই। তোমার যদি কথা যদি আমাদের সবার সঙ্গে কথা বলা সাহস থাকে, তবে চেষ্টা করে দেখতে। সব

শুনে রাখি আগে। তবে আমাকে তুমি ক্ষমা করবেন'—মনে রেখো না। সব দাবীর বলেই মুক্ত—তা হবে না। এই শর্তে যদি রাজি হও, তবেই বলবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তা হলে আপনি ইচ্ছা করলে উদ্ধার করতে পারেন?

না। আমি তা পারি না। কারণ আমি তোমাদেরই একজন। আমিও যে বিধি-নিয়মের অধীন। প্রিয়গোপালের ক্ষেত্রে তোমার যে ক্ষমতা, আমারও তাই। তবে এই অবস্থা থেকে তুমিও যেমন তুলতে পার, আমিও তেমন তুলতে পারি। উদ্ধার করার অর্থ অস্ত্র। তোলা আর উদ্ধার এক নয়। কিন্তু—

কিন্তু কি?

সেটাই তোমার উপযুক্ত কি না, তা না জেনে কিছুই বলা উচিত নয় মাঝে-মাঝে তোলা ঠিক নয়।

হরিহরী বললেন, তবে পণ্ডিতমশাই, আমরা তো জানি, যে পড়ে আসে, তার বাক্তির বিচার না করে শুধু তুলে নেওয়াই এখানকার কাজ। তারপর তাকে দিয়ে কাজ কিছু না হলেই চলে।

— তোমার ব্যক্তিস্বাধীন বাক্ত তোমরা করতে পার, আমি পারি আমার নিজস্ব

তেবে দেখ-যা, পণ্ডিতমশাই বড়ই দুষ্ট। কিন্তু যে কথা প্রকাশ করে বললে, যদি তো বিপদ ঘটে, তাই চুপ করে রইলাম।

পণ্ডিতমশাই প্রিয়গোপালকে বললেন, তুমি তোমার সব কথা বল। কথাটা যে মনে করবার জন্যে পড়েছে বুঝতে পারছি। কেন তুমি পড়িত, তা বল।

কিন্তু তোমরের বাবার যে উঠে বসতে পারছি না। এ অবস্থায় বলি কি করে? তবে শুয়ে শুয়ে বলতে বাধ নেই।

পণ্ডিতমশাই বললেন, বেশ তোমাকে হাত ধরে তুলে বসিয়ে দিচ্ছি।

প্রিয়গোপালকে বসিয়ে দেওয়া হল তিনি বাবার খুব বিকৃত করে তোমরের বলাটা মনের মতন করে নিলেন। তারপর বললেন, জগন্নাথ, হরিহরী, তোমরা সবাই আমার জন্য। সবার কাছে তোমরা। আমি যে সবার প্রধান অতিথি। আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা যেতে পারো না।

হরিহরী বললেন, তা!—তারপর চুপ করে গেলেন।

পণ্ডিতমশাই ক্ষুব্ধ করে যেমন মোটি নিরিয়ে নিলেন।

আমি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? জ্যোতি নেবানো যায়?

পণ্ডিতমশাই বললেন, এ কাজটি তোমরাও ইচ্ছে করলে করতে পার। যেমন একটা মুক্তমেন্ট আছে। তা থেকে বিদ্যুৎ শক্তি জন্মে। সে শক্তিকে যদি লাগাবার কৌশল যার করতে পারলে তোমাদের যেমন জ্যোতির্ময় হতে পারে। স্বর্গীয় প্রত্যেক যেমনার এ কৌশল জানা আছে।

হরিহরী এ সব বুঝলেন না। বললেন, অন্ধকার ঘরে তাহলে ভাল, প্রিয়গোপালবাবুর কাহিনী জমবে ভাল। কিন্তু আমাদের সামনে বলতে কোনো বাধা নেই তো?

আর বাধা! আমি তো কখনও কোনো বাধে লজ্জা পাই নি। সবাই যা জানে, তা আর বলতে বাধা কি! বলতে লজ্জাও পাই না। এখন শুনে তোমরা লজ্জা না পেলেই হল। এবারে পণ্ডিতমশাইকে ধন্যবাদ।

পণ্ডিতমশাই উঠলেন, তুমিও করো আরম্ভ করে দাও।

প্রিয়গোপাল আরম্ভ করলেন: আমি খুবই গরিব ঘরের ছেলে এককালে। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছে মনে মনে। সুযোগ পেলে লেখাপড়া করে মানুষ হব। সেটা আমার প্রথম সুযোগ। বিধাতার সুযোগ দেওয়াটা সত্যিই অদ্ভুত। হয়তো দেখা যায়, সত্য মানুষ হবার জন্যে তোমার যত ইচ্ছে হয় বহুৎ কৃতি হবে। তুমি মানুষ হবার জন্যে মনে মনে ভেবে আর বলিস্তী, তোমার বাবা কত ভিক্ষা করে, অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে, ছুটিতে টাকা বন্ধ করতে চায় না তবু আশা করে তুমি মানুষ হবে?

হরিহরী মুখ নত করে উঠলেন। বললেন, এ সব কথা বলছেন?

মনে হয়, মনে পড়ে না এককালের কথা। আজ মুখে যে দাম আছে লোকে এক কালে সেসব কথা তো মনে করে?

হরিহরী ও অন্যান্য একসঙ্গে বললেন, খুব আছে। কিন্তু তোমার কেমন?

প্রিয়গোপাল একটু ভেবে বললেন, একটা ঘটনা ঘটল, যার জন্যে যারা রয়েছে তাদের নিয়ে তোমো উৎসব করা তো দূরে, তাদের কি অসুবিধে হচ্ছে তাও দেখি। যারা তোমার মুখাপেক্ষী তোমার কোন মায়া—

পণ্ডিতমশাই পাশেই আমার প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি মাঝখানে বাধা দিয়ে উঠলেন, তুমি তাদের ত্যাগ?

সেই কথাই তো বলছি —একটু গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন প্রিয়গোপাল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপারটা কি ছিল?

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা।

হরিহরী বললেন, তা বটে সে সমস্যা সারাদেশে দেখা দিয়েছে কিন্তু মিটেছিল। আচ্ছা কত ছেলে হয়েছিল তোমার?

প্রায় চল্লিশ জন।

বাহ্যবাজেই হয়েছিল, চল্লিশ আগে আর পরে। একসঙ্গে অত বৃদ্ধি হবে তোমরা সকলেরা একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলে। তোমাদের বাড়ীতে যে রক্ত হয়—আমি বাঙালীজাতির কথা বলছি। দুজনের বয়সে লাখ লোকের

মুড়া খেলে
ওই ভবি

পণ্ডিতপাবন জিজ্ঞাসা করলেন, হাতে তোমার পাইরেটি চুরুটে তোমার হাত কতখানি ছিল?

ঠিক বলিতে পারি। ধারণাটা হাতে থাকতে খুব বেশি থাকে না, সে তো জান। শুধু তার ব্যালিস্টাইলের ব্যাপার। অবশ্য হাত কাজ করেছিলাম। এর মতোবাই মারাত্মক তাও-হাত ছিলাম। যাদের টাকা আছে, ধরবে না, তাদেরই তো বাঁচবার অধিকার। তাই বলে—

পণ্ডিতপাবন ধরতে উঠলেন, যাব, বক্তৃতা দিতে হবে না। বাঁচার অধিকার কার আছে না আছে, এ নিয়ে মূলতত্ত্ব নিয়ে তোমার মুখ থেকে কোনো আলোচনা শুনতে চাই না।

ধরলাম, এটা আপনার কিছু হবে। আমার হয় তাদের সঙ্গেই এটা করে প্রিন্সিপাল ভাঙিয়ে আছে, একটা করে মুখ নীতির পটভূমি আছে, নইলে কি আর এসব কাজ করতে পারতাম? সেসব কথার অনুমতি করেন তো বলা যেতে পারে।

সংক্ষেপে বল

মতের পার্থি। বলছিলাম, জীবনযুদ্ধে সবল হবো, তাহলেই তো বাঁচবার অধিকার। এই নীতিটা মনে গাঁথা হয়ে আছে। তাই অবশ্য বাঁচবার মানুষে আমার কোনো অনুবিধা হয় নি। দেখার কি না, ওরা বড় অসহায়। ওরা শুধু পরজন্মের কথা ভেবে আরাম বোধ করে। তোমাদেই তো ওরা ভেবেছে কতবার, পণ্ডিতপাবন। তুমি তো সবই জান। আর তুমিও তাদের মতোই সাধারণ বলেছ, বাঁচাতে নয়। নইলে আমার এখন সাধ্য কি?

আমি ওসব কিছুই করি নি, যাদের কথা বলো না প্রিয়গোপাল। না জেনে বিনা প্রমাণে কোনো কথা বলো না।

কিন্তু পণ্ডিতপাবন, এটা তো একটা বয়স দেখে-এর কথা।

তুমি ভুল করছ, প্রিয়গোপাল। আমি আগেই বলেছি, তোমাদের কোনো কিছুর মধ্যে আমি নেই। আমার চোখে সব সমান। আমি মৃত্যু, আলোআঁধার, ভালমন্দ, চোরসাধু—এদের মধ্যে কোনো ভেদ রেখি না। আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। বিশ্ববিধান নামক একটি অন্ধ বিধান আছে। সেই বিধানে আমরা সবাই বাঁধা।

ধরিত্রী বললেন, ও! আপনি তাহলে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানী।

আমি বললাম, তবে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আছে কেন?

আছে খুব অল্পপরিসরে। তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় ধরিত্রীকে বিয়ে করতে পার, নাও করতে পার—

ধরিত্রী চমকে উঠে ইংরেজীতে বলে উঠলেন, How objectionable! আপনি কথা ফিরিয়ে নিন।

শোন না আগে। বলছিলাম, স্বাধীন ইচ্ছায় এটুকুই পার, কিন্তু তোমাদের স্বাধীন ইচ্ছায় পৃথিবীর মোহা বন্ধ করতে পার না।

ধরিত্রী মাথা নীচু করে বসে রইলেন। আমি বললাম, আপনারও কি ক্ষমতা মাত্র এটুকুই?

পণ্ডিতপাবন বললেন, আমার তার চেয়েও কম। একেবারে সীমাবদ্ধ এবং সাময়িক। কিন্তু তোমরা অবশ্য সব নষ্ট করছ। একটা জরুরি বিবৃতির ব্যাপারে এভাবে বাধা দেওয়া তোমাদের অন্যায়।

পণ্ডিতপাবনের গায়ে ঠিক আগের মতো হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। তিনি তৎক্ষণাৎ কথা ভেঙে দিলেন, বললেন, হঠাৎ সুইচে চাপ পড়ে এর ব হয়েছে—বলে পুরনোর আলো নিবিয়ে দিলেন। বললেন, বিল্ট-ইন সুইচ আছে, চাপে জ্বলে, চাপে নেবে।

আলোতে অসুবিধাই হচ্ছিল। ধরিত্রী আরও বেশি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছিলেন। অন্ধকারে ওঁকাতে দেখাই একটা বেশ আরাম বোধ করছিলাম।

প্রিয়গোপাল বলতে লাগলেন, চোখের উপর সব মরতে দেখেছি। নির্বিকার ছিলাম। পণ্ডিতপাবনের মতন নির্বিকার। নিজের অক্ষমতায় নিজের প্রতি শ্রদ্ধা জাগল। কারণ যত লোক মারা গেল, তার অন্তত চারগুণের এককাল করে আমার হাতে। আমার সিরুক ভরতে লাগল প্রতিদিন। সে যে কি আনন্দ পণ্ডিতপাবন, তা মানুষ ভিন্ন অন্য কারো বোঝবার উপায় নেই।

বল, অমানুষ ভিন্ন।

না, তা বলি না। এ মানুষের কাজ। এতে মানুষের সম্মান। ছিলাম গরিব, সমাজের একজন বাজপথ নেতা হতে বেরি বলে না। কেন? কারণ মানুষ মারার ক্ষমতা আমার আছে। ও! সে কি অপূর্ব দৃশ্য। অসহায় মানুষ-পতঙ্গগুলো পাড়াগাঁ থেকে শহরে এসে ভিড় করতে লাগল। তারা শুধু পরকালের দিকে তাকাল। বুঝলে পণ্ডিতপাবন, এই অবস্থাই হচ্ছে আমাদের অনুকূল অবস্থা। অবশ্য পরকালের দিকে সব সময় তাকাল না। বাড়ি বাড়ি ঘুরে কিছু ক্যান সংগ্রহেরও চেষ্টা করল। তারপর বাড়ি বাড়ি ঘুরবে এমন শক্তি ফুরিয়ে এলো। তারপর সব শুরু। উপরে চাইবার ক্ষমতা নেই, ক্যান ফিকার ক্ষমতা নেই। কাঁচের চোখ দেখেছ, তাই জ্বলনাথ?

দেখেছি। কৃত্রিম চোখ। তা নড়ে না, একভাবে একদিকে তাকিয়ে থাকে।

ঠিক তাই। যারা শেষকালে পথে বসে ঘুরতে ঘুরতে মারা গেল, আর কিছুই চাইল না, না ক্যান, না ঈশ্বরের দয়া, তাদের দেখেছি সেই কাঁচের চোখ। সেই প্রাণহীন চোখ নিয়ে তারা পথে বসে ঘুরেছিল। মরবার আগে তাদের আর কিছুই চাইবার ছিল না। আমরা তাদের পাশ দিয়ে মাকে রুমাল চাপা দিয়ে হেঁটেছি। যখন মোটরে চলেছি, তখন পথের ধুলো চোখে মুখে লেগেছে, তবু চোখের পলক পড়ে নি তাদের।

নাট্য-সাহিত্যের সেই গৌরবজ্যোতি
ঐতিহাসিক নাটক প্রতিভার বহ্নিমুক্ত

অমর নাট্যকার-ঐতিহাসিক সম্রাট পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের

ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে :—প্রতাপাদিত্য, বিল্বমঙ্গল, আলিবাবা, নিষ্কৃতি, প্রমোদরঞ্জন।

২য় ভাগে :—ভীষ্ম, বঙ্গেশ্বর নন্দন, পদ্মিনী, রঘুমুখে, ফুলের বোঝা, চাঁদের আলো।

৩য় ভাগে :—রঙ্গবতী, নারায়ণী, দুর্গাদাসবধ, আলাদীন, জয়শ্রী, কুলী;

৪র্থ ভাগে :—আলিবাবা, রাবানন্দ; বাঙ্গালাদেশ, পুনর্জন্ম, কুবাসন বিকাস, রূপের ডালি।

৫ম ভাগে :—আলমগীর, অশোক, চাঁদবিবি, বাসন্তী, কুরুক্ষেত্র, খাঁজাহান, বিরানকুঞ্জ, রাধাকৃষ্ণ।

৬ষ্ঠ ভাগে :—রঘুবীর, ভূতিরা, বেদৌরা, কুমারী, বরুণা; কবি-কাননিকা ক্ষুদ্রেরের বন্দিরে।

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

ধন্বন্তরী এ পর্যন্ত শুনে বললেন, আমি একটু ঘুরে ফিরে বসি, আর শুনতে পারছি না এসব কথা।

তিনি উঠে গেলেন খানিকটা দূরে।

প্রিয়গোপাল বললেন, ও ঠিকই বলেছে, ওসব হিঁচকাদুনি আমার কথা সহ্য করতে পারবে না। পুরুষ হলে তো লৌকিক থাকবে। শক্তি থাকবে।

পতিতপাবন বললেন, চুপ! কি বলছিলে বল, অন্তের সমালোচনা করো না।

প্রিয়গোপাল বললেন, বাপ বলবেন, যার যাকে কথা বলব না। শুনুন, যা বলছিলাম। আর শোন, হরলাল তুমি তো আধুনিক, তুমি শুনলে আরও ভাল বুঝবে। —তে বড় ঘটনা বলি। তখন দেখেছি স্ত্রী স্বামীর মৃতদেহ সামনে নিয়ে চুপ করে। শিশুর মৃতদেহ সামনে নিয়ে বাঁচের চোখে চেয়ে আছে। অদ্ভুত সে দৃশ্য। সেই শুভদিন এতকাল পরে আবার ফিরে আসবে মানুষ বলছে। যদি তোমরা ঠেকিয়ে যাও, তবে আমরা কি করব জানি না। কিন্তু যা সে কথা। শোন পতিতপাবন, শোন হরলাল, সেই পঞ্চাশের মন্বন্তরে দেশের বড়বড় ক্ষতি হল, কত লক্ষের অপচয় হল, তা তারপরে কি ফুরিয়ে যায় না? বিনা অসুখে লক্ষাধিক লক্ষ লোকের অন্ন বন্ধ হলে ইউরোপে বিক্রি করে কত ডলার বাঁচানো যেত তার দেখি। বিজ্ঞানের সেবায় লাগত সে সব অঙ্কের। পরীক্ষার জন্য মৃতদেহ পাওয়া কত কঠিন, অথচ গাদা গাদা মৃতদেহ পড়ে হল। কিন্তু ইউরোপ তখন কিনবে কেন? তারাই তো তখন কত মানুষ মারছে। অ্যাংলো-আমেরিকানরা মারছে, জাপানীরা মারছে। মৃতদেহের প্রয়োজন ছিল না পৃথিবীতে।

আমি বললাম, আপনার তো তাহলে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল বিজ্ঞানজগতের এই ক্ষতিতে।

বুঝতেই পার, দেশের প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের দুঃখ আছে—স্বাস্থ্যেরও আছে। এত মরদেহ কি শুধু শকুনের ভোগের জন্য? এত মানুষ মেরে শুধু একদিনের মূলাফা হল, দেহগুলো বিক্রি করে যে টাকা হত তা আর হতে পারল না। কত সন্তোষজনক চোখের ধনিয়া নিয়ে কত অন্ধকে চক্ষুদান করার পরীক্ষা করা যেত। কত জীবিত লোকের অসুখ বিসুখ কেটে ফেলে তার জায়গায় মৃতের সুস্থ বিসুখ বসিয়ে কলম করার পরীক্ষা চালানো যেত। কত দুর্মূল্য রক্ত নিয়ে রক্তহীনের দেহে পুরে দেওয়া যেত।

আমি এবার মনস্থির করি, এসব দেখি পতিতপাবন আমল পাবে নেই। তিনি কি অবহেলা করলেন। একলা একলা ঘরে এদিকে দেখি তিনি ধন্বন্তরী বন্ধুবরের পাশে বসে অন্য বিষয়ের আলাপে মেতে গিয়েছেন। আমি তাই বললাম, এখানে বিরক্ত করে না থাকব। আমি এখন শেষ করেই উঠে যাচ্ছি তোমাদের কাছে। ধন্বন্তরী বোধহয় মনে পেয়েছে মনে।

ফিরে এসে প্রিয়গোপালের কথা শুনতে লাগলাম।

প্রিয়গোপালের সমস্ত দুঃখ নতুন করে জেগে উঠেছে, তিনি কেবলই হাহুতাশ করতে লাগলেন। এত বাঁচোয়া বিক্রি হল না। সেদিনের সমস্ত দুঃখের স্মৃতি তাঁর জেগে উঠেছে যেন।

পতিতপাবন একটি ফিরে এলেন। ধন্বন্তরী মজুমদার এবার নিশ্চয়ই বাণিজ্যের সঙ্গে করতে পারবে না বলে চুপচাপ বসে রইলেন। তবে কান দুটো সজাগ রাখলেন।

প্রিয়গোপাল পতিতপাবনকে পেয়ে আবার ঐসব অনুযোগ আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পতিতপাবন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, কাজের কথা বল। বাজে কথা বলো না।

বললেন, টাকার পর টাকা। বোঝাব কেন, টাকা যার তারই তো ফলত, তারই তো বাঁচবার অধিকার। আর এরকম তো নিত্য ঘটে, ফলহার সন্ধান পেলে তা যত বাড়ানো যায়, আরও বাড়াতে ইচ্ছা করে?

মনস্তত্ত্বটা আরও বলাও। শুধু ঘটনা বল

আগেই তো বলেছি পতিতপাবন, কিন্তু বলতে গেলেই তার মনস্তত্ত্বে কিছু বলা এমন অভ্যাসে এসে গেছে যে, সে অভ্যাস ছাড়া বড় শক্ত। এতটুকুনি ফলার চোখে না দেখলে যে বলতে পারছি না, ব্যাপার।

কিন্তু এই সময় প্রিয়গোপালের কোমরের ব্যথাটা হঠাৎ এমন বেড়ে গেল যে, তিনি আর্তনাদ করতে লাগলেন চটাৎ। আর তা শুনে ধন্বন্তরী মজুমদারও ছুটে এলেন তাঁর দূর আসন থেকে।

প্রিয়গোপাল কোনো রকমে বললেন, ওষুধ পকেটে আছে। জল নেই যে তা খাব।

পতিতপাবন তাঁর ফ্লাস্ক থেকে জল বিলেন।

ওষুধ খাওয়ানো হল। তারপর দশ মিনিট তাঁরা চুপচাপ। জল দিয়ে ওষুধ খাওয়ার সময় পতিতপাবনের মাথার আলো জ্বেলে দিয়েছিলেন বোধহয় টিপে। তবে সে আলো দু' সেকেণ্ডের জন্য জ্বলেই বন্ধ। প্রিয়গোপালের বেদনার্ত মুখখানার দিকে চোখ পড়ল। কি ভীষণ যে দেখাল। সমস্ত জীবনের পাপের ছাপ যেন স্থায়ীভাবে আঁকা হয়ে গেছে তার উপরে। আর সেই সঙ্গে দেখলাম সন্তোষজনক ভাবে ধন্বন্তরী মজুমদারের মুখখানা। তাও ভাল লাগল। যেন ডোরেন পাইটিংয়ের মুখের প্রতিচ্ছবি!

প্রিয়গোপালের কোমরের ব্যথাটা কিন্তু বলল এতক্ষণে।

পণ্ডিতপাবন বললেন, তা হলে এবারে বর তোমার কন্যা, তবে অন্যান্য বর যে-রকম হয়ে থাকে তার মতন নয়।

ঠিক বটে, সত্যই তাঁকে সকল অর্থেই স্বতন্ত্র বলা যায়। তাঁর বেশ এবারে একটু অন্যরকম হয়েছে। তাঁর মাথায় ছিল একটি পাগড়ি, তার ওপরে ছোটখাটো একটা পাহাড়ের চূড়ো একটি পদ্ম তৈরির কন্ট্রাক্ট নিয়েছিলাম। আমার আশা ছিল ঐ পাহাড়গুলো চাকরদের বিক্রি করা যাবে অবশ্যই নয়, অন্তত ভেড়ে কিংবা কাঁচের বাক্সে বিক্রি। খুব চাহিদা ছিল তখন ওর। প্রতি এক বস্তা চালে কম দেব কাঁচের এটাই ছিল তখন দস্তুর। কোনো কোনো অসাধু ব্যবসায়ী অনুপাত আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। খদ্দেররা কিন্তু কিছুই আপত্তি করল না। কেউ এ নিয়ে কোনো প্রশ্নও তুলল না। বরং এ নিয়ে অনেকে যে সব রসিকতা করল। কেউ কবিতা লিখল, কেউ গান লিখল।

আমি বললাম, সে কথা ঠিক, প্রিয়গোপালবাবু। আমি নিজেই একটি গল্প লিখেছিলাম।—সেই হাসির গল্প।

ধরিত্রী বললেন, আমি পড়েছি সে সব গল্প।

তবেই দেখ পণ্ডিতপাবন, আমার সব সফল হয়েছি সে নয়। আশায় হয় আশা করেছিলাম, কিন্তু সফল হচ্ছে।

রোমাঞ্চ-রহস্য গ্রন্থ

রক্তনদীর ধারা

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

রক্তনদীর ধারা মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। রোমাঞ্চ ও রোমাঞ্চের সত্য ঘটনায় বইটির পাতায়পাতা পরিপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনের অতিজ্ঞতা নয়; জীবনপথের দিক-নির্দেশ। তাই প্রবঞ্চনা; ছলনা ও প্রেমের লীলার চাঞ্চল্যকর বইটি চাঞ্চল্য তুলেছে সকল সমাজেই। প্রেম-মূলক সামাজিক কাহিনী।

দাম চার টাকা

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

তখনকার মতন ঐখানেই এসে তোমাদের কারবার শেষ হলে ভাল হত।—বললেন পণ্ডিতপাবন।

শেষ হয়ে তুমি চাইলেই—তাহলেই যে আরও একটা বড় অঘটন ঘটে। সেইটেই তো এখন করছে। তুমের ফরমাশ দেওয়া সৈন্য এসে বসেছে শহর ছেয়ে ফেলেছে। তাদের মনের অবস্থাটা তার। বুঝতে পারে তো তারা। বহন মুক্তিযুদ্ধের একটি ওলী এসে বিবরে তাদেরই সংখ্যা। অতীতকে কেউ ফেরাতে, ভবিষ্যৎ নেই, এমন অবস্থায় তাদের মন তোলাবার কি দরকারী উপায় ব্যবস্থা। মরণ সমুদ্রে ডুবল তারা, আর তার সঙ্গে অজান্তে বত বহন তোগাবল্লে। তা যোগানোর ভার কিছু নিলাম আমি। শোন পণ্ডিতপাবন, চমকে যেয়ো না, মানুষের বৈধিক মৃত্যু ঘটিয়ে হাত পাকিয়েছি, এবারে তার নিদান মনের মৃত্যু ঘটাবার। পাপের পথ একেবারে খোলা। রক্ত যে পার ক'রে নিলাম এই হাতে। এভাবে মরে যাচ্ছিল, এই সুযোগে তারা বিলাসিনী হয়ে উঠল। টাকার স্রোত বয়ে যেতে লাগল। নীতির কথা তুলো না দয়া ক'রে। ওসব গত চুকেই শেষ হয়ে গেছে বেটুকু ছিল। আমাদের ধারাটা যে বত পাকা পরিবর্তনের ফল, সে তো বুঝতে পারছ?

এসব কথায় আমি ভেতরে ভেতরে খুবই গরম হয়ে উঠছিলাম, কিন্তু বেরাদব পণ্ডিতপাবন আমার চেয়েও উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। তিনি হাত নেড়ে কি বলতে যেতেই হঠাৎ তাঁর বিল্ট-ইন সুইচে চার-পাঁচটা আলো জ্বলে উঠল। মনে হ'ল যেন সেও উত্তেজনায় জ্বলে উঠেছে। তাড়াতাড়ি আলো নিবিয়ে প্রিয়গোপালকে বললেন, বিষ তোমাকে।

প্রিয়গোপাল উত্তেজনাহীন কণ্ঠে বললেন, ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তো বলেছি এ কাজে তোমার ধারবার দরকার নেই। কারণ ন ভারু বানঃ—

পণ্ডিতপাবন চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন, থামাও তোমার ঐ সংস্কৃত নীতিবচন। তুমি কি তাহ'লে এর পরেও ঐ বোগান দেওয়ার কাজ চালিয়েছিলে?

এজ্ঞে। শেষ পর্যন্ত নিজের ঘর থেকে—

ধরিত্রী প্রায় আর্তনাদ ক'রে বলে উঠলেন, ওঃ!

পণ্ডিতপাবন বললেন, প্রিয়গোপাল, তুমি একটি জানোয়ার। তুমি নিজের ঘরের মেয়েদের দিয়ে ব্যবসা করেছ?

আমি তো এতে সবার থেকে পতিত হই নি, প্রভাত। সমাজে আমার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমি এখন একজন বড় মেতা। আমাকে যে সবাই সব অনুষ্ঠানে ডাকছে এও তার একটা প্রমাণ।

তোমার কথা আমি সবাইকে বলে দেব। আর ধরিত্রী, ভুবনাথ, তোমরা জেনেশুনে এর সঙ্গে এক সভায় বক্তৃতা দেবে? এক সঙ্গে বসবে?

এ কথায় আমি একটু বিব্রত বোধ করলাম। কারণ, পণ্ডিতপাবন কি জানেন না যে, যাদের কাছে উনি ব'লে দেবেন ব'লে ভয় দেখাচ্ছেন, তাঁরাও তো সবই জানেন?

পণ্ডিতপাবন একটুখানি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁর মধ্যে কেমন যেন একটা অধৈর্য। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, সব দেশের সব সমাজের ইতিহাসেই তো ঐ একই ঘটনা ঘটছে, পণ্ডিতপাবন। যত পাপের উপর এক একটা সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। রাজার লোভে হাজার হাজার লোককে হত্যা ক'রে এক একটা জাতিকে ভীরু বানিয়ে তারপর তাদের উপর প্রভুত্ব করেছে। ইংরেজদের কথা ভেবে দেখুন। জাল জোচ্চুরি আর হত্যার সাহায্যে তারা এক একটা সাম্রাজ্য গড়েছে, আর সেজন্য আমরা কি তাদের কম পূজা করেছি? কি বলেন? আর এখনও কি কম করছি?

প্রিয়গোপাল নড়চড়ে ব'সে বললেন, ঠিক বলেছ ভাই—মনের কথাটি বলেছ।

পণ্ডিতপাবন বললেন, ধরিত্রী, তোমারও কি ঐ মত?

ধরিত্রী বললেন, না। ইংরেজের যেটাই আর একটা ভাত আছে তারা ইংরেজকে বড় করেছে। নইলে রাজ্যগ্রাসী ইংরেজকে আমরা কখনই শ্রদ্ধা করতে পারতাম না।

পণ্ডিতপাবন বললেন, এর উত্তরেও কথা আছে। তোমরা প্রিয়গোপালের যুক্তির ভুলটা ধরতে পার নি। ভুবনাথ, ধরিত্রী, এর আর একটা দিক আছে, সেটাই হ'ল আসল দিক। সেটা তোমরা ভাব নি। যে ইংরেজদের কথা বলছ, তাদের ওটা একটা আদিম বর্বরতার দিক। তারা লুটপাট করেছে, হত্যা করেছে, কিন্তু নিজের দেশের স্বার্থ হানি ক'রে নয়। বরং তার উল্টোটাই করেছে। অর্থাৎ তাদের এই আদিম বর্বরতা সবই নিজের দেশের স্বার্থের খাতিরে করেছে। আর প্রিয়গোপাল কি

করেছে? সে বিদেশীদের ধারে আছড়ানো বিদ্যে বেরোচ্ছে। তবার মাত্র এইটুকুই।

প্রিয়গোপাল বলেন, কিন্তু ভদ্রলোকই ঠিকমতো বলেছে, পণ্ডিতপাবন। তুমি বাইরে যতই ভালোলো বিস্তার কর, মূল কথাটা হচ্ছে, লুটপাট, লুঠতরাজ। আমি যা করেছি, তা তবই হকুমের।

বলতে বলতে প্রিয়গোপালের পায়ে যেন জোর ফিরে এলো। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, দেখ পণ্ডিতপাবন, তোমাকে মিথ্যা ভেবেছিলাম। সে, পণ্ডিত ছিলে না, নিজের জোরেই উঠে দাঁড়িয়েছি। এখন আর আমার ভয় নেই, এখন তোমাকে আর আমি কেয়ার করি না। আমি এখন তোমার মুখের উপর স্বীকার করছি, আমি সমস্ত জীবন যা যা করেছি, তার জন্য আমার কোনো অনুতাপ নেই। যা করেছি—বেশ করেছি। আরও করব, সুযোগ পেলেই।

এই কথা বলে প্রিয়গোপাল নিজের দু-হাতের দুটো মুঠো আঙুল পণ্ডিতপাবনের নাকের কাছে ঘোরাতে লাগলেন। আর পণ্ডিতপাবন তাঁর লাঠিটা হাতের কাছে পেয়ে হঠাৎ তাঁর পায়ে এমন কষে এক চড় বসালেন যে প্রিয়গোপাল লাটুর মতন ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ে গেলেন।

আমি তো অবাক। পণ্ডিতপাবন নামে যিনি সাড়া দিলেন, তিনি নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ানো লোককে মাটিতে ফেললেন কেন?—ভেবে পেলাম না কিছু।

ওদিকে দেখি ধরিত্রী প্রিয়গোপালের কাছে ছুটে গিয়ে তাঁর মাথাটি কোলের উপর তুলে নিয়ে তাঁকে শুশ্রূষা করছেন। এও এক দুর্বোধ্য ব্যাপার।

দূরে লণ্ঠন হাতে অনেকজন লোককে দেখা যায়। সব ভেঙে একটু সরে দাঁড়ালাম। প্রিয়গোপালও কোনো রকমে উঠে বসলেন। ধরিত্রী তাঁর গায়ে একটু আলতো করে বললেন। নেটব্যাগ হতে একটা অভিনয়ের ভঙ্গি নিয়ে যেন আমরা ছায়া শ্বশ্রূষাকারী, বিস্ময় করছি সবের পাশে যেন এতক্ষণ কিছুই হয় নি।

কিন্তু লণ্ঠনবাহীরা আরও এগিয়ে এলো আমাদেরই দিকে। প্রথমে দূরে আমাদের চিনতে পেরে একজন এগিয়ে এসে বলতে লাগল, কি আশ্চর্য! আপনারা সব এখানে বসে আছেন। আমরা তো ভেবে ভেবে সারা। আপনাদের পৌঁছবার কথা দুটোর সময়। আর এখন প্রায় নটা বাজে। কেশবনে আসতে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু দেরি দেখে বলতে হয়েছে। খুবই ভয় হয়েছিল। যাই হোক, চলুন এবার।

আমি কিন্তু হঠাৎ ঠের পেয়ে দেখি, পণ্ডিতপাবন নেই! কোথায় নিঃশব্দে গেলেন ভাবছি, এমন সময় লণ্ঠনধারী যুবকদের একজন বলল, আমরা পথে পণ্ডিতপাবনবাবুকে দেখা পেয়ে তবে জানতে পারলাম আপনারা এখানে বসে আছেন।

ধরিত্রী সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, পণ্ডিতপাবনবাবু!

ওরে দুরন্ত বাবা, তাকে বোধ হয় আপনারা চেনেন না। তিনি সম্প্রতি কিনতে গেছেন, কিস্তানী তিনি। আমি যে বলেছি পণ্ডি, সেইখানেই তিনি অধ্যাপনা করতেন অনেক বিছরিন ধরে। বিহার-বিলাসে তিনি। ইলেকট্রনিক্স নিয়ে তাঁর গবেষণার বিষয়ে খুব নাম হয়েছে। তাঁর পণ্ডিতপাবন খাঁয়ের নাম বিদেশে খুব পরিচিত।

আমি তখনকে একেবারে থমে গিয়েছি। কিন্তু দুরন্তের ভয় করতেই হবে যে ওঁর নাম শুনেছি বটে, তা আগেই হবে। তবে এখনকে নিশ্চয় আরও পরিচয় হবে।

ধরিত্রীও সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হাঁ হাঁ, এখন বিয়ে এক ভদ্রলোককে যেতে দেখেছি বটে। তিনিই তাহলে তাঁর পণ্ডিতপাবন খাঁ। এই সময়োপযোগী ছলনাটা আমার বেশ ভালই লাগল।

প্রিয়গোপাল ভাঙা গলায় আমাকে বললেন, তোকটা সবই বলেছিল, কিন্তু আমরা আগেই অস্ত্র হকন করে নিয়ে ঠকেছি। আমাকে চড় মারতে তোকটা বেঁচে গেল, শুধু ঐ কারণে। রক্তটা ঠিক করে বন্ধার জেরেছিল বড় দুষ্ট তোকটা। ভবিষ্যতে দেখে নেব

পরিস্থিতি সকলেই সহজ। অন্ধ কিছু লোক এসে জুটেছে। আর ছেড়ে অনেকে অন্ধকারে পারে নি। নেটে একশ'র বেশি নয়। আশেপাশের সাত-আটখানা গ্রাম থেকে নাকি এই কজন আসতে পেরেছে।

সবার শেষে বক্তারদের অনেকেই বলি না এক ঘাঁদ না। এরেও কাজ আছে, তাড়াতাড়ি ফিরে যাবে। স্ত্রীলোক এবং শিশুও আছে অনেক

সভার কাজ শেষ হতে প্রায় ঘিনঘণ্টা লাগল। বক্তৃতা চলা অবস্থাতে নতুন নতুন লোক আরও আসতে লাগল।

প্রিয়গোপাল দুর্নীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিলেন খুব হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা। বর্তমানে যারা কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে গরিবের লোককে মারছে এবং কৃষকদের ঠকিয়ে ধান লুটে করছে তাদের বিরুদ্ধে অগ্নিগর্ভী ভাষায় প্রায় একঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। শ্রোতারা হর্ষ ধ্বনি করতে লাগল। আমিও মনে মনে।

ধরিত্রীও তাঁর বক্তৃতায় স্বীকার করলেন, প্রিয়গোপালবাবুর নতুন বন্ধার বাঁধে আর সবাই আমরা নিজেদের ছোট মনে করছি—ইত্যাদি।

তিনি গ্রামের মেয়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিষয়ে সুন্দর বলেন। মেয়েরা স্বাস্থ্য বিষয়ে তাদের অজ্ঞতার জন্য লজ্জিত হয়। তারা বুঝতে পারল, তাদের প্রত্যেকের প্রাত্যহিক কয়েক ঘন্টা অতিরিক্ত স্বাস্থ্যকর কাজের ব্যবস্থার উপরই গ্রামের উন্নতি নির্ভর করে। ব্যাপারটা খুব সহজ বলে মনে হয়েছিল। কি খুশি যে হয়েছিল ওরা এসে শুনে।

অনিতা মেয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিল। দেখতে দেখতে চারি পাশে প্রায় পঞ্চাশ জন মেয়ে জড়ো হয়েছে। শিশু স্বাস্থ্য শুধু নয়, প্রতি অষ্ট-প্রহরের গ্রামে একটি করে সিনেমা থাকা দরকার। মদের বিক্রির লাভের অতিরিক্ত অর্থাৎ যাতে প্রতি গ্রামে ছেলেমেয়েরা পড়ে উঠতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার।

গ্রামের কয়েকটিতে দু-একটি ছেলেমেয়ে বক্তৃতা দিতে পেরেছিল, তারা এ বক্তৃতা শুনে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল। এ ভাবে শেষ পর্যন্ত লোধাশুলি গ্রাম ছাড়াও প্রতি শহরে নিয়মে কয়েকটি ছোট পুতুর পরিষ্কার করা হয়নি, এবং এতে এত পর বক্তৃতা করেই এরা খুশি। অবশ্য সংবাদপত্র আমাদের সেই রাত্রের সভা-সমিতির যেসেটি আমাদের সবার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

সংবাদে বলেন ডক্টর পতিতপাবন খাঁ। বিদেশে থাকতেন, দেশ সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। তিনি বলতে লাগলেন, যাতে লোকের ঘরোয়া বক্তৃতায় গ্রামের উন্নতি হবে না। শুধু তাই নয়, কোনো বক্তৃতাতেই গ্রামের উন্নতি হবে না, আমার বক্তৃতাতেও না। আমি বিজ্ঞানের ছেলে,- আমি হাতে-কলমে কাজ করায় বিশ্বাসী। আমি গ্রামে এসেছি একটি প্রস্তাব নিয়ে। আমি কিছুদিন গ্রামে আপনাদের মধ্যে বাস করতে চাই। আমি গ্রামের উন্নতির জন্য নিজে পরিশ্রম করব। আপনারা আমার সাহায্য করবেন, আমার সঙ্গে কাজ করবেন। আমি—

আর বলা হল না। সবাই কলরব করতে লাগল। জমে তুমুল হট্টগোল। গ্রামের এক বোকা জাতীয় লোক বলল, আপনি এ সব কি বলছেন পাগলের মতন! আগে যাঁরা বললেন, কি সুন্দর তাঁদের কথা। আপনি অন্যায় করে তাঁদের নিন্দা করলেন।

পতিতপাবন বললেন, ঐঁদের কথার মধ্যে কাজের কথা কিছুই নেই।

কাজের কথা যে শুনতে চায় তাকে

আমাদের। ঐঁদের নিন্দা করার আমরা অধিকারী নই। আমরা নতুন নতুন সভায় গেলে কেহ এসে এইরকম ভাল ভাল কথা বলেন, আমরা আশায় পাই শুনে। আমাদের এইরকমই অভ্যাস। আমাদের কাজের মধ্যে অনেকে এসে হাত লাগাক এ আমরা চাইব না।

তাঁহার হট্টগোল আরম্ভ হয়ে গেল। যে ছেলেটি ডক্টর খাঁকে নিয়ে এসেছিল সে তো বিষম লজ্জা পেয়ে গেল। সে এখন তাঁকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারলে বাঁচে, অবস্থা এমনি গুরুতর হয়ে উঠল।

আমি ভাবলাম, যা হবে তা আগেই জানি। নতুন কথা কেউ বললেই এরা তাকে লক্ষের করবে। তা ছাড়া যাঁরা ছেলে এসে কোনো বক্তৃতা না দিয়ে কেউ চুপচাপ এদের সঙ্গে মিশে প্রথমে বিশ্বাস জন্মিয়ে, পরে কাজ করতে আরম্ভ করে তবেই সে সফল হতে পারবে।

ভেবে দেখি, প্রিয়গোপাল এবং ধরিত্রী এই দুইজনের মধ্যে আগেই এখান থেকে সরে গেছেন। এবং আমাকে না জানিয়ে।

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। ধরিত্রীর সঙ্গে প্রামোন্নয়ন বিষয়ে আমার অনেক আলোচনা ছিল। কিন্তু তাঁদের খুঁজে পাওয়া যেন না আপাতত।

অনেক পরে যেন শৈশবে এসে তাঁদের দেখা পেলাম। পতিতপাবন, আমি, প্রিয়গোপাল ও ধরিত্রী একই পাড়িতে ফিরে চলেছি শহরে একই পাড়িতে, কিন্তু একই শ্রেণীতে নয়। প্রিয়গোপাল ও ধরিত্রী প্রথম শ্রেণীতে চলেছেন।

তারপর কিছুদিন আর ওঁদের কোনো খবর পাই নি। পরে শুনেছিলাম প্রিয়গোপাল কুত্রিম দুধের কই বের করে তাঁর উদ্ভাবনীশক্তির পথে এক অকল্পনীয় সাফল্যের দেখেন শুনে ধরিত্রী বন্ধুদের তাঁকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করে তাঁর চরিত্র সংশোধন করবেন বলে উঠেপড়ে লেগেছেন। এবং প্রয়োজন হলে প্রিয়গোপালকে বিয়ে করতেও রাজি আছেন, এইরকম গুজব শোনা গেল।

তারপরের খবর ওঁদের বিয়ে হয়ে গেছে।

আরও পরের খবর, প্রিয়গোপালের চরিত্র সংশোধন হয় নি, কিন্তু নতুন পরিকল্পনায় এদের কোটি টাকা হয়েছে। ওঁরা সুখে আছেন।

ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি

হিন্দুধর্মের লোকরক্ষোভিঃ। হিন্দুধর্মের এই অতীব দুর্দিনে—স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর বিরাট অভাব দূর করিবার জন্য—গার্হ, শ্রৌত, স্মার্ত ত্রিবেদ—দর্শ উপনিষদ—অষ্টাদশ পুরাণ—সর্বতন্ত্র হইতে সঙ্কলিত—শাক্ত বৈষ্ণব বৈষ্ণব সৌর গাণপত্যের নিত্যনৈমিত্তিক মহাগ্রন্থ।

স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর গৃহে গৃহে লৌকিক, পারত্রিক অশেষ বহুল বিধানের নিধান, বেদজ্ঞ স্মার্তিক—তান্ত্রিক সাধক—সুবিস্তীর্ণ-বিশালে যাবতীয় ক্রিয়ানিষ্ঠ মহাপণ্ডিতের পঞ্চদশবর্ষব্যাপী ঐকান্তিক সাধনার ফলশ্রুতি, সুসংস্কৃত, সুসম্পাদিত।

১ম খণ্ড—নব প্রকাশিত মূল্য ৮৲।

২য় খণ্ড—সাড়ে প্রকরণে ১০০ পৃষ্ঠায়—সর্ববিধ সংস্কার, গ্রাহ্য তীর্থকৃত্য, প্রতিষ্ঠা, নৈমিত্তিক ক্রিয়া। মূল্য—৫৲।

পূর্বাভাস : [এই চলচ্চিত্র কাহিনী নয়, গল্প নয়, অনেক—অনেকদিন আগের একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার বিবরণ। সভ্য মানুষের এই পৃথিবী থেকে অনেক দূরে গহন অরণ্যে আছে একটি পার্বত্য উপত্যকা। এই ঘটনার পটভূমি। সুদূর অতীতে সেখানে আদিমকের মত নেটিভ বাসিন্দে

বিশ্বের মানুষ আবার একদিন এসেছিল মানুষের কোন এক অজানা দূরে আদিমের হাতছানি শুনে কিছুক্ষণ এই চলচ্চিত্র আর আলোক সম্পাতের জীবন্ত দৃশ্য সহজ, অনাবিল আনন্দে উপভোগ করবার জন্যে। মেডাগাস্কার বাদে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি দ্বীপের হাত ধরে নতুন

পাবেন কোনদিন যে
কেউ কেউ না পাবে
পরস্পরে
মনোবিনিময়ে
মানুষের ঘরে
ফিরে আসতে না।
এই আশ্বাসের আশে আবার আসবেন

সেই সময়—সুষ্ঠু কারণে
যোগাযোগ একটি শিল্পমাধ্যম এর মা

সোনার হরিণ থারুনী

বিখ্যাত একটি মামলার কাহিনী

সুজাতি সমাজদার

এই পথই সোজা পথ।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তারপরে বাঁশি বাঁশি তার ভাবে। তারই আদেশে পথ চলছে সে। আর এই রাস্তার প্রতিটি পাথর পরিচিত। ওই যে সামনে পলাশগাছের পাহাড়টা বিশাল কোন হাতিকে মত দাঁড়িয়ে রয়েছে পথ আগলে। ওই পাহাড়ের কাছেই বাঁক নিতে হবে। তারপরে—

আবার চড়াই-উতরাইয়ের পথ। দুদিকে আদিমজিঙ্গলের মধ্যে সে বাগান। রাত্রির অন্ধকারে কালো সমুদ্রের মত মনে হচ্ছে। বাগানে ঢুকে হলেই গ্রাম পাওয়া যাবে। তার আগে আরও আছে।

একটু বেড়েই একটা চালাঘরের আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে থামল। এসে পড়েছে গন্তব্যস্থানে। ওই সেই গ্রাম যেখানে একদিন একজোড়া কালো ভাসর চোখের সঙ্গে তার শুভদৃষ্টি হয়েছিল। পুরানো দিনের নানা টুকরো টুকরো স্মৃতি এক একটা দুঁচের মত তাকে বিঁধতে লাগল।

—কে রে কেউ আছিস?

কেউ কোন সাড়া দিল না।

অন্ধকারে ছোট চালাঘরটাকে খাড়া তুলে বসে থাকা কোন শিকারী জন্তুর মত মনে হচ্ছে। আবার সে আকুল হয়ে বলল, সাড়া দিচ্ছিস না কেন—কেউ নেই নাকি?

এবার দরজা খোলার শব্দ হলো। জরাজীর্ণ একটি বৃদ্ধ বেরিয়ে এল। ছাব্বিশেনের স্তিমিত আলোয় তার কোঁচকানো চোখে ভয়ের ছায়া দেখা গেল।

ধাবলী আছে?

—ধাবলী তো আসে নি এখানে। সে তো কাঠগাঁওতেই আছে।

আগন্তুক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দাঁতে দাঁত চেপে কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। যেমন এসেছিল তেমনি ঘন অন্ধকারে হারার মত মিলিয়ে গেল সে।

আবার পথ। চালু হয়ে নেমে গেছে সংকীর্ণ পথ। দুপাশে নিবিড় শালবন। শালবনের ভেতরে যেন জমাট হয়ে রয়েছে ভেতপুরীর অন্ধকার। অন্য কোন দিন হলে তার গা শিরশির করতো। ভূটান আর পশ্চিম বাংলার সীমান্তে এই শালবনের জঙ্গল ছিল বাঘের আবাসভূমি—তা সে জানে। জানে, ওই বনস্থলীর ভেতরে শ্বাপদ প্রতীক্ষা করছে অসতর্ক শিকারের আশায়; ঘাসের ভেতরে জ্বল জ্বল করছে ক্ষুধার্ত বাঘের চোখ। তার হাতে কোন অস্ত্র নেই; একটি লাঠি পর্যন্ত নেই। আর—

আর তার চেতনার ভেতরে ভয়ের অনুভূতির বদলে আছে একটা তীব্র উত্তেজনা ভরা। কি হলো তার—কি হতে পারে? অভিমানে তারী হয়ে উঠল তার বুকটা। সাহস পদক্ষেপে সে পথ অতিক্রম করতে লাগল।

কালো অন্ধকারের সমুদ্রে একটা আলোর বুদ্বুদ দেখা গেল। রামবাহাদুরের দোকানে এখনও আলো জ্বলছে! এই রামপাসি গ্রামে তার শিসীমার বাড়ি। এখানেও আসতে পারে। রামবাহাদুরের দোকানের সামনে কামারশালার পাশ কাটিয়ে বাজারের ভেতরে পড়ল। বাজারের প্রতিটি দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। তাকে দেখে পোষ-ওঠা কয়েকটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। চারিদিকে মৃত্যুর মত গাঢ় নিস্তব্ধতার ভেতরে এতক্ষণে জীবনের চিহ্ন পাওয়া গেল। বাজারের পাশেই পুলিশ আউটপোস্টের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো। এখানে একবার পুলিশের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখবে নাকি?

না। ওরা উল্টে জেরা সুরু করবে। জেরার চোটে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে দেবে। তাদের কাজ কিছুই হবে না। সেখানে যাব না। যত জরুরীই যেতে পারে—সেবে অন্ধকারে সে নিজে খোঁজ করে দেখবে।

—ঘট-ঘট-ঘট—

—কে?

—দরজাটা খোলো সহদীপিসী—

দরজা খুলল পিসীমা নিজেই। এত রাত্রে তাকে দেখে সে অবাক।

—তোমার কাছে ধাবলী এসেছে—ধাবলী?

—সে তো সেই চৈত-সংক্রান্তির দিনে এসেছিল। তুমি সঙ্গে ছিলে।

—আরে সে আমি জানি। আজকালের ভেতরে এসেছে?

—না।

—না? হতাশ হয়ে বসে পড়ল সে।

রাত্রার নাম্বল সে। চীৎকার করে ডাকল বুড়ি, আ রে শোন—শোন চলে গেলে। সেঁ সেঁ করা হাওয়ার বুকার গলার স্বর ডুবে গেল। আবার প্রগাঢ় নিস্তব্ধতায় সুপ্ত সেই জনপদ ঘুমঘুম করতে লাগল।

এবার সে চৌরাস্তার দাঁড়িয়ে ভাবল, এবার কোনদিকে যাবে?

কাঠগাঁওতে নেই, পলাশগাঁওতে আসে নি, আসে নি রামপাসিতেও, তাহলে গেল কোথায়? অদ্ভুত একটা অসহায় ভাবে ভেঙে পড়ল তার সারা শরীর। তার রোমকূপের মধ্যে মধ্যে কে যেন আগুন ছিটিয়ে দিয়েছে। তীব্র আর অসহ্য কোন যন্ত্রণায় তার চোখে জল এসে পড়ল।

এই রামপাসির চৌরাস্তা থেকে তার একবার বাসে উঠে জলপাইগুড়ি গিয়েছিল। ধরবার নতুন জন্যে আহ্লাদের মত কলকল করে কত কথাই না বলেছিল ধাবলী। সেদিনের সেই হাস্যপ্রদীপ্ত মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই নিশিরাতে অভিমান এবং স্নেহোন্মাদ মত রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল।

হাওয়া এল।

হুহু করে নির্জন বনস্থলীর ওপরে যেন একটা আর্তনাদ ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

আবার সে চলতে সুরু করল। যা ভেবেছে দীর্ঘ ভরের বছর, তাই ঠিক মনে হচ্ছে। তাহলে চাঙ্গমারির সেই চৌকিদার সরল লিং। যে কথাটা সে পাড়ার লোকের চাপা হাসির আওয়াজে শুনতে পেয়েছে, যে সন্দেহটা তার চেতনাকে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে, শেষ পর্যন্ত—হঠাৎ বুকের ভেতরটা চিনচিন করে উঠল। আর সন্দেহ—সন্দেহ একটা আক্রোশে মাথার ভেতরে আগুন জ্বলতে লাগল। সে জোর পায়ে চাঙ্গমারির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। চৌকিদার হয়েছে বলে কি একবারে মাথা কিনে নিয়েছে। সে কি ভেবেছে—গরীব বলে তাদের ঘরের মেয়ে-বৌ নিয়ে যা খুশি-তাই করবে।

পাশাপাশি গ্রাম। আধঘন্টার ভেতরেই পৌঁছে গেল। সে দরজার কাছে গিয়ে একটা লাথি মারল। যেন একটা বন্য উন্মাদ। দরজাটা বুঝি ভেঙে ফেলবে। কিন্তু—

ঘুমটা আর ভুলল না। জনমানবহীন অন্ধকার পুরী। যেন একটা পোড়োবাড়ির মত অন্ধকারে জমঘুম হয়ে মুখ গুঁজে আছে। পালিয়েছে—পালিয়েছে—নিশ্চয়ই পালিয়েছে। একজনের সুখের সংসারে অভিশাপের বিষ ঢেলে শয়তান হয়তো গা ঢাকা দিয়েছে। কিন্তু এখানে—এই গ্রামের কারো না কারো জানা দরকার যে, সে এসেছিল।

বাজারের মোড়েই চালের বিরাট গোডাউন। সেখানে রাত জেগে কাজ করে মুসলীরা।

—শোন, শরল সিং কোথায় বলতে পারো?

—ও তো সকালে সদরে গেছে।

—ওর বৌ কোথায়?

ফুদীরের চোখেমুখে চাপা হাসির আভাস দেখতে পেল। হাসবেই তো—ওরা সব জানে যে। ঐ অঞ্চলের সবাই জানে সেই অঘটন-ঘটা কাহিনী। সে মাথা নীচু করে চলে এল। আর কিছু না বলাই ভাল। খবর সিংয়ের কানে ঠিক পৌঁছবে—সে এসেছিল।

আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।

আর কোন পথ নেই। অতএব—

সে থানায় এল। যেন কবর থেকে উঠে এসেছে। গর্তে ঢোকা দুটো চোখ। চোখের নীচে দাঁতে গভীর কালির রেখা। কত রাত—কত রাত যে ঘুমোয় নি। চুলগুলো উস্কো-খুস্কো। খাকি জামাটার এখানে-সেখানে কালা কালা হয়ে ছিঁড়ে গেছে। হাতে পায়ে ছড়ে যাওয়ার দাগ। যেন বন-জঙ্গল আর কাঁটাগাছ ভেঙে বাইসনের পর বাইসন অতিক্রম করে এসেছে।

—কি চাই তোমার?

—একটা এজাহার আছে—

—এজাহার?

।। দুই ।।

নগদ টাকা—১৮৲

নাকের নথ—১টা।

কানপাশা—২টা।

বাউটি—১টা।

হার—১টা।

তার গায়ে এই কটি গয়না ছিল। প্রত্যেকটি গয়নাই সোনার। তার সারা-জীবনের উপার্জনের টাকা থেকে অনেক কষ্টে তৈরি করেছিল। এই অলঙ্কারগুলো পরে সে ঘর ছেড়েছিল।

—কবে ছেড়েছিল। ডেট বলতে হবে?

—যেদিন বারে বলবো। আমি ছিলাম লক্ষ্মীপুর রিজার্ভ ফরেস্টে—সেখানে বড় সাহেবের চাপরাশী আমি।

—বেশ। চিন্তিত হলেন ও-সি।

—তোমার সঙ্গে কোন ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল?

কোন কথা বলল না সে। কান্নার আভাসে চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। কিন্তু মুখ দেখে মনে হলো—দুঃখে নয়, ক্রোধে কাঁপছে।

—কারো সঙ্গে ভাবসাব ছিলো?

সে চুপ করে রইল। অফিসার ইনচার্জ বিরক্ত হয়ে বললেন, ওহে তুমি যদি এমনই খোলাখুলিভাবে না বলো, তাহলে আমরা কি করে বিশ্বাস করবো?

—আপনাদের চৌকিদার দারোগাবাবু—আপনাদের চৌকিদার—বলতে বলতে তার চোখ দুটো জ্বলে গিয়ে চিকচিক করে উঠল।

সে বেশ শান্ত ছেলে, অনেক উদ্যত দীর্ঘশ্বাস চেপে মেপে মেপে রেখেছিল আর ঘুছিয়ে সব বলেছিল। বলা হয়ে গেলে তার স্টেটমেন্টের নীচে টিপসই করেছিল।

কয়েকদিন পর। চাঙমারি থানার ও-সি তাঁর ঘরে ডাকলেন সেকেণ্ড অফিসারকে।

—হরধনের এজাহারটা নিয়ে কিছু ভেবেছেন?

—জ্যা স্যার।

—কদুর কি করেছেন? এনকোয়ারী তো একটা করতেই হবে।

—অনেক সোলসাল আছে স্যার?

সেকেণ্ড অফিসার কোন কথা বললেন না, একটা রিপোর্ট এগিয়ে দিলেন। রিপোর্টে নিম্নলিখিত খবরগুলো লেখা ছিল।

'লক্ষ্মীপুর রিজার্ভ ফরেস্টের চাপরাশী হরধনের বিবাহিতা স্ত্রী শ্রীমতী বাসন্তী ঠিক কবে গৃহত্যাগ করেছিল, তা ঠিক কেউ বলতে পারে না।

কাঠগাঁও, সহেলগাঁও, বানবাসি আর চাঙমারি। এই চারটি গ্রামই একই বন্দোবস্তের ওপরে পাশাপাশি। কাঠগাঁওতে হরধনের বাড়ি। সে মোটামুটি অবস্থাপন্ন। কাঠগাঁওতে থাকে না। তার কর্মস্থলেই তাকে থাকতে হয়। বছরে দু-তিনবারের বেশি বাড়িতে আসতে পারে না। তরুণী স্ত্রী তার এক বুড়ো কাকার কাছে থাকতো। কাকার নাম জলবাহাদুর। জলবাহাদুরের মুদীর দোকান ছিল বাড়ির সামনে। সে জলপাই-গুড়িতে দোকানের মাল কিনতে গিয়েছিল। গত ১২ই মে সকালবেলা সে জলপাই-গুড়িতে রওনা হয়েছিল। পাশের বাড়ির এক বুড়িকে (গ্রাম সম্বন্ধে পিসীমা) তার দিয়েছিল বাসন্তীর। বুড়ি বলে, ১২ই মে'র দিনেও তাকে বিকেলবেলা পর্যন্ত দেখেছে। ১৩ই মে রাত্রে কি ১৪ই মে সকালবেলা ঠিক কখন থেকে তাকে আর দেখা যায় নি, তা গ্রামের কেউ বলতে পারে না। খোঁজখবর নিয়ে আরও বিস্তারিত সব তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

হরধন ঘুরে যাবে। বাসন্তী তরুণী। ঠিক এই কারণেই হয়তো বাসন্তীর, তার বাবার ওপরে গভীর বিতৃষ্ণা ছিল। আরো কারণ থাকতে পারে। দীর্ঘ আট বছরেও তাদের কোন সন্তান সম্ভতি হয় নি। তাই হরধনও বাড়িতে আসার সময় অনেক সাধ্যি আর সাধনা নিয়ে এলেও দেখা যেত কেন যেন বাসন্তীর মুখটা তার ভার। অথচ—

আর পাশের গ্রাম চাঙমারির সরল শিশুর সঙ্গে তার সোনার সংসার-ভালবাসার একটা সম্বন্ধ ছিল। চাঙমারির এক বুড়ি বেহুলী, বাসন্তী আর একজন অজ্ঞাতনামা পুরুষ মানুষকে মহাকাল পাহাড়ের নীচে জঙ্গলে দেখা গিয়েছিল।

থামলেন সেকেণ্ড অফিসার।

ও-সি বললেন, তদন্ত শুরু করে দিন। হয় তখনই যাবেন চাঙমারিতে। সঙ্গে নিন আমাদের লোক। তাকে থাকলে ডাকিয়ে নিয়ে এসে জেরা করবেন। তারপরে যাবেন বানবাসিতে—দিন—

আর দেরি হলো না। সেইদিনই রাত্রে এই খবরটা থানায় ঘটে গেল কাণ্ডটা। অনেক রাত্রে ও-সি ফোন পেলেন বোয়াচারে। সেকেণ্ড অফিসারও মাতালের ঘুমিয়ে উঠে পড়লেন। শুধু লাইসেন্স পাড়েজীর বুক-ঘুমের ভারী আওয়াজ বড় বেশি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল—ঘর-ঘর-ঘর—

—হু কাল্স দেয়ার? টেলিফোনের ট্রিংয়ারে চক্ষু মিল পাড়েজী।

—বাধা প্রাণে মেরে না—মেরে না। আমি চাঙমারির ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ভোরা থেকে বললো। থানার লেটারম্যাকের আলোয় দেখা গেল ভোরার গায়ে ঘাম চিক চিক করছে।

—ঐ সিংয়ের বড়বাবুকে ডাক দাও—বলো প্রেসিডেন্ট সাহেব নিজে এসেছেন—

পাড়েজী ফোনটা পাঠালো। বড়বাবু চোখ কচলাতে কচলাতে ছুটে এলেন।

—কি হয়েছে—কি ব্যাপার? আপনি নিজে এসেছেন!

—জ্যা বড়বাবু। আসতে হলো নিজেকেই। কুড়িবছর ধরে এই ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টগিরি করছি। কোনদিন আমার এলাকার ভেতরে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে নি—

।। তিন ।।

জায়গাটা বড় মনোরম।

দুদিকে দুটো পাহাড়। মহাকাল আর কাঠগাঁও। বন্ধুর পাথরে ভরাট পার্বত্য-ভূমিতেও বিধাতার অকৃপণ আশীর্বাদের মত সবুজ বনরেখার আচ্ছাদন আছে। দূর থেকে

এইসব পাহাড়ের মধ্যে কয়েকজন এক একটা ছবি বসে আঁকছে।

কাঠগোদাও পাহাড়ের ওপরে বিশ্রী কিসের আওয়াজ হচ্ছে সকলের। শুধু সকলের নয়, উপরেও। আকাশের অন্তরঙ্গ তার অকৃত্রিমতে নিজে নাচা দুলছে। কাঠগোদা, চাংড়াবাড়ি আরও আশপাশের গ্রাম থেকে গরুর গাড়ি বোঝাই আসছে। ভোর ছটা থেকে দুর্বোধ্য শব্দ এখানে সেখানে আনাগোনা।

চারদিকে ঠুকরে যত শান্ত স্তব্ধতা। একমাত্র এই ঘন্টাদুই মানুষের কোলাহলে মুখর। চাংড়াবাড়ি থানার কনস্টেবল অবাক হয়ে ভাবেন, ঠিক কার এই জায়গাটাতেই এত বড় বাড়ী তোলা হচ্ছে হঠাৎ করে।

পুলিশের গাড়ী এগিয়ে যেতে একটা জোরের 'ব্রেক' সঙ্গে সঙ্গে তীব্র একটা দুর্গন্ধ ধাক্কায় অনেক দূর পেছিয়ে আসতে হলো।

—ব্যাটস—ভয়ানক।

—ওসব মন্তব্য পরে করবেন, আগে ডেডবডিটা থানায় পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। পোস্টমর্টেমে পাঠাতে হবে—

মুখটা চেনা যায় না। বহু জায়গায় মাংস খুবলে খুবলে খেয়ে গিয়েছে। কোন কোন জায়গায় হাড় বেরিয়ে গেছে। পচা দুর্গন্ধে নাকটাকের বন্ধ হয়ে আসে। পচা দুর্গন্ধে নাকটাকের বন্ধ হয়ে আসে।

—এই যে স্যার, এই পুঁটলিটা লাশের হাত-কয়েক দূরে পড়েছিল। প্রেসিডেন্ট সোসাইটির সাব কমিটির সেক্রেটারি বললেন, কাল বিকেলে একটা লোক দৌড়ে এসে আমাকে খবর দিল, জঙ্গলে লাশ পড়ে আছে—

—কিন্তু কাল বিকেলের খুন বলে তো মনে হয় না—

—ওকে করে তোদের ভেতরে ঢোকানো ছিল যে, বুঝতে পারার উপায় নেই বাইরে থেকে। লোকটার ছাগল হারিয়ে গিয়েছিল। জনবাবাড়ে লাঠির বাড়ি মেরে মেরে খুঁজছিল ছাগল। এখানে আসতেই এই লাশ চোখে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে আসে। গ্রামের লোকজনও এসে যায়।

—লাশটাকে কেউ সনাক্ত করেছে?

—হ্যাঁ স্যার।

—ওকে ঐ গ্রামে খুব ভাল করে চেনে। ও হলো লক্ষ্মীপুর রিজার্ভ ফরেস্টের অফিসারের চাপরাশী হরকান্তের স্ত্রী বাহাদুরী।

—হরকান্তকে খবর দিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ। সে নেই বাড়িতে। তার ঘরে তালা ঝুলছে।

—কেন আসতো এই গ্রামে?

হঠাৎ চারা পড়ল সোসাইটির মুখে। মাথা চুলকোতে লাগলেন। অস্ফুটস্বরে বিড় বিড় করে বললেন, থাক ছেড়ে দিয়ে বাদলে যা হয় করে—

খবর গেল বাহাদুরে। গেল জেলার বিভিন্ন দিকে দিকে। গেল দূর-দূরান্তরে। কাঠগোদা, পহেলগাঁও, মানবাসি আর চাংড়াবাড়ি—এই চার গ্রামের লোক তিনদিনের ভেতরে একটি রাতেও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারল না। কার কখন ভাব আসবে থানা থেকে কে জানে। চাংড়াবাড়ি থানার লকআপ ভর্তি হয়ে গেল। আলিপুরদুয়ার জেলে আটক রাখা হল বিচারাধীন বন্দীদের বেশ কয়েকটি। ও হরকান্তের সম্পর্কিত প্রায় সব লোকজনকে।

পুলিশ কেস দায়ের করেছিল। বিখ্যাত সেই খাসকলী হত্যার মামলা। আলিপুরদুয়ার কোর্টের ইতিহাসে এত বড় আর এত জটিল ও বিস্ময়কর কেস আর হয় নি।

জলপাইগুড়ি থেকে বিখ্যাত পাবলিক প্রসিকিউটার মোহন চ্যাটার্জী সরকার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন, আর আসামীর পক্ষে ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত ডিফেন্স এটর্নি অরিন্দম চ্যাটার্জী।

রিজার্ভ ফরেস্টের বেঞ্জ অফিসারের খাস চাপরাশী হরকান্ত। খুব বিশ্বস্ত আর অসাধারণ প্রভুভক্ত। পুলিশের হাত থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন কয়েক অফিসার। তার ফিল্ড আর্মীর এ্যাডভোকেট মিঃ চ্যাটার্জী। তিনি আসামীর পক্ষে জেরা করতে কলকাতা থেকে আসছেন জেনে লোক ভেঙে পড়েছিল আদালতে।

কিন্তু জনসাধারণ বিস্মিত ও মর্মাহত হয়েছিল আসামীর কাঠগড়ায় শমন সিং-এর বদলে হরকান্তকে দেখে। কেউ কেউ মন্তব্যও করেছিল, চৌকিদার তো নিজেদের লোক। তাই তাকে বাঁচাতে হবে বলে হরকান্তের ওপরে আক্রোশ মেটাচ্ছে। জোরী মক্কার ওপরে দাঁড়ায় না। কিন্তু—

পুলিশ মিছে কাজ করে নি। হরকান্তের বিরুদ্ধে পুলিশের হাতে প্রচুর প্রমাণ ছিল। ঈর্ষার জ্বালায় উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল সে। উদ্যুক্ত তোষালী নিয়ে অন্ধকার রাতে একেবারে বন্য উন্মাদের মত পাহাড়ে পাহাড়ে—

থাক। বিচারের বর্ণনার সময় পাঠকরা হরকান্তের কথা জানতে পারবেন। কিন্তু এখানে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা উচিত বলে মনে করছি। দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলেছিল। দু'পক্ষেই বহু সাক্ষী। প্রতিটি সাক্ষীকে পরীক্ষা করা, তাদের জেরা করার, বিরক্তি খুব দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর মনে হতে পারে পাঠকের। তাই শুধু ভেতের পরিণতি বুঝতে পারার পক্ষে যেটুকু প্রয়োজন বিচারের শুধু সেইটুকু বলবো।

।। চার ।।

—তুমি লক্ষ্মীপুর রিজার্ভ ফরেস্টের রেঞ্জ অফিসারের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছিলে কবে?

—১৪ই মে থেকে ২২শে মে পর্যন্ত স্যার।

—হুঁ। ঠিক আছে। মহকুমা হাকিম কয়েকমুহূর্ত কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন। বললেন ধীরে ধীরে, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, তুমি হরকান্ত সিং ১৪ই মে তারিখে তোমার বাড়ি কাঠগোদাতে এসে যখন দেখেছ তোমার স্ত্রী বাড়িতে নেই তখনি তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছ। তোমার মনের ভেতরে তখনি খুনের একটা প্রবৃত্তি জেগেছিল। তুমি পাগলের মত অন্ধকার রাতে গ্রামের পর গ্রামে ছুটে গিয়েছিলে। তুমি গিয়েছিলে মানবাসিতে, গিয়েছিলে পহেলগাঁও আর শেষরাতে গিয়েছিলে চাংড়াবাড়িতে শমন সিং-এর বাড়ি।

তোমার চরম বিশ্বাস ছিল, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে শমন সিং-এর অবৈধ সম্বন্ধ আছে। এই জন্যই তুমি প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠেছিলে। তাই সরকার পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, তুমি চাংড়াবাড়ির কাছে সেই দুই পাহাড়ের (কাঠগোদা আর মহাকাল) জঙ্গলে তোমার স্ত্রীকে দেখতে পেয়েছিলে। তুমি সেখানেই তাকে খুন করেছো।

থামলেন এস-ডি-ও। হরকান্তের চোখে অপার বিস্ময়। তার মনটা যেন কুয়াশার ধোঁয়ার পর্দা ছটফট করতে লাগল। আর নিদারুণ যন্ত্রণায় মুখখানা এঁকেবেঁকে ভয়ংকর কুৎসিত হয়ে উঠল। হাত দুটো যেন শিথিল হয়ে চীৎকার করে উঠল, হাকিমবাবু, আমি আমার বৌকে খুন করেছি—আমি—

—সেপাই, উসকো গারদমে লে যাও—

তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল হরকান্ত। আর্তনাদটা যেন পাঁজর কাঁপিয়ে ভেতর থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে এল। হাকিমবাবুর

মুহূর্তে তাকালেন হতভাগ্যের মুখের দিকে। গার্ডের জন্য তাঁর চোখেও ঘাসার ছায়া ছুটে উঠল। মনে হল, সত্যিই সবাই খুন করে কি! কে জানে, সভ্যমানুষের পৃথিবী থেকে অনেক দূরে সেই বন অথবা বিকীর্ণ মরুপ্রান্তর পাহাড়ের মানুষেরা দুর্বাসিনী বারুণীর জীবনের ওপরে কার আক্রোশের ছুরি হিংস্র হিসে উঠেছিল।

॥ পাঁচ ॥

অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে বিছানার মিশে যাওয়ার মতো হয়েছিল। এই দুনিয়ায় ঈশ্বর নেই, সত্য নেই—ন্যায়-ধর্ম কি উচ্ছন্নে যায়নি? হঠাৎ মনে হল চারিদিকে যেন অন্ধকার নেমেছে। আর অন্ধকার মহাসমুদ্রে সে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। সে থরথরিয়ে খুন করেছে? যেদিন লক্ষ্মীপুর বাগান থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছে, সেদিনও তার জন্য নতুন শাড়ি এনেছিল। এনেছিল সুগন্ধি পাউডার, সো আরও কত রকমের প্রসাধনদ্রব্য! তার চেতনার ভেতরে একটি মাত্র মুখের ছবিই জল জল করে—সে মুখখানি বারুণীর। আর সে হত্যা করেছে তার বুকের ভেতরে প্রাণের ধুকধুকির মতো বারুণীকে! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—সোহাইজি—

—ক্যায়, চিল্লাচ্ছিস কেন?

—বড় সেখাবো—তুমি দিয়ে যেবে!

হরবক্সের মনের ঐকান্তিক আগ্রহের জন্যই হয়তো দূর এক অরণ্যময় পর্বতের আড়ালে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেল। ঠিক যেদিন সরবাংগেঞ্জে সাঙ্গীরের দোকানী মুক্ত হবে, তার আগের দিন দেবলীর বাড়ির সামনে এক আগন্তুক এসে দাঁড়ালো।

—বুড়ি বাড়িতে আছো?

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। চারদিকে শালগাছের নিবিড় জঙ্গল। সেই জঙ্গলের ভেতরে একটি কুঁড়েঘর। সেই কুঁড়েঘরটাও ফেলে পড়েছে। বারান্দার দড়ির শিকের তিন-চারটি হাঁড়ি ঝুলছে। চারিদিকে নাম-না-জানা পাখী ডাকছে। থেকে থেকে এক-একটা হরুকা হাওয়ায় শালবনে ঝড়ের মতো আর্তনাদ উঠছে।

—দেবলী বুড়ি বাড়িতে আছো? এবার দু'পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করল।

ছোট দাওয়ার একপাশে বসে আছে বুড়ি। থুঁতনি যেমন দিয়ে বসে পাকাচুলের ভেতরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উকুন বাছছে। আর বিশ্বের যেন আক্রোশে দাঁতে দাঁত ঘষে কি বিড় বিড় করে বকছে।

—কি চাও তুমি?

—তুমি নাকি অনেক মন্ত্রের জানো?

—না—না বাবা, আমি কিছু জানি না—কিছু জানি না—ভয়ের ছায়া ছুটে উঠল তার মুখে।

লোকটা পকেট থেকে টাকা বের করল। অনেক টাকা—মেলার মোষা মোষা চোখ দুটো লোভের আগুনে ফসফসে ঘাসের মতো জ্বলে উঠল। খাঁটি পাকা লোক এরা যে। মুখের দিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি যেন দেখল।

লোকটার গায়ের ভেতরে শিরশির করে উঠল। চোখ দুটোর রঙ পিঙ্গল। মোমেরটির মুক্তির মুখে ছুটিবারার আভাস। একটু থেমে বলল, তা যত কিছু—তাও বাবা। তারপর তোমাকে বলবো বশীকরণের কত রা আমি জানি—

আগন্তুক পঞ্চাশটাকা—পাঁচখানা দশ-টাকার নোট ওঁজে ওঁজে তার হাতে দিল।

বুড়ি বলতে সুরু করল, আচ্ছা বাবা, তোমার কি রকমের আলা। স্ত্রী বশীকরণ না পুরুষ বশীকরণ?

—স্ত্রী বশীকরণ।

—শোন, লজ্জালুতা, অপামার্গের জটা, বহেড়া, অপরাজিতা ও চণ্ডালীলতা এই সব একত্রে গরুর দুধের সঙ্গে মিশিয়ে বাদাম মতো করতে হবে। পরে এর খানিকটা অংশ পদ্মফুলের বোঁটা পদ্মনালের সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে রাখতে হবে। তারপর একখণ্ড গাওয়া ঘি প্রস্তুত করে সেই ঘি দিয়ে পদ্মনালে বাঁধা সেই বস্তুটির সলতে জ্বালাতে হবে খুব সাবধানে। একবারের চেষ্টাতেই প্রদীপ জ্বালানো যায়।

বুড়ি থামল। অনেকক্ষণ একটানা কথা বলার ঝোঁকে হাঁফাতে লাগল। আবার বলল, শ্মশানের অঙ্গার ও মেয়ালের রক্ত একত্র করে যার মাথায় ফেলবে—

কিন্তু বুড়িমা, লজ্জালুতা অপামার্গের জটা কিম্বা মেয়ালের রক্ত পাবো কেমন করে। সবই যে কঠিন। আপনার একজন লোক ছিল—

দেবলীর মুখে দুশ্চিন্তার রেখা দেখা গেল। বলল, সেই লোকটা খুব শয়তান ছিল বাবা। আজেবাজে শিকড়ের কথা বলে লোক ফেরতো—

—বলো কি! লোকটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। বুড়ির বুদ্ধিহীন মুখের দিকে, আর একবার তার বাঁকানো কোলকুঁজো দ্বীভিগুলোর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালো।

—না—না মোন বাবা, ভয় পাচ্ছো! ভয়ের কিছু নেই। বুড়ি একটু নাচিয়ে বলল, লোকটা ছিল ভারি দুষ্টু। ওকে তাড়িয়ে দিয়েছি—

—কেন?

—না—না আমি যে বলতে পারবো না—পারবো না—হঠাৎ তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার করে উঠল দেবলী।

—তুমি চলে যাও! আমি এখুনি আসছি—ভয়ানক ভেবড়ে যাওয়া হয়ে গেল লোকটা। আর—

বুড়ি লজ্জাবনত শিরে দাঁড়িয়ে রইল উঠানে। একটার পর একটা। বেলা বাড়তে লাগল—বাড়তে লাগল রোদের তেজ। এতগুলো টাকা দিয়েছে, আর আসবে না? নিশ্চয়ই আসবে! কিন্তু—

আর এল না লোকটা।

ছয়

দেবলীর সন্দেহ, সেই দুষ্টু লোকটা, যেকোন অধিকারের হলদুয়ার বিলোটে থাকে বলা হয়েছিল অজ্ঞাতনাম পুরুষমানুষ,—সে সেই লোকটা? তিনজনার আরও মন হয়ে আরও কাছাকাছি আসে।

আসামী পক্ষের উকিল হয়তো পারছো না, একটা মেয়েছেলের হাতে একটা পৌরুষের চেহারা এত সহজে আসে—তাকে নিয়ে গিয়েছিল দেবলীবুড়ি আর সেই লোকটা। সবচেয়ে আগে তো সন্দেহ হওয়া উচিত ওদের ওপরে—

কয়েক অধিকার। আশ্চর্য, লোকটা কিন্তু চারদিকে নেই। পালিয়েছে। আমি খোঁজ নিয়েছিলাম।

অধিকার (ভয়ের গোরেন্দা)। আরে আমার তো মনে হয়, বেশি টাকা পেলে এই বুড়িই মানুষ খুন করতে পারে—

আসামীপক্ষের উকিল। আচ্ছা, বশীকরণ মন্ত্র দিতে গিয়ে কারও ক্ষতি করেছে বা ক্ষতির চেষ্টা করেছে এমন লোক তোমরা বের করতে পারছো না? চেষ্টা করো—চেষ্টা করো, যদি হরবক্সকে বাঁচাতে চাও—

কয়েক অধিকার ও তার স্ত্রীসুলভ মনের গোয়েন্দা চেষ্টা করেছিল আরাধিক। কিন্তু মানুষের প্রচেষ্টা, মানুষের সাধনা, মানুষের

ইচ্ছা আমার সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করে। আমার অধিক
সহায়ের সন্ধান তোমাদের
আমাদেরই মোকাবিলা করতে
হবে দেখে এসে, আমার কুটীরের দরজায় এক
ভিক্ষুক ভোরের সঙ্গে।

সাত

সওয়ালজবাব সাক্ষীদের শুনানী শুরু হলো।

সেপাইজন বলে। ১৪ই মে তারিখে দুপুরে আমি ও আর কয়েকজন সাহেবের হুকুমে ফরাসডাঙ্গার একজনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলাম আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম। এর বয়সের ন। যেন ন আমি জানতাম, বুড়ি কুড়ানোর জন্যে, তাকে অনেক মারধোর। আর হরেরহের মুখ স্বভাবচরিত্র ভাল নয়। হয়তো বন্দীকরণের মধ্য তাকেই ধরেছে

চাটার্জী। মাই লর্ড, আমি একজন সাক্ষীকে ক্রস করতে পারি?

হাকিম। ইয়েস।

মিঃ চ্যাটার্জী। ১৪ই মে তারিখে দুপুরে কয়েদখানায় ছিলেন মিঃ প্রেসিডেন্ট (হাকিমকে উদ্দেশ্য করে) মাই লর্ড, এই লোক কোন সাহেবের কাছে, চাকরীতে প্রেসিডেন্ট সাহেবের বেলাতীতে দুটি মোরগের চাইতেও আছে। সেই মোরগের মাংস কিনতে গিয়েছিলেন—(ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন।)

বেহুলা। ধারুলীর মধ্যে সিংহের গোপন ভাবনার ছিল। ধারুলী আমার কাছে বন্দীকরণের মন্ত্র চাইতে এসেছিল। আমি তাকে দিয়েছিলাম কণ্টকারীর মূল। বলেছিলাম কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর রাতে আমার সঙ্গে শ্মশানে যেতে। সেখানে মহানীল বৃক্ষের শিকড় নিয়ে তার সঙ্গে কণ্টকারীর মূল বেটে খেলে পরে সিংহ বন্দীভূত হবে।

মিঃ চ্যাটার্জী। কণ্টকারীর মূল যখন যেন তখন আপনার সঙ্গে একটা লোক ছিল। সে কোথায়?

বেহুলা। নেই গেছে। কুটীরে—

মিঃ চ্যাটার্জী। মাই লর্ড! এই কণ্টকারীর মূলের সঙ্গে বর্তমান সাক্ষী বিশ্বাস করবীকুলের বিচিও সংগ্রহ করেছিল। একথার সাথে আমি প্রবন্ধনাথ পালের বক্তব্যের সাদৃশ্য পাচ্ছি। তাদের পক্ষের কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা দুপুরের বিশ্রামের আগে ওকে কিছু প্রশ্ন করতে চাইছিলেন—সে আমি কিছু শুনি।

হাকিম। কোন—ই তেমোরো—

মিঃ চ্যাটার্জী। (জেরা করে) আপনি বন্দীকরণের মন্ত্র করে ধারুলী-হাটের সবের পদুইয়ের কিছুদিন টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন। যখন পদুই কলাচের জোরে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছিল—

হাকিম। প্রীজ দিস মিঃ চ্যাটার্জী—নেক্সট উইটনেস।

প্রবন্ধ সিং। মহারাজ ধর্মাবতার, আমার কপালে তিলক। নাম প্রবন্ধনাথ। কাঁঠালবাড়ী। আমি ব্রাহ্মণ। আমি যাহা বলিব তাহা সত্য বলিব। ধারুলীকে আমি ছোটকাল থেকে ভালো মত জেনে করি। হুজুরও একটা বুঝ। ও জোয়ান বৌকে ঘরে রেখে ওস্তাদ করে। তা ধারুলী আমার কাছে দু'বার এসেছিল—দু'বারই তাকে আমি ফুসলে করিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি—। আমার কাছে আসলে সেই লোকে খারাপ ভাবতো তবে।

হাকিম। ঠিক।

সেদিনের মত শুনানী বন্ধ থাকল। কিন্তু পরের তারিখে আর বিচার করতে হলো না। সেই লোকটা যার সঙ্গে অরবিন্দের দেখা হয়েছিল ভূটান-ভারতের সীমায়, সে দোষ স্বীকার করেছিল। বিস্ময়কর তার স্বীকারোক্তি এবং ভূটানের পুলিশের কাছে দোষ স্বীকার করতে তারা গ্রেপ্তার করে ধারুলী রেখে পালিয়েছিলেন।

সে ভূতকর্মের অনুশোচনায় প্রায় উন্মাদের মত হয়ে গিয়েছিল। সে সত্যিই বন্দীকরণ মন্ত্র জেনে লোভে পড়ে কাজ করেছিল। দু'দিন পরই কৃতে পারল, বুড়ি শুধু টাকাপয়সা আত্মসাৎ করে (যেখানে ধেঁকায় অন্য দেয়) ছেড়ে দেয়। সে বেহুলার আশ্রয় ছেড়ে আবার আগের মতো করছে এমন সময় সোনার হরিণের খোঁজে এল ধারুলী। ধারুলীর গহনা কাপড়-চোপড়ের পুঁটলীর ওপরে পড়ল বেহুলার লোভের দৃষ্টি। ধারুলী টাকা দিতে রাজী হলো। কিন্তু গহনা দেবে না, মুক্তিও ছাড়বে না। আমাকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে তাকে সাহায্য করতে বাধ্য করলো। বুড়ি কণ্টকারীর মূলের সঙ্গে করবীর বিচি, ধুতরা ফল আরও সব কিছু মিশে সরষে তৈরি করিয়ে খাইয়েছিল। আরও—আরও অনেক কথা বলেছিল। সে-সবের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

বিচারের রায় দেওয়ার আগে জজ বলেছিলেন, সরকার যদিও পরাজিত হলো, কিন্তু এ যে আনন্দের পরাজয়। অরবিন্দবাবু, মিঃ চ্যাটার্জী চেষ্টা না করলে হয়তো আরও কত নিরপরাধ হতভাগ্য বেহুলার শিকার হতো আর হরেরহের মতো লোকেরা ফাঁসীতে ঝুলতো···থাক—

বেহুলা নেই। তার ফাঁসী হয়েছিল। তার কুটীরখানিও নেই। কিন্তু—

আছে, মহাকাল আর কাঠগাঁও পাহাড়ের মাঝখানে সেই মনোরম কিন্তু অভিশপ্ত সেই জায়গাটা। এখানে এলেই স্মৃতির ভেতরে ভেসে উঠবে সকল, অবোধ এক পরাজয়ের বিষণ্ণ দুঃখ। মনে হবে, দুর্ভাগিনী স্বপ্নময়ী করতে এসে প্রাণ রেখে গিয়েছিল এইখানে।

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অবদান

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরেজী অনুবাদ

● আনন্দমঠ—স্বাধীনতার শক্তির সংগ্রামের পূর্ণাভাষ

আনন্দমঠ—'অধ্যাত্মতত্ত্ব' গ্রন্থের পূর্ণ-প্রকাশ।

● আনন্দমঠ—তাঁর রচিত ও তাঁর অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্ধশতাব্দীর সাধনে

ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক।

মূল্য—তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নাট্য-সমালোচনা ও আধুনিক রঙ্গমঞ্চ

অশোক সেন

শিশিরকুমার বলতেন, আমাদের দেশে প্রকৃত নাট্য সমালোচনা হয় না। তাঁর মতে, সমালোচক হতে গেলে নাটকের সঙ্গে নাড়ীর যোগ থাকতে হয়। প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে হয় নাটককে—তাছাড়া নিরিখ-ভাবে বিশ্লেষণ আর অভিনয় দেখতে হয়। দেশী এবং বিদেশী নাটক ভাল করে পড়া থাকা দরকার।

শিশিরোত্তর যুগের নট-প্রযোজকের মত দেখি, যা তাঁদের নাট্য-প্রযোজনা বা ব্যক্তিগত কিংবা যৌথভাবে অভিনয়, সঙ্গে সঙ্গে আমার বার বার শেক্সপীয়রের সেই বিখ্যাত লাইনগুলো মনে হয়—

'Dress in little brief authority.
Most ignorant of what he's most assured,
His glassy essence like an angry ape
Plays such fantastic tricks before high heaven
As make the angels weep.'

এদের পিঠ চাপড়ানোর মত কিছু বিবরু (আমাদের দেশীয় বান অঞ্চলের) ব্যক্তি আছেন। এইরকম একটি অধ্যাপক—ক্লাশের ছাত্রীদের রোমান্টিক চিঠিপত্রাদি লিখে যিনি একসময় প্রখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন—সভা-পরিষদে বক্তৃতা দিতে উঠে বলেন : আমরা ছায়ের লোককে চিনতে পারি না। আমি ইংরেজ-আমেরিকার রঙ্গমঞ্চের শ্রীযুক্তের মত অভিনেতা দেখি নি, ইত্যাদি।

এ নিয়ে আবার প্রথম প্রশ্ন—আপনি নিশ্চয় সারা পৃথিবীতে রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখেছেন। কিন্তু এই ধরনের অদ্ভুত বক্তব্য প্রচার করবার মত সমালোচকের দৃষ্টি কি আপনার আছে?

দ্বিতীয়ত, আরও বহু নাট্যরসিক ব্যক্তিও আপনার মত ইংরেজ-আমেরিকার রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখেছেন—শিশিরোত্তর যুগের রঙ্গাভিনয়কে ইংরেজ-আমেরিকার রঙ্গাভিনয়ের সঙ্গে তুলনা করবেন, এরূপ তাঁদের কাছে হাস্যকরই মনে হবে।

আর যাঁরা ওদেশের রঙ্গাভিনয় দেখেন নি, তাঁরাও তো ছবিতে ওদেশের রঙ্গাভিনেতাদের অভিনয়ের খানিকটা ঝলক পেয়েছেন। যেমন শিশুরাও দেখা গেছে ডুগলাস ফিয়ারবেঙ্কস, রিচার্ড সি আর্লে, রামোন্ট অক, উইলোল রীড, অলিভিয়াকে হ্যাভিলেণ্ড, রিচার্ড সি আর্ল-এ প্রিন্স, এবং সি সো আর্ল-এ, এদেরকে পিনিসকে ডিল অন দি হিলার কোয়াই-এ, পিটার উস্টিনভকে কোওভেডিস-এ, লোরানস, ও জুলিয়েট-এ, রিচার্ড বার্টনকে প্রিন্স অভ, প্রেমার্স-এ এড উইন বুথের ভূমিকায় এবং রোব চবিতে। নামার দুয়েকটি উদাহরণ দিলাম—আমাদের দর্শকরা অনেকেই ইংরেজ আমেরিকার অভিনেতাদের অভিনয় ছবিতে দেখেছেন। তাঁদেরই জিজ্ঞাসা করি—বর্তমান বাংলা রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের ঐ সব অভিনেতাদের সঙ্গে তুলনা করতে যাওয়াটা কি হাস্যকরই নয়? আমাদের অধ্যাপক ভদ্রলোকও কি এসব বোঝেন না? বেশ চালাকিই বোঝেন। তবে আজকাল সরকারের নানা সভায় স্থান পেতে হলে নিজেকে বিশেষ গুণীজন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। আর বর্তমানে আমাদের দেশে ভেজাল বাজারটাও সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে—সুতরাং, আমিও ভেজাল বক্তব্যবিশেষের পিঠ চাপড়িয়ে দিলাম, তাহাও আমাকে রাজখাতিরে সর্বত্র বক্তৃতা দিতে নিয়ে যাক—ব্যস্, সরকারের কোন না কোন সংস্থায় কায়েমী চাকরি হয়ে গেল বা বিদেশ সফর হয়ে বসে রইলাম। আর আমাকে পায় কে।

তখনকার দিনের অভিনেতারা, কিন্তু নিজেদের দোষ-ত্রুটি বা যেসব নিজে থেকে অন্য অভিনেতার শ্রেষ্ঠত্ব, এসব কথা বলতেন। শিশিরকুমার একবার নীলকণ্ঠে উত্তমকুমারের দেখেছেন—অভিনয় দেখে সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শিশিরবাবু বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করেন—কেমন লাগল। পাঁচকড়িবাবু উত্তর দেন—ভালই হয়েছে, তবে এ ভূমিকায় নূতনদী সাহেবের অভিনয় আরও ভাল হয়। শিশিরবাবু এতটুকু দমবার পাত্র নয় বলেন—আ রে কেরকথা আর বলাতে, সাহেবের রোলে কেউ কখনও অমন জুতে ছুঁড়তে পারে।

আমার আবার ঠিক মনে নেই ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে মিনার্ভার রঙ্গমঞ্চের অভিনয় শুরু হয়। দু-চার রাত্রি অভিনয়ের পর শিশিরবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন—কিন্তু তিনি বই বন্ধ করতে চান না। কিন্তু করণার প্রাণে কে—শিশিরচন্দ্রেরই পরামর্শে ২য়ই পিছে বসে অর্ধেন্দুশেখরকে—অর্ধেন্দুবাবু কিন্তু প্রথমটায় রাজী হন নি। বলেছিলেন—ওরেবাবা, সে পার্ট যে শিশির ভাদুড়ি দিয়ে গেছে! ও পার্ট আর কাউকে ছুঁতে হবে না।

শেষ পর্যন্ত সবার অনুরোধে তিনি রঙ্গলালের ভূমিকায় নেমেছিলেন এবং শোনা যায় শিশিরবাবুকে বাদ দিলে তাঁর মত রঙ্গলালের এপর্যন্ত কেউ করতে পারেন নি।

শিশিরকুমার তো সব সময়েই শিশিরচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি পূর্বসূরীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন।

ইন্দিরা দেবী তাঁর রবীন্দ্র স্মৃতি বইতে ঠাকুরবাড়ির অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'আমেই বলেছি আমাদের রঙ্গলক্ষ্য অনেকটা বিলিতী অনুকরণে ছোত। ' 2. 6. 2.—

হরিশচন্দ্র হালদার আমাদের দৃশ্যপটগুলি প্রায় নিখুঁত বিলিতী অনুকরণে আঁকতেন। বাস্তবের যথাসাধ্য অনুকরণ করাই ছিল তখনকার আদর্শ।...

পরবর্তীকালে আমাদের চোখের সামনেই

অবশ্য শিশিরকুমার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ঠা ও সততার সহিত এই নাটকের অভিনয়-শিক্ষের প্রতিটি অংশে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়াছিলেন। রবিবাবুর অনবদ্য সংগীতের মাধ্যমে নাটকের পরিবেশকে নূতন এক আবেদনে অনেকটা হাল্কা করিয়া দিয়াছিল।'

এখানে দেখুন শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর মন্তব্যের প্রতিটি বিষয় উল্লেখ করিতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি।

অবশ্য নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর অশ্রুমতী নাটকে একটি অদ্ভুত কাল্পনিক কাহিনী যুক্ত করিয়াছেন—যাহা প্রতাপের সঙ্গে অশ্রুমতীর মিলনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপের একটি অবান্তর এবং অসঙ্গত ব্যাপার কোনদিন দর্শক এবং সমালোচকদের সমর্থন পায় নি। তবে নিঃসন্দেহে অবশ্য আমরা আশা করিতে পারি যে, বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ নাটকের মধুরেণের পরিবর্তে থিয়েটারে প্রথম অভিনয়ের আমন্ত্রণী রজনীতে এই দোষত্রুটির কথা স্মরণ রাখিবেন।

● নাট্যকার মধুসূদন

মধুসূদনের মন নিশ্চয় করেন নি। একটি তথাকথিত ঐতিহাসিক সাহিত্যিক মেলোড্রামা উপন্যাসকে নাট্যাকারে রূপায়িত করে শিশিরকুমারের কাছে যান নাটকটির অভিনয়ের জন্য। শরৎচন্দ্র এবং শিশিরবাবুর এ নাট্যরূপ পড়ার পর হওয়াতে পরে শরৎচন্দ্র নিজে মেলোড্রামার ক্লাইম্যাক্স যেন জোড়ালো করে দিবে। বাংলার নাট্যরসিকদের কাছে মেলোড্রামার সম্বন্ধে কিছু বলবার দরকার হয় না। এদিকে ওই ঐতিহাসিক সাহিত্যিকটি শরৎচন্দ্র এবং শিশিরকুমারের প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে উঠেন। শিশিরকুমার আমেরিকা থেকে ফেরবার পর এই আধুনিক-যীশুকে যন্ত্র বিষোদ্গার করেছিলেন শরৎচন্দ্র এবং শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে। এদেরকে দেখাকে সমালোচনা বলে না—বলে দেশের নীচ মনোবৃত্তির পরিচয়।

বিদেশ-ফেরত ইংরাজ-পরিচালিত এবং সম্পাদিত ইংরাজী কাগজগুলিতেও বাংলা থিয়েটারের যথাযথ সমালোচনা প্রকাশিত হোত। ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ বলতে ঐ সব কাগজের সমালোচকরাও দ্বিধা করতেন না।

শেক্সপীয়রের চতুর্থ শতবার্ষিকীর সময় একটি ইংরাজী সৈনিকের কাগজী থেকে অবাক হয়ে গেলাম। অবশ্য বলবার কিছুই নেই—এদের এদেশের নাট্য-সমালোচক একজন বাঙালী ভদ্রলোক। লিটল থিয়েটারের শ্রীযুক্ত উৎপল দত্ত অতি সুন্দরভাবে ইংরাজীতে ওথেলো নাটকটি বক্তৃতা করলেন। যাঁরা লণ্ডনে ওথেলো প্রডাকশন্ দেখেছেন—এঁরা বহু দর্শকের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার আলোচনা হয়েছে। এঁরা প্রত্যেকেই অবাক হয়ে গেছেন উৎপল-বাবুর এই দায়সারাগোছের প্রডাকশনটি দেখে। অথচ ইংরাজী সৈনিকে ঐ ভদ্রলোকটি কোন দ্বিরুক্তি করলেন না নাটকটির। নাট্যরসের ইতিহাসে এরূপ একটি ঘটনাকে যে একটি বিরাট কাণ্ড এরূপে অভিহিত করতে পারে, এ আমার ধারণার অতীত ছিল।

তবে আজকের দিনের দেশী কাগজের নাট্য-সমালোচনা যে ধরণের হয়, তার দ্বারা কোনদিন রঙ্গমঞ্চের উন্নতি হতে পারে না। অভিনয় দেখতে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁরা নিজেরাই তো দেখছেন আজকাল পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে কি নিম্নশ্রেণীর সব নাটক (?) রাতের পর রাত অভিনয় হচ্ছে। অথচ এ বিষয়ে কোন সত্যিকার সমালোচনা দেখতে পান কাগজের স্তম্ভে? ভাল ভাল অভিনেতা এবং অভিনেত্রী—যেমন সৌরিন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মে, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে যে সব নিকৃষ্ট নাটকে কয়েক বছর ধরে অভিনয় করানো হয়েছে, দেখে বিস্মিত হয়েছি। আবার প্রথমশ্রেণীর অভিনেতা-অভিনেত্রীকেও কেবলে প্রশংসা করা হয়েছে, কয়েকটি আবর্জনাকে বিশেষ বিশেষ ছবির তৃতীয়-শ্রেণীর নটনটীকেও তাঁদের থেকে উঁচুতে তুলে ধরা হয়েছে কাগজের সমালোচনায়। যুক্তিহীন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেই নাট্য-সমালোচনা হয় না। তাতে কষ্টে-দেখের মনোরঞ্জন যান করলেই নেবে আসে। ওদেশে পিলগুর বা অলিভিয়ার কোন বইতে নেবে অভিনয় fail করলে সমালোচকরা তাঁদের ছেড়ে দেন না। এইজন্য পিলগুর একবার বলেছিলেন—তাঁদের সমূহ বিপদ—সদা সজাগ থাকতে হয়, যাতে অভিনয় খারাপ না হয়ে যায়—কারণ অভিনয় খারাপ হলে দর্শক কখনও ক্ষমা করবে না।

আমাদের বর্তমানের কাগজের তো সে-সব ভয় নেই—কাগজের সমালোচনায় তো তাদের সম্বন্ধে এই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হবে।

বিখ্যাত আমেরিকান অভিনেত্রী হেলেন হেজ ১৯৪৬ সালে লণ্ডন স্টেজ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দেন। এ সম্বন্ধে লণ্ডনের ডেইলি টাইমসের ২২শে আগষ্ট ১৯৪৬ সালে এইভাবে খবরটি প্রকাশিত হয়:

U. S. Actress On Our 'Slipshod' Acting New York, Aug. 21—Miss Helen Hayes, the distinguished

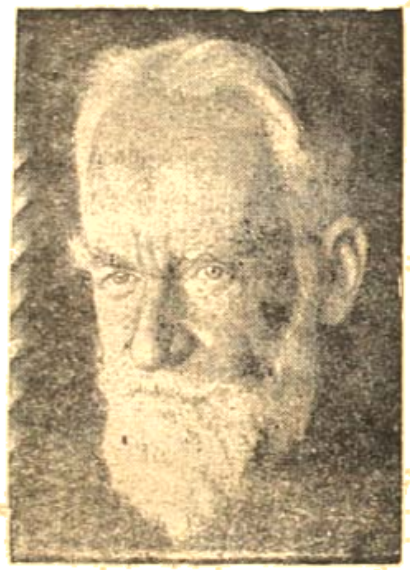

● বার্নার্ড শ'

American actress, returned here from a visit to Britain today to deliver a blistering attack on the British theatre, its playwrights and its actors and actresses.

Miss Helen Hayes, who had been working on the production of the film Anastasia in London, was asked by reporters for her impressions of the British theatre and said: 'We have pulled away from them so far you can't see us for dust. They have no playwrights to

compare with us. I feel their acting standards have let down. The West End Theatre is no patch on ours.

All the years I have been going to London, I have come away thinking how severe our critics are in comparison to theirs. But now I think it's a good thing.' Miss Hayes declared—'the acting is slipshod. They need a great deal more discipline. I have never been impolite before but I really feel this.'

লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে এই সব বক্তৃতার Extension Lectures দেওয়া হয় নাটক সম্বন্ধে। প্রথম দিনে আলোচনা করেছিলেন বিখ্যাত প্রডিউসার পিটার হল। বক্তৃতার পর কথাপ্রসঙ্গে হেলেন হেজের উপরি-উক্ত বিবৃতি সম্বন্ধে কথাবার্তা সুরু হয়। অনেক ইংরাজ পুরুষ এবং মহিলা শ্রোতা খুব উষ্মা প্রকাশ করতে থাকেন। পিটার হল তাঁদের বলেন, মিস্ হেজের কথাগুলি ভালভাবে বুঝে দেখতে—সমালোচনার অধিকার সবারই আছে—তাছাড়া মিস্ হেজ, তো একজন বিশেষজ্ঞ। তাঁর সমালোচনার সারবত্তা খুঁজে বর্তমান বৃটিশ থেকে বুঝে নেবার চেষ্টা করা উচিত, না বিদেশী বলেই তাঁর উক্তিকে malicious বলে উড়িয়ে দিতে হবে। ঠিক proper spirit-এ সমালোচনাকে গ্রহণ করবার জন্য মনের উদারতা থাকা দরকার।

আর আমাদের দেশে সমালোচনার ক্ষেত্রে সত্যি কথা বলতে কি অবস্থা দাঁড়ায় দেখুন। শিশিরকুমার ছাড়া এক নবনাট্যাচার্য তাঁর দলের এক অভিনেত্রীর অভিনয়ের বিরূপ সমালোচনা করায় ডাঃ অমিয় ঘোষ সম্বন্ধে নিজেদের (আজকাল অনেক থিয়েটারী দলের নিজেদের পাবলিসিটির জন্য একটি করে থিয়েটারী-পত্রিকা প্রকাশ করবার দরকার হয়ে পড়ে—যদিও অনিয়মিতভাবে এই সব পত্রিকার ৩।৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়) পত্রিকায় লিখলেন—ছাত্রদের উপর থিসিস লিখে যিনি ডক্টরেট হয়েছেন, ইত্যাদি।

ডাঃ ঘোষের অসন্তোষ যে তিনি কোন পালতরা জলযানের বিরুদ্ধের উপর ডক্টরেটের থিসিস দেন নি। অবশ্য একথা আমি একবারও বলছি না যে—এমএ বা ডক্টরেট উপাধিধারী হলেই ভাল নাট্য-সমালোচক হতে পারা যায়। তাহলে তো ইউনিভার্সিটির সাহিত্যের অধ্যাপকেরা সবাই অবশ্য dramatic critics হয়ে উঠতেন। কিন্তু অধ্যাপক প্রবোধ ঘোষ, ডাঃ শান্তিদেব ভট্টাচার্য, ডাঃ সাধন ভট্টাচার্য, ডাঃ অমিয় ঘোষ তথু নাট্যসাহিত্য বিষয়েই প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করে ক্ষান্ত হন নি, নাটকের রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধেও তাঁদের বিশেষজ্ঞের জ্ঞান আছে একথা আজ বাংলার নাট্যরসিকদের অজানা নয়। সুতরাং কোন নাটক বা অভিনয় সম্বন্ধে এঁরা যদি কিছু মন্তব্য করেন, তবে প্রযোজকের কর্তব্য সে বিষয়ে চিন্তা করে দেখা—এঁদের নিজে প্রযোজক মন্তব্য করলে নিজেদেরই অজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে।

১৯৫৬ সালে Old Vic-এ একসঙ্গে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়—রিচার্ড বার্টন এবং জন নেভিল

● শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইয়াগোর ভূমিকায় একদিন অন্তর পার্ট বদল করে অভিনয় করতেন। বার্টনের ওথেলো এবং নেভিলের ইয়াগোর ভূমিকায় অভিনয় আমি দেখেছিলাম—কিন্তু এ অভিনয় আমার অন্তর স্পর্শ করতে পারে নি। পরে অবজারভার পত্রিকার নাট্য-সমালোচক কেনেথ টাইনান্ তাঁর রিভিউতে লিখেছিলেন:

'Even in prospect, the double Othello of John Neville and Richard Burton looked fairly black. The roles of Othello and Iago to be alternated by two born Cassios: how could they manage overnight the switch from black outside to black inside.

কিন্তু এ সমালোচনা পড়ে নেভিল বা বার্টন টাইনানের উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন নি।

স্বাধীন দেশের পক্ষে লোকশিক্ষা দেবার best pulpit রঙ্গমঞ্চ। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের রঙ্গমঞ্চ কতটুকু কাজ করেছে? দেশে আজ রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, আন্তর্জাতিক, খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি সববিষয়েই বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এর কিছু কোন তাজা নাটক বা সমস্যা সমাধানের কোন ইঙ্গিত কি আমাদের রঙ্গমঞ্চে আজকাল পাওয়া যাচ্ছে? ডেটর ইবসেনের নাটক বা পিরানদেল্লোর শিল্প ব্যাখ্যেটার্স্ট বর্তমান বাংলা রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নাটক নয়। অবশ্য এর বিষয় নিয়ে কোন নাট্য-সমালোচক আলোচনা করছেন না। ভাল নাট্য-সমালোচক না থাকলে ভাল নাটক সৃষ্টি হয় না, অভিনেতাদের অভিনয়ের মান ক্রমশই নেমে যায় এবং রঙ্গমঞ্চ রসাতলে যেতে বসে। এক সময় ইউরোপের থিয়েটার যখন অধঃপাতে যেতে বসেছিল, তখন বিখ্যাত ইতালীয়ান অভিনেত্রী এলিওনোরা ডুজে মন্তব্য করেছিলেন—'To save the theatre, the theatre must be destroyed'.

সত্যিই সত্যিই অবশ্য তিনি থিয়েটারকে ধ্বংস করতে চান নি—নিজীব পুরাতনকে ভস্মে পরিণত করে, নবীনের আবির্ভাব আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন।

থিয়েটারটা ঠিক তলানো দেবার জায়গা তো নয়। জনশিক্ষার প্রসারে, জাতীয়তা-বোধ জাগিয়ে তুলতে, সমাজের ভেতরকার সংকীর্ণতা, নোংরামি দূর করতে, সত্য-শিব-সুন্দরকে অনুভব এবং উপলব্ধি করতে তুলে ধরে সর্বদেশে এবং সর্বকালে রঙ্গমঞ্চ থেকে আমরা প্রেরণা পেয়েছি। এই সব কারণেই বার্নার্ড শ' বলেছিলেন:

'This would be a very good thing if the theatre took itself seriously as a factory of thought, a prompter of conscience, an elucidator of social conduct, an armory against despair and dullness, and a temple of the Ascent of Man'

'When the far-off sail is blown by
the breeze of softer clime'.
—Maud

এবার উলিল

জল উঠিয়েছে। জল। রাইগ্রামের জল—বন্যা নয়। বন্যা নয়। যে বন্যার সুদীর্ঘ বর্ণনা আমাদের বৈষয়ী গ্রন্থকার পাতের পর পাতে প্রবহমান করিয়া যাবেন কয়েক পাত চা ও রক্ত সিগারেট সেবন করিয়া নদীর কোন ফলির বলীরাঙ্কিত টেবিলের কোন পটভূমিকায়।

বন্যার পরিধি মাপ করিয়া তাহাদের সমস্যার মধ্যে আরও আর একটি যুক্ত হইবার আসে। এরা জলের জীব নয়—এরা প্রেমে জাহান্নাম। সেই অতি দীন, অতিক্ষুদ্র অর্দ্ধশুষ্ক পটভূমিতে যেন প্রেমে পড়বার জন্যই আধুনিক নরনারী উপস্থিত হয়। অবশ্য, প্রত্যহ পরিস্থিতি পূর্বেই জল ও কাদার পিচ্ছিল করিয়া রাখেন, যাহাতে পদস্খলনের তিলমাত্র অসুবিধা না ঘটে।

বন্যার হিস্ত্রিকের মাঝে মাঝে অপূর্ব-সুন্দরী বৎসরান্তার দল। বন্যার মৃত বা আহত বৎসকুলে অভিলাষ থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা যোড়শবর্ষা। নানুনিধি রক্তচর্চার আনুষঙ্গিকে চর্চিত দেহকান্তি পছন্দসই। পল্লবিকের জলের পল্লও রাসায়নিক পরীক্ষার নিকট পরাস্ত।

বন্যাত্রাণের বর্ষীয়সী নরক-নায়িকা কতদূর দেখার সুযোগ-লাভে ধন্য, কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কের মূলসূত্র কৌতুকী চিত্তচক্ষে ইঙ্গিতহীন দেখা যায়। দেখা যায়—ডাক্তারের বন্যাপীড়িত ব্যক্তি অপেক্ষা মনোযোগ অধিক—কোনও সমাজ-সেবিকার প্রতি দেশপ্রেমীর যেন প্রধান কর্তব্য হয় কিঞ্চিৎ অ-সেবীর মনোযোগ স্থাপনা। বন্যা সকলকে সমান ভাবে নেয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই ঐক্যস্থানে সামাজিক বাঁধা-ধরা প্রাত্যহিক জগতের নিয়মকানুন বন্ধ। বিভিন্ন পরিবেশের সম্পূর্ণ বিভিন্ন পুরুষ ও নারীর এক অসামান্য পল্লীগ্রামে অবাধ মেলামেশার ভিন্ন কারণ দর্শাইতে প্রাজ্ঞ উপন্যাসিকের পিছাওড়ন আবশ্যক হয় না। জলের মত সহজ ও অবাংপতি পাত উপন্যাস। জল উঠিয়েছে। জল। বান নয়, সাধারণ বর্ষার জল। পাবিস্থান বা পাবনার কোন গ্রামে বর্ষার জল উঠিয়েছে।

ছিতে বিশেষ, বস্ত্রে স্থিত, গ্রীষ্মে শুষ্ক জলা বা চলনবিলে জল ছুটিয়া আসিতেছে। চলনবিলের মধ্যে বৃহৎ পদ্মবিল। সেখানে কূলে কূলে ছল ছল জল। পদ্মবিলের জল আসে বিশাল নদীর খরস্রোত বহিয়া। বর্ষায় এখন সেই পদ্মা ভয়ঙ্করী। সেই নদীর ধারে বস্ত্রাত্রাণকার্য চালাইতে হইতেছে। ফুলিয়া ফুলিয়া উৎস ঘোলা জলে ঘোর আবর্ত রচনা করিয়া সেই নদী খরবেগে

বাণী রায়

ছুটিতে চাষ [illegible] বন্ধ হইয়া যাই ও তাহে জলের হাহাকার পড়িয়া যায়। নদী আর ডিসেম্বরের স্বচ্ছতোয়া ও স্রোতী প্রতিদ্বন্দ্বিনী নয়। সে ভাবে, আকাশে ছিল না মৈত্রেয়ী। যার যার বাড়ীতে ঘর তৈরি হইয়াছে, তাহারা ঢেউ নদীকে আবদ্ধিত খড়কুটোর মতো পড়ের ঘর বহুদূরের চুলিবার খড়টা তাহাদের হাতেই সঁপিতে হয়। পাতাবর বা টিনের ঘর তাহারা উহার ফোপড় দর্শিলেও আবহেলাভরে তাহা। অনেক শিকলের পরে, দূরের বস্তায় বাঁধিয়া গৃহনির্মাণের পরেও যেন যায়—তবুও নদী যেখানে চলিয়া আসিয়াছে। নদী যেন পড়ায়ে।

নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে যাহার ভয় পায় না, ঝড়কে ভয় পায় না, দুর্যোগ ভীতি নাই। তাহাদের মধ্যেও ভয়ের বস্তু নদী।

ইহে বিদেশী ঢেউয়িনী প্রতি বর্ষায় পাগল হইয়া ওঠে। মরণাবী গজরাজের মত উন্মত্ত হয়।

খেলার মাঠে জল জমিয়াছে। পল্লীর খেলার মাঠটিতে নানা গ্রাম হইতে গ্রামের নিজস্ব দল আসিয়া খেলা করিয়া যায় শীত-প্রতিযোগিতায়। বৃহৎ গ্রামে ঈদ গ্রামের জমিদার রায়বর্তী মৈত্রেয়ে বায় দিয়াছিলেন।

মৈত্রেয়ে স্কুল মৈত্রেয়ের পিতামহী দুর্গাদেবীর নামে। বন্যার জল নিবেটের মেঝে, টিনের চাল ঘাঁটির আর্থে পড়ে উঠিয়াছে। স্কুল বন্ধ। মৈত্রেয়ে আনা-মেয়েরা সি নিরটেই দুইটি উঠিয়া গেছ কাঁসাটারের বাড়িতে উঠিয়াছে।

মৈত্রেয়ে স্কুল আপোয়ে পাকা উঁচু বাড়ি। এখান হইতে গেছে যাইতে স্কুল-কর্তৃপক্ষ নিতে হয়। মৈত্রেয়ে আসে ছিল লাগিয়েও বন্যার পাইতেন পড়িয়া দেওয়াতে চালু রাখা হইয়াছে। রায়বর্তীদের বংশে পরিবারে আজ স্কুল সুদক্ষ। ম্যাট্রিকটি হাজিরা হক সহকারী ও রায়বাড়ির ছেলে অমিরেন্দ্র রায়ের অনুরোধে আপাত নিয়েছেন যে, স্কুলটির অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভরিয়া দিবেন।

গ্রামের যারা শিক্ষার এই বেহাল যেটি দুটী ব্যবস্থা রায়বর্তীরা করিয়া দিয়াছেন। এখন তাঁহারা শরবরাহী হইলেও, পাকিস্তান হইয়া গেলেও তাঁহারা এখনও পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধের সময় টাকা পাঠান। মৈত্রেয়ে স্কুলটি তো তাঁহাদেরই পাকিবে।

মৈত্রেয়ে স্কুলে প্রাইজ বিতরণের সময় দুর্গাদেবী বার্ষিক বিদ্যালয়ের প্রয়োগটি ছাত্রী কিছু না কিছু পাইত ঘুঁড়ি রায়বাড়ির মেয়েরা উপস্থিত থাকিত, তাহারা বিশেষ সম্মান লাভ করিত। বাহুড়িয়া সদর বিতে ইতে পিতার প্রাইজের আশিয়া এবার স্কুল পরিবর্তন নিয়াছিল। পিতামহ নামে দুইটি স্বর্ণচিত যৌপদকও সে ঘোষণা করিয়াছিল।

মৈত্রেয়ে পাইব [illegible] সম্পর্কে মেঝে আসার সময়ে পড়িয়া [illegible] দুই উপজেলা মেঝের মধ্যে [illegible] মেয়েদের

যাইতে বিয়া [illegible] অনেক, আবার মৈত্রেয়ের [illegible] মেয়েদের স্কুল পরিবর্তন চুকে [illegible] [illegible] উপস্থিত হইত। মেঝে সাথি সাথি [illegible] মেয়ে মৈত্রেয়ের ৩টি মেয়ে তাহাদের [illegible]। [illegible] উপর পড়া, প্রাইজ পাওয়া। মৈত্রেয়ে স্কুলে মধ্য-পরিবারের যে তেই বাড়ি আসে।

[illegible] হইব [illegible] পড়ুয়া হইয়া [illegible] বাড়ির এর মেয়ে [illegible] উপরে বর্তমান-[illegible] আসুন হইয়া [illegible] করিব। কিন্তু [illegible] মেয়ে [illegible] আসিতেও [illegible] মেয়ে [illegible]

অনেকটা সময় বেঁচে যায় বলে হইহাটির বাজারটা সে বেছে করিয়া নেয়। টেলে উঠিয়া হালদের লঞ্চঘাটে বসে সন্ধ্যার সময়ে বাজার ভাগিয়াছিল—চন্দনবিলের বাজার। জলে-ভেজা ভাঙা বাজার। এমন বাজার কখনও সরে যায় নাই।

প্রাইজ-অন্তে অন্য মেয়ের মত সন্ধ্যাও পাইল একটি উল্টোপিঠে ও চুলের একগুচ্ছ লাল রেশমী ফিতা। রায়বাড়ির মেয়েকে হিংসে কোন সময়ের বেখোলে যে চলিবে না—এই নির্দেশ পূর্বেই রায়বাড়ি হইতে আসিয়াছে। অন্য মেয়েদের মতই 'হাজনা প্রাইজ' পেন্সিল ও ফিতা তাহার প্রাপ্য।

সেই সময়ে জিনিসে কত আনন্দ!

মেয়েটির আজ বড় হওয়া। রায়-পরিবারের আনা-যাওয়া কমিয়া গেলেও পাকিস্তান হইলে দুইটি নাম কিছু দিবস অসুবিধা ঘটিল। অবিরাম হিমুরেরে চলিয়া গেল। কয়েকটি রাত্রি রহিল। তা-ও ছলে আসা-যাওয়া তাহাদের অভ্যস্ত।

সম্প্রতি বর্ষার জলে যা ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে ঘরখানির আমূল সংস্কার না করিলে আর ছল মোলা যাইবে না। অবশ্য কয়দিনের পরে বৃত্ত হামিদ ম্যাজিস্ট্রেট সাহায্য করিবেন বলিয়াছেন। বড় চালাঘরে ভিন্ন-ভিন্ন মোপে দুইটি ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণী আশ্রয় নিয়াছে। খুঁটির পতন হইয়াছে।

দূরে পদ্মা-যমুনার বর্ষা আসিয়াছে। সেখানে জলের রূপ ভয়ানক। তীরের ঘোর আবর্তে 'ঘুর-ঘুর' পদে পাড়ের মাটি অবিরত ধসিয়া পড়িতেছে। গাছপালা ভাঙিয়া, ঘর ভাঙিয়া ভাঙনহরা নদীর ক্ষুধায় যেন মেখানে। মানুষ, গরু-বাছুর কিছুই পার পায় নাই। সেখানে সময় হইতে রিলিফ আসিয়াছে।

রায়গ্রাম নদী হইতে বহু দূরে। অল্পজোরে দীন। কিন্তু নদীর বন্যা পরিখেলে জলদীতি করিয়াছে। পরিখাল হইতে চন্দনবিল ভাসিয়া উঠিয়াছে। ঘরে ঘরে জল। বাঁধও এখানে বন্যা নাই।

গ্রামের শেষে পরিখালের মুখে খেলার মাঠটি সম্পূর্ণ জলমগ্ন। যেন ছোটখাটো হ্রদ একটি। এবার ফুটবল খেলাটা বন্ধ হইল। রাজ-কাশিমপুরের দলের হাতে হিন্দু চলিয়া গিয়াছে বহু বছর। এবছরও খেলা না হইলে ও গ্রামেই থাকিয়া যাইবে। খেলার অন্তে বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়কে রায়বাড়িতে আহারে আপ্যায়ন করা হয়। কর্তারা না-থাকিলেও জাতি মুরাবহাবের দুই ছেলে মনীন্দ্র ও হরেন্দ্র তাহা করে।

ফেরিবোটের শব্দে আনন্দ চলিয়া গিয়াছে। তবু খেলার উত্তেজনা ছিল। এবার জল ওঠার ভয়ও নাই।

হাটের স্থানটিও জলমগ্ন। নৌকায় নৌকায় যেন-তেন হইয়েছে। নৌকায় পান-সুপারি, মাছ, তরকারীপত্র ও দুধ আসিয়াছে। দোকান-নৌকার গায়ে ক্রেতা নৌকা ঠেকিয়া নিজের নৌকা ভিড়াইয়া দামাদামি করিতেছে।

ডেলিন নদীর গাওলা নয়, সাধারণ ডিঙিনৌকা। দুই জোড়া নাই। পাটাতনের উপর সারি সারি বেঞ্চি। সূর্যের উত্তাপে মাছ পচিয়া যাইবে, তাই মাছের ঝুড়ির উপরে চট, চাটাই বা তেরপল ঢাকা।

মিয়াজান একখানি ইলিশ কিনিয়া, কালো ভাঁড়ে দুধ কিনিয়া ফিরিতেছে।

গ্রামের পিছন বসির আলী নৌকায় ডাক বিলি করার পথে মিয়াজানকে দেখিয়া ডাকিল, 'তোমাগারের রায়বাড়ির ডাক লয়া যাও।'

মিয়াজান নৌকা ভিড়াইয়া চিঠি লইল। বুধে সরকারের নামে ও ডাক্তারখানার নামে চিঠি। মেহের রায়কর্তা মহেন্দ্র বিবাহ-সংক্রান্ত কাজে কলিকাতা হইতে লিখিয়াছেন।

বসির আলী বলিল, 'এত চাঁদ-সুর আছ ক্যান, কওতে? মনে লয় আমারে বুঝি খাওয়াবের চাও।'

মিয়াজান হুঁহু করিয়া হাসিল, 'হু, হু, হু! না ভাইসাহেব, বুলুদিদি কলকেতা থে চিঠি দিছে। গ্রাম-সেবিকার কামে হয় বাসেংতো পাশ করছেন, তাই আজ পায়াস জোগ হ'বানে। মাছ দিয়া মাদলচণ্ডীর জোগ হ'বানে।'

ভুঁড়ি নাচাইয়া বসির আলী বলিল, 'ভালই তো। উঁয়াগারের জোগরক্ষ হলেই তোমরা খাবের পার। মেমবিদি বুলুদিদিকো লয়া ভালই করছেন। তা মেমবিদির সাথে সেহেবুতার সাদী হয় নাই?'

মিয়াজান বলিল, 'হুঁ তো। সেহেবুতা বিলাত চল্যা গিছেন আবার। আর, মেমবিদির সাথে ম্যাজেস্টার সাহেবের না বিয়া হবে শোনছি।'

'বও কি! ম্যাজেস্টার সাহেব না কলীর হয়া গেছেন।' অন্য কোন ভুঁড়ির চাকরের সঙ্গে বসির আলী এত কথা বলিয়া নিজের পঞ্চমবারা ক্ষুণ্ণ করে না। কিন্তু রায়বাড়ির বারদেলে চাকর মিয়াজান; তাহার নিকট রায়বাড়ির খবরটার দরকার আছে।

'কলীরই তো হয়াছিলেন, ভাইসাহেব। কিন্তুক চইলা যাওয়ার আগের দিন মামলিটি মিট্ গুইটে' কাহারোঘরে আইজা মেমের পানি খেইলা উঁয়ারে রাজী করছেন।'

'হাবিব সাহেব তালে হিঁদু সাদী করছেন?' বসির কিছুক্ষণ চিন্তার পরে বলিল, 'তা জানই, হিঁদুর মেয়া আদি ভাল হয়।'

এক্ষেত্রে বসিরের ইঙ্গিতটা তরফদারির মেয়ের কথা তোলা উচিত হইবে কিনা, না বুঝিয়া মিয়াজান ঘোড়ার মত হ্রেষ করিয়া আবার হাসিয়া উঠিল।

জলমগ্ন ধানক্ষেতের সরু আলে-আলে পা ফাঁকিয়া বাসিনী হাট হইতে ফিরিতেছিল। তাহার মা নাই। চলতি কোন নৌকায় তাহার যাইবার আছে। হাটে সে আসিয়াছিল মাথার তেল কিনিতে। থাক না থাক, নারিকেল তেলে কবিরাজী ঔষধ মিলাইয়া মাথায় মেওয়া তার নিত্য কর্তব্য।

চুলগুলি এখনও ছোট বাসিনীর। প্রেমাস্পদ খোকা ছেলে বিধবা জেলেনী প্রসূতিকে লইয়া ঘর বাঁধার আশাতে বাসিনী পাগল হইয়া গিয়াছিল। অনেক ডাক্তারী-কবিরাজী ফল দেয় নাই। অবশেষে পীরসাহার রোজা তাহাকে সারায়। মাথা মুড়াইয়া সারা গায়ে খিচুটি লাগাইয়া রোজার অমানুষিক চিকিৎসা দেখিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু বাসিনী সারিয়া গেল।

চিকণ দেহ আর নাই বাসিনীর। দেহ দীর্ঘ, হস্ত লম্বা কাল। নিত্য বর্ষণের ফলে ঝকঝকে কাঁসার মত রঙ। বাসিনী এখনও দুর্বল। কায়ক্লেশে (ঠিকে ঝি) কাজ করিতে পারে না। ঢেঁকে কাটে ও ভাই-এর সংসারে পড়িয়া থাকে। গায়ের গহনা-গুলি বাসিনীর সম্পত্তি ছিল। তাও খোকা ছেলের ভাঁওতায় গিয়াছে। ভাই-এর সংসারে কোন রস নাই তার। মেয়ে থাকিতে না দিলে লোকনিন্দা তাই ভাইয়ের সোজাসুজি কাঁটা ধরিয়া বাহির করে না। কিন্তু কাটিয়া কাটিয়া কথা বলে।

যথা :—এই যে বলে হলদে,

ভালো তা কই বাবি।
পাষাণ হয়া যে গেলাম,
কবে আমার স্বামী?

অথবা

ও ঠাকুরঝি, বলি বাবের আইন কতদিন? আগল লাইগা বলদে বলি হলে আমিও বইসা যাহি। নাগর আইন ত্যাল দিবনে। কামকাজ ফইলা সবর পইড়া গেল।'

অথবা

বইয়া গেলায় মাইটা। খাওনের লোক আছে, কামের নাই। ব্যালেকার কইরা, হাতের-ভাতের যোয়াড় জগদ্দুর হলছে আবারি গলায়।

ফলে দুর্বল শরীরে বাসিনী কাজ করে যাচ্ছিল। চৈতো কাটিয়া সুতা বিক্রয় করে। চিকিৎসালয়ের ব্যয় চলে। ঘর বা পণ্যের অভাবে বাসিনী একেবারে শেষ হওয়ার মুখে। রাহবাড়ির লোকেরা এখন নাই। বেহু আসেও না। সুতরাং সাহায্যের প্রত্যাশা নাই। মুড়াঘাসের বিধবা কন্যা বুলু থাকিলেও কিছু পাওয়া যাইত। কিন্তু কলিকাতাগত লেখিকা সুভদ্রা মিত্র বুলুকে সঙ্গে লইয়া গেছেন তাহাকে উপজীবিকার প্রতিষ্ঠা করিবেন উদ্দেশে।

বাসিনী কোথাও সুখ পায় না। খোকা জেলের পাশে প্রফুল্লকে দেখার জন্য গণ্ডা বাড়ায় না। হাসি-খুশি, ধারালো ব্যক্তিটি এখন একেবারে অন্তরূপ। মাথা তাহার আর গরম নাই সত্য, কিন্তু পূর্বের সত্তা বিলুপ্ত।

গভীর রাত্রে ঘুম আসে না। বাবার মাত্র একখানি ঘর। বারান্দায় বাসিনী চটের শয্যায় পড়িয়া থাকে। ঘুম আসে না চিন্তায়। রাত্রে উঠিয়া বসিয়া থাকে।

তাহার কি ভবিষ্যৎ? তাহাদের শরীরই সম্পদ। সা খাটাইতে পারিলেই ভাত বস্ত্র তাহার ছিল 'অরণ্যের ধর্ম'। হাড় ছিপছিপে শরীর সাধ্য কাজে খাটাইয়া সে কত গয়না গড়াইয়াছিল, খোকা জেলের সঙ্গে বিবাহের আশায়?

তবে বা শরীর সুস্থ হইবে, তবে বা আবার সে রোজগারে নামিবে? মনে হয় আর রোগের কখনও বর্ধিষ্ণুতা ফিরিবে না। মন ভাঙিয়া গিয়াছে। খোকার জন্য সে বিবাহ-সম্পত্তিওয়ালা প্রার্থীকে প্রত্যাখান করিয়াছে। এখন সে খুটো-বন্ধা না। কেউ চাহিবে না।

বাসিনী সহজে লোকালয়ে বাহির হয় না। নারকেলের তেল ফুরাইয়া গিয়াছে। ভাবিয়াছিল আর এ বিলাস রাখিবে না। কিন্তু কবিরাজমশাই নারকেলের তেলে তাঁহার আরক মিশাইয়া নিয়মিত মাখার দিতে বলিয়াছেন। বহুদিন বাদ নেওয়াতে বাসিনীর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। আবার

পেট চইলার তরে তেল কিনিতে হাটে

প্রথমে হালার বেজা ছেলে ওকে সে অনুরোধ করে, 'ও রে ছাই বিধা এট ত্যাল আন-দেলা আমারে। মাতিরে ঘুম হয় না।'

তাইরো গোপাল মুক্ত করিতে করিতে চিপ্‌টেন কাটিল, 'আমরা অলে সর্ষার ত্যাল পাই না, তার নারকেলের ত্যাল! বেশ আছে হকলে (সকলে)।'

আগে বাসিনীর কুসংস্কার হলদার উপরে অবার কুটিত। কিন্তু এখন তাহার উহার নাই। সে কলহ-বিবাদে তর পায়।

বুড়া উত্তর দিল, 'পারমু না।'

বাসিনী বলিল, 'যা না, লক্ষ্মীটা। দুইটা পয়সা দিমু। (মুড়ি) হুতুম কিন্তা খাম।'

বুড়া বলিল, 'উঁ—হুঁ।'

বুড়ার মা বলিল, 'কাল তোর বহুনাকে পিসিয়ে যে দুইটা পয়সায় এখন আবার ছাইও পাওয়া যায় না।'

বাসিনী বাধ্য হইয়া নিজেই আসিয়াছে বুবোরবাড়ির নৌকা ধরিয়া। কিন্তু তাহারা মোটাদিন খাটিবে, হাটে হাড়িকুড়ি বিক্রয় করিবে। চিংড়িদের দল আগায় হাড়িকুড়ির চাহিদা বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। বুবোরের ভাতে টান পড়িয়াছিল! এখন বুবোর আবার ব্যবসা ফাঁদিয়াছে নূতন করিয়া।

আলে-আলে হাঁটিয়া চলিয়াছে বাসিনী। পৌষ শ্রাবণ মাসে ধরন কুটিয়াছে। দুর্বল শরীরে এতটা পথ হাঁটা কষ্টকর। কিন্তু হাটের লোকের দৃষ্টি এড়াইতে সে ক্রত ধানের ক্ষেতে নামিয়া আসিয়াছে। এখন একখানা পাতার নৌকা পাইলে উঠিতে পারে।

সতরঞ্জে যাওয়া হয় নাই। একটা ছোট ছুট ভাঙিয়া যাইয়াছে। চাল নাই অনুধাতে তাইরো হাড়ির বাসি ভাত দুই ছেলে পচা ও বড় এক বাসীকে দিয়াছে উপুড় করিয়া, রান্না চাপায় নাই। বাসিনীর বিশ্বাস নিজের ভাতও সে খাইয়া আর ভাত নাই বলিয়া বাসিনীকে ভাঁকি দিয়াছে।

মাথা অনাহারে ও দুর্বলতায় ঝিমঝিম করিতেছে বাসিনীর। পাগল অবস্থায় তাহাকে খাওয়ানো যাইত না। তখনই খাওয়া দিয়াছিল। তাহাদের চিন্তায় মুখে খাদ্য উঠিত না। তাইরো পড় বেলার ধান মুখে কুচিত না।

বাসিনী আর চলিতে পারিল না। জলকাদা মাখা ক্ষেতের আইলের উপর বসিয়া পড়িল। ঘুমায় তাহার চোখ ঢুলাইয়া উঠিতেছে। স্বপ্নে সুধায় সে খাইয়াছিল জীবনভোর, মনে পড়িতে লাগিল। নয় মাস পূর্বে রায়বর্ত্ত চৌধুরি বাবে প্রথম হুকুমের অবহেলা করে পড়িল। পাতে দুইবার করিয়া শিকলের বালতি হইতে হলেরা হলেরা দিয়াছিল। সেই হলে-হলেরা হলেরা যদি একটিও এখন পাইত!

'হলেরা বাসিনী না? আগে বলদা ক্যান? লাগ বাবের পরে।'

লাগি চৌদ্দির গুড় ভাঙ্গি ডিঙি ডাকাইয়া এদিকে আসিতেছে নব বর্ষি সে খোকা জেলের বন্ধু।

বাসিনীর জ্ঞান গেল। খোকা জেলে সম্পর্কিত সকলেই ঘৃণ্য তার। ট্যারা ও খোঁড়া নব মূর্তি নৈতিক সকলকেই ভরি পাইয়াছে। এই তাবৎজগতে বাসিনের বাড়িতে যাবার একা আছে তাহার। কোমরে চাল বাঁধিয়া ছুটিয়া ছুট অন্ধ বাড়ি ফিরিতেছে খোকা ছাড়া বোধি। টাকা আছে, সুতরাং চিকিৎসার বেলার মনও আছে।

জলে টলমলে ধানের ক্ষেতের মধ্যে ডিঙি ঠেকাইয়া নব বলিল, 'বাড়ি যাবা তো আসো।'

অন্য সময় হইলে বাসিনী প্রত্যাখান করিত। কিন্তু আজ সে নিরুপায়। ঘরি আর নৌকা না পায়? এক পাও হাঁটিবার সাধ্য নাই তার।

অগত্যা হতজ্ঞাড়া খোকার বন্ধুর নৌকায় বাসিনী উঠিল।

লাগি চৌদ্দির নৌকায় মুখ ফিরাইয়া নব বলিল, 'কেমন আছ এখন?'

নক হাসল, চোখের ও ইঙ্গিতে আশ্বাস দিল। বাসিনী ঘোমটাটা আরও টেনে দিল। কুয়ার ধারের সব কটি বউ-ঝি তখনও তাকিয়ে।

তাদের চোখে নক যেন কী একটা কাণ্ড করেছে। বাসিনীর মনে হচ্ছিল, 'বাক্স দুইটার জেল্লাই যা, বাপরে!'

ঘোমটার ভিতরে বাসিনী বলিল, 'না, না।'

নক জোর করিয়া বলিল, 'হাঁ, হাঁ। অনেক টাকা দুইখানে আছে। অনেকগুলান আছে। যাদের বেচেছে পাটে না বাকিতে।

নক বাসিনীর হাতে চাপ-পাওয়ানো [illegible] জোর করিয়া দেখাইল।

[illegible] ও [illegible] ফেলে দুইবারে। [illegible] একটা শুধু ছেঁড়া নয়, পড়াও যায়। কাজেই [illegible] টুকরো বার করে দেওয়া গিয়াছে। বাসিনী বলিয়াছে 'ছেলেটি যাইল হিসাবের বাহির না'

নক আরও একটি চোখ টিপিয়া বলল ও খাতাটাই বাহির করিল।

'টাকা দেখ একটু।'

[illegible] হইতে [illegible] ও হইল।

দুইতোড়লের পরে একখানে বাসিনীর মনে হইল পুরিয়া ছাড়া যা বাকী আছে নক, বাজের দড়া।

গ্রামের ভিতরে নৌকা প্রবেশ করিয়াছে। আগে নকর বাড়ি। নক বলিল, 'ভিতরিগুলান নামায়া যেতেছারে দিয়া তোমাক খটাঘাটে। দেখি, একটু দড়া বলো।'

সরিয়া বসিতে যাইয়া হঠাৎ দুর্বলতায় বল, করিয়া বাসিনী ছইয়ের পাটিয়া ভেঙে।

'আ হে, আ হে', বলিয়া নকও জলে লাফাইয়া পড়িয়া দুইহাতে বাসিনীকে ধরিয়া তুলিল।

একখানি মাত্র কাপড়ের অবয়ব দেখিয়া তখন বাসিনীর চোখে জল আসিয়াছে। কাজলে মাখামাখি তিন নৌকার লোকের বাহিরে লজ্জা ছেড়া। অতিকষ্টের ভেঙেটুকুও জলে পড়িয়া ভাসিতে লাগিল। রাগে বাসিনী জ্বলিয়া উঠিল। খোকা ভেলের উপর সঞ্চিত রাগ, এতদিনের অবাঞ্ছিতা দুঃখ, সবই যেন বন্যার [illegible] পাইয়াছে কিল।

[illegible] ও বলে, 'তোরা [illegible]

'দেখি, একটু দড়া [illegible] তোরা কিসুন [illegible] মইল ধরবের মি পারেন।'

নক ও চটিয়া গেল। আশেপাশের নৌকা [illegible] উঠিয়াছে। দুইজন জেলেকে দিয়া বাসিনীর খাটে কাছাইয়া দেওয়াইয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, 'আমাই তো আছি। তোরা আছি, খেতা আছি। বসি মোরে ছড়ায়, তাকে [illegible] তোরাক ছাইয়া আমার সোয়াই তো আছয়া দুনি।

বাসিনী অপ্রতিভ হইয়াছিল। নক তাহার উপকার করিয়াছে। খাক দিয়াছে অনায়াসে। মনে পড়ার কথা নয় নক রাখী নয়।

নকর মুখে এতবড়ের কথা শুনিয়া বাসিনী আরও অপ্রতিভ হইল। নিজের ছড়ানো চারিদিকে করুণ স্বরে বলিল, 'ওগুচে, এখন পরি কি? ভিজিকে কাপড় দিতাছে বিছানা আনাতেরে তো নকী তালায় নাই। অন্যোপায়ের দিবে না?'

'কাপড় চাও? কত কাপড় যি পরবার পারো, আগে আনি দিতেছি। আমার ঘরে আসো।'

বাসিনী একেবারে বিস্মিত হইল। খোকার পরিত্যক্ত সহায়-সম্বলহীনা সে। পরিবার কাপড় নাই, ছেলে কোল। তার স্বামীহীন বিপত্নীকহীন দেহ। তাহার তো খানকতির মূল্যও নাই!

বাসিনী বলিল, 'আমাকে যাইবার চাও?'

নক উত্তর দিল, 'হান, হান, কও কি? পাঁচ বছর বৌ গিছে মেয়েডা রাইখা। কাউক কি ঘরে আনিছি না রাখছি? তোমাক বিয়া করবের চাই।'

জলের মধ্যে তখন বাসিনীর কাঁপুনী ধরিয়াছে। চাটুজ্জে আজন্ত খাইয়া বিবাহ প্রস্তাবের কথা সে জন্মেও শোনে নাই। কাঁপিতে কাঁপিতে বাসিনী বলিল, 'আমাক বিয়া করা কি বরযা? ঘাটাঘাটি করবের পারি না। শরীল খইড়া গিছে। চ্যাহারা লেখীর নাপাল হইছে।'

'ঘাটাঘাটি করবার লাগবে না। আমার কি আছে। কেবল মাওড়া মেয়েডার মা হয়া থাকো। মেয়েডাক ভুলায়া রাখছি মা অ্যান্য দেব বইলা।'

জলের তলায় বাসিনীর হাতখানা নক চাপিয়া ধরিল, 'চ্যাহারা? তোমার মতন চ্যাহারা কার? আমি তো একজাও দেখি না। খোকা ছিল বইলা আমার ঠিক ঠিকানাও তো নাই।'

বাসিনী নকর হাতের অবশিষ্ট ছিন্ন কাপড়েই নকের দেওয়া টিনের ঘরের সন্ধুকে উপস্থিত হইল। সেখানে দরজার বাহে নকের মাতৃদেবী বসা পিঁড়ির অপেক্ষায়।

নক বাসিনীকে বন্যার দিকে ঠেলিয়া

বলিল, 'এই যে, পুটি, তোর মা। বন্যার জলে কাঁদার ভিতা ভিজা আছে।'

বাক্যের অভাবে ধনী নকের বৃদ্ধা বন্যার অভাবে বৃদ্ধা বাসিনীকে জড়াইয়া ধরিল—'মা, আসি? আমার কাছে ভিজা আসি?'

বাসিনীর চোখের জল এইবার বিনের জলে মিশিল।

॥ দুই ॥

হংসদূত

'ঘনরন্ধ্রী, ঘনরন্ধ্রী, মনে পড়ে
হংসীমুখে আমন্ত্র-বারতা?'—

সেই জল আর এই জল!

বর্ষাবিধ্বস্ত গ্রামটির ভিতের ধারে দাঁড়াইয়া আছে হানিফা ফকির। নাতে

বন্ধ আদায় হিন্দিকের কার্যকলাপ পরিবর্তনে পাবনা শহর হইতে ব্যাভিন্নে হামিদ প্রায়ই লক্ষীতারবর্তী গ্রামগুলিতে আনা-যাওয়া করে।

তখন অনিবার্যভাবে যুদ্ধের ঘোড়ার মত তাহার পা দুখানি টানে পদ্মাকিল। পদ্মাকিল পার হইয়া চায়প্রায়। দক্ষপাশি অধিবেশের চায়ের অধিকারী ও সৈনিক পল্লী হামিদের এত প্রিয় কেন লাগে একমাত্র হামিদ ভিন্ন অন্য কেউ জানে না। যুদ্ধের ঘোড়ার মত পা তার নাচিয়া ওঠে। সে অন্তত একবার পদ্মাকিলের তীরে দাঁড়াইতে চায়। একবার যাইতে চায় সেই পরিত্যক্ত ভারবাড়ি যেখানে উৎকণ্ঠিতা প্রতীক্ষায় আকাশে চাহিয়া আছে।

জনশূন্য কলপুরী। কেউ নাই আজ সেখানে। রাজ-পরিবারের জ্ঞাতি খুড়তুতভাই প্রভাত রায় সম্প্রতি স্ত্রীসহ প্রবাসী। বিধবা কন্যা বৃন্দু কলিকাতার লেখিকা সুভদ্রা মিত্রের সাহায্যে প্রায়লেখিকার কাজ পাইয়াছে প্রাথমিক শিক্ষার পরে। সম্প্রতি কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি ভাল কাজ সুভদ্রা মিত্রের তাহিরে লাভ হইয়াছে। তাহারি উপর নির্ভর করিয়া প্রভাত রায় ও সাবিত্রী কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। আর থাকিবার কোন ইচ্ছা নাই। হামিদের জন্যই বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। ওখান হইতে ভারতবর্ষের বাহিরে সে চলিয়া যাইবে। অতএব পাকিস্তানের এই গণ্ড-গ্রামটিতে থাকিবার সাহস হিন্দু কম্যুনিটির কাহার নাই।

অবশ্য অন্য একটি কারণে সাবিত্রী আর এখানেই থাকিতে চান নাই। মণীন্দ্র, তাঁহার সাধের বড় ছেলে নির্বিচারে তাঁকে ছাড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিল। সৈতা ফেলিয়া, নিজের প্রাপ্য করিয়া গোস্বামীবাড়ী মণীন্দ্র এখন বনমালন স্বামী। মাতার অন্ন, পিতার বাসন, স্বজনবিবর্তিত কোনটাই তাহাকে ঠেকায় নাই।

মণির পরিত্যক্ত ঘরে সাবিত্রীর কয়েকটি দিন অতি অসহ্যভাবে কাটিয়াছে। যে মুহূর্তে নবসন্নিবীত অনুসহ মণি গমন করিবে, তাঁহাদের বসবাসের ব্যবস্থা হইবে, সে পর্যন্ত ওটাইয়া তোলা। বসুধারার ছড়ার ঘাসে গৃহপ্রাচীর শোভিত হইল কই? সে গৃহ পরিত্যক্ত। এখানে ওখানে মণির ফেলিয়া-যাওয়া দু-একটি জিনিস বিদ্যমান ফেলিতেছে। রাগার সময়ে ভাঙিয়া যাইয়া মণির প্রিয় আলুপোড় যা ফেলনের সর্বেসাধুরী যা তুলিয়া ফেলিতে যান। অবিলম্বে মণি সংক্রান্ত করে না। হঠাৎ মনে পড়িয়া যায়, বই কোথায় তাঁর ছেলে? কাঁকো ঘরের স্বামী বনমালন নিরালম্ব সন্ন্যাসী। সে মাতাপিতা হইতে ভরণপোষণ করে নাই। তার পরিবার নাই, সন্তান নাই। সুকোমল স্নেহ প্রীতি-মেহা সংসারে সে প্রেমের কোনো স্থানগ্রহণ পাইল না। কঠিন বিধাতা মাঠের কঠিন শিলায় সে সেবকাকে খুঁজিয়াছে। এদিকে মাতৃহৃদয় উঠেল, সমস্ত ভালবাসা চোখে করিয়া পড়িতেছে।

চোখ মুছিয়া কোটা আর উনুনে এক সাবিত্রী। রান্নার প্রবৃত্তি হয় না। উঠিয়া যান ঘরে। ওই যে কোণে চামড়ার চটিজোড়া, একখানা খদ্দরের চাদর—সমস্ত সে ফেলিয়া গিয়াছে। বিহঙ্গহীনে থাকে মনে পড়ে, শৈশবের ক্রীড়াপুত্তলি সে, কৈশোরে চঞ্চল, যৌবনে পরিণত। মাতাপিতার জন্য অল্প কালে সে কাজে লাগিয়াছিল। গঞ্জের হাটে দিনের পর দিন সে বাজার রাখিত, তত্ত্বাবধান করিয়া গুড়, আটা, ছোলা, ডাল, তিসি রাখিত। বাসায়ে বেহানের সম্মুখে টাকাটা বাবের হাতে সে নীরবে তুলিয়া দিত।

সে যে কি চায় বা চাইতে পারে এমন চিন্তা কখনও কাহার শিরোপীড়া উদ্রেক করে নাই। কেউ ভাবিবারও রাখে নাই মণীন্দ্র অন্য জগতের কিছু বা চাহিতে পারে।

যদি বা চায় কি সে চাহিতে পারে?

গঞ্জের সবচেয়ে বড় দোকানে ম্যানেজারী?

রূপসী মনোবৃত্তি অনুসারী বিলাসীর সুখের ভূমিকা?

নিজের অর্থে ক্রীত করেক পাকী জমি?

নিজের নির্মিত দালানকোঠা?

নিজস্ব আড়তে আড়তদারী?

যে অধিক লেখাপড়া করে নাই, সে কি চাহিতে পারে? ছেলেটাকে একজোড়া বই হাতে অনেক সময় বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত। কিন্তু তাহার হাতের বই সম্পর্কে কেউ কখনোবার প্রশ্ন হয় নাই। চলতি নাটক-নভেল ভিন্ন, সিনেমা-পত্রিকা ভিন্ন অল্পশিক্ষিত তরুণের আর কি পাঠ্য হইতে পারে?

সে নিত্য বৈকালে শ্মশানের বসিবে যাইত সত্য। কিন্তু ওখানে গ্রামের ছেলেদের আড্ডা। বিদ্রূপের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়া তাহারা পাশের বাড়ির মেয়ের দেহসৌষ্ঠব সম্পর্কে আলোচনায় রত হয়।

অতএব মণির কখন সাধারণ চাহনার উর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে কে জানে?

ঘরে ঘরে শত্রুমাতা থাকেন। বিভূতিপ্রিয়ার অভিজ্ঞ পরীর জন্যই বোধহয় বিনা কারণে নিমাইশিশুর বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু মণীন্দ্র বিবাহবিমুখী ছিল। মাতার ধারণা, পাকিস্তানী হিন্দুদের ঘরে যথেষ্ট সুন্দরী কন্যা না পাওয়া যোগ্যের বিবাহ-বিলম্বের কারণ। কলিকাতায় যাইবার আগ্রহ তাঁহার আরও বর্ধিত হইয়াছিল।

আজ যে মণি ধর্মীশ্বরীর নিত্য সে মন্ত্র, প্রাণময়, হৃদয়ময় মণীন্দ্র নয়, সে বনমালী। তাহার অন্তরে জানানো ভবিষ্যৎ। সে ভবিষ্যতে বিবেকানন্দ হইতেও বড়লোক না মনে করিবেন পুত্রের জীবন যোগ্যের ব্যর্থ। বিবাহে অন্ত প্রভাব মর্জিত করিয়া যেহের অপচয়ে তাৎকালিক সুখলিপ্সার ভেবে অধিক প্রাপ্য কি আর আছে? ক্ষীর, নবনী, মধু, মাংস, ডিম ইত্যাদি সুখাদ্যের ক্রমাগত ভোজনে বিহঙ্গ লভার নরম শরীর অজ্ঞাতসারে সুস্থতার দৃঢ়তর নিম্নে সুখলাভের কি প্রকৃষ্ট পন্থা?

—হায়, হায় সাবিত্রী!

চোখের জল চোখে শুকায়। আবার জলে চোখ ভরে। মন্থর জলে চলপ্রবাহ বাহার আজ একটি নারীর চোখের জল।

সাবিত্রী ছোট ছেলেকে সঙ্গে লইতে পারিলেন না। মণীন্দ্র অসুস্থাত হিল, চাকুরী ছিল না করিয়া বসুধারার মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত হইবে না। মাসান্তে বড় রাহখরিতে বসিয়া-খরিয়া যেমন আসে। তারপর সে যাইবে তা ছাড়া, এখন সকলে চলিয়া গেলে ভারবাড়ির প্রতি অবিচার করা হইবে। বসুধারার পূজা বন্ধ হইলেও পৌষী প্রভাতে ঘটস্থাপনা করা হয়। একটি পাঁঠা বলি পড়ে ভোগ-রান্না হয়। পরে স্নানাপূজা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা নয়-নয়ো করিয়া করিলেও করিতে হয়। এগুলি কে করিবে?

মুখ্যমাতাদের সঙ্গে কথা হইয়াছে ছুটি এবং শনি-রবিবারে নিয়মিত বাড়ি আসিবে। বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনাও করা হইবার। বিশেষত বর্ষায় ম্যালেরিয়া জ্বরে হাত-পা তুলিয়া অনাথ সহকার দেহরক্ষা করিয়াছে।

সাবিত্রী পুত্রের কথায় ভুলিলেন না। কথনের বৈকল্পতা পুতুল যে হয়ে গৃহবাসের কারণ তাহা বুঝিলেন। পূর্বে হইলে তিনি

বাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতেন। কিন্তু এখন ঈশ্বরে মন তাঁহারা দিয়াছে। এক মুহূর্ত অবিশ্বাসীর পুরবাসের ইচ্ছা নাই। বস্তুতই দূরে। কাছে থাকিলে কিছু সান্ত্বনা হয়তো পাওয়া যাইত।

নিরুপমের আশা মনে জাগে। রায়বাড়িতে সুপারিশ করিয়া যদি হরকে চাকুরি দিয়া দেওয়া যায়। যদি সংকুলজাতা পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া যায়। পুরাম নরকের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে।

সাবিত্রী যাত্রা দেখিতেন। অলৌকিক প্রাপ্তির আশায় প্রেতাত্মারক্ষী পূর্বপুরুষ কিভাবে হাহাকার করিয়া ফেরেন। তাঁরা কোন পৌরাণিক নাটক দেখেন। জানকী-চিন্তায় সাবিত্রী পাগল হইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। সেখানে রায়বাড়ির ছেলেরা আছে। বুলু আর সহায়-সম্বল হীন গৃহস্থ নয়। আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চয় বধূর দৃষ্টিতে ধরা দিয়াছে।

যাত্রার পূর্বে হামিদ আসিয়াছিল। ওই কলিকাতার নাম শুনিলে হামিদের অঙ্গে জোয়ার অপরিসীম উৎসাহে। অড়-ওড়া পাতার মত সে ছুটিয়া যায়। মনে হয়, কোন খবর পাইয়া মনে হয়, এরিয়েলের গান পাইয়া ভাগ্যান্বেষীদের বিদায়ের উদ্দেশে। কি করিতে চায়? ছটফট করে। বাড়ি ফিরিয়া নিস্তব্ধ—শয্যায় লুটায় হামিদ। অস্ফুটস্বরে বলে, অন্ধকারে শোনা কবিতা :—

'Love has gone and left me and
the days are all alike;
Eat I must, and sleep I will,—
and would that night were
here!'

রাত্রি নামে। অতীতের অন্ধকার জাল হাতে। জলে অনাবৃষ্টি গ্রামের শিয়রে রাত্রি যেন বেদুইনী কন্যা। কাল—কাল আসুলে রাত্রিকালো সুতার জাল বোনে। সমস্ত জলাশয়ের বাসনীয় বস্তু সে জালে গাঁথিবে—ইলিশ, কাতলা, পাবদা, রুই, চাঁদামাছ, ভাঙাবাহু। হামিদের ভাগ্যভাঙা মাছ। এমনি নির্বিঘ্ন অন্ধকার পল্লীগ্রামে নিশ্চিন্ত হামিদের ভাগ্যভাঙা বাবার জালে বুত। একবার চোখের জাল ছিঁড়িতে পারে দীর্ঘ অভিদৃঢ় অঙ্গুলি। কিন্তু সে ভাগ্যচক্রে অসহায় মীনপ্রায় বুত। মুক্ত সে জালের পঞ্জরে।

রাত্রি নামে। অন্ধকারে পরিচিত জগৎ যায় বিলুপ্তিপথে। নূতন তারা ওঠে গগন-সুরের আকাশে। সেখানে চাঁদের আলো জাগে। মানসলোক জাগে।

বিনাপ্রদীপে হামিদ কবি হয়।

হাতে কবিতা নাচে। সাদা পাতায় কালো কালি নাচে। কিন্তু সে কালো কোথায় যাইবে?

আবার বিছানায় ফেরে। ব্রহ্মচারী হামিদের শয্যা আজকাল বৃহৎ পাশবালিশ শোভিত। অন্তরঙ্গজন বিস্মিত হয়। হাতা শয্যা এখন তাহা সযত্নরচিত। ব্রহ্মচারী হামিদ সেখানে শয়ন করে। শয্যা একার নয়। নারত বিপত্নীক চিরকুমার হামিদুল্লার শয্যা এখন যেহতাপে তাপিত। সেখানে কল্পনা-প্রতিমা অলঙ্কার করে। সুস্থ নারবীর দেহ তার। বপ্রে-গড়া চোখ। ঘিলে-ঘিলে হামিদের মনের কামনা মূর্তি ধরে। মানসলক্ষ্মীকে আবাহন করিতে হয় যে শয্যায় সেখানে চাই বিলাস। রায়বাড়ির উপযুক্ত শয্যা। হিন্দুয়ানী দেবীকে ঘটে পটে-মূর্তিতে আহ্বান করেন। সেই কুমারী দেবী পীবর, সোনার বর্ণ, শয্যাবরণ কি পরিধান করেন নাকি? তবে তো উদ্যোগ আয়োজন হয় বস্তুজাত। মনোমত বস্তুতে দেবীকে অর্চনা করা হয়। কুমারীর উদ্দেশে কল্পনাকৃতিকের ভোগ প্রস্তুত হয়। দেবী কি ভক্ষণ করেন?

সেইভাবে নব-সৌরভিলিপ্তায় দীক্ষিত হামিদ একান্তে তার শয়নকক্ষটি সজ্জিত করিত। শয্যায় শুভ্রতা, শয্যায় কোমলতা. কয়েকটি ফুল বাসর কাছে ত্রিপাদীতে। লিখিবার ছোট টেবলটিতে কাব্যগ্রন্থ, লেখা উপকরণ। সরকারী তক্ত কাইল ইতিপূর্বে বাকী ফলাটে টেবল ভরিয়া জমা থাকিত। এখন সে-সকল নির্বাসিত।

কবিতা লিখিয়া যায় হামিদ। বেশিভাগ কলিকাতার পত্রেই ছাপা হয়। নূতন কেন-না কবিতা, মুদ্রণ আশায় প্রকাশকদের চিঠি দিতেছে। কলিকাতার যাওয়ার দিন অনুমান পাছে।

যাওয়া এখনও কি অনাগ্রহ?

বিবাহ সম্পাদন হইলে ছাপা নিয়মন আসিত। সুতরাং সেদিকে এখনও অসম্পূর্ণ।

কিন্তু গ্রামেরীভাবাপন্ন রায়বাড়ি কি চালাও পূর্বরাগের প্রযোগ আশ্বাস করে নাই কলাসের মত? পড়াশুনি যাও যাহার প্রয়োজন।

হামিদের অঙ্গে পর্যন্ত বেদনার রোমাঞ্চ জাগে। নূতন কবিতার জন্ম হয়।

সে যাহাই হোক, অজস্র সুখ তাহার পাওনা হোক। মানসলোকে হামিদ তাহাকে বরিয়া আছে। সুখান্বিতা বধূরা।

শেষদিনের অন্তে আকাশে জাগে দিবাজ্যোতি। বাতাসে মধুর শান্তি। জীবনের দিন শেষ হয় পরকালের অন্তরালে উদ্ভাসিত আকাশে। সেখানে জাতিবর্ণ নাই। দুইটি বিদেহী আত্মা সেখানে পারস্পরিক আলিঙ্গনে উন্মুখ

'সেখানে বিলিব। এখানে নয় কেন? আমি অন্ত অপারক্তের বর্ণের লোক। আমি অন্ত জাতিতে জাতিপাত অপরাধে দুষ্য। এই তো আমার ত্রুটি। অন্তরায় যাঁহারা যে বিমুখ নয়, আমি জানিয়াছি।

অন্তরঙ্গ মনের কামনায় নিত্য আমি তাহাকে জয় দেব। আমার দেহকম্পিত উত্তেজনার রাগে আমি তাকে মানুষের রূপ দিতে চাই না। প্রত্যহ আমার দুই হাতের বন্ধনে মানুষের মত সে আসিবে, যখন সভীর রাত্রি নির্জন।'

দুর্ভ যৌবন বিলম্বিত প্রলোভনে হামিদ দেহ যখন উষ্ণ করিয়াছে। তাই সুখদা হামিদ, কবি হামিদ চায় মানস-রক্তমাংসকে। সারা জীবন সুখদা যৌবন তার বৃভুক্ষু।

বিছানায় মুখ গুঁজিয়া হামিদ নিজে নিজে বলে :—

এমন তাপিত শয্যা,
এমন উতলা রাত্রির রচিত নিশাণ।
আমাকে যেমন ঘিরেছে,
এক বালা তেমি ঘেরে নারীদল।
হঠাৎ হাজার আকাশে জাগে চাঁদ,
কোটে তারা।
সমগ্র ভুবন শঙ্কিত প্রতীক্ষায়,
আ ঈশ্বর!
এমন আলিঙ্গনে স্পন্দিত
তার সত্তা কোথায়?
কোথায় আমার সমুদ্রবেলার
প্রান্ত উতলা সমুদ্রগান—
'দীরি দীরি যোয়াও বাকে?'
আই প্রাউড সিঙ্গিং।
কিন্তু তোমাকে জানায় কোন কানে?
তার চেয়ে,—সুরের বালক,
তুমি অতল সুখে নীড় গড়ো;
আমাকে নাই বা চিনলে।...

সেই বলা কবিতার রূপ নেয়, লেখা হয়।

(শেষাংশ ১১৩ পৃষ্ঠায়)

পুরোনো শতাব্দীর কলকাতা মহানগরীর বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের আকর্ষণ আজও কি অম্লান আছে?

হিন্দুর কাশীক্ষেত্র, মুসলমানের আজমীরশরীফ, পর্তুগীজ-ফরাসী-আর্মানী-ইংরাজের ক্যালকাটার সেই ঐতিহ্যময় সপ্তাহ রূপ-লাবণ্য কালের যাত্রায় কিছু যেন ম্লান বিদ্ধ আকৃতি ধরেছে। হাতে হাতে ঘুরে বেড়ানো, আলো ঝলমল জবজবাট কলকাতা শহর স্বাধীনতা লাভের পরেই রাজনীতির আলোচনাস্তর থেকে প্রথম ধাক্কা লাভ করে। আজ আর বলতে বাধা নেই, কলকাতাকে যারা ঠিক চিনতো বুঝতো ভালবেসেছে, পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার সম্ভারে সাজিয়ে তিলোত্তমা বানিয়ে তুলেছে, শুরু প্রেমিক সেই ইংরাজদের বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা যেন বিরহিণীর বৈরাগী রূপ ধরেছে। এতদা মোটা ভারতবর্ষের হেমাক-হেমাক টাকা রেন্ত, সমস্ত ভূতাহত তোলপাড় করে এই কলকাতাকে শ্রিয়তমা মনোনীত করেছে তৎকালীন জন বুল কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিরা। কলকাতার মত এমন প্রতিকূল জলবায়ু ও আবহাওয়া ভারতের অন্য কোথাও মেলে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের, কাজ-কারবারের সুবিধাজনক পরিবেশ কলকাতার শ্রেষ্ঠত্বের আকর্ষণ। শহরের নদীর বন্দরের অবস্থিতি এমনিতেই দুর্ভাগ্য। কলকাতা বন্দরের চুম্বক-আকর্ষণে সমস্ত দুনিয়া সাড়া দেয়। ইংরাজ তাই কলকাতাকে পাট-রাণীর প্রাধান্য দিয়েছে, রাজধানী স্থাপন করেছে কলকাতায় বুকে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে নানা প্রয়োজনে কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। তবুও বৃটিশ সরকার কলকাতার কৌলীন্য রক্ষা করেছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে কলকাতা যে অপরিত্যাজ্য, ইংরাজরা তার প্রমাণ দিয়ে গেছে প্রতি পদে।

ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী সর্বজনশ্রদ্ধেয় জওহরলাল নেহরু দিল্লীতে আহূত এক রাজনৈতিক সম্মেলনে ভাষণদান প্রসঙ্গে দিল্লীকে 'সিটি' বা শহর আখ্যা দেওয়ায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে থেকে স্যার ক্যাকোর্ড ক্রীপস্ তৎক্ষণাৎ সরবে আপত্তি জানিয়েছিলেন। স্যার ক্রীপস্ জানতে চেয়েছিলেন, দিল্লীতে কি 'সিটি'র উপযোগী সব কিছু আছে? অর্থাৎ আর্ট গ্যালারী, থিয়েটার, বাদুঘর, পাঠাগার, রেস্ কোর্স ইত্যাদি?

নেতিবাচক উত্তর দিয়েছিলেন পণ্ডিত নেহরু। কিন্তু তিনি ভুলতে পারলেন না

● কলকাতার ঘাটের

ক্রীপস্ সাহেবের টীকা ও মন্তব্য। অবশ্যের সরকারী বিভাগে দিল্লীতে আর্টগ্যালারী, গ্যালারী, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতির স্থাপনের উদ্যোগ চলতে থাকে। কলকাতার মত দিল্লীকে প্রকৃত 'সিটি'র পর্যায়ে তুলতেই হবে। হয়তো আর মান রক্ষা হল না। দিল্লীকে সাজানোর প্রচেষ্টা আজও চলেছে। হয়তো ভবিষ্যতেও চলবে। যদিও দিল্লীর অসহ গরম ও দুঃসহ ঠাণ্ডা প্রাকৃতিক নিয়মে থাকবে অপরিবর্তিত। যমুনা নদীর দুর্দিন কবে যে মোচন হবে কে বলতে পারে! ইতিহাসে লিখিত আছে, দিল্লীর নাবরাজ অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমান সম্রাটও দিল্লী থেকে কতেপুর সিক্রীতে রাজধানী স্থানান্তর ক'রেছিলেন। সিক্রীতে যেমন গরম তেমনি নিদারুণ জলাভাব।

দিল্লী দূর অস্ত!

কলকাতাই আমাদের মত বাঙালীর কাছে সুখের স্বর্গ। এমন কি অন্যান্য প্রবাসীদের কাছেও কলকাতা শহর এখনও ফাঁসকুড়া।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

প্রাণতোষ ঘটক

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

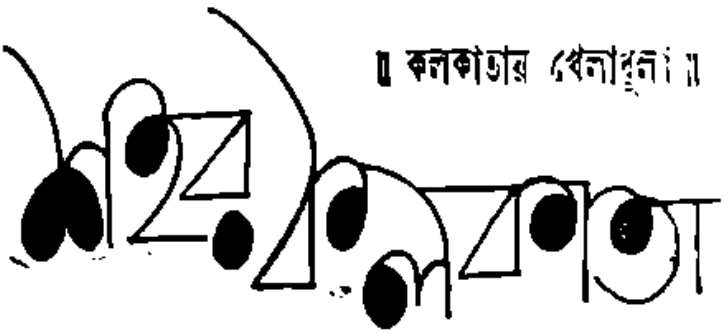

মহাবিপ্লবী 'দিল্লী চলো' মন্ত্র শুনিয়ে সবাই যেমনভাবেই 'দিল্লী' যাবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেখানের দুর্গ উচ্ছেদ করতে হবে। ঔপনিবেশিক সরকারের পতাকা ধ্বংস করতে হবে। বিজয়ীর বেশে 'বিজয়ী' হতে হবে। সাংবিধানিক সংবিধান রচনা করতে হবে। বিজয়ের গর্বে ভারতীয় নিশান উড়াতে হবে

আজ সত্যিই দিল্লী আমাদের অধিকারে। সাংবিধানিক গণতন্ত্রের পতাকা উড়ছে ভেরেন্ডা! লক্ষ্মান ব্যাঙের ছেলের সন্তান আমরা। আমরা বহুদেশবাসী। আমাদের চোখ হলুদবিহীন বটে, মুক্ত স্বদেশের নীল আকাশে যখন দেখতে পাই উজ্জীয়মান ত্রিবর্ণ পতাকায় ধূর্মচক্রান অশোকচক্র।

আকাশের সূর্যকে দেখলেই বাঙালীর স্মরণে আসে সূর্য সেন। চন্দ্র দেখলেই মনে পড়ে সুভাষচন্দ্রকে।

• • •

কলকাতা নামে দিল্লী প্রসঙ্গে দুঃখজনক হলেও বলতে হয়, কলকাতার আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও সুখোজনক আকর্ষণ আজও অটুট আছে বিশ্বাস না করেন, ঘোড়দৌড়ের মাঠে চলুন। আর কোথাও যেতে হবে না। চিড়িয়াখানা বা যাদুঘরে আপনাকে যেতে অনুরোধ করছি না। এমন হইচৈ পেশন কমি না। আপনি রেস্ কোর্সে চলুন। দেখতে পাবেন, পৃথিবীর যেন জাতের লোক নেই এখানে জমায়েত হবে। দেখতে দেখতে আপনার মনে পড়বে লীগ অফ নেশন্স্। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এমন পুঞ্জীভূত বিশ্বরূপ কুত্রাপি দেখতে পাবেন না। ইউ এন ও'তে কথা কাটাকাটি, পাল্টাপাল্টানি, ভোট আউট, ভেটো প্রদানের হৈ-হুল্লোড় চলে। কলকাতার রেস্ কোর্স আনন্দের কলকাকলিতে মুখর হয়। কলহ-কথা নেই, বাদ-প্রতিবাদ নেই, জাতির অভিযোগ নেই। অশান্তিও নেই।

কলকাতায় ঘোড়দৌড়ের খেলা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

হাট, পাশা, দাবা, ছক্কাপাঞ্জা খেলায় অভ্যস্ত ছিলাম আমরা। চার দেওয়ালের ঘরে ব'সে ঘরোয়া খেলায় বড় মাতামাতি। মহাভারতের পাতে পাতে পাশা খেলার বৃত্তান্ত আছে। খেলতে খেলতে টাকাকড়ি ধনরত্ন রাজ্য-সাম্রাজ্য নয়, পঞ্চপাণ্ডবী তাঁদের একমাত্র সহধর্মিণী দ্রৌপদীকে বাজী রেখেছিলেন জুয়াড়ীদের মানসম্ভ্রম।

মুক্ত-প্রাঙ্গণে খেলার কায়দা-কানুন আমরা বিদেশীর কাছে শিখেছি। ছা-ডু-ডু, বাইচ, ঘুড়ি ও লাটিখেলা, এঁড়োয়ে বাঙালী জাতি চিরকালই পাকা-পোক্ত। মনের সঙ্গে চলতে চলতে ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস্, হকি, পোলো খেলা আমাদের শিখতে হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বলবৎ রেখিয়ে তারার চুনিকার স্বীকৃতি পেয়েছে বাঙালী খেলোয়াড়। আবার বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর চ্যাম্পিয়ন, ক্যাপ্টেন, খেলোয়াড়রা এসে সগৌরবে খেলা দেখিয়ে গেছেন কলকাতার মাঠে-ময়দানে।

গুরুগম্ভীর আলোচনা থাক। কলকাতায় শহরে খোলামাঠে খেলাধূলার প্রচলন কবে থেকে সুরু হ'ল তারই বিবরণ যৎকিঞ্চিৎ জানাচ্ছি পাঠক-পাঠিকাকে। সেকালের আমোদ-প্রমোদে খেলাধূলা স্থান পেয়েছে সগৌরবে

কলকাতা শহরে প্রথম ক্রিকেট খেলার অনুষ্ঠান হয় ইং ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী। সে যুগের পত্রিকায় প্রকাশিত একটুকরো সংবাদ :

'প্রাচীন কলিকাতায় ক্রিকেটের প্রথম প্রচলন হয়, ১৮০৪ খৃঃ ১৯শে জানুয়ারী। উক্ত দিবসে কোম্পানীর ইউরোপিয়ান সিভিল-সার্ভেন্ট ও অন্যান্য ইংরাজদের মধ্যে প্রথম 'ক্রিকেট ম্যাচ' হয়। ইহার পূর্বে প্রকাশ্যভাবে ক্রিকেট ম্যাচের আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।'

● এম সি সি'র দলপতি মিঃ ডি এ্যালেন ও দলপতি মিঃ বিলি গ্রিফিথ ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত টুর্নীয় টেস্ট খেলা দেখছেন।

ঐতিহাসিক কটন সাহেবের কলকাতার ইতিহাসে আরও একটু বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া যায়। কটন বলছেন,—

'The first notice we can find of cricket in Calcutta is that of a grand match, played on the 18th and 19th of January, 1804, between the Etonian Civilians and all other servants of the company resident in Calcutta. The Etonians, it is related, scored 732, while their opponents, who had two innings to their one, were not able to total more than 80'.

কলকাতার ঘোড়দৌড়ের কাহিনীর প্রথম অধ্যায় অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। 'সমাচার' দর্পণ' যেসব বই পাওয়া যায়, সেকালে ঘোড়দৌড়ের ইস্তাহার আত্মপ্রকাশ করতো। তৎকালীন একটি ইস্তাহার বলছে,—

'আগামী ৮ই ১ই ও ১০ই জানুয়ারীর বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার ঘোড়দৌড় হইবে। এজন্য প্রাতরাশ ও

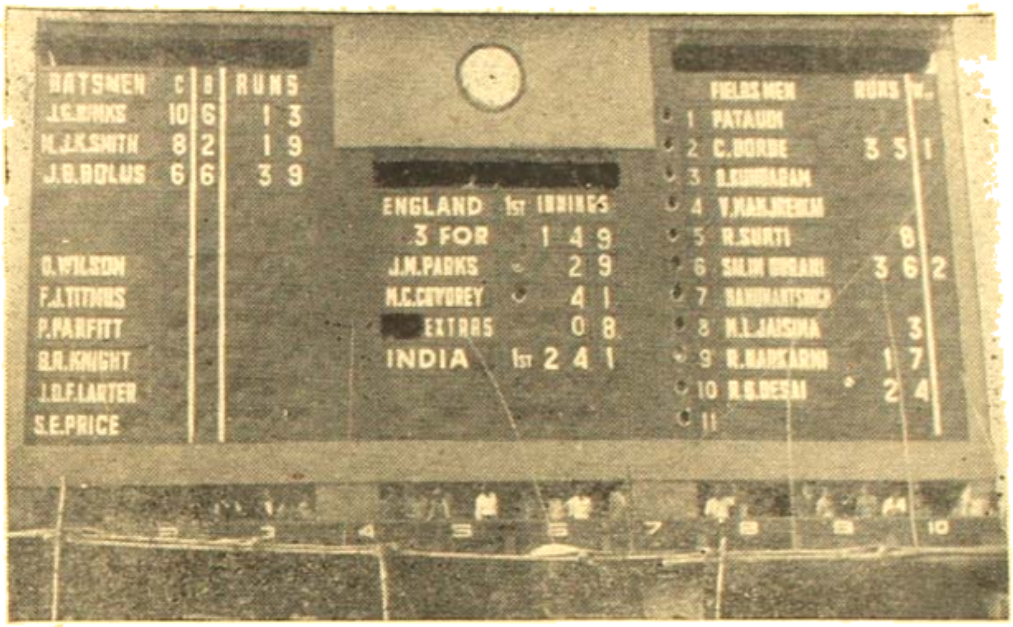

● ইডেন উদ্যানের টেস্ট খেলার স্কোর-বোর্ড।

সঙ্গীতের আয়োজন করা হইয়াছে। যাহারা ঘোড়া ছুটাইতে ইচ্ছুক, তাহারা ঘোড়া সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সম্পাদকের নিকট জানিতে পারেন।' (১২ই ডিসেম্বর ১৭১০ খৃঃ)

সম্ভবতঃ এই ঘোড়দৌড় কলকাতা শহরের নিকটবর্তী স্থানে হয়ে থাকবে। সেই সময়ে বারাসত অঞ্চলে ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল। কলকাতার বর্তমান রেসের মাঠ তখনও সম্পূর্ণরূপে জঙ্গলবিমুক্ত হয় নি। কিন্তু তার জন শোর (পরে লর্ড টেন্মাউথের)-এর আমলে, কলকাতায় মাঠে ঘোড়ের ব্যবস্থা হয়।

সমাচার দর্পণের ইং ২২শে ডিসেম্বর ১৮২৭; বাংলা ৮ই পৌষ ১২৩৪ অব্দের সংখ্যায় একটি সংবাদে প্রকাশ,—

'কলিকাতার প্রথম ঘোড়দৌড়েতে একটী দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল বিশেষতঃ তাহাতে শ্রীযুত মেজর পিলবর্ট সাহেব ও শ্রীযুক্ত বাসবেল সাহেব স্ব স্ব অশ্বারোহণ করিলেন এবং যে সময়ে অতিবেগে তাহাদের ঘোটক নিরূপিত স্থানে আসিতেছিল সেই সময়ে একটীর এক বালক একটা টাট্টু আরোহণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে পড়িল তাহাতে ঐ দ্রুতগামি অশ্বেরদিগকে থামাইতে না পারাতে ঘোড়া ঐ টাট্টুর উপরে পড়িল তাহাতে তাঁহারা অশ্ব হইতে পতিত হইলেন তাহাতে অতিশয় আঘাত হয় নাই কিন্তু ঐ বালকের প্রাণসংশয় প্রকারে ভাসিয়া গিয়াছে।'

সমাচার দর্পণের মতে প্রথম দুইটি খেলা হিসাবে এই খেলাকে ঠিক গণ্য করা যায় না কেন না হিকির গেজেটেও রেস্ খেলার প্রথম বিজ্ঞাপন দেখতে পাওয়া যায় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর আমলের শেষ ভাগে। ইং ১৮০৩ সালে ভারত ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়। আগে গার্ডেনর'চ বা বর্তমান মেটিয়াবুরুজের উপান্তভাগে, আকড়া-বাকরখানায় ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল। বাকরখানা নামের কারণ, এখানে কোম্পানীর একটি ম্যাগাজিন বা বারুদখানা ছিল। বর্তমান ঘোড়দৌড়ের মাঠ খোলা হয় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে।

আশ্চর্যজনক ঘটনা, সেযুগের ঘোড়দৌড় কলকাতার মাঠে সকালবেলায় খেলা হতো। সকালের কুয়াশা কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হ'লে তবিয়া মাঠে নামতো। বটন সাহেব বলছেন,—

'Racing was always popular in old Calcutta. The Bengal Jockey Club came into being in 1803 and not even Lord Wellesley's disapprobation could extinguish the ardour of the Anglo Indian sportsman. Lord Valentia notes that on Lord Wellesley's arrival in the country he set his face decidedly against horse-racing and every other species of gambling. Yet, at the end of November, 1803, there were three days' races at a small distance from Calcutta'. There must have been run, in all probability, on the course which existed at the end of Garden Reach, on the site of what was afterwards the Akra Farm. Still, it was many years before Calcutta racing altogether revived from the shock, and it was not until March, 1816, that the races again commenced under the patronage of the Marquess of Hastings. On each of the three days, two races were run; and as the events were decided in the morning after the fogs had disappeared it must have been warm work for both horses and on-lookers'.

কলকাতার ঘোড়দৌড় সম্পর্কে অবশ্যই এই বেরী লিখিত 'The Good Old Days of Honourable John Company' নামক গ্রন্থে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বেরী বলছেন যে, কলকাতার রেসের মাঠে

[illegible] ১৮১৬ [illegible]
[illegible] ১৮১৬ [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

practice hither to. There were races also regularly held at Barrackpore. They commenced as early as 1816'.

কলকাতার বহরমে সেই ঐতিহাসিক রেসের মাঠে আজও সাড়ম্বরে ঘোড়দৌড়ের অনুষ্ঠান নিয়মিত চলেছে। সারা ভারতবর্ষ থেকে ঘোড়ার কারবারী আর রেসুড়েদের সমাগম হয় কলকাতায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিভিন্ন জাতির সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। কেবলমাত্র পুরুষ নয়, প্রচুর মহিলাও খেলার মাঠে হাজির থাকেন। পুরুষদের সঙ্গে সমান উৎসাহে মেয়েরা রেস খেলেন, রেস দেখেন। খেলার শেষে দেখা যায়, কারও মুখে হাসি, কারও মুখে বিষাদ ও নিরাশা। বোঝা যায় মুখ দেখলেই, কে জিতেছে আর কে হেরেছে।

অশ্ব খেলা বা কথা, ঘোড়দৌড়ের মাঠে গেলেই আপনিও দেখতে পাবেন কলকাতার সম্মোহিনী আকর্ষণ এখনও বিলুপ্ত হয় নি। বরং ইদানীং বৃদ্ধি পেয়েছে। লক্ষ্মীমন্ত জাতিপুঞ্জের এমন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অন্য কোথাও আপনি দেখতে পাবেন না। দিল্লী দূরের কথা, নিউইয়র্ক বা প্যারিসেও নয়।

তাই বলছিলাম, দিল্লীকে আজ যতই সাজানো গোছানো হোক, চিরযৌবনা কলকাতা নগরী (কেন্দ্রের অবহেলা অনাদর সত্ত্বেও) সগর্বে ও সহাস্যে আজও আনন্দ দান করছে ভারতবর্ষ নির্বিশেষে সকল দেশের মানুষকে। প্রাদেশিকতার স্বীকৃতি আর যেখানে থাক, অন্তত শহর কলকাতায় নেই। অবিশ্যি ঠেকলে আপনি যেতে পারেন চিড়িয়াখানায়, যাদুঘরে।

কিন্তু আপনি কি পারবেন খাঁচায় থাকতে? কিংবা জীবিত অবস্থায় যাদুঘরে টাঙ্গের আলমারীতে—

তদপেক্ষা ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে কলকাতার মূল্যমান যাচাই করতে পারলে আপনি হতেন লাভবান হবেন। সর্বজনীন কলকাতার আসল রূপটি দেখতে পাবেন। তারপর কেউ যদি কলকাতার প্রতি দোষারোপ করে, আপনিই তখন জোরালো কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাতে পারবেন। বলতে পারবেন, শহর কলকাতা আন্তর্জাতিক খ্যাতিতে আজও অদ্বিতীয়। কলকাতা আর মেহলীতে অনেক ফারাক। প্রায় আসমান জমিন!

আজ দিল্লীতে রাজনীতির খেলা চলেছে। যদিও আসল খেলা এখনও চলেছে কলকাতায়। ফুটের মাঠে, ইডেন উদ্যানে, রেস কোর্সে, রবীন্দ্র সরোবরে। খেলার ময়দানে কলকাতার অলিতে গলিতে উঠানে আঙিনায়।

একটা অপবাদ চালু আছে বাঙালীর নামে, সে নাকি শুধুই কাঁদতে জানে। আজ পৃথিবীর সকল জাতি জেনেছে, বাঙালী খেলতেও জানে। প্রদীপ, জয়দীপ, দুর্গা এই কলকাতার মাঠের ফসল। তারা কেউ দিল্লীর ফসল নয়।

● তৃতীয় টেস্ট খেলার প্রথম দিনে মার্কেন্ডের বলে ইংলণ্ডের দ্বিতীয়ের ঐ বোল্টার ৬৬ রান করে উইকেটকিপার প্রাউট ক্যাচ আউট হন। মার্কেন্ডকে হাত তুলে অভিনন্দন জানাচ্ছে বোলার

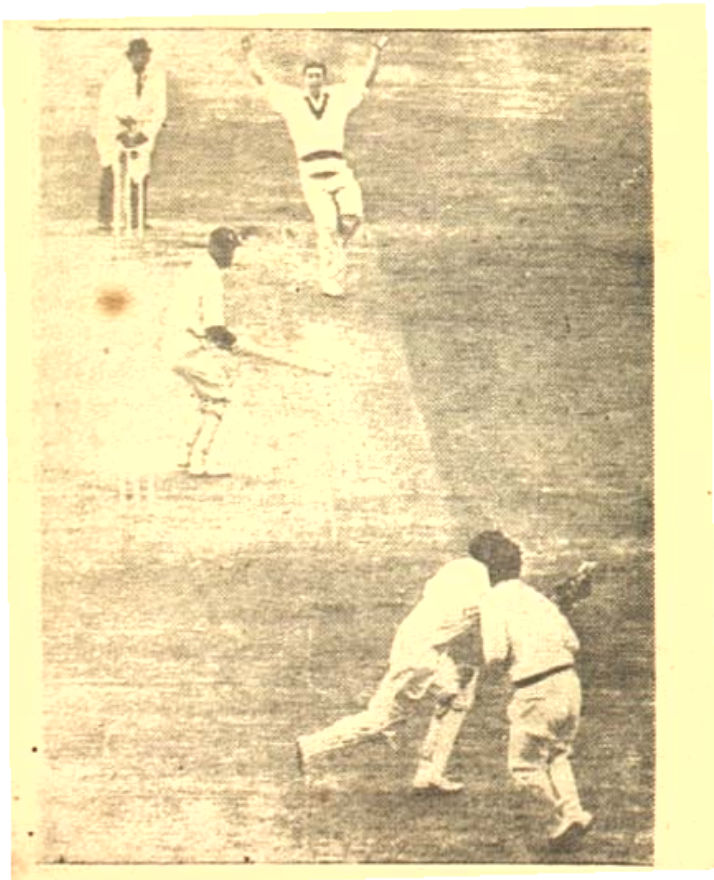

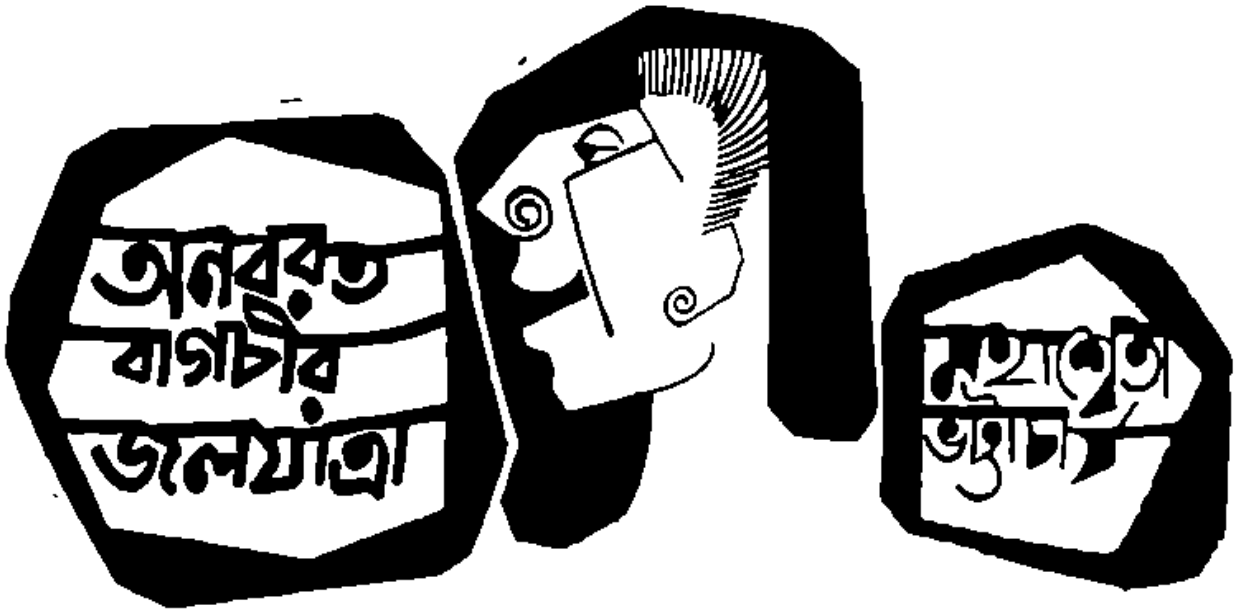

দোতলার [illegible] চেয়ে রাজেনবাবু [illegible] বললেন, 'কি [illegible]। এখন বেরুবে এখনো আমার ছোট ভাইয়ের [illegible] মনে পড়ে। [illegible] হয়, আমি আসলে [illegible] কিনা!'

'কেন, হঠাৎ কি মনে

আমার এহেন [illegible] রাজেনবাবু শঙ্কিত হলেন না। হেসে, 'কেন হঠাৎ মনে হবে কেন? যে ভাওয়ালিটিতে [illegible] চাষ-বেরোতো নিয়ে আসতে পারেন না?'

'আচ্ছা ঐ যে বললেন [illegible]...'

'হ্যাঁ, অবশ্যি হয়েই ত।'

'তাই ভাবলুম...'

'সে ডরার ভয়ে না। ছাড়ুন ঐ বাজেটটা [illegible] বলেন না, আপনার বইটার [illegible] উপহার। বাঙালিমনের [illegible] বেরে ত, 'বিখ্যাত লজ্জা ওরে

রাজেনবাবু কিছুক্ষণ হাসি-হাসি মুখে [illegible] দিকে চেয়ে রইলেন তারপর নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'হকলকে বুঝিয়ে চিলেকোঠার ঘরে বসে তৈরি করেছিল।'

'ওরকম লেখা কিন্তু একসময়ে ঘরে ঘরে বানাত সবাই।'

আমার কথায় শান্ত রাজেনবাবু ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 'আজ্ঞে না। নাচের [illegible] দেখেছেন? আমাদের [illegible] পুকুরের বিখ্যাত জলযাত্রা। একেবারে [illegible]...'

রাজেনবাবু চুপ করে গেলেন এবার নিয়ে পঁচবার হল [illegible] পঁচবার পাঁচ বছর পরপর নিয়ে আসছেন [illegible]

[illegible]
রাজেনবাবু, বাগচীমশাই, [illegible] মুখোপাধ্যায়ের [illegible] প্রত্যেকবারেই [illegible] কেমন করে যেন নামে [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
'আ

[illegible] বেরে যায়
'ওটেনবার্গ সাহেব আসবে
অনবরত বাগচী মুহূর্তে হয়েছেন
'হাসি গাইডটে মাসে গোলাপিটের
[illegible] সাইকোলজিস্ট [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [

'চলুন আজকে কি সর্বানন্দে ওষুধে হাতেখড়ি আমার তুলেছিল।'

'সর্বানন্দ কি রকম?'

আমার দিকে তাকিয়ে চুপিচুপি হেসে ডাক্তার বললেন, 'মাতিনের মায়ের নাম সর্বানন্দ।'

খিস্‌খিস্ করে রাজেনবাবু বললেন, 'আর হলে আর হোক। মাতিনের নাম শুনিয়ে আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না।'

বলা-না-বলা ক'রে কি একটা সুর ভেঁজে বললে, 'না না, জেনে রাখা ভাল। জানের শেষ নেই। তা ছাড়া আমি যে-সব সার্কেলে বেলাবেশা ঘুরি, তারা নানারকম খোশগল্পের সন্ধানই নেতে থাকে।'

'সত্যি বরদা, সত্যি,' মুক্তকণ্ঠে সোল্লাসে বলে উঠলেন।

অনন্তর বাগচী বললেন, 'নেপু চাটুজ্জেকে আপনারা কেউ চেনেন? মুক্তাগাছার ভেঁপু চাটুজ্জেকে মনে থাকতে পারে। এক সময় আপনাদের পাড়ায় পেল্লায় আপিস খুলেছিল, সম্পত্তি বেচাকেনা করত।'

'মনে আছে।'

'অতিশয় দুখ জেলেদের হাতে বিস্তু ভাবের প্রকৃতির ছেলে। লাইনের শেষ ছিল না। বারোয়ারীর মেটিনুমুরে রাতে চোঙা ফুঁকে ইস্কুল পালিয়ে বর্ষতলায় গিয়ে এক সার্কাসকে ঘরে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। আমরা বলতুম সার্কাস কিনলে কেন! ও বলতে, না, আমি বলতুম, এর নাম হচ্ছে সরাইস হাউস। এই মুহূর্তে নিয়ে যেতার পূর্বপুরুষরা ঘরবাসে বাস করতে বেরুত, ছেলেরও স্পেশালিটি।

'ছেলেবেলাতেই ঐ। তারপর যত বড় হতে লাগল, ততই স্বভাবে খোলতাই। ওর ভয়ে ওর বাবা ইজারীর নিরুদ্দেশ হয়েই থাকতেন। শেষটায় ভেঁপু বাপের মৃত্যুসংবাদ হাঁপিয়ে ফিরে হাজিরাতি সুরু করে। খবর পেয়ে ওর বাপ ভাঁ রাসে কাঁপতে কাঁপতে কলকেতায় উপস্থিত। হতভাগা একবাড়ি লোকজনের সামনে বলে কিনা এই না হলে কি আর আপনি আসতেন? এয়েছেন যখন তখন পুত্রবধূ আর নাতিদের নিয়ে যাবুন এবার আমিই যাচ্ছি।'

'সেকাল শেষ অবধি?'

'আপনিও যেমন, বাবার মধ্যে মাঝে মাঝে শুধু ফেলে যেত। তার মত জন্মাত আর কোন্ চুলোয় যাবে?'

'যা হোক, ভেঁপু চাটুজ্জের উপন্যাসটাই শোনা হবে নাকি?'

'তবলে উপকৃত হবেন রাজেনবাবু।' অনন্তর বাগচী মুচকি হেসে বললেন, 'আমার মেজ ছেলের যে আপনার শিষ্যা যে লালুবাবার কাছে থাকে মনে পড়েছে, সেই ভেঁপু।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ মশায়, প্রত্যেকটা জেলেরবাবের পর ওর মোর বৈরাগ্য আসে। এই সেদিনই বলছিল আর নয়, এবার একেবারে বর্ষের দিকে যাব। যাক্ সে, নেপু যদিও ভেঁপুর ভাই, তবু স্বভাবে মোটেই মিল নেই। তাঁর অবাধিক স্বভাবের নিরীহ ছেলে। ভেঁপুর মত হাবার জন্যে ওর দু-একটা অধিধিক্ষা খারাপ হয়, কিন্তু সে আর কি করা যাবে। যাক্, ভেঁপু যেমন বেটি ধরত, সেটি ফসত, নেপুর ছিল তেমনি পাথর চাপা কপাল।

'নেপু যেবন চাকরী পেলে অমনি অফিসের কানিশ ওত বাড়াবা পড়ল জলে। নেপু গেল আসামে এক চা-বাগানে, ম্যুবিকল্পে ম্যানেজারের বাবাই যো'ল আনে। আসাম থেকে নেপু যেদিন কলকাতা এল, সেদিন থেকেই ভেপুর এল তার পিছুপিছু।'

'আপনার মনে স্বভাবই এ প্রশ্ন হতে পারে, যে ভা নেপু একটির পর একটি চেষ্টা করত কেন।'

'না না, তা কেন।'

'কি যে বলেন?'

'শ্রেষ্ঠ হল লক্ষ্মী।'

আমাদের সমবয়সকে বাধা দিয়ে বাগচী বললেন, 'আপনারা হচ্ছেন অত্যন্ত পিওর, অতি বোকল। কু-প্রশ্ন আপনাদের মনে মোটেই হয় না। আমার কিন্তু মনে হয়েছিল। নেপুকে অযোগ্য। বলতুম ইনটেলেক্ট গিয়ে বল্, না, আসলে অমে ভেঁপুর ভাই করে পাঠিও না, পরবর্ত কপাল ফিরু, অমে ফিরে পদাতে দাঁপিয়ে পড়। নেপু বলতে নারা, সেটি পারব না। কেন না আমি ইচ্ছি

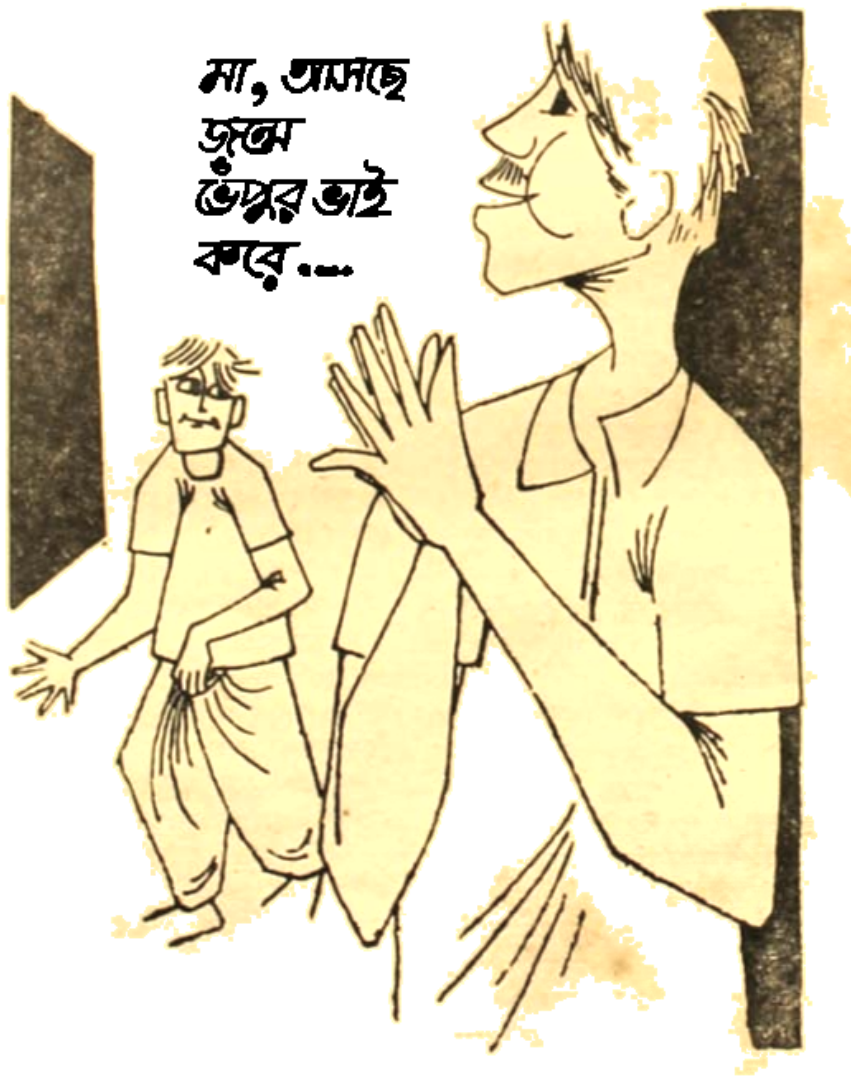

আপ-নোটিক, ফর্ম এখানেই, হাজীবুল্লা-এ বিষাদী। যা হবে সব এ অঙ্কেই হওয়া চাই। এ বিষয়ে আমার সঙ্গে অনেকের মিল পাবেন, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে জলে ডুবে মরতে-উঠতে মন মোর নহে রাজী।

'আমি বুকলুম এর আড়ালে আছে ভূপেনবাবুর দেবের চাটুজ্জেদের বিখ্যাত ঘোঁ। বেণু তার দু'হাত পুছে তুলে আকাশের দিকে তাকাল, একবার না পারিলে দেখিব শতবার, তবু পিছিয়ে পড়ব না।

'আজকাল বেণু একটার পর একটা ঢেঁকুর তুলে চলল। আর আমি বেজায় বিপদের কাছে। বাবার আগে বেণুকে জলে নেমায়, সব চাঁই তোর কাজ আছে আমি সেই কাজ সব খুঁজিয়া, কিন্তু যদি ডাক প্রয়োজনে, তবে সর্বদাই আমি এগিয়ে আসব।

'তারপর বেণুর খবর আর রাখি না। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হয়ে-টয়ে ভাগবর্ষের তোল পাল্টে গেছে। বেণুর এখন জমজমাট বাড়বাড়ন্ত। তার বাবা তাকে পেন্নায় এক কাজ জোগাড় করে দিয়েছেন। বেণু এখন খোটে খাকে আর নবীন যায় তবে খেলায়।'

'মাছ গোনা যায় না।'

'আরা, মাছ গোনবার মেশিন বের করে আমাদের গভর্নমেন্টের ডাক্তার বেজুতে রাশভুজন লাহার ভাইপোটে পেয়ে গেল, আপনি জানেন গোনা যায় না! জানবেন বিজ্ঞানের অসাধ্য কিছিকা নেই। এ হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ।'

'তারপর? মাছে আসুন, মাছে আসুন।'

ঘড়ির দিকে চেয়ে বেলে বাসটী বললেন, 'ছুটো মিনিটে পিসফিক্স অবজেক্সন হয় ভাই, এক ঘন্টে কথা, অনেকটী হচ্ছে কথা। মেয়েদের সবটা বলবারই বলতে গেছি তবুবারই পিছনে গেছে। আমি আবিশ্যি হাল ছাড়ি নি। দুই কাঁপাতিত মাছ নাচিয়ে প্রতিটি সভায় ভেতর কাঁপিয়ে পড়েছি। কিন্তু শেষ অবধি আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। এই-ই হয়। মাছের প্রসঙ্গে যখন পৌঁছবার তখন পৌঁছব। অধীর হলেই কাজে যাবে জেন।'

'অবিশ্যি বলতে চাচ্ছি, বলতে পারছি না এমন সবজা আরো অনেক আছে, যেমন টাকা, কিন্তু আমার সে-সবে কোনদিনই আগ্রহ ছিল না, যার সে, এই মেয়েদের কথা। সন্ধের দেকে মাছ ধুয়ে বিটায়ার করে বসে আছি, ইয়া ভল আনতে-টানতে খোঁজ নিচ্ছি কোথায় লাইফ-মেম্বর হয়ে ঝুলে পড়া যায়, খাই কি খাই, জানেকবার, এই প্রসঙ্গেই বেঁপুর সঙ্গে দেখা। ও-ও একটা আশ্রম করেছে কিনা! আমায় অনেক পোড়াল। বলল, চলে এস, চলে এস। এই একটি মাত্র যাদের, যাতে বয় কম্পিটিশনই থাকুক না কেন, তবু পার্সিবিলিটি আছে।'

'কিন্তু না,' ভাজেনবাবু খিকখিক করে হেসে বললেন, 'অবশ্যে কিনোদ করে দেখুন, এর পাশা সন্ন্যেসী হয়ে গেছেন বলে ও এলাকার কিছুই, বাজনায়, ইত্যাদি অনেকটা জায়গার মাছুয়োলাদের আখড়া বাঁধনের ইঁদুর-বাঁচা করে বেরেছে। বেরেছে প্রসঙ্গেই অতি চিত্তাকর্ষক ছিলেন।'

বলা বেশিরে বড় খুঁতোয়ার বড় বাঁদি-বেঁধে গলায় বললে, 'মোর কম্পিটিশন। তা ছাড়া এখন আর মিনিমিন খাওয়া, কুছ্-চাহন কথা এসব পাঁচ চলে না ও! চাই ভাল ব্যাপিটাল, আর চাই ভাল কানেকশন।'

আমি বলতে চাইলাম ব্যাপিটাল এবং কানেকশান থাকলে লাভ হতে যাব কেন, যে কোন কাজ করতে পারি।

অনবরত বাসটী বললেন, 'ওতেও কিছু হবে না। আসলে প্রথম আত্মপ্রকাশটি লাটুকে হওয়া চাই। অবিশ্যি তার পরেও লাগ থাকা চাই। বেঁপুর বোধহয় সেকেন্ডই হচ্ছে না। যাক্ গে, আমি অনেক আহাদের প্রসঙ্গেকটাল বেঁটে দেখলাম: কেউ বলে অ্যাকাউন্ট দেখতে হবে, কেউ বলে শি-আর-ও'র কাজ করুন, কেউ বলে সাহেবদের সঙ্গে যে চিঠি-চাপাটি চলে তার হিসেব রাখুন। যাই যাক্ গে, বেঁপু লন্ডে' কথা প্রস্তাব দিয়েছিল। বলেছিল সন্ন্যেসীদের হাত ছাড়ে লোকের ছুবকণ্ঠ দূর করা। কোথায় নাকি গলাবন্দী না কি একটা জায়গা, সেখানে অনেকজন চোরাই বালের রিসিভার আছিব না খেয়ে মারা যাচ্ছে।

'আমি কি করব? অগত্যে বেঁপু বলল সন্ন্যেসী সেজে আফিস খোঁড়ে দিবি। শুনে আমি খিউরে উঠলাম। বেঁপুকে আমি জানি। যতক্ষণ না আমি রাজী হব ততক্ষণ ও হাল ছাড়বে না। কি করি কি করি ভেবে মাথার চুল উঠে যাবার জোগাড়, এমন সময়ে এল একটা রামভুজনের চিঠি, বাসটী, একদিন এসব দিন ছিল, যে আমি হাতের আটি ছুঁড়ি করে ঘতবার জলে ফেলুন, তুমি সাঁতার কেটে তুলে এনে দিতে। আজকে আর বয়ে খেলার সময়। যমালয়ে সরব চলে এসো ভাগলা। যখন বাঁচনের বিমারে কিশিং একেবারে। ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্কার্স ধরি এগারো চাও তবে বয়ের মত-এসো। এই বেলমুজন।

'চিঠী পড়েই আমি আগে বেলার ভ্যালোয়ার হচ্ছে। তারপরে ভেবে আপনারা প্রস্তাব সাপোর্ট করলে, ভবাই জানেন...'

'হাঁ, সন্ন্যেসীদের আমরা ঘনিষ্ঠভাবে এ আর আমাদের মত কেউ বিশ্বাস করতে পারে না।' ভাজেনবাবু বলে চলেন।

'তাই আমাদের মনে। বলুন ভাজেনের ঘরে আগুন ছাড়া আর কে দেবে? আর ঘরে আমার চাই ই চাই। বেণু জানেন: সেবার কাবেরীবেলের কলম 'পলাশী বিপ্লব' আমার আঙ্কেল হয়েছে খুব। তেমনই এক কলমই আমার হৃৎকমল উদ্ভাসিত হয়। তা যে যাই বলুক না কেন, যে এখন আর একটা বলে কিছু নেই।

'তা ভ্যালেন বলছে একটা বয়স বাঁচনেরদের জন্য কবিতা লেখে উঠিয়ে খুঁড়ি খেলত। কেউ বয়সের 'পিসা' চতুর্থ ছেড়ে রেখে কেন্দ্রনো কবিতাদের ঘরে 'পিসত'। সবাই বলতেন, আমি আসার ঘরের ভক্ত। বিশ্বাস করে আর যে উচ্চারে যায় যাক, আমি যাব না। চুলোয়ারে কেন কেন খুবিস্তীর্ণ ভ্যালোয় 'বসে, বয়সের চাপ এবং প্রচুর মুদ্রণ রেখে যাচ্ছেন। শেষে ঘর, মুহূর্তে আগে বেরোবিলেন ভেবে তাঁকে আসোর ব'ওয়াতে চেষ্টা করছে। বেরবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়ে সবলাম: ঘটাকা বিয়ে' আসেন খেয়ে বেরুবে লোকে মনাহত হয়ে, ছেলের অবিমৃষ্যকারিতায় চিন্তিত হয়ে তিনি ঠোক মেরেন।

'এ হেন বয়স বাঁচনের ছেলে বয়স বাঁচক। বিলাস এবং মুর্খবন্ধে ভ্যালোয় বিয়ে নাকি উৎসুক্ত কোনোটী কাব্যে, বয়সোপ এবং আরকেই চায় হয়। সভানেটকে বিয়ে থেকে যথেচ্ছ নাচ হবার অধিকার দিয়ে বয়স বাঁচক বিধিয় অবস্থা ও'ছয়েছেন।'

'ভাবতে চাইলাম, 'এ হেন ভ্যালোয় এটা রামভুজন কি করে?

ভ্যালো হেসে বললে, এখন ও' যখন বাঁচক অন্তর্ধানী চায়, ভোবার পরে। তাঁর সুযোগ্য পুত্র হোরেন বাঁচক নিজস্ব মেরেসারেবদের এনেছে।

'হোরেন মেরেসারেব আবার কেন? এ প্রশ্নের জবাবে ভ্যালোয় হোরেন কবে কি করবে তা কারো পক্ষেই বলা মুস্কিল। 'সম্ভবত নিজের মেরেসারেব বইকে সঙ্গ দেবে বলেই আরেক মেরেসারেব ঘরে এনেছে। বলিও, সত্যি কথা বলতে কি, এটাকে বিতীয়া

নাইরোবি ভূমিকায় কল্পনা করা আমার পক্ষে কঠিনই হতো।

'শেষবারের মত জানতে চাইলাম, এই সিদ্ধান্ত অন্য চতুর্থাংশের মধ্যে কিংবা কোন ঠগ পাল্টে যাচ্ছে কি?

ভাবলা বলল, 'উঁ তোমার কথা আমার কাঁধ পাচ্ছে! তোমার চেয়ে অনেক বড় বড় লোকের ওখানে নিমন্ত্রণ আসছে। গভর্নমেন্ট ওখানে লুকিয়ে লুকিয়ে গোল্ডের কার্গো নামাচ্ছে। সে-বিষয়ের এক্সপার্টদের জন্য আই-ফ্লাইটের জন্যে একটা ছোটখাট প্লেন চার্টার্ড গ্রাউণ্ড তৈরি করা হচ্ছে, আর তোমার?

'ওরা হর জেনে ভাবলা বলল, 'ওখানে যদি সে কোন ঘর খুঁজি, আমি একটি ঘরই নিয়ে নিও, দুটো খুঁজতে আমার দেরি হবে না।

'আমি ওর থুতনি নেড়ে দিয়ে বললুম, ভাবলার ঘরে দিয়ে ভাবিস, তুমি আমার জন্য উপহারই কর না কেন, আসলে তুমি হাড়ে হাড়ে ব্যাবসা, জিতে ভাতার বড় অবস্থিতর। ঘর যদি খুঁজে হয় তাহলে কি আর তোমার জন্যে হয়ে থাকবে?

'চল বেলুন ভাবলা। যাবার সময়ে বেলুন চুপসানো বালিশে জলে টইটুম্বুর, তার মাঝে বাঁধের খুঁটোয় এক বারোইঞ্চি লম্বা সাইনবোর্ড ঝিকমিক করছে—'ভাবলা ড্রাইভ অফার সৌজন্য নেবেন।' তা হাতে বেলুন এক আশ্চর্য লম্বু, পরে যেখানেই ট্রেন থামে, সেখানেই ভাবলা-পাঁচার ভিড়। তারা নিজেরা নিজেরাই ট্রেনে উঠে পড়ে।

'আমার একমাত্র সহযাত্রী ওভের নাগরীতে মাথা রেখে চোখ বুজে ছিলেন, চোখ খুলে বললেন, দেখুন মশায়, গভর্নমেন্টের মুদ্রাস্ফিতির ফলে এদের ছোটখাট ভারসাও কেমন হয় করে বড় হয়ে যাচ্ছে।

'কেন, এদিকে কি কোন ইভাস্কি হয়েছে!

'অবাক হয়ে ভদ্রলোক বললেন, কেন, ক্যাটল ব্রীডিং সেক্টার! ভাবলার প্রথম গ্রামের মধ্যেই ক্যাটলসেক্টার হয়েছিল। ভাবলা ডেভেলপমেন্ট, ছাগলগেঁড়া কাছাকাছি ছড়ানো থাকত, ট্রেন করে যাবে মাঝে ভাবলার ইন্সপেকশানে আসা হত।

'আমি জানতে চাইলুম, এর চেয়ে একজন কর্মচারী ঘুরে ঘুরে ইন্সপেক্ট করলে এখন কম কি হত!

'ভদ্রলোক বিস্ত হয়ে বললেন, বিওরি না প্র্যাকটিস?

'সাইত ক্যাটল যে বিওরিতে ইন্সপেক্ট করা যায় তা ত' জানি না মশায়।

'আমিও জানতুম না মশায়। স্টেশনিবারী শপ করে এসে দেখি মাঠে শিলশিল করে চরে বেড়াচ্ছে পাঁচা, মধ্যে ছিলে ইন্সপেক্টর কয়। মাস তিনের অভ্যাস পরিশ্রম করে দেখে আমি চাকরি ছেড়ে দিই। এখানে দুহাজার ক্যাটল ইন্সপেক্ট করে রিপোর্ট দিলুম, সুলায় বললে সর্বনেশে কথা, কেন না ভাবলা ভাতুয়ারীতে বাকি সবশুদ্ধ দুহাজার ক্যাটল। যেই বুঝলুম সেই দুহাজার ক্যাটলকেই একবার থেকে ওনাঠ, আবার অন্য মাঠে ঘুরে ঘুরে দেখেছি, সেই আমার নাম্বার গেল ঘুরে। বলুন, স্যার, আমি একান্তভাবে চিরকাল নাগর। মাংস খেয়েছি, পাঁচা দেখি নি। ভাবলা ভাতুয়ারীর অবহর ধূর্ত ক্যাটলের সঙ্গে ম্যাচ করা আমার সাধ্য নয়। ক্যাটলের সুদে ম্যাচ্যুর, হা হা, কেমন মিলিয়েছি বলুন দেখি?

'আমার সন্দেহ হল ভদ্রলোকের মাথা খারাপ। ভদ্রলোক স্বীকার করলেন। বললেন, হতে পারে। রিউম্যান বীয়িংস্ আর অলপ্রেক্টিক্যুটেবল। তবে চাকরি আমি ছেড়ে দিয়েছি।

'ইন্সপেক্টরি?

'বেলুনের ও' ওরা নিজেরাই ট্রেনে চড়ে ভাবলা আসে। ভেট্ট স্টেশনের সামনে কিউ দিয়ে সেট টিপিয়ে চলে যায়।

'কলকাতায় এত মাংসের দরকার···

'ভদ্রলোক কিন্তু ঠেটে বললেন, ও কথাও বলবেন না। মিনিট-তিনেক প্লান হয়ে গেল, ভাবলা ক্যাটলের ভাগটি কেউ ছোঁয় নি। বলেন কি, ম্যাটেল, টু লেট দি লাইভস অফ দি ক্যাটল রোমান দিয়ে এবার এখানকার ক্যাপিটালেট রিটার্ন হল, জানেন?

'ভদ্রলোক আবার ওভের নাগরীর ওপর কাৎ হলেন। ভাবলার নতুন এবং অবিকৃত একটা দিগন্ত কি আবিষ্কার করলুম? ভাবতে না ভাবতে ট্রেন থামল। ভদ্রলোক বললেন, ট্রেন থামলেই গায়ের জোরে লাফ মারবেন। এখানে গাঙের পরিবার থাকে। গার্ড রোজই ওদের জন্যে ডিমিনিমাছ আনে। গার্ড যতক্ষণ বাঁশাকপি ছুঁড়বে, ওর ছেলে বহুবে, ততক্ষণই আপনার নামবার টাইম।

'অতএব একসময়ে ট্রেন থামল। আমি এবং কয়েক পাল ছাগলভেড় নামলুম। ছাগলরা গেল ইন্সপেকশান অফিসের দিকে, আমি দেখতে গেলাম একটা চাটুজোড়া মুণ্ডত মুটি বাঁধা লম্বা মুখ, ছা ছা দাড়ি, মুখে রুমাল ঘুরিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা। আগে চোখে পড়ে নি, পরে বেলুন এটার সঙ্গে বাঁধা ছিলবাঁধের বাবা। যেমন মুখমুণ্ডি চেহারা, তেমনি ঘোরকৃষ্ণ রঙ, মুণ্ডিত শিখাস্থানে একগুচ্ছ সাদা চকচকে চুল। দেখেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলুম। বললুম, বাবা, বাঙ্গিতে যে তোমার দর্শনে বেলুন, অ্যাত্ত হয়ে এখানে ঘরে এলে?

'মদন মল্লিক আমার মাথায় হাত রেখে বললো, নাঃ, ছেলেটার ভক্তি আছে। [illegible] তুমিই পারবে বাবা, মরীলে [illegible] ছেলেগুলো আমার ঠেকানো যাবে না। আমার স্ত্রী-ও যখনই বলছে, লোকের মত লোককে ডেকিছি···' লম্বা মুখ উঁচুতে তুলে মদন মল্লিক হুকরে ডেকে উঠলেন, বা ঘাগো, কি তোর মনে আছে জানিনে বা, পথ দেখিয়ে যে যা! পথ দেখিয়ে যে যেন্তী, আহ্লাদী, সুখস্বেড়ানী, যেই নাচুনী।

'ভগবানকে এ যেন আন্তরিক সম্ভাষণে আপ্যায়িত করে মদন মল্লিক বললেন, বাঙালী জাতের কি দোষ জান ভাগ্না, তাকতে জানে না। অথচ তেমন করে তাকতে জানলে যেন্তী তাকাকেই তাকাবে?

'মেথলার মা মদন মল্লিককে পেল্লায় গাড়ি, ঐশ্বর্যের বাড়ি, সবই ছেলে দিয়েছেন হু'হাতে। পুকুর, বাগান, নাহিরবাথান সমন্বিত মস্ত দোতলা বাড়ি। পাশেই সুবিস্তীর্ণ ভাবলার-বিল। তাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত টুলাস, বেড়োডিঙি, শালতি। বিলের মাঝে একটি ছোট দ্বীপ। তার বুকে একটি সাদা বাড়ি। একটা মুচকি হেসে বললে, ঐ বাড়িতে তুমি থাকবে।

'চোখ মটকে বললে, ওটি বুড়োর সেরার। এ বাড়িতে মদনগোপাল বিগ্রহ, বালগোপাল ভোগ। এখানে গিন্নীর রাজত্ব। তখনে মাঝে মাঝেই টপ সেক্রেসে কনফারেন্স বসে। সব ব্যবস্থাই আছে। তা ছাড়া বেলু চাটুজ্জেকে বর্তমানে ওখানে আটকে রাখা হয়েছে।

'বেলু চাটুজ্জে?

'আবার সবিস্ময় উক্তি শুনে মদন মল্লিক বললেন, চল ভাগ্না, একটু নির্জনে বসা যাক। অতঃপর বহির্বাথানের চৌহদ্দে বসে বললেন, এখন আমার প্রাইভেসি বলতে কিছু নেই। ছুটো সোপনকথা কইতে হলেই আমি টুঁ আসি। বেলুর ভয়ে এদিকে কেউ ঘেঁষে না।

'তারপর বেলু চাটুজ্জে সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন অনর্গল, সেও নিশ্চয় ভগবানই ওঁর মুখে যুগিয়ে দিলেন।

নইলে এমন মৌলিক ব্যাপারটা আমি এতবারই শুনেছিলাম, মুক্তকিশোরের মুখে, ছোড়িদলা যখন হাতের ওপর মজো বল তৈরি করেছিল, আর তখনকার যখন বল্লিকের মুখে।'

'সইত্য কথা' মোলায়েম মুক্তকিশোরের স্বীকার করলেন। বিশদ করে বললেন, 'মনের মধ্যে ইয়োশান যখন ফাল পাড়ে তখন ভগবানেই মুখে বইরোয় জোগান, সইত্য।'

যখন মল্লিক বললেন, লেপু চাটুজ্জের [redacted] মোহন মল্লিক ফেপে ওঠে, ছাবলার [redacted] কালার চাদ হয়ে।

আমি বললুম সুপ্রস্তাব। তবিও লেপুর রেপুটেশান আপনার জানবার কথা নয়। ওর প্রোজেক্টগুলো লাইফেলঙ্ক ফেল করে।

'এই দেখ! যখন মল্লিক উঠের চালের দিকে চেয়ে বললেন, ছেলে যে আমার মনের কথা বলছে সো। না ভায়া, তোমার বত ভগবদ্ভক্ত লোকা আমি বেশি দি। তোমার আমি নির্ঘাৎ চাকরি দেব।

'বললেন, মোহন ছোট ছিল যখন, হর-দা হক ভূত মাথার কাটা মারতুম। ব্রেনটা ওর মোটেই বাড়তে পায় নি। ও বললে, বাবা, গভর্নমেন্ট এখন ব্যাং পেলে বাং কেনে, এ ত' সোনালী কাৎলা। ওরাই মাছের পোনা দেবে, ওরাই এক্সপার্ট পাঠিয়ে সব দেখে-শুনে দেবে, আমরা শুধু মনের বেটিব, বাইর মুখে। সিম্পাথি প্রকাশ করে বললেন, যাও না সো, ও যা বলছে করে যাও না সো, জেনইউটি এনেছে, মোদের কি এটুই কাজ দেখাতে সাধ হয় না?

'তাই হল। ছাবলার ভিলে কি কি মাছ আছে তা গোণবার জন্যে প্রথম এল রাশভূষেন। তারপর এল টলার নিয়ে ফ্রেঞ্চ এক্সপার্ট। সোনালী কাৎলা নাকি অতি সুলভ প্রাণ সৌখীন মাছ। পোনা ছাওয়ার ব্যাপারটি ফ্রেঞ্চ ছাড়া আর কেউ জেমন পারে না। এল টলার নিয়ে জেনারি পেরিন্ ফ্রেড সেল কয়েকজন বাহের পোনা।

'আঁদি দেব?' নামটা কি পোনা পোনা মনে হচ্ছে? ওর নামটা জেনারি হবে না মল্লিকমশায়।

'যখন মল্লিক বললেন, তুমি আর চন্দ্রবিন্দু গুলো আউডিও না বাবা, আঁদিও হও আর ইদিও হও, কাজের বেলা ত' ছাড়লে মাছের পোনা। ভেবেচি কাঁদে আমার উড়িয়া জেলেগুলো যে কাজ হরদম করে থাকে।) দেব ওরা, তোমাদের সরকারের ব্যাভড়ুখানা দেখ। এই বুদ্ধু বটুকা জেলে সর্বদা কহছে, সেই কাজটি করবার জন্যে ফ্রান্সের এক্সপার্ট, জেনারেল টলার ছানো ভ্যানো সাতসমুদ্দুরে।

'তারপর?

'তারপর সোনাদের খাবার খাওয়াবার জন্যে ব্রেডিলের আরেক লাবের। খাবার আসছে নরওয়ে থেকে। রাশভূষেন জেলেডিঙি চেপে দূরি পরে মেশিন দিয়ে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে, নাছ খই খই করছে. নেটিব ট্যাংরা চিংড়ির সঙ্গে সেই সোনালী কাৎলার গুঁড়োগুঁড়ি মেপে দেছে, মল্লিক, ইউ ক্যান প্রোসিড।'

যখন জিজ্ঞেস করলে, 'সোনা ওজেছে, নাছ বড় হচ্ছে, তাতে যখন মল্লিক প্রোসিড করবে তোমার?'

মুক্তকি নিমীলিত নয়নে বললেন, 'গভর্নমেন্টকে কেনবার কথা বলতে।'

'কি করে বুঝলেন?' আমি অবাক।

'ও, তেমি সং এগ্রপেরিয়েন্স ইন্ সব যখন কেনাবেচা।'

হাজেনবাবু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। হঠাৎ চুলবুলিয়ে উঠে বললেন, 'ও, এতনো যেজন্য ঘুরে মুক্তকির বত নব-এক্সাইসমেন্ট প্রপার্টি ছোঁ-কেলা করতে কাকপক্ষে দেখলুম না। বাহজন্মোদে তহবীলদার অবধি ফেল করে যায়।'

'সইত্য' মুক্তকি সবিনয়ে স্বীকার করলেন।

অ-বয়স্ত বাপচী বললেন, 'ওটা ক্যারিবিয়ির ব্যাপার। অর্থ বলে একটা কথা আছে ত' ভাই। মুক্তকির যে কাকা বিয়ে করেন নি তিনিই ছেলে-মেয়ের দেখাশুনা, বিয়ে এবই না এবটা ছুতোয় সবকের কাছে সাহায্য পিতেন। যা নেই তা ভাড়িয়ে যাওয়া ওদের পরিবারে রীতিমত শিল্পে পরিণত হয়েছে।'

'যা হোক, লেপু চাটুজ্জে গভর্নমেন্টের সঙ্গে ডিল করে ফেললে। সব ঠিকঠাক। বাহ তোলবার দিন বলবেতা থেকে কারা আসবেন, প্রেসের লোকরা কে কোথায় থাকবে সব তৈরি। দিন-ক্ষণ দেখে যখন মল্লিকের শিল্পী বটুকাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, লোকজনের সামনে অপদস্থ হব না ত' রে? এতগুলো বাইরের লোক আসবে, তাদের খেতে দিতে পারবি ত'?

'বটুকা ছেলে বললে, হ্যাঁ বা। ভেত কই কিছু কিছু এনো আছে বড় পুদুরে। তবে লবকারী মাছের খবর জানি না।

'যথাসময়ে টলার জলে নামল। মোহনের তৎপরতায় ভারতীয় রীতিতে অনুষ্ঠান হল। ব্রেডি-ইন্ডুসের মেয়েরা এসে 'আমাদের যাত্রা হল সুরু' গেয়ে গেয়ে নাচলে।

'অথচ বাহ নেই। তোঁ তোঁ। নেই বলতে ছাবলার বিলের বোথাও একটি মাগুর নেই সোনালী কাৎলার। বিরাট ব্যাপার। অথচ ব্যাপার সামান্য নয়। পৃথিবীর তাবড় তাবড় দেশের ফ্রেঞ্চ-নিশিন এক্সপার্টরা ছিল। দেরী হলের টাকা আপনারের পাকপাবা নদীর মতই বয়ে গেছে।

'লেপু চাটুজ্জের বিয়াত ছুলোপুদুর হলের সৌ ছেপে গেল। রাশভূষেনও বাইরোবার। আবার জলসার্ভে। আবার পৃথিবীর দুয়েক দেশের সহযোগিতার মাছের চাষ। কলে তোলার সময় এসে আবার সেই ভেস্কিবাজী। রাশভূষেন বললে আরো ইট্ট'ং। ও' গল হেলে কারুকে ভয়ার না, ছলের আঁকিও তেমনি অনুভোতরে বলে বললে 'সাবোতাজ!' ব্রেডিলের রাজেনো মল্লিকের কানে কানে বললে, সাবোতাজ কেউ করে থাকে ত' আঁদিই করেছে। কিলবটিক মাছের পোনা জলে ছেড়েছে যাতে সে-মাছ গলে যায়, যখন মল্লিক অপ্রস্তুত হন। যখন মল্লিক শুধু মন মন হুকার ছাড়লেন। তিনি রাজনৈতিক নন। মাছ পাকেন বলেই পোনা ছেড়েছিলেন। বল জলাবাদ অপশাতেই উচ্চীপিত হয়ে তাঁর একাকে নাম।

'লেপু চাটুজ্জে মাথা চুলকে বললে, ঠিক ছোকা ধাচ্ছে না ব্যাপারখোনা আর একবার চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি কি!

'যখন মল্লিক বললেন, আর একবার চেষ্টা মানেই আবার অর্থব্যয়। হু হু ক'রে সরকার ঝেঁকরে যাওয়া, হলে যা তা সরকারের, যখন মল্লিকের কাছে তা অতি অপ্রীতিকর। কাজেই যে জন্যে তিনি ওসব ধরে পড়েন না। এত লাখ, এত কোটি টাকার স্কীম ফেল করেছে জানলেই তাঁর মনে হয় টাকা বেরিয়ে যাবার হর হর শব্দ তিনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন।

'রাশভূষেনও খুঁতখুঁত করলে। বললে এর ভেতর নির্ঘাৎ আরো কিছু আছে। এটা বললে তার ঠ' আমি ধরি, যা খরচ হয়েছে তা হয়েছে, এখন ছাবলার বিলে অর্থ এবং পরিশ্রম না ঢেলে চল আমরা হবে পড়ি।

'যখন মল্লিক বললেন কিন্তু মোহন এবং তার স্ত্রী আড়ুকো। হয় তারা জেব বললে, তবু আবার ছাঁদলে ধরে কেল্লার পুনরাবৃত্তি হল, কিন্তু কার্যকালে থেকে সেই তাবপর লেপু চাটুজ্জেকে ঐ জলকুমিতে রকী রাখা হয়েছে। এটার ভখানক ভারা হয়েছে আমাকে।

'যখন মল্লিক বললেন, সবই ত' শুনলে ভায়া। এখন বলছে কি, আমাকেও জেব মেপেছে এ রহস্যের শেষ অবধি দেখব।

'তারপর বললেন, চল ভায়া বড় পুদুরে যাই। সেখানে এসব ঝুটঝামেলা নেই।

আমাদের প্রতিবেশে পুরুষ। নিতান্ত আমি ঘরছে এইটি মাত্র ধরি, শিল্পী আমার সেটি নিজে বেঁধে দেন। মেয়েটির অন্যদের কোন ধারেকাছে নেই যে সব, সেজন্যে মাত্র থেকে মেন বে করে কেমন যেন পালটে গেছে। স্বাভাবিক একটি, বুঝলে না? কেন যে বাপু, দুই ছেলে ছাবলার বন্ধিবন্ধনের ছেলে। তোর এত এনাজিই বা কেন, এত ধর্ম-তৎপরতাই বা দরকার কি?

'ভিতরটেরটেরকে আমার বেশ লাগছিল। নিতা বলতে কি কখন যে ঘরে ঘরে কেউ, সে বিশ্বাস আমার চুত হচ্ছিল।

'সেদিন বড়পুকুরে। বিয়ের কাছাকাছি এক পেয়ার পুরুষ ঘাটের রাস্তার বসে বটকা গান গাইছে মরকোলে মুখে বিয়ে টিকে গান টিকে শুনাকু···। আর যা যা বললে তাতে সন্দেহ হয় তুমি নির্ঘাৎ বাংলা বই পড়ছ।

'ও, ইয়েস!

'মোর কবি সিনেমাও দেখছ···

'ও, দ্রেট একটা রেটেইনার।

'এতে প্রমাণ হচ্ছে ডেনমার্কের কেউ আজও বেহার গণ্ডগোল। তাই তোমার বন্ধু পাগলকে ওরা ইণ্ডিয়াতে পাঠিয়েছে।

'রামসুমেন খুব হাসলে। তারপর বললে, এখানকার ব্যাপার-স্যাপার সব বাদু-ই আনুষঙ্গিক বেশ্। কারুকে বিশ্বাস করি না আমি। তোমার ও বাহাদুরী বেরাদরিতেও আমার বিশ্বাস নেই। তবে সাবধান করে দিই, মন বন্ধিকে অতি ভীষণ ভীষ। ইমার্দাং একটা ওর স্পাই-এর কাজ করছে। কেন করছে জানি না, কেন না মেয়েরা কখন কি করে তা বুঝবার চেষ্টা আমি করি না। এ কথা শুনে এই ছেলেটার মত ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। আমার দিকে আড়ালে ডেকে বললে, এই মেয়েটি ওর নতুন পরিবর্তন। আমার যা তা বলে। আসলে বিজ্ঞানী ত'। ওর এক্সপেরিমেন্টে কাজে লাগছে না বলে মন ভেঙে যাচ্ছে। তা ছাড়া যোগেনের বউ হচ্ছে ডিভনশায়ারের মেয়ে। বহা বড়িলাভ। আমি কি আর বুঝি না ঐ ফ্রেঞ্চ আর ব্রেজিলিয়ান এক্সপার্টের সঙ্গে ওর কিসের এত খাতাত! ডেনমার্কের রাম-সুমেনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। অথচ রামসুমেনকে এ সব কথা বোঝাবে কে? একটা ফোঁৎ ফোঁৎ করে কাঁদতে লাগল। বলল, বিনতোষ যখন বন্ধিবের বাড়ির তৈরি মিষ্টি খাচ্ছে রাতভোর বাইনো-কুলার বাগিয়ে ছাবলার কিল দেখছে, তখন নিয়ে আমি কি করব!'

মুক্তকি নিমীলিত চোখে বললেন 'এইটা কি আজো মিষ্টি মিষ্টি হবে না? সব কিছুর কি ব্যাখ্যা হয়? এদেশে ব্যাঙার হয়ে-হাঁচে কি অবাক হাও অপেক্ষা করে থাকে না? অস্বীকার করতে পার, পাহাড়ে ট্রাকেতে বেরুলেই এদেশে এখনো মিশকিরিয়াসদের দেখা মেলে? তোমাদের নাইন্টে-নাইনারদের এখনো বিপদ ভেবে বাঁচার অলৌকিক ভৈরব-ভৈরবীরা? আমে মনে, যে দেশের প্রতিটি জিহ্বেবান এবং ওয়ান এমন পাল পাইয়ে···

'আমার বটকার কথা মনে পল। বলসুম আমি না। এখানে এসে আমি একটি পল্লীগীতিই শুনেছি, মরকোলে মুখে বিয়ে টিকে পান টিকে শুনাকু···। আর যা যা বললে তাতে সন্দেহ হয় তুমি নির্ঘাৎ বাংলা বই পড়ছ।

'ও, ইয়েস!

'মোর কবি সিনেমাও দেখছ···

'ও, দ্রেট একটা রেটেইনার।

'এতে প্রমাণ হচ্ছে ডেনমার্কের কেউ আজও বেহার গণ্ডগোল। তাই তোমার বন্ধু পাগলকে ওরা ইণ্ডিয়াতে পাঠিয়েছে।

'রামসুমেন খুব হাসলে। তারপর বললে, এখানকার ব্যাপার-স্যাপার সব বাদু-ই আনুষঙ্গিক বেশ্। কারুকে বিশ্বাস করি না আমি। তোমার ও বাহাদুরী বেরাদরিতেও আমার বিশ্বাস নেই। তবে সাবধান করে দিই, মন বন্ধিকে অতি ভীষণ ভীষ। ইমার্দাং একটা ওর স্পাই-এর কাজ করছে। কেন করছে জানি না, কেন না মেয়েরা কখন কি করে তা বুঝবার চেষ্টা আমি করি না। এ কথা শুনে এই ছেলেটার মত ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। আমার দিকে আড়ালে ডেকে বললে, এই মেয়েটি ওর নতুন পরিবর্তন। আমার যা তা বলে। আসলে বিজ্ঞানী ত'। ওর এক্সপেরিমেন্টে কাজে লাগছে না বলে মন ভেঙে যাচ্ছে। তা ছাড়া যোগেনের বউ হচ্ছে ডিভনশায়ারের মেয়ে। বহা বড়িলাভ। আমি কি আর বুঝি না ঐ ফ্রেঞ্চ আর ব্রেজিলিয়ান এক্সপার্টের সঙ্গে ওর কিসের এত খাতাত! ডেনমার্কের রাম-সুমেনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। অথচ রামসুমেনকে এ সব কথা বোঝাবে কে? একটা ফোঁৎ ফোঁৎ করে কাঁদতে লাগল। বলল, বিনতোষ যখন বন্ধিবের বাড়ির তৈরি মিষ্টি খাচ্ছে রাতভোর বাইনো-কুলার বাগিয়ে ছাবলার কিল দেখছে, তখন নিয়ে আমি কি করব!'

মুক্তকি নিমীলিত চোখে বললেন 'এইটা আপনার গল্পের রোমান্টিক আবহাওয়া। গল্পে সবকিছু বলাই যাওয়া প্রয়োজন।'

'বলতে পারেন। যদিও মহাভূতির আশার এটা আবার গল্পে বড় বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে। রামসুমেনের জেলাসি আপাতত জন্যে আর কি, ট্যাম-টুলা পদ্ধতি। কিন্তু আমার শুধু ভয় হতে লাগল রামসুমেন হঠাৎ না ফেপে যায়। হঠাৎ ফেপে গেলে বৈজ্ঞানিক অনেক কিছু করতে পারে।

'কিন্তু রামসুমেনের কোন দোষদিকে মন নেই। রাতভোর মইনো হাতে জলপুটির চৌহদ্দি চৌহদ্দি ঘিরে বেড়ায়। আমিও সঙ্গে থাকি। মাঝে মাঝে শুধু গভীর রাতে শুনি বটকার গান। একদিন রাতে রামসুমেন বললে, বটকার গান গাওয়াটা যেন কেমন বিশ্রিরিয়াস। মাঝ তোমরাও সবর মত এগিয়ে আসে ওর গান গাইবার বহর মত বেড়ে যায়। কেন বল ত'?

'সে জবাব কি আমিই জানি? এদিকে মন বন্ধিবের আর ধৈর্য মানতে চায় না। উঠে বসে প্রাণখোলা কথা আমরা বলেই চলুন, বটকার হাত থেকে একটা সুতো-বাঁধা মাছ তুলে নিতে কুল হল না তাঁর। কিন্তু আর কোন সমাধান হল না। এদিকে আমার ভেবে আঁরি আর এগারজন মাছের পোনা ছেড়েছে, ফলাফল দেখবার জন্যে সবাই ব্যগ্র। মাঝে মাঝে শুধু একটা এসে ফিসফিস করে কৈফে যায়, আর যোগেনের বউ বলে বাগচী, ঐ ড্যানিস বুড়িকে ঘুণাক্ষরে বিশ্বাস কোর না।

'এদিন করে দিন যাচ্ছে, মাঝ তোমাদের সবার এগিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়ল উদ্বেগ, আর বটকার বাড়ল সঙ্গীত-প্রীতি। প্রতি রাতে শোনা যায় তার কণ্ঠে সেই একই আবৃত্তি 'টিকে পান, টিকে গুবাকু।'

'সেদিন রাতে কর্মীর শোভা। ভাদ্রমাস বিল চাঁদের আলোয় রূপোলী হয়েছে। আমি একা বসে ভাবছি রূপোলী জলে সোনালীমাছ, কেন যেন ছেলে কবিতা শোন কবিতা মনে হচ্ছে। এমন সময় শুনতে পেলাম বটকার গলায় সেই আবেগপূর্ণ আবৃত্তি। নেপু বললে, নিতা এর গান শুনে কি সুখ পায় ব্যাটা, বলুন ত'? আমি বললুম, শুনেছি কালাহাড়িতে ওদের বাড়ি, পূর্বপুরুষ ওর বাইগা বাড়িয়া। জলের কলল, অথবা ক্ষেতের, হাড়েক্ট-এর সময়ে ওদের ভক্তকবিতা আমিন আসরে গান গেয়ে ওঠে।

'রামসুমেনের ওপর এ নির্ঘাত উত্তিষ্ট কাজ করলে ইলেকট্রিক চাবুকের মত।

ছিটকে দাঁড়িয়ে সে বললে, বাগচী। যাই হোক আমি এবং তুমি দুজনেই অজুহাত।'

'আমরা দুজন দুখ হয়ে চালাব কে?

'কেন, ঐ বটকা?' বলে রাসমুখেন আমার ডিঙিতে তুলল বললে, নৌকা ভাল, লাইফ আর ওড় ভাল। দেখুকে বললে চালাবে ডিঙি।

'ছেড়ে দেখুন মশায়। অর্ধেকরাতে মুচকি-হাসা চাঁদ। স্রোতের বিনে ভেসে চলেছে ডিঙি। জলপরীদের মত রাসমুখেন ও শশধরার নাম ডিঙিকে আর নাকে ফোঁৎ ফোঁৎ করে শব্দ করছে। বটকার গান ক্রমেই কাছে আসছে।

'ডিঙি পাড়ে রেখে আমরা ছুটতে ছুটতে গেলাম বড়পুকুরের ধারে। সেখানে ঘাটের রানার হতে বটকা গান গেয়ে যাচ্ছে, একই ঘরে মোড়া পেতে বসে নবনী মল্লিকের গিন্নী ছেলে কুটোপাটি হচ্ছেন ওদিকে বড়পুকুরের বেঁধিকটার্ট উঠ, সেদিক থেকে হুটুর হুটুর করে শব্দ আসছে।

'আমরা সেঁদিকে ছুটে গেলাম। রাসমুখেন বললে, দেখ বাগচী, ভাল করে দেখ।

'দেখলুম। ভোর সুরুজের মুখ খোলা। সে সুরুজ দিয়ে কাতারে কাতারে সোনালী কাৎলা চুকছে বড়পুকুরে।

'রাসমুখেন বললে, মাছগুলো ওর দেখেছে। কিন্তু ওদের মনে ছিবার সাইকোলিস ভোকালে কে? দরকারী স্কীমের মাছ, ওরা ও টনারের শব্দ অথবা অন্য কিছুতে ভয় পাবে না?

'জবাব দেবার পেছনে এল। আবাল্যের আবাঢ়ের মেঘের এক রাখবোয়াল। বর্ষার এ রকম রোয়াল দেখেই বোধহয় ছড়া বেঁধেছিল কেউ, না' দিয়ে গেল রোয়াল নাচে।' অতঃপর রোয়াল দেখে তেঁপিড়ের মত নাচতে বাকি রাখলুম আমরা। রাসমুখেন লাফিয়ে বাঁচে না. রাঘবোয়াল পাঠিয়ে চোরা সুরঙ্গ দিয়ে বড়পুকুরে মাছ বোকাই করবার বুদ্ধি কার? রাঘবোয়ালকেই বা এ টেনিং দিলে কে? বিলের তলা খুঁজেপেতে সব কটি মাছ তাড়িয়ে আনে, একটিও যায় না। বটকা যদি সে রাস্তা হয়, তবে বটকাকে আমি জেনারেল নিয়ে যাব। ডি-ডিতে ওর প্রোগ্রাম হবে! বটকা বললে, যা জানেন, ঐ গিন্নীমা জানেন, আমি শুধু চুলুম তামিল করেছি। তখন মল্লিকগিন্নী মুখ খুললেন। কিচ কিচ করে কেঁদে বললেন, বাবা তোমরা সব সাক্ষী রইলে, অমুক মল্লিককে জব্দ করব বলেছিলুম, বাপের বংশ তুলে বড় খোঁটা দিয়েছিলেন, তাই বটকার সাহায্যে এই কারসাজিটুকু করেছি। ভুল বুঝ না বাপ সকল, এই সায়েবটির মুখ দেখলেই মনে হয় নিশ্চাই ভালমানুষ, আহা, আমাদের ছুকরের কাছে ইটের ওপর বসে খেউরি হয় এমন আমি আর দেখি নি, তোমরা রাগ কোর না।

'রাসমুখেন ওস্তাদ হতে হয় ন, কিন্তু ন. রোয়ালকে আপনি এমন ট্রেনিং দিলে কি করে? 'মল্লিকগিন্নী বললেন, উটি আমার বাপের বাড়ির রোয়াল মাছ। আমার বাপের বাড়ি.ত আমরা সব জানোয়ার পুষি। আমাদের বাঁড়কাক আছে, সে সবরকম সব কাক তাড়িয়ে নিয়ে যায়, বাদার পোষা বক আছে, সে ছিপ ফেলে মাছ বেছে পাঠিয়ে দেয়, আমাদের অভ্যেস আছে। আর কে বললে যায় নি? কিছু খেয়েছে, কিছু রেখেছে।

'কিচ কিচ করে আরেকটু কেঁদে বললেন, আরো বলি বাবা, বটকা আমার বাপের বাড়ির লোক। ও এতদিন এই পেয়ার বিলটি সাবলে এল, আর এখনি কি একেবারে দেশ-বিদেশের এজপার্টের ওপর পড়ে গেল? যা হয়েছে হচ্ছে, যেকালে তোমাদের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছি, সেকালে আর এ-সব ছেলেখেলা করে লাভ নেই।

'রাসমুখেন বললে, বাগচী, এতজন পর্দানশিন লেডী একজনকে জব্দ করলেন এর ওপর কি তুমি মিকিরিয়াস ইণ্ডিয়া দেখতে পাচ্ছ না? ছয়রা জব ইউর কাটি...। আমি আর দেখতে চাই না।

'মল্লিকগিন্নী ওর কথা ধরে আদর করে বললেন, তোমার ধারে কাছে? বইমাটিকে যে ডেকে তাকি পছন্দ ওর সঙ্গে আমার বইন হয়ে পড়িয়ে দেব, তোমাকে আর তোমার বুন ভাই পাতাতে হবে। এখানেই থাক তাদারের ইস্কুল তোমাদের মত ওটা সাহেব হতে দিবা পুরতে পারেন 'তাহলে?'

'তাহলে আবার কি! এক্সপ্লেনেশন দিয়ে ওরে বটকা কে ইন্ডাক্ট দেখুন স্কীম প্রাক্ট ফেলিওর, আমরা সব ডলে এলুম

'প্রাক্ট ফেলিওর?' 'তা আর হয়ে না? ওদের মাছ হল ভারি আত্মসম্মানী, অভিমানী। যেই টের পেল যে বড় পিসীর তরফ-ওরফি বিলের চারধারে ওদের ওপর নিয়ে ছেলে ধরা করা হচ্ছে, অমনি ওদের স্রোতের বিলের ওপর এসে পড়ি এসে গেল।' 'রেজাল্ট?'

'সব মাছ এক সঙ্গে স্যাইসাইড করলে। কেন, বাবার বিলে সোনালী কার্পের 'বাস' স্যাইসাইডের কথা শোনেন নি? কাজল পড়ল কেন? ধরে দব।'

আমাদের দুঃখের জবাব হয়ে নিয়ে অবধারত বাগচী বেরিয়ে গেলেন।

তুর্গেনিভ বনাম টলস্টয়

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

তুর্গেনিভের মতো বন্ধুবৎসল লেখক বিরল। রাশিয়ান লেখকদের জন্য তিনি অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু তিনি রাশিয়ার বাইরে বেশি থাকতেন। তাই তরুণ লেখকদের—বিশেষ করে গরীবী লেখকদের—তুর্গেনিভ নানাভাবে সাহায্য করেছেন ফ্লোবেয়ার, জোলা, মোপাসাঁ, হেনরি জেমস, প্রভৃতি তাঁর কাছে ঋণী ছিলেন। জোলা নিজেই বলেছেন যে, যখন তিনি উপবাসে দিন যাপন করছিলেন তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তুর্গেনিভ। তিনি যে সামান্যিক অর্থ সাহায্য করতেন তাই নয়। এঁদের বই যাতে প্রচার লাভ করে, লেখা থেকে যাতে উপযুক্ত পারিশ্রমিক এঁরা পেতে পারেন, তার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতেন তিনি। ফ্লোবেয়ার, জোলা ও মোপাসাঁর অনেক লেখা তুর্গেনিভ নিজে অনুবাদ করেছেন রাশিয়ান ভাষায়। এঁদের লেখার জন্য রাশিয়ান সম্পাদক বা প্রকাশক পারিশ্রমিক দিতে বিলম্ব করলে তুর্গেনিভ নিজেই অগ্রিম অর্থ দিয়ে দিতেন। সে টাকা প্রায়ই ফিরে আসত না তাঁর কাছে। কিন্তু এজন্য কোনো দুঃখ ছিল না তাঁর মনে। এমন প্রতিভাবান লেখকের জন্য না হয় কিছু টাকা গেল। তাতে কি এসে যায়।

ফরাসী লেখকরা তুর্গেনিভের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। হয়ত তার জন্য তাঁরা উপযুক্ত পরিমাণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নি। কিন্তু উপকারকের বিরুদ্ধে তাঁরা দাঁড়ান নি। নিজের দেশের লেখকরাই তাঁর বিরোধিতা করেছেন, লাঞ্ছিত করতে চেষ্টা করেছেন।

তুর্গেনিভের মা বলতেন, লেখক আর কেরানীতে কোন তফাৎ নেই। দুজনেই কালির আঁচড় টেনে রাজস্ব করা করে। তা সত্ত্বেও তুর্গেনিভ কিন্তু লেখার দিকেই ঝুঁকলেন। ১৮৫৭ সাল নাগাদ পত্রিকায় তাঁর কতকগুলি সুখপাঠ্য রেখাচিত্র বেরিয়েছে। সেই সূত্রে তাঁর আলাপ হল ৮ বছরের বড় এবং একটি উপন্যাসের লেখক আইভান গঞ্চারভের সঙ্গে। গঞ্চারভ সরকারী কর্মচারী। আর বেশি নয়। তুর্গেনিভ প্রচুর সম্পত্তির মালিক—যদিও কর্তৃত্ব সব মা'র হাতে। তবু যতটুকু তাঁর হাতে ছিল তা দিয়েই অনেক সাহায্য করা চলত। গঞ্চারভ তার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। তুর্গেনিভ প্রায়ই তাঁর বাড়ি আসতেন, অন্য লেখককে নিজের লেখা শুনিয়ে মতামত চাইতেন। গঞ্চারভও শোনাতেন তাঁর নতুন লেখা। প্রায় দশ বছর এমনি করে চলল। শেষের দিকে গঞ্চারভ প্রায়ই অভিযোগ করতেন যে, তুর্গেনিভের লেখায় তাঁর রচনার ছায়া পড়েছে; অনেক ক্ষেত্রে প্রায় নকল। তুর্গেনিভের 'এ ন্লেট অব জেন্টল্ ফোক' এবং গঞ্চারভের 'ওব্লোমোভ' প্রায় একই সময়ে বের হয়। সমালোচকরা তুর্গেনিভের প্রশংসায় পঞ্চমুখ; 'ওব্লোমোভ' সম্বন্ধে বিশেষ উচ্ছ্বাস নেই। এতে রুষ্ট হয়ে গঞ্চারভ তুর্গেনিভকে লিখলেন: তুমি

জীবনের উপরেলায় নিঃসুরে বেড়াচ্ছে : আর আমার কলম আলোকিত করেছে জীবনের গভীরতম প্রদেশকে।

এর পরে টুর্গেনিভের 'ফাদার্স এণ্ড সন্স' যখন বের হল, আলোড়ন তুলল সাহিত্যজগতে, তখন গঞ্চারভের ঈর্ষা জ্বলে উঠল নতুন করে। গঞ্চারভ অভিযোগ করলেন, টুর্গেনিভ প্লট এবং প্রত্যেকটি চরিত্র চুরি করেছেন তখনও অপ্রকাশিত উপন্যাস 'দি প্রিসিপিস্' থেকে। যতদূর লেখা হয়েছে তা পড়ে শুনিয়েছিলেন টুর্গেনিভকে। শুনে চুরি করেছেন টুর্গেনিভ।

গঞ্চারভ এই চুরির কথা এমন করে প্রচার করতে লাগলেন যে, টুর্গেনিভের আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। বুঝিয়ে এই যে, গঞ্চারভের বই তখনো প্রকাশিত হয় নি ; সুতরাং পাঠকদের তুলনা করে দেখবার সুযোগ ছিল না। তাই প্রবীণ লেখকদের নিয়ে একি বিচারসভা বসল। সভা রায় দিলেন, টুর্গেনিভ চুরি করেন নি।

গঞ্চারভ কিন্তু শান্ত হলেন না। তাঁর কেবল সন্দেহ চর ঘুরে বেড়াচ্ছে—যা-কিছু তিনি লিখবেন সব নিয়ে টুর্গেনিভের হাতে তুলে দেবে। একদিন সেন্ট পিটার্সবার্গ পার্কে হঠাৎ তুজনের দেখা। অমনি গঞ্চারভ চীৎকার করে উঠলেন, 'চোর! চোর!' মনোযোগী জনতাকে সমস্ত ইতিহাস শুনিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন। তাই মোড়ে পালিয়ে বাঁচলেন টুর্গেনিভ।

গঞ্চারভের চেয়ে বেশি আঘাত টুর্গেনিভকে করেছেন ডস্টয়েভস্কি। তুয়ার নেশা কিছুকাল পেয়ে বসেছিল ডস্টয়েভস্কিকে। একবার ব্যাডেন ব্যাডেনে জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়লেন। একটি পয়সা নেই হাতে উপবাসে থাকতে হবে এমন অবস্থা। টুর্গেনিভ তখন সেখানে ছিলেন। ডস্টয়েভস্কি তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার করলেন। যত শীঘ্র পারেন ফেরৎ দেবেন এই সর্তে। অনেক দিন হয়ে গেল ; ফেরৎ দেওয়া আর হল না। দিতে যে দেরি হচ্ছে সে কথাও জানালেন না টুর্গেনিভকে। একদিন টুর্গেনিভ দেখতে পেলেন ডস্টয়েভস্কিকে। ডস্টয়েভস্কি তখন বুঝতে পারেন নি। পরে স্মরণ করলেন টুর্গেনিভ তাঁকে দেখে ফেলেছেন তখন মনে হল মহাজনের সঙ্গে গিয়ে দেখা করা উচিত। না হলে টুর্গেনিভ ভাববেন টাকা শোধ না করে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

টুর্গেনিভের সামনে উপস্থিত হয়ে অবর্ণনীয় হীনমন্যতায় ডস্টয়েভস্কি অভিভূত হয়ে পড়লেন। টুর্গেনিভের নতুন বই 'স্মোক' বেরিয়েছে। কথা আরম্ভ হল সেই নিয়ে। ডস্টয়েভস্কি বললেন, এই উপন্যাসে রাশিয়ানদের এত ছোট করে দেখানো হয়েছে যে, বইটি প্রকাশে পোড়ানো উচিত। টুর্গেনিভ অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নীরবে তাঁর কথা শুনলেন। ডস্টয়েভস্কি এতেই শান্ত হলেন না। তিনি টুর্গেনিভ সম্বন্ধে নানা বিরূপ মন্তব্য লিখে পত্রিকায় চিঠি পাঠালেন।

টুর্গেনিভের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্বেষ ডস্টয়েভস্কি চিরস্থায়ী করে রেখেছেন 'দি পসেস্ড' নামক নভেলে। এই উপন্যাসের বারবাজিনভ চরিত্রটি টুর্গেনিভেরই ব্যঙ্গচিত্র। তাঁর যত চারিত্রিক ত্রুটি, যত বাস্তিক, সব কিছুকেই বিদ্রূপ করা হয়েছে। টুর্গেনিভ খুবই আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন, আমার অস্তিত্ব সবাই ভুলে যাক, তাতে হয়ত একটু শান্তি পাব।

টলস্টয়ের 'হোয়াট ডু উই লিভ বাই' তখন ধারাবাহিকভাবে একটি সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। টুর্গেনিভ সম্পাদককে লিখলেন, চমৎকার লেখা—প্রতিভার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। লেখককে আমার অভিনন্দন জানাবেন। ১৮৫৫ সালের নভেম্বর মাসে তাঁদের দেখা হয়। পনেরো দিন টলস্টয় থাকলেন টুর্গেনিভের বাড়ি।

● এফ এম ডস্টয়েভস্কি

টুর্গেনিভ একে পছন্দ করতেন, এই ধরনের মেয়েরা শুধু এই সময়ে চোখে আকর্ষণ করতে পারে,—আমরাই সংযোজন। টলস্টয়ও তাঁর প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ অনুভব করেন।

১৮৫৭ সালে টলস্টয় প্যারিসে এসেন টুর্গেনিভের সঙ্গে দেখা করতে। টুর্গেনিভের সঙ্গেই থাকেন টলস্টয় অনেকদিন। টলস্টয় বিদায় নেবার পর ছিন্নচিত্তে টুর্গেনিভ লিখলেন: 'যে চলে যাবার পর আমি কেঁদেছি। মেয়েটা ঠিক জানি না। তবে ভালোবাসি তাকে। আমাকে সে নতুন মানুষ করে তুলেছে।'

অবশ্য পরিচয়ের প্রথম পর্বের উত্তেজনার মধ্যেও মনে মনে বিরোধের সূচনাও দেখা যেত। কিন্তু বিরোধ চরমে পৌঁছত না। কারণ বিরোধের সূত্রপাত হত কবি আকসাকভ কেটের বাড়িতে। কবি ওঁদের দুজনকেই তাঁর বক্তৃতার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন ১৮৬১ সালের মে মাসে। এইটা বাড়ি চেনবার কাউন। পরদিন সকালে তাদের টেবিলে মাঝে কেউ টুর্গেনিভকে প্রশ্ন করলেন: আপনার মেয়ের নতুন ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী কেমন পড়াচ্ছেন?

—খুব ভালো। টুর্গেনিভ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। শিক্ষয়িত্রী শুধু ভালো পড়ান তাই নয়, তিনি চরিত্র গঠনেও সহায়তা করছেন। মেয়ে পনিন কোথায় কোথায় কি পরিমাণ টাকা দান করবে তাও তিনি স্থির করে দেন। সম্প্রতি শিক্ষয়িত্রী স্থির করেছেন যে, পনিন দরিদ্র লোকদের বাড়ি গিয়ে ওঁর পোষাক দিয়ে আসবে এবং নেলাই করে দেবে। এর ফলে দারিদ্র্যের সঙ্গে পনিনের পরিচয় ঘটবে, সমাজের অবস্থার নানা দুর্বিষহ দেখে না।

টলস্টয় নীরবে শুনছিলেন। হঠাৎ বললেন: এই কি ভালো শিক্ষার আদর্শ? ধনীর মেয়ে কোলের উপর ওঁড়া বস্ত্র পোষাক রেখে সেলাই করছে,—এমন একটি ছবি মনে পড়লেই খিয়েটারের অভিনয়ের সঙ্গে তুলনা এসে যায়। পনিন যদি আপনার নিজ সন্তান হত তাহলে নিশ্চয়ই তার শিক্ষার অন্য ব্যবস্থা হত।

টুর্গেনিভ রাগে অপমানে জ্বলে উঠলেন। যৌবনের প্রারম্ভে বাড়ির এক তরুণী ঝির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। পনিনের জন্ম তারই কোলে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে টুর্গেনিভ বাড়িতে উঠে এলেন: তুমি যদি চুপ না করে থাকতে মেয়ে তোমার মুখ বন্ধ করত।

এরই পরেই টুর্গেনিভের হাতে ফিরে আসা চাইলেন মাদাম কেটের কাছে। টলস্টয়ের দিকে তাকিয়েও স্পষ্ট ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর দুজনেই বিদায় নিলেন। টলস্টয় আলাদা গাড়িতে নিজেই এক জায়গায় গিয়ে উঠলেন। সেখান থেকে চিঠি লিখলেন টুর্গেনিভকে: দুঃখে যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, তাবিলম্বে তা লিখে পাঠিয়ে দিন।

টুর্গেনিভ বিলম্ব না করে লিখিতভাবে ত্রুটি স্বীকার করলেন। কিন্তু চিঠিটি টলস্টয়ের হাতে পৌঁছতে বেরি হল। টলস্টয় অধৈর্য হয়ে উঠলেন চিঠি না পেয়ে। শিগ্‌গির টুর্গেনিভকে আহ্বান করলেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে। সাক্ষীকারের দ্বন্দ্ব—একজনের মৃত্যুর মধ্যেই যার সমাপ্তি।

তারপরেই টুর্গেনিভের চিঠি এসে পৌঁছল। সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি জানালেন, তাঁরই দোষ হয়েছে।

মাস তিনেক পরের কথা। টুর্গেনিভ প্যারিসের বাইরে আছেন। টলস্টয় বিনীত-ভাবে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখলেন। টুর্গেনিভের প্রতি তিনিও অবিচার করেছেন। টুর্গেনিভ ছেলে-বেলাতে জলে আছেন। তাঁর অভিযোগ, টলস্টয় নাকি ক্ষমা-চেয়ে-লেখা চিঠিখানি বন্ধু-বান্ধবদের দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। সুতরাং এবার দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন টুর্গেনিভ। সেকেণ্ড ঠিক করার ব্যবস্থা করা হবে। টলস্টয়কে তিনি জানিয়ে ছিলেন। টলস্টয়ের চিঠি পেয়ে তাঁর দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান নাকচ করলেন। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে যে ফাটল ধরেছে তা আর কখনো জোড়া লাগে নি।

টুর্গেনিভ কবি ফেটকে লিখলেন: টলস্টয়কে আমি পছন্দ করি। তার লেখা সাগ্রহে পড়ি, তার কল্যাণ কামনা করি। কিন্তু যতক্ষণ দূরে থাকি ততক্ষণই ভালো। কাছে এলেই অস্বস্তিকর, বিরোধ সুরু হয়ে যায়। মনে হয় আমাদের দুজনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। সুতরাং দূরে দূরে থাকাই ভালো।

এরপর সতেরো বছর তাঁরা দূরে দূরে ছিলেন। টলস্টয়ের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসবার পর আত্মাভিমান ত্যাগ করে তিনি টুর্গেনিভের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর পক্ষে এটা চিত্তশুদ্ধির জন্য অবশ্যকর্তব্য ছিল। কিন্তু প্রথম পর্বের সেই মধুর সুরের আর পাওয়া যায় নি।

টুর্গেনিভ মৃত্যুশয্যায়, এ খবর পেয়ে টলস্টয় লিখলেন: আজ উপলব্ধি করতে পারছি আপনার প্রতি আমার আকর্ষণ কত গভীর। আপনাকে দেখবার জন্য প্যারিস যাব কিনা ভাবছিলাম। আপনার অবস্থা আমাকে অবশ্যই জানাবেন।

টুর্গেনিভ মৃত্যুশয্যা থেকে শেষ চিঠিতে লিখলেন: তোমার মতো লেখকের সহানুভূতি পেয়ে গৌরব বোধ করছি। লেখকের মতো একটি অনুরোধ করব: আমার লেখার মন দাও। আমার অনুরোধ তুমি রক্ষা করেছ এ কথা জেনে যেতে পারলে সুখে মরতে পারতাম!

টলস্টয় তখন বিশুদ্ধ সাহিত্যের চর্চা ছেড়ে দিয়েছিলেন। সাহিত্যকে তিনি ব্যবহার করছিলেন তাঁর নতুন জীবনদর্শনের বাহন হিসাবে। টলস্টয়ের শিল্পিমন আঘাত হয়ে পড়েছিল আদর্শের মোহে। টুর্গেনিভের শেষ অনুরোধ টলস্টয় রক্ষা করতে পারেন নি।

সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মূল্য : এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত রোমাঞ্চকর উপন্যাস। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার।

উপহার দিবার মত বই

—

বিশ্বজনের বরেণ্য সাহিত্যিক

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—

ফোকলা দিগম্বর, পাপের পরিণাম, ভূতচরিত।

মূল্য এক টাকা

২য় ভাগে—

ভূত ও মানুষ, কঙ্কাবতী, ময়ূর সঙ্গ, মুক্তামালা।

মূল্য : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

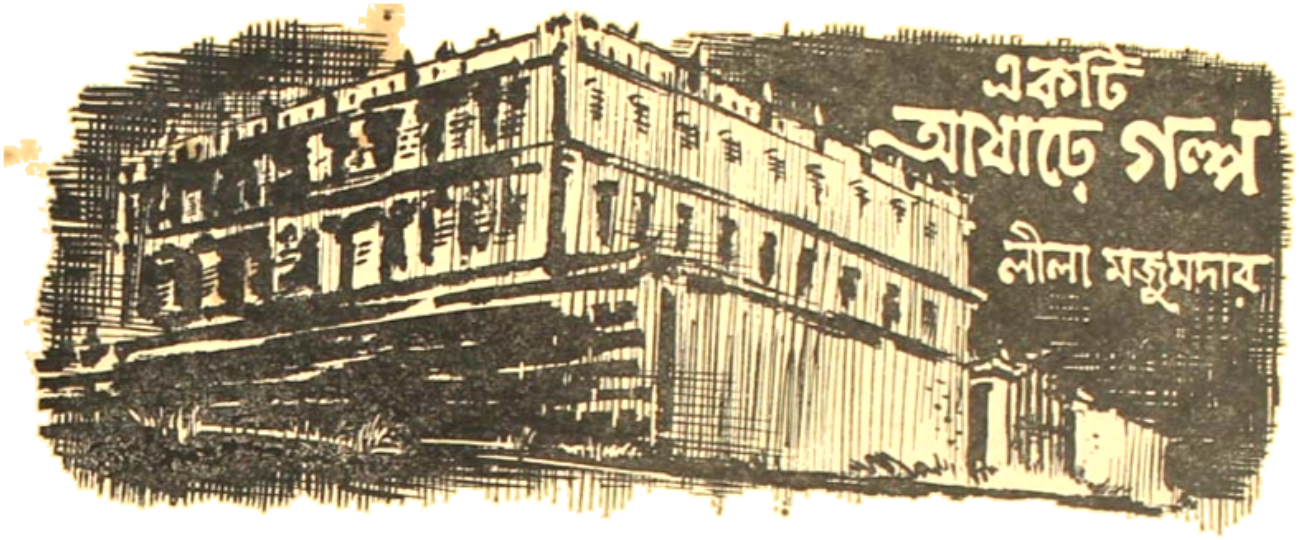

আজকাল নাকি কলকাতা শহরে বারো-চোদ্দতলা বাড়ি উঠছে; একদিন যখন সব ছড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে তখন ঠেলাগাড়ি বোঝা যাবে। বাস্তবিকই যদি জায়গা-জমির অত অভাব হত, তাহলে নকুড়বাবুদের বাড়ির পাশেই, দেড় বাঘুর উঁচু পাঁচিলে ঘেরা যেসব বাগানের পুরোনো বাড়িটাকে, তার চার বিঘে বনজঙ্গল আর বাগান নিয়ে, আজ তিনপুরুষ ধরে লোকচক্ষুর অগোচরে অমন পড়ে থাকতে হত না।

এককালে যে অনেক খরচ করে ওবাড়ি তৈরি হয়েছিল, তার প্রধানস্বরূপ এতকালের অব্যবহারেও দরজা-জানলা এঁটে বন্ধ, কোথাও কিছু খসে-খুসে পড়ে নি। সদর রাস্তার ওপরে দশ ফুট উঁচু কটকের প্রকাণ্ড লোহার কড়ায়, কোন কালের কোন হাকিমের হুকুমে যে বিরাট লোহার তালা লাগানো হয়েছিল, তাকে মরচে ধরলেও, ভাঙে নি।

লোকে বলত ভূতের বাড়ি; তবুও কেউ ভেতরে যাবার চেষ্টা করত না। নকুড়বাবু তাঁর এটর্নি মক্কেলের কাছে শুনেছিলেন, তিনপুরুষ ধরে বাড়ি নিয়ে মামলা চলে, অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে গিয়ে থেমে আছে আসল ওয়ারিসরা নিখোঁজ। সন্ধ্যামণির বাবাবাড়ির সঙ্গে ওদের নিকট সম্পর্ক ছিল, এমন কি সন্ধ্যামণির বাবা বিয়েবার বিয়ে হয়েছিল ঐ বাড়িতেই। তখন এঁরাকাল, পাঁচের বাড়ির চারধারে জল, নৌকো চেপে যাতায়াত করতে হত। ঐ বিয়ের পর আর কেউ বড় একটা ও-বাড়িতে বাস করেছে বলে শোনা যায় নি। বাড়ির বাসিন্দারা নিয়ে সেই ইস্তক কলত-কাটিমালা-নোকরা চলেছে। এ-বাড়ির তিনতলার এই ঘরটিকে নকুড়বাবুর পড়ার ঘর, কারেৎ ঘর, শোবার ঘর, অবাধী শোবার ঘর ও বিপদের আশ্রয়ও বলা চলে। সন্ধ্যামণি বড় একটা এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে চায় না। চারদিকে জানলা, ফুরফুর করে হাওয়া বয়, পাখার অভাব বিশেষ টের পাওয়া যায় না জানলার মাঝে মাঝে প্রায় ছয় অবধি উঁচু কালো কাঠালকাঠের আলমারি, তাদের কানায় কানায় বইপত্র, কাইল আর আইনের বই ইত্যাদি দিয়ে ঠাসা। তাকালেও সব বন্ধ হয়ে আসে; কিন্তু ঘরটি নিরিবিলি; সোজা একতলার হলঘর থেকে উঠে আসা যায়, মক্কেলরা তাই আসেও। ছবিঘর হল, দোতলার বড় ঘরে সিঁড়ির দিকে মুখ করে, সন্ধ্যামণির চেলারা দিনরাত বসে থাকে আর কে উপরে গেল না-গেল রিপোর্ট করে। বন্ধুবান্ধবদের এখানে আনা যায় না।

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে, জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, পাশের বাড়ির দোতলার বন্ধ খড়খড়ির ওঁকে আলো দেখতে পেয়ে নকুড়বাবু একটু বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। মনে পড়ল ছেলেমেয়েরা ছোটবেলায় মাঝে মাঝে বলত বটে, পাশের বাড়িতে ভূতেরা আলো জ্বালে, তবে ওদের কথায় কেউ বড় একটা কান দিত না; সন্ধ্যামণি ওসব কুসংস্কার পছন্দ করে না। আজ দেখা গেল শুধু আলোই নয়, মাঝে মাঝে একটা ছায়াও যেন নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। আলোটা বসছে, বাড়ছে, কাঁপছে, মোমবাতিই হবে বোধহয়।

ছোট একটা হাঁচি দিয়ে, নকুড়বাবু ভাবলেন, বোধহয় হবে তো এইখানেই হাতের গোড়াতেই রয়েছে, অথচ সেখানে তাকে খোঁজা ঘুরের কথা, শুধু মশাটের কোনাক সিঁড়িতের বইগুলোকে পর্যন্ত নখিপত্রের ঘরে চালা দিয়ে ঘুরিয়ে বসিয়ে গেল, যাবার কালপেন্সিল দিয়ে টেবে গিয়েছে এই ভয়ার ঘরের শক্ত কাঠের চেয়ারে বসে, গভীর রাতে হুকহুকুনি পড়ছে হয়। অথচ এ কথাও স্বীকার না করে উপায় নেই যে এই সামান্য অভিজ্ঞতাবিহীনতার মধ্যেও যেটুকু বোঝবার অপেক্ষা রাখে, নকুড়বাবু তারও শেষ বলবার উপক্রম করেন। অবিশ্যি এর বিন্দুবিসর্গও যদি সন্ধ্যামণি জানতে পারে, তা হলে যে নকুড়বাবুর বিপদের এই নিরেট অন্ধকারটুকু ঘুচে যাবে, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। উঠতি এটর্নিদের যে এরকম বিলাসব্যসন থাকতে নেই, সন্ধ্যামণির মুখে সে কথা নকুড়বাবু বহু বার শুনেছেন।

উঠতি এটর্নি হলেও, নকুড় ছোকরা অবশ্য নিতান্ত বয়স নয়, তবে সন্ধ্যামণি বলে, আটত্রিশ না কি একত্রিশের উঠতি বয়স; তার আগে পরে হলেও, সেটা অবশ্য কিছু এসে যায় না। সন্ধ্যামণির মুখে এরকম কথা শুনে নকুড়বাবু একটু বিস্মিত হয়েছিলেন, কারণ শুধু যে সন্ধ্যামণি ওদের চেয়ে বয়সে বড়, তাই নয়, উপরন্তু সন্ধ্যামণি আইসিএস-এ পাস করেছে, এ কথা ভোলা যায়ও না, সন্ধ্যামণি ভুলতে দেয়ও না। সুতরাং এরকমভাবে সব কিছু তার হুকুমে চলে; বলা বাহুল্য বাড়িটিও সন্ধ্যামণির বাবার কাছ থেকেই পাওয়া।

যে যেন ছুঁ দিয়ে পাশের বাড়ির বন্ধ ঘরের ভয়টাকে নিভিয়ে দিল।

তবু নকুড়বাবু কল্পনাকে সেই দিকে একটুও ছড়িয়ে যেতে দেননি এবং তার পুরস্কারও পেলেন। কাঁচা ঘরে পাশের বাড়ির একতলার পেছন দিকের এই বন্ধ দরজা খুলে, একটা চায়ারমূর্তি খুব সাবধানে বেরিয়ে এসে, বাইরে থেকে দরজায় তালা দিল। তারপর জানালার গ্রেল-গাছের চারার ছায়ার গা-ঢাকা দিয়ে, মনে হল যেন বাড়ির সামনের দিকে চলে গেল। নিশ্চয়ই কোনো আইনব্যবসায়ী, হয়তো ওর কাছে বন্দি-ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে প্রকাশ্যভাবে দোরগোড়ায় বেরুলেই ওকে ধরে নেবে। দেয়াল-আলমারিতে রাখা লাল কালির শার্টগুলোর কথা, পুরোনো বেতের ঝাঁটার পাশে বেমানান ফিনিশিংয়ের ছাতের কথা এসে সন্দেহে কিছু জানতে বাকি নেই। বিশেষ করে রোমাঞ্চ সিরিজের বাজে নকুড়বাবুর খুব অশ্রদ্ধা হয়। এখন তিনি এসবের কী বিচার করবেন।

সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শুনেই, জানলা থেকে চোখ সরিয়ে নকুড়বাবু টেবিলে ঝুঁকে পড়ে খুব মনোযোগ দিয়ে কাগজগুলোর ওপর চুপটি করে বসে রইলেন। বুকের নীচে রোমাঞ্চ সিরিজ নিঃশব্দে অসহ্য হয়ে রইল। সন্তোষণি ঘরে ঢুকে খানিক অন্ধকারে ঘুরে পড়ে, টানতে টানতে ঘরের উত্তর কোণের খড় ছড়িয়ে পড়ল। নকুড়বাবু ভয়ে ভয়ে একবার চোখ তুলতেই সে বলল—'অবিনাশবাবুর দোকান থেকে ছুটে নতুন ছিপ এনেছিল, কিনিয়ে নিয়েছি।'

নকুড়বাবু কলমে মন দিলেন। কপালের দু'পাশের দুটো শিরা প্রকাশ্যভাবে দপ্‌দপ্‌ করতে লাগল।

সন্তোষণি আবার বলল—'অত ছিপটা করে হচ্ছে?'

নকুড়বাবু মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন, সন্তোষণির কাছে বিচ্ছুদার নাম পর্যন্ত করা যায় না। বলতে হল না কিছুই, সন্তোষণি নিজেই আবার বলল—'কার জন্যে তাও আমার জানা আছে। ঐ নিকম্মার ধাড়ি বিচ্ছু, বাঁড়ুজ্জে ছাড়া আবার কার জন্যে! তাকেও তাড়িয়েছি। কি যেন শনিবারের বিষয় বলতে এসেছিল, মিটিছি হাঁকিয়ে! চুল খাঁচড়ায় না, দাড়ি কামায় না, কাপড় কাচে না। ছিঃ!'

নকুড়বাবু এমনি চমকে উঠলেন যে, তিনখানি দলিল একসঙ্গে টেবিল থেকে পিছলে নীচে পড়ে যাওয়াতে, হলদে কলাটের ওপর লাল হরফে লেখা 'হরকুর নিশান'—রোমাঞ্চ সিরিজ ৫ (১৯) সন্তোষণির চোখের সামনে অবারিত হল।

নকুড়বাবু সেটা লক্ষ্য না করেই বললেন—'ইয়ে, মানে তাকে তোমরা তুই তুমি বলো? ওর বয়সটা বড্ড কম কিনা'—আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সন্তোষণি বাধা দিয়ে বলল—'তুই তুমি বলব কেন? তাকে বলে দিয়েছি শনিবার দুপুরে হোমার জন্য কাজ আছে।'

নকুড়বাবু বললেন—'কি কাজ? ছুটির দিনেও মাছ ধরবে না তো হবে কখন?'

'মাছ ধরতে হবে না। আমার বাবার নাম জেনে যে ধরে থাকে, তিনি কবে মাছ ধরেছেন শুনি? যারা পরলোকে গোছগাছ করে, তারা কখনো মাছ ধরে? টাকা ফেললেই তাদের ঘরে পাঁচ-দশ কিলো কাটা পোনা এসে উপস্থিত হয়।'

নকুড়বাবু ভয় ভয় বললেন—'কিন্তু তাকে যে কথা দিয়েছিলাম—'

কথা বন্ধ হয়ে গেল, হঠাৎ চোখ পড়ল পায়ের কাছে মাটির ওপরে হাড়ে একটা সোনালি চাবি চক্‌চক্‌ করছে। বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগল, তা দিয়ে চাবিটাকে ঢেকে ফেললেন। এদিকে সন্তোষণি বলেই চলেছে—'তাকে তোমার কথা! তাকে এমনি কড়া কড়া কথা শুনিয়েছি যে, আমি থাকতে আর সে এদিকে হবে বলে মনে হয় না! কাল তুমি ছোট ছুটির পর আমাকে বোসের বাড়ি নিয়ে যাবে। তার বেয়ে নাকি বোম্বাইয়ের এক তিনশো টাকা মাইনের ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হচ্ছে, সেসব বন্ধ করতে হবে।'

সন্তোষণি দুদ্দাড় করে চলে গেলে, চোখ বন্ধ করে নকুড়বাবু মনে মনে বলতে লাগলেন—'হে ভগবান, ও যদি সত্যিই না থাকত কি ভালোটাই যে হত!' তারপর নিজের চিন্তাতে নিজেই খাঁপ্পা উঠে, জিভ কেটে বললেন—'তাই বলে ও মরে যাক তা বলছি না, ভগবান, তার আবার বেলা কালাকাল, কিন্তু যদি না-ই জন্মাত, তাহলে আমি কি সুখীই না হতাম।'

চোখের সামনে ভেসে উঠল বিচ্ছুদার ঠাকুর্দার আমলের পুরোনো পুকুরের পাড়ে প্রকাণ্ড কাঁঠালগাছের ছায়াতে, ঘাটের তাঙা সিঁড়ির ওপর পাশাপাশি বসে বিচ্ছুদা আর উনি। কেউ কোনো কথা বলছেন না, পাশে বিস্কুটের টিনের মধ্যে কেঁচো কিলবিল করছে, শিপড়ের ডিম গাদা হয়ে আছে, মুখবন্ধ [illegible] ঠোঙাতে মাছ। বাবার মনাল, তার একটুখানি গন্ধও যেন নকুড়বাবুর নাকে এল। না, এর একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়। অস্থিরভাবে পাইচারি করতে করতে আবার জানলা দিয়ে পাশের বাড়ির বাগানের দিকে চোখ গেল। চায়ারমূর্তি এপাশের নীচে, সে-গাছের নীচে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। আহা, সন্তোষণি বাড়িতেই থাকত কি এমন কষ্টটা হত—আহা, সেই অদ্ভুত চাবিটা কোথায় গেল। মাটি থেকে সেটিকে তুলে অন্যমনস্কভাবে নকুড়বাবু পকেটে ভরলেন।

সে শনিবারটা সত্যিই মাঠে মারা গেল। বোসের বাড়ি গিয়ে সন্তোষণি যদ্দা হৈ-চৈ করে এল, তিনশো টাকা মাইনের ডাক্তারকে ডেকে এনে দা-নয়-তাই বলে অপমান করা হল, কিন্তু কেঁদে কেঁদে সারা। একবার তাকে একটু একা পেয়েই নকুড়বাবু বলে বসলেন—'আহা, ওরা [illegible] তুমি নে, এখন চুপ করে থাক, আমি যা হয় একটা ব্যবস্থা করব, বেশি।' কি ব্যবস্থা যে করবেন তা অবিশ্যি নিজেই জানেন না।

এই নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সন্তোষণির সঙ্গে একটু মনোমালিন্য হল, অর্থাৎ সন্তোষণি খুব খানিকটা মনোমালিন্য করল, নকুড়বাবু বোবা হয়ে রইলেন, তার কোনো প্রশ্নের উত্তর পর্যন্ত দিলেন না। পরদিন সকালে সন্তোষণি সুটকেস গুছিয়ে গোনা বয়ে মাসির বাড়ি গেল, বাপের বাড়ি যাবার উপায় নেই, কারণ বাপ-মা বহুদিন মত হয়েছেন, তাদের সঙ্গে আদায়-কাঁচকলায়।

সন্তোষণি বাড়ি ছাড়ায় [illegible] মধ্যে নকুড়বাবু বিচ্ছুদার বাড়ি গিয়ে, তাঁকে টেনে বের করে এনে নিউ স্পোর্টস্ থেকে সেই ছিপ দুটি নগদ টাকা দিয়ে উদ্ধার করে, কালীকেতান থেকে ঘুড়ি বোঝাই পরটা, সাবিকাবাব, বিরিয়ানি আর মটন-কোর্মা কিনে মুটের মাথায় চাপিয়ে, নিজে প্রকাণ্ড ওয়াটার বটল্ কাঁধে ঝুলিয়ে, বিচ্ছুদার ঠাকুরদার পুকুরের ধারে সারাদিন কাটিয়ে দিলেন। বাড়ির কেউকে জানলা দুঁড়ো বয় [illegible] বাড়ি ঢোকেন। বাড়ির লোক বলতে সন্তোষণির বুড়ি পিসি, উঁর বিধবা পুত্রবধূ, সন্তোষণির সই আর তার ছেলে বছর তিনেক বয়সের। নকুড়বাবুর মেজের কোণ্ঠকালে খুব ভালো বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলে বড়গপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে। বলা বাহুল্য ঠাকুর, চাকর, কি, মেথর এরাও সন্তোষণির স্পাই।

সন্ধ্যেবেলায় জলের বোতল, খাবারের পুঁটুলি ও রাত বারার দরকার বিছানার চাদরটা দিয়ে বেঁধে মনের খুশিতে তিন-তিনটে বোঁচকা পিঠে নিয়ে, যোগানদারকে নিয়ে অভ্যাসমতো খবরের কাগজের ঘলাট পকেটে গুঁজে, নকুড়বাবু বাড়ির পথ ধরলেন। মোড়ের বাথায় পৌঁছে, ঢি-ঢেলের আধা-অন্ধকার গলিতে ঢুকতে যাচ্ছেন এমন সময় লক্ষ্য করলেন দশ গজ দূরত্বে আপাদমস্তক কালো কাপড়-চোপড় পরা একটা মূর্তি হনহনিয়ে এগিয়ে চলেছে। কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হলেও, প্রথমটা হঠাৎ নকুড়বাবু ঠাওর করতে পারেন নি লোকটা কে। কিন্তু যেই সে পাশের বাড়ির বিশাল তালা ঝোলানো দশ ফুট উঁচু কটকের সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে, পকেট থেকে লম্বা একটা চাবি বের করে, কটকের গায়ের ছোট কাটা দরজাটি খুলে ফেলল, তখন আর তাকে চিনতে বাকি রইল না।

তারপরেই যা ঘটল, সে এমনি অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক যে, নকুড়বাবুর যেন বুদ্ধি লোপ পেল। হঠাৎ ফোঁস করে কটকের নীচেকার আধাআধি থেকে বেরিয়ে এসে ফণা তুলেছে, এরকম নিজেরি অজান্তে নকুড়বাবু তাঁর লোহা-বাঁধানো লাঠির এক বাড়িতে তার মাথা ভেঙে দিয়েছেন। লোকটার হাতে একটা ছোট্ট লম্বা ইলেকট্রিক টর্চ, তারি আলোতে দেখা গেল, বড়া সাপটার শরীরের পাকে পাকে তখনো যেন ঢেউ খেলছে। দেখে লোকটা শিউরে উঠল।

তার হাত দুটো থর থর করে কাঁপছে, টর্চের আলোটাও লপবস করছে, অন্ধকারে তার মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, ঠাণ্ডা একটা হাত দিয়ে নকুড়বাবুর হাত চেপে ধরে ভাঙা গলায় ফিস ফিস করে বলল—'আসুন, ভিতরে আসুন, আজ আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।'

এরকম একটা ধোঁয়া ধোঁয়ার লোকের মুখে এমন ভদ্র ভাষা শুনে নকুড়বাবু বেশি অবাক হলেন না, কারণ রোমাঞ্চ সিরিজের এর চেয়েও অনেক বেশি অপ্রত্যাশিত ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে।

আনন্দে, উত্তেজনায় অধীর হয়ে লোকটার পেছন পেছন কাটা দরজা দিয়ে তিন-ভূতের বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন। সে খুব সাবধানে দরজাটিকে আবার ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে, একটু অপ্রস্তুতভাবে বলল—'নিজেই চাবিটি করে নিয়েছি। আমার নাম অর্ধেন্দু পাকড়াশী। আসুন আমার সঙ্গে।

।। দুই ।।

কালের কল

আঃ! কি আরাম, কতদিনের কৌতূহল এবার চরিতার্থ হতে চলেছে, তিনপুরুষ ধরে আবার এই প্রথম ভূতের বাড়িতে মানুষের পা পড়ল, অবিশ্যি কালো পোষাক পরা লোকটাকে না ধরলে—খাদান তো নয়, সোঁদর বন; একশালে বাড়ির চারদিকে পাথর দিয়ে বাঁধানো দশ ফুট চওড়া পথ ছিল, এখন তার কোথাও কোথাও ঘাস, আগাছা, ঝাড়ের অঙ্কুর গজিয়েছে। বাড়ির পিছন দিকের বন্ধজাটি নিঃশব্দে খুলে, অর্ধেন্দু বলল—'আমার মুখ-খানি, নিরাপত্তা, এমন কি প্রাণটি পর্যন্ত আপনার হাতে তুলে দিলাম; উপকারীকে আমি নরক দেবতা মনে করি।' এই বলে হঠাৎ টিপ করে নকুড়বাবুর বরফা পায়ের কপাল ঠেকিয়ে, দরজা ঠেলে ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভিতরে ঢুকে গেল।

কাঁপা টর্চ জেলে সে বলল,—'নির্ভয়ে চলে আসুন, এ সবই আমার বহুকালের জানা, কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই।' আশ্বাসের বোকাই হলোয় ঘুমন্ত হলধরটিকে সাবধানে পেরিয়ে ওরা পিছন পিছন নকুড়বাবু শ্বেত-পাথরের চওড়া সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলেন। সিঁড়ির মাথায় একটা খালি সিগারেটের টিন মোমবাতি গোঁজা। পকেট থেকে দেশলাই বের করে সেটি জেলে, পথ দেখিয়ে নকুড়বাবুকে একটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে, বহু বাতিদান থেকে অর্ধেন্দু খালি ভক্তাপোষে বসতে দিল। তারপর নিজেও তাঁর পাশে বসে বলল—'আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?'

নকুড়বাবু এমনি আঁৎকে উঠলেন যে, জিভ কামড়ে গেল। একটু সামলে নিয়ে বললেন—'না—মানে, না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করি না।'

লোকটি হাসল; সে যে কি বিশ্রী শুকনো খটখটে হাসি, না শুনলে কল্পনা করা যায় না। নকুড়বাবু জিভ দিয়ে এবার ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন। লোকটি তাই দেখে নরম গলায় বলল—'না, না, লজ্জা পাবার কিছু নেই; আমি তিনকাল ঘুরে দেখেছি ভূতটুত কিছু নেই। হ্যাঁ, তবে দেকালের লোক, যারা কোনকালে পঞ্চম পেরোননি, তাঁদের যে মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে দেখা যায় না, একথা বলছি না।'

নকুড়বাবু ক্যাকাশে মুখে তাকিয়ে রইলেন, খুতনিটা বেড়ে ইঞ্চি খুলে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে লোকটার হাত থেকে একটু সরে বললেন, সেও অনেক কষ্টে ঢোঁক গিলে বলল—'গেলো রাত নেই, বলেছি তো ভূতটুত কিছু নেই। বাঁশ যে একবারে পচলে পোল আর তার দেখা দেবার উপায় থাকে না। যা করবার বেঁচে থাকতেই করতে হয়।'

নকুড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—'তবে যে এইমাত্র বললেন, পঞ্চম পাওয়ারের মানুষ মাঝে দেখা যায়।'

লোকটা উঠে দাঁড়াল—'কি মুস্কিল, ন্যায় অবস্থাতেই অনেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভবিষ্যৎ খুঁজে আনতে পারেন তো, তখন ভবিষ্যতের লোকরা তাঁদের দেখতে পেয়ে ভূত ভাববে না তো কি ভাববে? কিন্তু আসলে তাঁরা যেমন তাঁরা তেমনই আছেন—।'

এই অবধি বলে, নকুড়বাবুকে মাথা চুলকোতে দেখে অর্ধেন্দু বিরক্ত হয়ে বলল—'কি? বিশ্বাস হল না বুঝি! দেখুন, আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আমার পরম দেবতা-স্বরূপ আপনি, কিন্তু বুদ্ধিটা যে খুব প্রখর তা তো মনে হচ্ছে না।—তবে এই দেখুন।

এই বলে লোকটা তার ঢাকা গলাবন্ধ কোটের আস্তিন একটু গুটিয়ে নিল। নকুড়বাবু দেখলেন তার কব্জিতে একটা অদ্ভুত হাতঘড়ি, একগোছা রঙ-বেরঙ তারের ব্যাণ্ড দিয়ে বাঁধা। অবাক হয়ে বললেন—'কি এটা?'

'দেখুন না, অত ভয় পেয়ে, খুলে ভালো করেই দেখুন না। অদ্ভুত ঘড়ি, মুখটা অনেকটা টেলিফোনের ডায়েলের মতো, ঐ রকম ০ থেকে ৯ সংখ্যা গোল করে সাজানো, ঐ রকম একটা কাঁটা লাগানো, ডায়েলটাকে ঐ রকম করেই ঘোরানোও যায়।

অর্ধেন্দুর দিকে নকুড়বাবু এবার ভালো করে তাকালেন। তাঁর নিরীহ চেহারা, সামনে পিছনে সমান ছোট করে কাঁচা-পাকা চুল ছাঁটা, মুখের দাড়িবিহীন কাঁচা-পাকা খোঁচা-খোঁচা, থানটা একটু লম্বা, দাঁতটা সামনের সরু জোড়া। সেদিকে চোখ পড়তেই লোকটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল—'আমাদের কালের সব ছেলেমেয়েরাই এই রকম কানের লতি

● 'এই দেখুন—'

জোড়া দিয়ে পায়ের আঙুলের ডগাকে যাদের পায়ের মতো পাতলা চামড়া লাগানো।' এই বলে, বলল লাগানো রবারা জুতোর মধ্যে থেকে একটা পা বের করে, আঙুল ফাঁক করে দেখাল।

নকুড়বাবু ঘড়িটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। ডায়েলের ধার দিয়ে বারো ঘরের নাম আর ১ থেকে ৩১ সংখ্যাও লেখা রয়েছে দেখা গেল। অবেক্ষু পাকড়াশী বলল—'বিলক্ষণ এতক্ষণে টের পেয়েছেন যে, আমি একজন উঁচুদরের বৈজ্ঞানিক? এইচ-জি ওয়েলসের টাইম মেশিন নিয়ে আপনারা এত নাচলেন, ছবি তুললেন, অথচ সেটা একটা বেহুদা বস্তু, অতি আনাড়ি ব্যাপার। কোথাও নিয়ে গেলে, নিরাপদ জায়গায় রাখাই এক মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, অমনি ভিড় দাঁড়িয়ে যায়, প্রেমের উদয় ঘিরে ঘিরে ফেলে নেড়ে উঠতে হয়। জটিল সব ঝঞ্ঝাটের, একটা ফলফল বিপদ্তারণেই তো হয়ে গেল, বাজুন পড়ে পঞ্চাশ গো সালে। এই অবেকটা আমার যেমন হয়েছে, যদিও এ ঘড়িটার ব্যাপার অনেক সোজাসুজি। দুনের বিষয় চাবিটা কোথায় পড়ে গেছে।'

নিশ্বাস বন্ধ করে নকুড়বাবু ওর কথা শুনছিলেন, দারুণ উত্তেজনায় কৌতূহলে নিশ্বাস পড়ছিল। চাপা গলায় বললেন—'চাবির ব্যবস্থা হলে তবে কি এই ঘড়িটার সাহায্যে অতীতে কিম্বা ভবিষ্যতে যেখানে খুশি যাওয়া যাবে?'

অবেক্ষু বিরক্ত হয়ে উঠল—'যেখানে খুশি আবার কি? এটা কি একটা বাইসিক্‌ল যে যেখানে খুশি যাবেন? যখন খুশি বলুন। ঐ ১ থেকে ৯ অবধি যতগুলি সংখ্যা আছে আর তার সঙ্গে ০ জুড়লে, কোন রাশিটা না হয় বলুন? অর্থাৎ কোন্ সনে না যাওয়া যায় বলুন? দেখতে পাচ্ছেন ডায়ের ধারে একটি ও কিংবা দুই-ই চিহ্ন করা আছে, ঐ ছোট কাঁটাটা যেখানে হওয়ার দাঁড়িয়ে দেখেন, তারপর ঘড়ি, মাস তারিখ ঠিক করে নিয়ে, টেলিফোনের মতো ডায়েল ঘোরালেই!—এখন ঐ চাবিটা নিয়েই যত ভাবনা। ওটি ছিরে যদি না মিলে, কারের তল এক সেকেণ্ডও চলবে না।'

নকুড়বাবু ভুরুর মধ্যে হুঁ্যাৎ করে উঠল, তাই দেখে বললেন—'চাবিটা যদি খুঁজে দিই, আমাকে ঘড়িটা একবার এঁকে পরতে দেবেন?' হিহিহাত লাগিয়ে উঠল অবেক্ষু।—'না, না, না, সে কাজ নেই, সেটা কি হতে কি হয়ে যাবে। আপনি বরং এখান থেকে বাড়ি যান, যত ছাই দেখেছে, ঘড়ির কথা ভুলে যান।'

নকুড়বাবু তখুনি উঠে পড়ে বললেন—'যাও তবে চাবিটা।'

অবেক্ষু হোহোই করে লাফ মেরে একগাল হেসে নকুড়বাবুর হাত চেপে ধরে বলল—'না, না, তাই বললাম কি? মিছিমিছি বিরক্ত হচ্ছেন। এর অনেক বিপদ, অনেক ঝামেলা, তার থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্যেই—সেটা না জেনে-শুনে—'

নকুড়বাবু বাধা দিয়ে বললেন—'না জেনে-শুনে আবার কি? জানেন আমি না পরীক্ষায় জলপানি পেয়েছিলাম—না জেনে-শুনে কেউ পায়? তারপর সাড়ে তিন মোহ বেশি রোমাঞ্চ সিরিজ পড়েছি।'

অবেক্ষু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল—'চাবিটার জন্যে আমি সব দিতে পারি। এই দেখুন আরেকটা ঘড়ির সব তৈরি, কিন্তু ঐ চাবিটার চাপ না পেলে আরেকটা চাবি হবে না।' এই বলে পকাবন্ধ কোটের পকেট থেকে একমুঠো ছোট ছোট বকবকা স্ক্রুটকের টুকরো ইত্যাদি বের করে দেখাল। তারপর আবার বলল—'সব দিতে পারি, বুঝলেন, আমার যা আছে সব। কই চাবিটা?'

নকুড়বাবু পকেট থেকে রুমিয়াল বের করলেন। তার সবচেয়ে ছোট খোপ থেকে চাবিটাকে বের করে অবেক্ষুর হাতে দিয়ে বললেন—'ভিন্ আপনার চাবি, বড় পরম্বর জিনিস। পেতে না পেতে যে সুযোগ কেউ পায় না, তাও আবার হাতের মুঠোর মধ্যে এনে দিয়েছে। এবার বলুন কবে ঘড়ি পরতে দেবেন? কাল রাতের মধ্যে না হলেই নয়, তারপর আর আবার সে রকম সুবিধা হবে না বোধহয়।'

অবেক্ষু অত্যন্তনম্রভাবে বলল—'কেন ভাই যেন। আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আপনাকে অদেয় আমার কিছু নেই।'

নকুড়বাবু উঠে বললেন—'তাহাড়া চাবিও খুঁজে দিয়েছি।'

'হ্যাঁ, কোথায় পেলেন ওটাকে?'

'পাশের বাড়ির তিনতলায়, আমার পড়ার ঘরে। এইটাই আমার আশ্চর্য লাগছে।'

'আশ্চর্যের কিছুই নেই। কালুজ্বরে ছেলে গেলে ছোট্ট একটা জিনিস একটু ইতিউতি ছিটকে খুবই পড়তে পারে। সে যায় যে, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান। আমি আজ রাত্রেই নতুন চার্টটা করে ফেলব, কালকেই ঘড়ি পড়তে পারবেন। আচ্ছা, নমস্কার। আমার টর্চটা ফিরে পথ দেখে যাবেন, কাল ফিরিয়ে দিলেই হবে। অনেক তাই এটি জোগাড় করতে হয়েছে।'

অবেন্দু পাকড়াশী যেন তাঁকে বিদেয় করতে পারলেই বাঁচে। নকুড়বাবু সহজে নড়েন না, এতকাল বাদে অন্ধকারের মধ্যে একটু ক্ষীণ আশার আলো দেখেছেন, অমনি অমনি চলে গেলেই হল কি না!

অবেন্দু উঠে দরজার দিকে এগিয়ে বলল—'তাই, উঠুন।'

নকুড়বাবু বললেন—'মানে ইয়ে, ঘড়ির সাহায্যে যে কোনো কালে গিয়ে ফিরে আসার মতো শুধু বেখা দেব, নাকি কথা বলতে, কাজ করতে পারব?'

অবেন্দু হাসল—'নিশ্চয় পারবেন। কেন পারবেন না, সুদ্ধ আর মানুষ তো আপনি। খুব আধিন করে না গেলে আশা-টাশাগুলো কোনো অসুবিধা হবে না, তবে একটা কথা সর্বদা মনে রাখবেন, টাইম মেশিনে অত্ত কালেই শুধু যাওয়া যায়, অত্ত জায়গায় না। যেখানে দাঁড়িয়ে কল ঘোরাবেন, ঠিক সেখানেই ফেরে যাবেন, যদি সুরটা পাল্টে যাবে। যদি অত্ত জায়গায় যেতে চান, সেকালের যানবাহনের ওপর নির্ভর না করে, ট্রেনে কিংবা মটরে কিংবা উড়োজাহাজে সেখানে গিয়ে তবে ডায়েল করাই ভালো।'

নকুড়বাবু অধৈর্য হয়ে বললেন—'না, না, অত্ত কোথাও আমি যেতে চাই নে, এতেই আমার হবে।'

অবেন্দু একটু হাসল। 'এখানেও যে যত্ত নিরাপদ, তা ভাববেন না। বাপ, একদিন অন্যমনস্ক হয়ে যত্ত বেশি আগে চলে গেছলাম, তারপর এক অতিকায় তাঁরোপোকার তাড়া খেয়ে পালিয়ে পথ পাই নে। এ জায়গাটাও সেকালে খুব নির্জন ছিল না।'

নকুড়বাবু শুধু বললেন—'অত্ত আগে যাব না।'

বাড়ি ফেরার পথে কথাটা ভেবে হাসি পেল। অত্ত আগে যাবার দরকারটা কি? সত্যবাদিকে যাতে না জন্মায় তার ব্যবস্থা করলেই তো হল। তার বাবা-মার বিয়েটি ঘটতে না দিলেই তো ব্যাপারটির ইতি হয়ে গেল। কিন্তু মনটা খুঁৎ-খুঁৎ করতে থাকে, সত্ত্ব কানের কাছ ঘেঁষে যাওয়া হচ্ছে নাকি? তা ছাড়া ওঁদের বিয়ে হয়েছিল বোধাই সহরে, সেখানে এখন যাবার কোনো সুবিধেই হবে না। অধিকন্তু সত্যবাদির পিসিমার বিয়েতে বাদ্যি দিলেও চলে: কিন্তু তাঁদের বিয়ে হয়েছিল নাকি ওকলহমের আমলে, লন্ডনে কোথায়। তার চেয়ে সত্যবাদির বাবের পিসিমার বিয়েটি পণ্ড করে দিলেই তো ঢের ভাল হয়; কোথাও যেতেও হবে না, ঐ পাশের বাড়িতেই বিয়ে হয়েছিল, কোনো অসুবিধে নেই। তা ছাড়া এতে আরো নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, একগাদা হোপলেস ইডিয়ট আর থাকতে না তা হলে জন্মায় না।

এতকাল ধরে এত কেস্ দেখলেন, শুনলেন, পড়লেন, ধাঁইকের নকুড়বাবু আর এই সামান্য কাজটুকু পারবেন না? কেন, গত বছর দু'হাজার টাকা কি দিয়ে, চোখের সামনে অত্ত ঘোর ঐতিহাসিকের অতকালের ঐ পুরোনো বিয়েটা পণ্ড ভেঙে দিতে পারল, তার তুলনায় এটা আর এমন কি! কোনো অসুবিধেই নেই। ওঁদের বংশপরিচয় আছে সত্যবাদির বেয়াল্লে, তাতে বুড়োবুড়ির বিয়ের দিন তারিখ লেখা আছে। রাতে শুয়ে শুয়ে প্ল্যানটাকে আরো পাকিয়ে নেওয়া চলে। একটা বিয়ে ভাঙা কিছু শক্ত কাজ নয়। কেন, ছোটকাকার বিয়ে তো একটা নেড়াল ন. ফুলুর না দিলে যেন ভেঙে দিয়েছিল। সঠিক জানেন না নকুড়বাবু, কিন্তু জানোয়ারটা হঠাৎ লেপে উঠে বরকর্তাকে তাড়িয়ে কেমন পার করে দিয়েছিল। সুযোগ পেলে বরও চেঁ-চাঁ ঘোড়া, একেবারে বিদেতে পর্যন্ত। মেয়ের বিয়েবাড়ির পাড়ায় কোনো ছেলের সঙ্গে। নিশ্চয়ই অবিশ্যি বললেন যে, সমস্ত ব্যাপারটাই ঐ ছেলেরই সাজানো। সে যাই হোক গে, বিয়ে ঠিক করার চেয়ে যে বিয়ে ভাঙা অনেক সহজ, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

বিশেষ করে সেকালের বিয়ে। মেয়ে সম্পর্কে বরপক্ষের কানে মনগড়া একটা কানাঘুষো তুলে দিলেই হল, শুধু ঐ মেয়ে কেন, ওর বোনদের বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত দায় হয়ে উঠবে। কিন্তু মেয়েদের অস্তিত্ব নকুড়বাবুর দ্বারা হবে না, ওঁর বিবেকে বাধে। হ্যাঁ, তবে সত্যবাদিকে নাই করে দেওয়াটা তো আর ওর অস্তিত্ব করা নয়, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বরং ওর উপকারই করা। কারণ উনিও সত্যবাদি বলে যে, নকুড়বাবুর সঙ্গে বিয়ে হওয়াতেই নাকি ওর ভাগ্য ফিরেছে। কাল যদি না-ই জন্মায়, তা হলে তো আর নকুড়বাবুর স্ত্রী হয়ে ওকে কষ্ট পেতে হবে না। অধিকন্তু তাই বলে নকুড়বাবুকেও কিছু আইবুড়ো থাকতে হবে না, ছেলেমেয়ের সম্বন্ধে আরো ঢের ভালো যা হবে, অন্তত এর চাইতে মন্দ তো আর হবে না, কারণ সেটা অসম্ভব। তা হলে সত্যবাদির জায়গায় যে নকুড়বাবুর স্ত্রী হবে সে কেমনটি হবে? এই ভেবে নকুড়বাবু আপনি বিস্ময়বোধ করতে লাগলেন যে, যার সঙ্গে কুড়ি বছর আগে বিয়ে হয়ে গেছে, সে কেমন দেখে তাই জানেন না। —সে যাই হক গে, সত্যবাদির বাবের পিসিমার বিয়ের ব্যাপারটিকে যে কোনো উপায়ে ভাঙাতে হবে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নকুড়বাবু ভাবলেন, ব্যাপারটাতে যে খুবই রোমাঞ্চ আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; তাছাড়া কি এমন অতিটা হতে পারে? একটা হাতঘড়ির মতো ছোট কালের কল কিনে, বিশেষ করে যেটা চার্ট দিয়ে চলে, এরকম একটা জেনেশুনে বল, তাই নিয়ে যে ইতিহাসের ধারা বদলে দেওয়া যেতে পারে এটা নকুড়বাবুর আদৌ বিশ্বাস হয় না। তাই যদি হত, তা হলে অবেন্দু ব্যাটা আর কোপে কাছে ঘোরানো চাবি ঘুঁকে বেড়াত না, নির্ঘাৎ ঐ সব পুরোনো ছাদি দেওয়া কোট আর খাঁটো পেন্টেলুন ছেড়ে একটা বদলে-কালাপ হয়ে, ইতিহাসিক বনেদী জায়গাগুলো পরে সোনার ফলকে বসত। এই অবধি ভেবে হঠাৎ নকুড়বাবু ঘুমিয়ে পড়লেন।

।। তিন ।।

ঘুম থেকে যখন উঠলেন নকুড়বাবু অবাক হয়ে গেলেন, ঘুমের মধ্যেই প্ল্যান্ অব্ অপারেশনটি কেমন মগজের ভেতর তৈরি হয়ে গেছে। একটা নয়, একেবারে দু-দুটো প্ল্যান্, তবে একটাকে তক্ষুণি বেমালুম বিদেয় করে দিতে হল। হাসে টোকো বাড়ুজ্জে মশাইয়ের সঙ্গে আলাই চৌধুরীর বিয়ে ভেঙে দিয়ে, নিজে তাকে বিয়ে করেছিল, খুব সহজ উপায়ে। বিয়ের দিন সকালে মেয়ের বাপের কানে তুলে দিল যে, ছেলে বিবাহিত, এমন কি নিজের ছোট বোনকে ছেলের আসেকার স্ত্রী সাজিয়ে মশাইয়ের বাড়ি পাঠাতে পর্যন্ত দেরিপাও হল না। কিন্তু সেকালে এই সামান্য কারণে বিয়ে

[illegible] হবে [illegible]
[illegible] ওদের মত ক'টার ঘরকন্নার ভার যে তেমন অনিষ্ট হয় নি, অবশ্যই কারণ ওদের [illegible] থেকে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

'ও ঘরে যে সারা দিনটা কাটল, সে কথা নকুড়বাবু আজও ভেবে পান নি। সেখানে অবিশ্যি এমনি কাজের ভার পড়ে যে, সময় কাটল কি কাটল না, এ বিষয়ে চিন্তা করবারও সময় থাকে না। নকুড়বাবুর সময়কে একটি অদ্ভুত শত্রু বলে মনে হচ্ছে না; বরং সিনেমার ফিল্মের মতো লাগছে, যাকে ইচ্ছেমতো এক ফিল্ম থেকে আরেক ফিল্মে গুটোনো যায়। তফাৎ শুধু এই যে, ফিল্মের আরম্ভও নেই, শেষও নেই।

যে যাই হক, এক সময় সত্যি সত্যি সন্ধ্যে হল, নকুড়বাবু নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে পাশের বাড়ির ছোতলার সেই ঘরখানিতে অর্দ্ধেন্দুর কাছে উপস্থিত হলেন। অর্দ্ধেন্দু কিন্তু তাঁকে দেখে।—'বিশ্বি তো ঘড়িটা আপনাকে বিশ্বাস করে। শেষটা একটা যাচ্ছে তাই ব্যাপার পাকাবেন না তো? আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন সেইজন্যে আমি এবং আমার চোদ্দপুরুষ আপনার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব সেই কি যথেষ্ট হত না?'

নকুড়বাবু কর্কশ গলায় বললেন—'না, হত না। কথার খেলাপ করতে চান নাকি অর্দ্ধেন্দুবাবু?'

অর্দ্ধেন্দু বলল—'আমার আসল নাম অর্দ্ধেন্দু নয়, এই যখন ঘড়ি। আমার পরিচয় সম্পর্কে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করবে এ আমার অসহ্য। তবু আপনার ভালোর জন্যেই জিজ্ঞাসা করি, কোন সালে যেতে চান? তার জন্যে ভালোভাবে প্রস্তুত হয়েছেন কি? শেষটা ঘড়ি বিপদে পড়ে নিজেকে অপরাধী মনে করব যে, আপনি হলেন প্রাণদাতা।'

কব্জির হাত বা হাতের কব্জিতে ঘড়ি বাঁধতে বাঁধতে নকুড়বাবু বললেন—'আবার পরিবর্তনা তৈরি আছে, আবার জন্যে অত ভাবতে হবে না। তাছাড়া বেশি আসেও যাব না, মাত্র একশো বছর আগে, ১৮৬৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি হলেই আমার চলবে। ঐ তারিখে এই বাড়ির একটা ঘিয়ে পত্র করতে হবে। ব্যস্ আর কিছু নয়।'

অর্দ্ধেন্দু, অর্থাৎ যে নিজেকে অর্দ্ধেন্দু বলে চালাচ্ছিল, সে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল, তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, দাঁতকপাটি লাগতে শুরু করল, নকুড়বাবু তাকে ঠাণ্ডা করেন, চিন্তা করে যে ঠেকে করা। নকুড়বাবু এক গাঁটরি নিয়ে হাত ঝেড়ে বললেন—'চলে আসুন। আপনার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রপাতি করবার আমার কোনো অধিকার নেই বলতে চান? চাবি খুঁজে দিই নি?'

অর্দ্ধেন্দু মরীয়া হয়ে বলল—'আছে, আছে, নিয়েছেন, কিন্তু ওসব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলেই কি ভালো হত না, তাছাড়া একটু ধারণা করে না নেলে যে আপনি কোথায় পৌঁছবেন একেবারে কাপড় চোপড় ছাড়া হয়ে।'

শুনে নকুড়বাবু ঘাবড়ে গেলেন—'তা হলে? তা হলে কি হবে!'

অর্দ্ধেন্দু আবার সেই শুকনো কটকট হাসি হাসল।—'আমি বৈজ্ঞানিক, সে ব্যবস্থা কি আর করি নি? কেন আমার গায়ে কি কাপড়-চোপড় নেই বলতে চান?' এই বলে পকেট থেকে দুটি চুলের মত সরু পিন বের করে নকুড়বাবুর ঝুঁটোর নীচে আটকে দিল।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'যান এবার। কি আছে কপালে কে জানে, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা—' ওর কথার সঙ্গে সঙ্গে নকুড়বাবু তলিয়ে যেতে লাগলেন, আগে মাথা, তারপর, ঠিক ধরে তবে সাল ঠিক করলেন। তারপর যেতে লাগলেন আর অর্দ্ধেন্দুর কথাগুলো যেন ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে, ঘরের মোমবাতি থেকেও যেন বড় বেশি ধোঁয়া বেরুচ্ছে। শেষ একবার মনে হল যেন অর্দ্ধেন্দু তাঁর জুতো পরা পায়ে মাথা ঠেকাচ্ছে, তারপর চট্ করে একটু চোখে অন্ধকার দেখলেন, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল, সেবার পড়া ঝিঁঝি পোকা ঠিক যেমন হয়েছিল, কান ঝোঁ ঝোঁ করতে লাগল হাতে-পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরল।

এক মুহূর্তেই আবার নিজেকে সামলেও নিলেন, দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এল, হাত-পা স্থির হল, খালি কান ঝোঁ-ঝোঁর বদলে কোথায় যেন শানাই বাজতে লাগল। ঘরের কোণে এক মোমবাতির জায়গায় কারবাইড গ্যাস জ্বলছে, সেটা প্রথমে খেয়াল হয় নি। পা হাত পা ঝেড়েঝুড়ে দেখে নিলেন; না, সব ঠিকই আছে, হাতে ঘড়ি, জুতোর নীচে কাঁটা—'কি হচ্ছেটা কি? তুই কে রে অলক্ষুণে? খিড়কি ঘরে কেন ঢোঁ মেরেছিস্? মৎলবটা কি তোর?' কানের কাছে কর্কশ গলার স্বর শুনে এমনি চমকে উঠলেন নকুড়বাবু যে, প্রথমটা মুখ দিয়ে কথাই সরল না। তাছাড়া এরকম বিরাট সাইজের মহিলাও তিনি কখনো দেখেন নি। পঞ্চমে একখানা চওড়া কালাপেড়ে গরদ, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার আর কিছু নয়। কিন্তু গলায় কিছে, কোমরের চন্দ্রহার, হাতের অনন্ত, তাগা, চুড়ি, বালা মিলে সের দুইয়ের কম হবে না।

মাথার কাপড় খসে গেছে, গায়ের মুখ বেশি নেই, চওড়া সিঁথিতে মোটা সিঁদুরের রাঙ, কপালে এই বড় সিঁদুরের কৌটা, মুখে পান, পায়ে আলতা, বয়স আঠার পঞ্চাশ।

হাঁ করে নকুড়বাবু তাকিয়ে রইলেন, কি যে বলবেন ভেবে পেলেন না। কিন্তু

● তুই কে রে অলক্ষুণে—

ভদ্রমহিলা ছাড়বার পাত্রী নন, মহা হাঁক-ডাক জুড়ে দিলেন—'কে তুই? কি চাস কি? আমি জল খেয়ে না খেয়ে দিনভর খিড়কি ঘরের জোর আগলাচ্ছি। বস্তিবাসী এসে বললে কিনা জোড়াসাঁকোর দেবেন ঠাকুর এসেছে, তাই একটু দেখতে গেছি আর অমনি কিনা ঘরে চোর ঢুকেছে? কি নাম তোর?'

ততক্ষণে ভদ্রমহিলার চ্যাচামেচিতে সোনার তাগা পরা, গেঞ্জি আর কিনারিকে ধুতি পরা, টেড়ি কাটা, আতর মাখা দু'তিনজন কর্তাবাবু এসে ছুটেছেন। সব চাইতে পেছনের বাবুটি আবার গাকে যেন চাপা গলায় বললেন—'এই আমার ভাগ্নিটা বোধায় স্থান দিয়েছিল।'

বেগতিক দেখে নকুড়বাবু আমতা আমতা করে বললেন—'ইয়ে—দেখুন, আমার নাম নকুলেশ্বর ঘোষ—আমি চোর নই, কিন্তু একটা ভুল—'

'কি নাম বললেন—চোর? ছি, ছি, ছি, বড়বৌদি কাকে কি বলছ? উনি

তা হলে বরের মামাবাড়ির কেউ হবেন।' দেখুন জোড়-হাতে নাল চাইছি, আমাদের শত অপরাধ হয়ে গেছে, তেমনের ঘটি কোনো বৃদ্ধি থাকে, কিন্তু মনে করবেন না'—বলতে বলতে ছাওয়া বলে গেল নন্দুড়বাবুর আদর-যত্নের তখন আর শেষ নেই। কোথা থেকে মানের তত্ত্ব, শাকিপুরের লুচি, আস্তিক পিরাশ, কৌটোনো উন্নুনি সব এসে গেল. নন্দুড়বাবু টেরই পেলেন না। একটা রোগা অতি চালাক চাকর আবার কানের পেছনে আতরের পুঁটলি গুঁজে দিয়ে গেল।

এই রকম ঘটা করে তা হলে সন্ধ্যামণির বাবের বিয়ে হয়েছিল 'নানাই, মিলিটারি ব্যাণ্ড, বাই-নাচ, যাত্রা, লরের থিয়েটার, কিন্তু বাঘ নেই।'

নন্দুড়বাবুর জুতো পালিশ করতে করতে চাকরটা বলে যেতে লাগল।—'এ জুতোটা ফেলে দিন বাবু. এই কি বিয়েবাড়ির জুতো? নতুন একজোড়া নিয়ে আসি ঠিক এই মাপে।'

অ, সর্বনাশ, জুতো হারাবেন কি, জুতোর তলার কাঁটাটি খুলে পড়ে গেলেই তো হয়ে গেল, বাড়ি ফিরতে হবে উদোম গায়ে। হাতঘড়িটাও এদের কাছ থেকে অনেক কষ্টে চাওয়া দিয়ে রাখতে হয়েছে। জুতো ছাড়তে না পেরে শ্বশুরবনে চাকরটা শেষ পর্যন্ত নন্দুড়বাবুকে ছেড়ে দিল।

গোরুগোড়ায় হাত জোড় করে যে কর্তা অভ্যর্থনায় দাঁড়িয়েছিলেন, তিনিই কনের বাবা। এই হেনস্তার কথা যেন বরকর্তার কানে না ওঠে, এই তাঁর মিনতি।

নন্দুড়বাবু হেসে ফেললেন,—'ছিঃছিঃ, ছিঃছিঃ, এ আবার একটা কথা হল. আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ বিষয়ে কেউ বিন্দুবিসর্গও জানতে পারবে না।'

পাশের বাড়ির দিকে চেয়ে দেখেন যেখানে তাঁদের তিনতলা বাড়ি এখন গোটা পাঁচ, সেখানে ঘোড়ার গাড়ির ভিড়! বরযাত্রীরা সভায় বসেছে, গানবাজনা হচ্ছে. বিয়ের লগ্নের একটু দেরি আছে। নন্দুড়বাবু উপলব্ধি করছেন, বুঝতে পারছেন বড্ড উঁচু কাজ হয়েছে. অন্তত একটা দিন হাতে রাখা উচিত ছিল, একেবারে লগ্ন এসে গেল বলে, এখন কি করতে যে কি করবেন মুখে উচ্চারণ পারছেন না। কন্যাকর্তা তাঁকে নিয়ে ঘরে ঢুকে বরকর্তার পাশে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন. নন্দুড়বাবু বুঝি কন্যাপক্ষেরই কোনো প্রয়োজন আত্মীয়, সুবিধা শুধু এই যে তাঁর কানটি পাওয়া যেতে পারে।

কনের মা ঘোমটা উল্টে দেখে, খুলে গেছে, কপালে চুল, চোখে কাজল নয়, যেন অসুখের পর খুব এই বড় বড় দেখাচ্ছে বলে নন্দুড়বাবু একটু ভয় পেলেন, কোনো মেয়ে মুহূর্তে ভরে দিয়ে পেপোও হলে, এখন অঘোষ আর লাগবে যাবে না। তবে বরের বাপের কাছে একজন তাঁর কর্ম নয়, বরং বরের কাছে গেলে কিছু হতে পারে মনে হল। একজন পাকা এঞ্জিনিয়—পক্ষে লক্ষ্মী ভারানো খুব শক্ত কাজ নয়। গুটি গুটি গেলেন তার পাশে।

মেয়েরা বলা হয়। বয়স বছর দুই-তিন বেশি নয়, গোল, কাঁচা মেঝেনি রঙে—এ মেয়েনি ফর্সা, কপালের ওপর গোড়া গোড়া কোঁকড়া চুল, পরনে জরির বসার দেওয়া পাঞ্জাবী, তার এক পাশে চুনী বসানো বোতাম, গলায় সোনার হার, নন্দুড়বাবুকে হঠাৎ এত কাছে এসে বসতে দেখে একটু ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। এর ওপর সোনাক শিশিরের পুরোনো একটা পাঠ লাগাতে নন্দুড়বাবুর একটু লজ্জাও করছিল, কিন্তু প্রেমের কিছু হাতে ছেলে ওসব বালাই থাকতে নেই, তাই ও শিশুর মতো কাঁচা কাঁচা কাঁচা মুখ নিয়ে, চোখের তাঁর দিয়ে, চুপচাপ বসলেন, 'কেউ পড় এখন থেকে দাঁত না, কিছু করতে হবে না।'

প্রেমেটা যেন কাঁই হয়ে গেল নন্দুড়বাবু আরো বললেন, 'চাকরিটরি করছ কি নয়া মেয়ে হয়ে গেছ—ঠিক এই কথাই লেখাক শিশিরের ৪ (৪৪) কিছু ১৯১-এর সময় বলেছিল। নন্দুড়বাবু বলেন, 'আস্তে আস্তে হাওয়া হয়ে যাও; চাকরিটরি নয়া যদি এমুনি হও তো আর দেখতে হবে না। এ মেয়ে তোমার জন্য নয়। যাও, বন্ধুর হও। এইসে তোমাকে আমি বয়ে ফেল খাটানো আমার পক্ষে কিছু নয়।'

ফলটাও ঠিক তেমনি শিশিরের মতোই হল; বাস্তবিক যখন দেখে ওল, তা কে ইংরিজী থেকে চুরিই হক আর যাই হক। ছেলেটা আস্তে আস্তে কখন যে খাট পড়ল, শুধু অন্ত দেখে ফেল, স্বয়ং নন্দুড়বাবুও টের পেলেন না। একটু নড়তে চাপাচ্ছিল বটে,

● 'পড়ে পড়—

কোথাকার কোন ঘরে কখন কি ঘটে গেছে, তার কোনো হদিস কারুর কাছে নেই। ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাছে এইখানেই যে অনিন্দিতা মেয়েটির জন্যে একটা কিছু ঠিক করে নিতে হবে, সে কোথাকার কে কুলশীল কিছুই জানা যাবে না। পরে কোথায় পাওয়া যায়?

ভিড়ের মধ্যে নকুলবাবু পাত্র খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ পায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, ঐ যাকটার পাশে বোঁচে বসে, ও-লোকটাকে অর্কেন্দু মতো লাগছে না? তাই তো, অর্কেন্দুই তো বটে, বিশ্রী দুর্ভিক্ষ-পাঞ্জাবী পরে বেরেছে এসেছে, কি মতলব ওর? শেষ মুহূর্তে সব পণ্ড করে দেবে না তো? বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাবে কি তো অর্কেন্দু? ওর কাছে নিজের উৎকণ্ঠাটা ছেড়ে বলা যেন ঘর ভুল হয়েছে। ও মনে করেছিলেন ঠিক তাই। অর্কেন্দু হঠাৎ কৌচ ছেড়ে উঠে গিয়ে কন্যাকর্তার কানে কানে কি যেন বলল। অমনি ঘর কই? ঘর কোথায় গেল? খোঁজ খোঁজ রব উঠল। ভক্তক্ষণে লগ্নও এসে গেছে। দেখতে দেখতে চারদিকে হুলুধ্বনি শুরু হয়ে গেল।

দশ মিনিট বাদে কন্যাকর্তা পাইকে এসে নকুলবাবুকে ঘেরাও করে ফেললেন। সব বুঝেছি, ভালো করে বলবার, তবু কানে তুললেন না। এইভাবে অপমানের শোধ তুললেন? আচ্ছা, আমিও কম যাই না। এ বিয়ে আজ এই লগ্নে আমি দেবই এবং আপনি যেন পাত্র ভাগিয়েছেন, আপনাকেই তার জায়গা নিতে হবে।' পাইকরা সোজা হয়ে ঘিরে দাঁড়াল।

বাঁচা গেছে নকুলবাবু চারদিকে তাকালেন; কি সাংঘাতিক, নিজের শান্তভীর বিদিবাবে লগ্নে বিয়ে! বয়সের মতো ঠাণ্ডা মাথা সায় গা ঝেড়ে উঠল। এমন ক্যালাসে কেউ পড়েছে কখনো? হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে অর্কেন্দুকে দেখা গেল। ততক্ষণে বরপক্ষীয়েরা খানায় ঘর দেবে বলে শাসাতে শাসাতে সভা ছেড়ে চলে গেছে। অর্কেন্দুর মুখে সে যে কি বিশ্রী হাসি। নকুলবাবুর বিপদ দেখে তার মজা লাগছে। হঠাৎ নকুলবাবুর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, চিৎকার করে বললেন—ঐ, ঐ, ঐদের ঐ রয়, ঐ বেলুন হুজুরেরা এসেছে।

এক মুহূর্তের জন্য চোখ ফিরিয়ে সকলে অবাক হয়ে সেইদিকে বেই তাকিয়েছে, অমনি নকুলবাবুও ১৯৬৪ সালের ভাবেল খুরিয়েছেন। চাঁদ দিয়ে যাদ তারিখ আসেই ঠিক করে রেখেছিলেন, শুধু লালটি বাকি ছিল। ঐ এক মুহূর্তের জন্যে মনে হল অর্কেন্দু চোখ উঁচু চোখের দিকে তাকাল, তারপরই সব যেন ঘোঁয়া ঘোঁয়া হয়ে গেল, কান ভোঁ ভোঁ করতে লাগল, মাথা ঘুরতে লাগল, পায়ের নীচে মাটি সরতে লাগল, বিয়েবাড়ির কোলাহল ক্রমে ক্ষীণ হে-তে লাগল, কেমন যেন কাপসা কাপসা মনে হল যে, অর্কেন্দুর মুখের ভাবটা পাল্টে গিয়ে পাশ দুটি হাসিতে ভরে গেছে। তারপরেই ওকে উঠলেন নকুলবাবু, এ কি, যতদূর করে এ যে কোথাকার কোন এঁদো পুকুরে পড়েছেন, এখন প্রাণটা বুঝি যায়।

বেশি দূরে নয়, পাশের বাড়ির জন-জমজমে ঢাকা ঘাট-বাঁধানো পুকুরেই পড়েছিলেন। এ পুকুরটি তাহলে আগে ছিল না; এই জায়গাতেই তো মস্ত চালোরা খাটিয়ে বিয়ের সভা বসেছিল। কি আশ্চর্য, এতগুলো বছর আগেকার সেই সভা নকুলবাবু এই মুহূর্তেই ছেড়ে এসেছেন। বাঁ-হাতের কব্জির দিকে চোখ পড়ল, কি সর্বনাশ, ঘড়িটা কোথায় খুলে পড়ে গেছে, শুধু খানিকটা ছেঁড়া তার জড়ানো হাতে—যাক গে, তাই নিয়ে আর কি হবে, কার্যসিদ্ধি তো হয়েই গেছে। ভাগ্যলোকে খুলে পুকুরে ফেলে দিতে গিয়ে নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি পড়ল। আঁতকে উঠলেন নকুলবাবু। কি ভয়ঙ্কর, তাঁর যে পরনে কিছু নেই। এতক্ষণ পরে মনে পড়ল—বিয়ের সভায় পিন-আঁটা ছুতোজোড়া খুলে রেখে, কলাসে বসে বরযাত্রীদের তাকিয়ে ঠেস দিয়ে আরাম করছিলেন!

একটু হাসলেন নকুলবাবু, রোমাঞ্চ সিরিজের নায়করা এত অল্পে কখনো ঘাবড়ায় না। তাঁরও আজ রাতের অভিজ্ঞতা তাদের অভিজ্ঞতার চাইতে কম নয়। তা ছাড়া এখন দেখবার্ত, কর্তব্য কেউ কোথাও নেই! নিঃশব্দে বুমানিজিলিয়া লতাগাছ বেয়ে নকুলবাবু তিনতলার ছোট ছাদে গিয়ে উঠলেন। তারপর ঘরজার ভাঙা কাচের মতো দিয়ে হাত গলিয়ে, ছিটকিনি নামিয়ে, ঘরে ঢোকা কিছুই শক্ত নয়। বলাবাহুল্য, এ পথে যাওয়া-আসা করা এই তাঁর প্রথম নয়। বিলুদাই প্রথম বুদ্ধি দিয়েছিলেন যে, তিনতলায় ঘরের ভিতর থেকে ছিটকিনি এঁটে, এইভাবে যাওয়া-আসা করলে কাকপক্ষীও টের পায় না।

পাশেই স্নানের ঘরে গিয়ে খুব খানিকটা গায়ে মাথায় জল ঢেলে, তকতকে তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, কর্পা কাপড় পরে নকুলবাবু যখন শয্যাগ্রহণ করলেন, কালাঘরে যাত্রার সময় রাত্রি তখন কেটে গেছে, খালি পিত্তে পেট চোঁ চোঁ করছে। বিয়েবাড়ির পোলাও খাওয়া ছেড়ে এলেন বলে, একটু দুঃখও যে না-হচ্ছে তাও নয়। যাই হোক, নিজের খাটে, নিজের দেশে, নিজের ঘরে, বড় এক ঘরা ঠাণ্ডা জলই বা কম কি। একবার পাশের বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, এক ঘণ্টা আগেও যেখানে বিয়ের হট্টগোলে কান কালা পালা হয়ে যাচ্ছিল, এখন সেখানে সব অন্ধকার নিঝুম, এর মধ্যে একশো বছরের ব্যবধান। কি কাণ্ড করেছে অর্কেন্দু! বালিশে মাথা রাখা মাত্র গভীর ঘুম।

সে ঘুম ভাঙল—অনেক বেলায়, সন্ধ্যাবলির ব্যাকুল ডাকাডাকি আর বন্ধুজার ধাক্কাতে। সন্ধ্যাবলি? সন্ধ্যাবলির তো আসবার কথা নয়; তবে কি শেষ পর্যন্ত কাঁচি ঘড়িটাকেই ধরে আনা হয়েছিল? এত করেও কি তবে সব পণ্ড হয়ে গেল! ধরজা খুলতেই সন্ধ্যাবলি একেবারে আদুরালু বেগে ছুটে এসে তাঁর পায়ে পড়ল।—এ কেবল সন্ধ্যাবলি, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, বেশ দেখাচ্ছে লাল লাল গাল দুটো আর তার মুখে এ কি সব অদ্ভুত কথা।—'আমাকে ক্ষমা কর। বাবা বলেছে অত শাসন করলে তুমি কোথায় পালিয়ে যাবে, বেশো নাকি তাই ভেবেছিল। ওগো, আবার ফেলে কোথাও যেয়ো না।'

কেমন যেন মনটা নরম হয়ে গেল নকুলবাবুর: মাথা ঘুরে তুলে ধরলেন সন্ধ্যাবলির মুখখানি। কানের ওপর চোখ পড়ল, দেখলেন বেশ বড় কান, তার লতি জোড়া। আর মুখে কথা সরে না। সন্ধ্যাবলি চোখ মুছে, কুঁজো থেকে জল ঢেলে নিজের হাতেমুখে দিল, বাকিটুকু পায়ের ওপর ঢালল। বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে নকুলবাবু দেখলেন পায়ের আঙুলের ফাঁকে খানিকটা আলতা চাবড়া, অনেকটা ঘাসের পায়ের মতো!

সন্ধ্যাবলি একটু অপ্রস্তুতভাবে হেসে বলল—'আবার মামাবাড়ির সকলের রঙ্গ পায়ের আলতা আর জোড়া লতি।' আনন্দে-আত্মহারা হয়ে নকুল সন্ধ্যাবলিকে নকুলবাবু দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। অর্কেন্দুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন ভরে গেল। তবে সাক্ষাৎ বুড়ো-ধাড়ীবতর ঘরে যাবে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছেন মনে করে লজ্জাও পেলেন।

প্রিয় প্রশান্ত,

আমার পূর্বের পত্রখানা খুব সম্ভব তোমার দৃষ্টিপথে আসিয়াছে। মনে করিতেছ দামান্য ব্যাপারকে অনাবশ্যক ঘোরাল করিয়া আমি নিজেকে ভাল করিতেছি। বাস্তবিকই সেদিন অত্যন্ত বিক্ষিপ্তচিত্তে ও উত্তেজনার মধ্যে ঐ চিঠিখানা লিখিয়া পাঠাইয়াছি। সত্য বলিতে কি, ঠিক এতখানি না হইলেও প্রায় এই প্রকার মানসিক বিপর্যয় পূর্বেও ঘটিয়াছে। সে এক বড় অসহায় অবস্থা। সাক্ষাতে বুঝি বা বোঝান যায়, পত্রে একেবারেই অসম্ভব। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি,—তবে প্রতি বছরেই বিশেষ একটি সময়ে—শীতের মুখে। এ-বছর সেই ভয়াবহ সময়টি নিরুপদ্রবে পার হইয়া গেল দেখিয়া বড় আশা হইয়াছিল যে, এতদিনে রোগমুক্ত হইলাম।

শুধু রোগমুক্তির আশাই নহে। সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর পরে দিল্লীর হোটেলে সেদিন নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তোমার সহিত সাক্ষাৎ। ভাবিলাম ইহার পিছনে বিধাতার কোনও গুঢ় ইঙ্গিত রহিয়াছে। মনে হইল, তুমি God-sent। বিশ্বাস কর, কিছুদিন ধরিয়া তোমার মতই একজনকে খুঁজিতেছি। তাই সেদিন তোমাকে দেখিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। তোমার নিশ্চয় মনে আছে সেদিন হোটেলে চায়ের টেবিলে বসিয়া একটি কথা প্রথমেই বলিয়াছিলাম,—'বাবু যা চাইছিলাম তাই পেলে, এখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেল'। কথাটি আমার মুখ দিয়া অলক্ষিতেই বাহির হইয়া আসিয়াছিল। তুমিও বোধ করি এ ধরণের উচ্ছ্বাস শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলে না। কি মনে করিয়াছিলে, জানি না। হয়ত বা কথাটির উপর তেমন গুরুত্বই দাও নাই, নিতান্ত সহজ কথা বলিয়াই ধরিয়াছিলে। তাহাই স্বাভাবিক কারণ, দিল্লীতে ঐ অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের উভয়ের গত বাইশ বছরের জীবনের সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া বা নেওয়ার কোন সুযোগ ছিল না।

কিন্তু ইতিমধ্যে আমার পূর্বপত্র পাইয়া তাহাতে কি কি লিখিয়াছি, তাহা সঠিক স্মরণে নাই। আজকাল প্রায়ই এরূপ বিস্মরণ ঘটে। অতি অল্পকালের মধ্যে অনেক কথা ভুলিয়া যাই। অবশ্য যাহা ভুলিলেই চলে, তাহা অতীতের তেমন কোন কোন ঘটনা বা কথা চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারি নাই। যাই হোক পূর্বপত্রে কি লিখিয়াছি স্মরণ নাই বলিলেও এমন কিছু আছে যাহা তোমার দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। আজ মন অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সংযত। তাই এই পত্রে তোমার কোন চিন্তার নিরসন করিতে পারি, এমন আশা নাই। একমাত্র ভরসা তোমাকে যদি অল্প কয়েকদিনের জন্যও কাছে পাই, তবে হয়ত অনেক কষ্টকর অবস্থা মোটামুটি তোমার সুবোধ্য করিয়া তুলিতে পারি। সেইজন্য হয়ত তোমার পথও খুঁজিয়া পাইব।

ভাই প্রশান্ত, আজ তোমার উপর সমস্ত ভরসা কেন করিতেছি, তাহার কারণ বহু আমি খুঁজি নাই। যে অল্পকয়েক ঘণ্টা তোমার অনেক সময় কাটিয়াছে, তাহাতে তুমি ও আমি কোন চেষ্টা করি নাই। বরং বিপরীত ব্যবহারই করিয়াছি। মধ্যবিত্ত ঘরের অর্ধশিক্ষিত এক যুবকের চোখে সেদিন এই পৃথিবীর যে উপরতলার রূপটি ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তোমার-আমার যে উহা বাসনা ও ক্ষুধা তাহার সমস্ত সত্তাকে নিশ্চিহ্নরূপে গ্রাস করিতেছিল, উচ্ছৃঙ্খলতার সে স্রোতের মুখে বৈধ, সৌধ, স্বজন-বান্ধব, বন্ধু-প্রীতির মত কল্যাণকর মনোভাব, যে সৎপ্রবৃত্তি সবই শুষ্ক তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া গিয়াছে। কলেজের দিন শেষ হইবার পর সমস্ত তোমার সাহিত্য সাধনার সংঘর্ষ এড়াইয়া চলিয়াছি। অবশেষে

একদিন হেমন্তর ও তোমার মত আরো অনেকের শুভানুধ্যায়ীর সঙ্গেই হেমন্তর দিল্লি বদলির সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছিলাম। তখন আমি তোমার বেলার উত্তর। তোমের বাসনা কেবল উৎ হইতে উত্তরে হইতে থাকে। আমারও তাহাই হইল। এইভাবে কোথা দিয়া দিন, মাস ও বছরের পর বছর কাটিয়া গেল। সহসা এক সময় দেখিলাম, সে উত্তরোত্তর খরচের নেশার পায় দাস হইয়াছে ও পায়ের গায়ে কিছু অলঙ্কার ও বস্ত্র পরিয়া আছে। চাই উপস্থিতে দেখিয়া কিছু কিছিয়া পাইলাম। কিন্তু বড় বিলম্বে।

জানিও বৃদ্ধার নিতান্ত মামুলী। তোমার জীবনে তুমি এমন একাধিক দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এসব কথা শুনাইবার জন্যই তোমাকে এখানে আসিতে বলিব না। আজ তাহার কোনও প্রয়োজন বা সার্থকতা নাই। যাহা তোমার সাক্ষাতে বলিতে চাই, তাহা একদিকে যেমন মর্মান্তিক অপরদিকে তেমনি বিস্ময়কর।

এই কটি পত্র তোমার পক্ষে নিশ্চয় ক্লান্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। তবু অতি পুরাতন বন্ধুত্বের খাতিরে সেই ক্লান্তি ও বিরক্তির সহিত তোমার মনে এইটুকু ধৈর্য্য তোলাইয়া রাখিবে, এই আশা করিয়া আজ আমি তোমার শরণাপন্ন। এতগুলি কথা গুছাইয়া লেখা ইহলোকে আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। মন এমনই বিক্ষিপ্ত থাকে। আজ সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া কোনমতে এই পত্রখানি লিখিতে পারিলাম। কাল হয়ত পারিব না।

উপরের ঠিকানা দেখিয়া বুঝিবে পূর্বের বাসস্থানত (যাহা দিল্লীতে বলিয়াছিলাম) কলিকাতা বা বম্বাকর কোথাই টিকিয়া থাকা সম্ভব হয় নাই। ঘাটশিলাতেই ফিরিয়া আসিয়াছি। আশা করিতেছি, তোমার পূর্বের বাসস্থানত তুমি এখনো দিল্লীতেই আছ। তাই সেখানেই পত্র পাঠাইলাম।

পূর্বে লিখিয়াছি—বাসী করিবার কোন পথ রাখি নাই। এ কেবল অনুরোধ,—তিকাও রক্ষিতে পার। এবার এস। পারতে থাকিলে এস। পরিত্রাণের এখনো যদি কোন উপায় থাকে—সে তুমি।

ইতি—

শক্তিপদ।

এতদিনের লম্বা চিঠিখানা পড়া শেষ করে নিতাই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। অফিসের কাজ নিয়ে দিল্লী আসতে হয়েছিল, দিন দুই আগে। এমনি প্রায়ই ঘুরে বেড়াতে হয়, কখনো বোম্বাই কখনো মাদ্রাজ, নাগপুর, আহমেদাবাদ। এবারে ভারী কাজ নিয়েই এবার দিল্লী এসেছি। কাজ মেটাতে অনেকটা দিন লেগে গেল। কিন্তু আর দেরি করা চলে না। কলকাতার হেড-অফিস থেকে তাগাদা এসে গেছে ফিরে যাবার। তাই কাল দুপুরের মধ্যে কাজ চুকিয়ে, সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতার রেজার্ভেশন করে ফেলেছি। মনটাও বেশ হালকা। তার কারণ, যে কাজের ভার নিয়ে দিল্লী এসেছিলাম, তা ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। উপরি হিসেবে মোটা রকমের অর্ডারও আমায় করেছি। মনের এমনি একটা প্রসন্ন অবস্থায় হঠাৎ মনকা হাওয়ার মত চিঠিখানা এসে সব যেন এলোমেলো করে দিল।

দিল্লীতে পৌঁছবার দু-তিন দিনের মধ্যেই নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে শক্তিপদর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কিন্তু, সে এতই অল্প সময়ের জন্যে আর কোনরকমে নিজের অস্তিত্ব এনফোর্সমেন্টের তাগিদে এমনই প্রবল যে, তার কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। অবশ্য, এত বছর বাদে দিল্লীর মত শহরে, একই হোটেলের বারান্দার দেরাদোর ওর সঙ্গে সাক্ষাৎটা ঘটেছিল, তাকে ছোটখাটো নাটকীয় ঘটনা বলা চলে। ঘটনাটা আগে একটু নাটকীয় হয়ে পড়েছিল যখন তাকে অব্যবহিত পরেই শক্তিপদ আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল চায়ের টেবিলে, তারপর ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে প্রথমেই বলে বসল,—আঃ বাঁচালে তুমি আমাকে প্রশান্ত। তোমাকেই ত' খুঁজছিলাম এতদিন ধরে, এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তারপর আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে পকেট থেকে দামী রুমাল বার করে মুখ আর ঘাড় মুছতে মুছতে বলল,—কথা আছে প্রশান্ত তোমার সঙ্গে, অনেক কথা। ট্যাক্সি থেকে হোটেলের বেয়ারা তখন ওর সুটকেস আর বেডিং নামাচ্ছে দেখে বুঝলাম ও সবেমাত্র দিল্লীতে এসে নেমেছে। বললাম, কথা পরে হবে। স্নান খাওয়া, চা খাও, সুস্থ হও। ইতিমধ্যে বারান্দায় শক্তিপদর সামনে চা-টোস্ট আর ডিমসেদ্ধ নামিয়ে রেখে চলে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম,—কয়েকটা দিন থাকবে ত'? আমি এই হোটেলেই দোতলায় একটা কামরা নিয়েছি। পাশের কামরাটা খালই খালি হয়েছে। বলত' ঐখানেই তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দিই। কিন্তু তখনই বহু পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল,—কিন্তু গোল মার্কেটের এই ছাপোষা হোটেলে তোমার পোষাবে কি? প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই ও অদ্ভুতভাবে হেসে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, ক'দিন থাকতে চাও?

চায়ের শূন্য পেয়ালাটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে জবাব দিল, আপাতত দুদিন। তেমন দরকার হলে কাল রাত্তিরেই বেরিয়ে পড়তে হবে নির্জাপুরের দিকে,—সেখান থেকেই ত' আসছি। কিন্তু এতদিন পরে তোমার দেখা পাওয়া গেছে। কাজেই নির্জাপুরে যেতে না হলে আরো দু-একটা দিন এখানেই থেকে যাব। এই বলে পকেট থেকে সোনা-বাঁধান সিগারেট কেস বার করে অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে কেসটা বন্ধ করলো। তারপর কী মনে করে কেসটা আর একবার খুলে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, চলে নাকি এখন? না কি এখনো কলেজের সেই গুড-বয় হয়েই আছো?

আমার চাউনি থেকেই উত্তরটা বুঝে নিয়ে সিগারেট কেস বন্ধ করে ঘুরিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলে। এবার চেয়ারটা আমার বিপরীত দিকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে একমনে সিগারেটেই ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো, কোন কথা না বলে। ওর এই ব্যবহারটা খুব স্বাভাবিক বলে মনে হল না। হোটেলের বারান্দায় কিছুক্ষণ আগে ওর সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে সুরু করে ও যে ভাবে এতক্ষণ কথা বলছিল হঠাৎ তার মধ্যে এতখানি পরিবর্তন হবে ভাবতে পারি নি। দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শক্ত করে আমার হাত ধরা ও তারপর চেয়ারে বসে পড়ে প্রায় আর্তস্বরে ঐ সব কথা বলার সঙ্গে এখনকার চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে জানলার দিকে চেয়ে একমনে সিগারেটে টানার কোন সঙ্গতি খুঁজে পেলাম না। আবার তাকালাম, গত রাত্তিরে ট্রেনে হয়ত বিশ্রাম পায় নি, ক্লান্ত করে তুলেছে। এই ভেবে আমি সেখান থেকে উঠে হোটেলের ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে আমার পাশের ঘরটার সঙ্গেই ওর থাকার ব্যবস্থা করে দিলাম। দিল্লীতে এসে আমি বরাবর এই হোটেলে উঠি, ম্যানেজারের সঙ্গে তাই একটু খাতিরও হয়েছে। ঘরের ব্যবস্থা হয়ে গেছে, এ খবরটা বেয়ারাকে দিয়ে শুকে পাঠিয়ে আমি আমার

ঘরে ফিরে এলাম। অনেকখানা চিঠিপত্র লেখা তখনি দরকার। তারপর কয়েকটা জায়গায় বাইরে যেতে হবে। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। ভাবলাম ফিরে এসে ধীরে সুস্থে গল্প করা যাবে শক্তিপদর সঙ্গে। যদি তাও না হয়ে ওঠে, পরের দিন ত' পড়েই আছে।

বেরুব বলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাচ্ছি এমন সময় শক্তিপদ তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। গায়ে পলমী জেকেটের ওপর বাদামী ফ্লেনিল গাউন, পায়ে হটকার পায়জামা। ইতিমধ্যে স্নান সেরে নিয়েছে। চুল ব্যাকব্রাশ করা। লক্ষ্য করলাম মাথার সামনের কাঁচাপাকা চুল বেশ কাঁকা হয়ে কপালের ওপর থেকে চওড়া টাক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কর্মী হং আর বলিষ্ঠ চেহারায় এই বেশে ওকে মানাচ্ছে ভালো। মনে পড়ে গেল কলেজে-পড়া সেই শক্তিপদকে। তখন ওর বয়স ছেচল্লিশের বেশি নয়। আমার সতীর্থ হলেও বয়সে সে আমার থেকে বছর তিনেকের বড়ই। সেই বয়সেই ওর লম্বা-চওড়া চেহারার সঙ্গে এমন একটা তাঁরিক্কী ভাব ছিল, যা সচরাচর ঐ বয়সের মুকের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু ক্রমে তার কেতুক, চলন-বলন আর কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা আড়ম্বর আর অহমিকা বাসা চাড়া দিয়ে উঠছিল, যার ফলে আমাদের চোখে ওর ব্যক্তিত্বটা অনেকখানি নকল আর ধার করা বলে ধরা পড়ে যেত।

প্রৌঢ়ত্বে এসে এখন ওর গায়ের রং একটু তামাটে হলেও চামড়া বেশ টান টান। চাউনি ঈষৎ ঘোলাটে, দু'চোখের নীচের দিকটা একটু কোলা। চওড়া কপাল এখনো বলপ, বেশী চোখে পড়ে না। দাঁড়াবার ভঙ্গী এখনো ঋজু, কাঁধ ঘোরদার সামান্য ঝুঁকতে চায় সামনের দিকে। ওকে দেখে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, তাই ও কিছু বলে থাকলেও শুনতে পাই নি। সম্বিৎ ফিরে আসতে বললাম, একটু বেরুতে হচ্ছে, সন্ধ্যের আগেই ফিরব,—তুমি থাকবে ত?

ও বললে, আমিও বেরুব খানিক পরে। মনে হয় সন্ধ্যে নাগাদ আমিও ফিরে আসবো। দেরি হলেও খুব বেশি দেরি হবে না

সেদিন পরপর অনেকগুলো জায়গায় কাজ সেরে আর সৌজন্যের খাতিরে একজনের চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে যখন হোটেলে ফিরলাম, তখন রাত হয়ে গেছে বেশনাম শক্তিপদর দরজায় টোকা মারলাম। কুকলাম আমার জন্যে অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত কোথাও বেরিয়ে পড়েছে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে কিছুক্ষণ বরফের কাগজ ন্যাড়া চাড়া করতে করতে ঘুম এসে গেল। শক্তিপদ তখনো ফেরে নি দেখে অগত্যা দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সারাদিনের ঘোরাঘুরি ও পরিশ্রমে সত্যিকার বেশি ক্লান্ত হয়ে ছিলাম। মিল্লীর ঐকতান বেশ কড়া। তাই কখন ঘুমি দিয়ে শোবার সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম! কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। এক সময় পাশের ঘর থেকে চাপা গোঙানির শব্দ শোনা গেল। মনে হ'ল স্বপ্ন দেখছি, কোন দুঃস্বপ্ন।

ঘুম ভেঙে হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসলাম। কিন্তু গোঙানি তখনো শুনতে পাচ্ছি। ভাবলাম, দুঃস্বপ্নের ঘোর তখনো কাটে নি। তাড়াতাড়ি বেড-সুইচ টিপে আলো জেলে দিলাম। গোঙানি বন্ধ হল। কয়েক সেকেণ্ড সেই অবস্থায় বসে থেকে যখন আর কোন আওয়াজ কানে এল না, তখন আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। সবেমাত্র ঘুমিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা আওয়াজ শুনে আবার ধড় ধড়ে উঠে গেল। আর গোঙানি নয়, এবার স্পষ্ট শব্দ। আলো না জ্বালিয়েই আবার উঠে বসলাম। বেশ বোঝা গেল—আওয়াজ আসছে পাশের ঘর থেকেই। কিন্তু ব্যাপারটা শক্তিপদর হলে মনে হল না যদিও ঐ রকমেরই ভারী আওয়াজ। বেশ ধীরে ধীরে কয়েকটা কথা বলছে, তারপর কিছুক্ষণ থেমে ধীরে ধীরে আরো কয়েকটা কথা একই সুরে। ভাবলাম, শক্তিপদ হোটেলে ফেরার পরে তার কোন আত্মীয় বা বন্ধুকে সঙ্গে এনে থাকবে, হয়ত শুয়ে শুয়ে সুখ দুঃখের কথা কইছে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগের সে গোঙানির শব্দটা কিসের? এর কোন মীমাংসা তখন হবার নয়। হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে বেশ খানিকটা জল খেয়ে আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুলাম।

পরদিন খুব ভাল্লো একটু বেরিয়েই। মুখহাত ধুয়ে গায়ে আলোয়ানটা জড়িয়ে নীচে নেমে গেলাম চায়ের জন্যে। তখন সবাই চা খেয়ে যে যার ঘরে চলে গেছে। কেবল শক্তিপদকে দেখলাম এক কোণে বসে বরফের কাগজ উল্টাচ্ছে। আমি ওকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে প্রথমেই গতকালের ত্রুটির জন্যে মার্জনা চাইলাম। বেরুবার ও তা নিয়ে কোন মন্তব্য করলো না বা আমি সময়মত ফিরে না আসায় ও নিরাশ হয়েছে এমন ভাবও দেখাল না। আমি আশা করেছিলাম, কাল সকালে হোটেলে এসেই যে সব কথা আমাকে শোনাবার আগ্রহ দেখিয়েছিল, আজ নিশ্চয় তার কিছু শোনাবে। হয়ত কোন জটিল সমস্যার সমাধান চাইবে। বোটের ওপর কাল থেকে আমার মনের মধ্যেও বেশ একটু কৌতূহল জমে উঠেছিল।

কিন্তু শক্তিপদ যে ধারে ধিরেই গেল না, এমন কি তার ভাব দেখে এখনও মনে হ'ল না যে, সে কোন প্রসঙ্গ তোলবার বা এড়াবার চেষ্টা করছে। সকালে যে শক্তিপদ নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে দু'হাত দিয়ে আমার হাতখানা চেপে ধরেছিল, আজকের শক্তিপদ যেন সে মানুষই নয়, সম্পূর্ণ অন্য একজন। প্রথমে একটু অস্বাভাবিক মনে হলেও অতীত দিনের কয়েকটা ঘটনা মনে করে এই পরিবর্তনটা মেনে নিলাম।

এ প্রসঙ্গে পরে আবার ফিরে আসব।

শক্তিপদর চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। তবু বেয়ারাকে আমাকে সঙ্গ দেবার জন্যে আর এক পেয়ালা চায়ের ফরমাশ দিয়ে সে আলাপ সুরু করে দিল। আলাপের বিষয়বস্তু নিতান্তই নমুনা এবং নিছক বর্তমানকে নিয়ে। সংক্ষেপে তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমিও তাকে প্রায় একই প্রশ্ন করলাম। ওর জবাবগুলো ছিল আরো সংক্ষিপ্ত। বিস্তারিত বলতে গিয়ে পাছে অতীতের কোন কথা এসে পড়ে, সম্ভবত এই ভয়ে ও উত্তরগুলো আরো সংক্ষেপ করল। বেশন কাজ-কর্মের কথা বলতে গিয়ে শক্তিপদ ঘোষের একটু অন্যমনস্কতা

শ্রীবিষ্ণু ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস
ইঞ্জিনিয়ার্স, কণ্ট্রাক্টর্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স
২।১, রাধামাধব ঘোষ লেন, হাওড়া

হয়ে পড়েছিল—সেই অবসরে তার মনটাও পিছনে অতীতের দিকে পাড়ির দিয়েছিল। যেটুকু বলে, তা থেকে বোঝা গেল—মানে হয়তো ব্যবসা করে ও ছেড়ে কিছুকাল থেকে কলম আর ইটের কারবার করছে বাপ-মায়ের কাছে কি একটা ভাড়াগাছ। তবে, তাও আর ভালো লাগছে না। তাই সে এখন একমাত্র উপযুক্ত ভাইপোর নামে সব লিখেপড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত নিস্তে চায় বাটানিলার তার নিজের বাড়িতে। ভাইপো তবে বাবার নিজের সন্তান নয়। তবু বাবা যখন সব করছেন এবং ঐ এক ভাইপো ছাড়া সংসারে আর কেউই নেই তখন শক্তিপদর উপার্জিত বাবতীয় সম্পত্তি ছাড়া তাই প্রাপ্য। আর শক্তিপদ তাই ভেবে মনে সিদ্ধান্ত করেছে।

বিবাহ? না। অর্থ সঞ্চয় করতেই এ পর্যন্ত তার জীবন কেটেছে, বিয়েরের কথা ভাববার সময় সে পায় নি। প্রয়োজনও কোন বোধ করে নি তেমন। আমি বলতে যাচ্ছিলাম, বয়স তো এখন পঞ্চাশও হয় নি; এই অল্প বয়সে সে কাজ-কর্ম থেকে অবসর নিতে চাইছে কেন। কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই শক্তিপদ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বললে,—এবার উঠতে হচ্ছে প্রণব। একবার ভবানীপুর যেতে হবে। আজ বিকেলের ট্রেনেই সোজা কলকাতায় ফিরতে হবে। তার আগে দু-একটা কাজ সেরে নিই। এই বলে সে তোতলায় তার ঘরের দিকে চলে গেল। তারপর আর দেখা হয় নি।

ইতিমধ্যে গত কুড়ি বাইশ দিন একটানা কাজের মধ্যে আর ভিন্ন ভিন্ন বন্ধুদের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে গিয়ে শক্তিপদর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছি। হঠাৎ চিঠিখানা পেয়ে মনে পড়ে গেল।

হোটেলে সাক্ষাতের পরমুহূর্তে শক্তিপদর আকুতির সঙ্গে সেদিন ও পরে ভিন্ন ব্যবহারে যে অসঙ্গতি প্রথমে আমাকে আহত করেছিল ও পরে তার স্বভাব-প্রকৃতির যে বিকট ভেবে সমস্ত ব্যাপারটাকে আমি সহজ করে নিয়েছিলাম সেকথা বলতে গেলে যৌবনের দিনগুলিতে কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে যেতে হয়। সে সময় আমাদের দিন কেটেছে মাছড়ানাগানের অলিগলি ও কৈলের পাশাপাশি বুড়ি হয়ে। আমরা দুজনেই ডফরিচার্চ কলেজে পড়তাম একই ক্লাসে। অবশ্য প্রণব বয়সটা এক ক্লাসে নয়। আমি হয়ন মধ্যমগ্রাম থেকে প্রত্যেকদিন পাশ করে ডফরিচার্চে ইন্টারমিডিয়েটে পড়তে শুরু করি, শক্তিপদ তখন ইন্টারমিডিয়েটে দেওয়ার ছাত্র। পরের বছর আমি দেওয়ার ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে শক্তিপদ আই এ-তে ফেল করে দেওয়ার ছাত্র। এই থেকে আমরা বয়সে পরের দিন বছর আই এ ও বি এ দুজনে একসঙ্গে পড়েছি। তবে বয়সে একসঙ্গে ঐ অসঙ্গতি হলেও। চরিত্রে অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় আমাদের দুজনেরই বয়স বেশি, শক্তিপদর তো বটেই বছর দুয়েক আমার চেয়েও প্রায় তিন বছরের বড়। অতএব একমাত্র কলেজের ক্লাস দুটো অন্ত সময়ে আমি আর শক্তিপদ অন্য ছেলেদের দলে না-মিশে একটু তফাতে বসে পরস্পর সঙ্গ-সুখ লাভ করতাম।

ক্রমশ অন্তরঙ্গতা এল, আপনি থেকে তুমি। শক্তিপদ তার বয়সের সুযোগ নিয়ে কখনো কখনো তুই বলতেও ছাড়ে নি। দুটো ক্লাসের মাঝখানে একটা ছুটি পেলে সেই সময়টা কাটাতাম হয় মুদির পাশে, নয় কাছাকাছি কোন চায়ের দোকানে। খরচ অবশ্য শক্তিপদরই। উপার্জনশীল অভিভাবক তার যেহেতু আমি নই। চায়ের দোকানে দুজনের চা-খাবারের দাম তাকে দিতে দেখে বার কয়েক হাত দিয়েছি। কিন্তু পয়সা টাকা বা নোট কম করে বার করে দিত। খরচটার চেয়ে নিজে এসে তা থেকে মোট বর্ষিশ তাকে দিয়ে দিত তার কিছু না চেয়েই। দামী সিগারেট তখন থেকেই শক্তিপদ নিয়মিত খেত। এছাড়া কখনো কখনো ক্লাসের ও হস্টেলের জন্য অনেক ছেলেকে ছেড়ে নিয়ে হোটেলে বসে খাওয়া করতেও তাকে করতে দেখেছি। এ ব্যাপারে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সম্ভবত ছিল। টাকার জোরে অন্যের ওপর খবরদারি সম্ভব প্রতিপত্তি বিস্তার করা। হয়ত এটাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। কারণ, সামান্য একটু আলাপ ছাড়া অন্য ছেলেদের সঙ্গে গল্প করতে তাকে বড় একটা দেখি নি। ছেলেরা মেশতে চাইলে শক্তিপদ তাদের আমল দিত না,—চুচার কথায় তাদের বিদায় করত। কেবল আমার ওপর তার স্নেহ দুর্বলতা সেটাও বোধহয় কাছাকাছি বয়সের বলেই। কথা শক্তিপদ বরাবরই কম বলত। পড়াশুনা, সাহিত্য, শিল্প, গান-বাজনা, খেলা-ধুলো, যা নিয়ে ঐ বয়সের ছেলেরা সর্বদাই আলোচনা করে থাকে, শক্তিপদকে বড় একটা সে-সম্বন্ধে কিছু বলতে শুনি নি। একমাত্র শখ ছিল বিয়েটার দেখা, তাও খুব ঘন ঘন যেতে দেখি নি। ওর বাড়ির গল্প কখনো শুনি নি ওর মুখে। একবার ওর দাদার কথা চুচারবার বলতে শুনেছি,—তাও খুব অবজ্ঞার ভঙ্গীতে। 'খালাটা একটা আস্ত বোকা,—একেবারে নিরেট—খালার বুদ্ধিসুদ্ধি সম্বন্ধে একথাও তাকে বলতে শুনেছি।

শক্তিপদর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা চারবছর আগে সাহিত্যের জন্যে অনেকখানি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল বটে, তবে তার মধ্যে অন্তরঙ্গতার গভীরতা ছিল খানিই। তার একটা বড় কারণ আমাদের দুজনের মৌলিক প্রকৃতি ও মনের গড়ন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এ সত্যটা অবশ্য তখন উপলব্ধি করতে পারি নি, আর তাই সে বয়সে তার ব্যবহারের মধ্যে অসঙ্গতি দেখে মনে কষ্ট পেয়েছি। দুজনে পরস্পরের সঙ্গী হলেও আমাদের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক কোনদিনই গড়ে ওঠে নি, প্রকৃত বন্ধুত্ব যা অন্তরঙ্গতার যা সোড়ার কথা। আমি ছিলাম দরিদ্রের সন্তান। তার ওপর অল্প বয়সে বাবা মারা যাওয়ায়, তখন মামার ঘরে পালিত হচ্ছিলাম। তাই সব সময় আমার লক্ষ্য ছিল কত তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারব আর বিধবা মায়ের ভার নিতে পারব। আমার আর ভাই-বোন ছিল না। সে তুলনায় শক্তিপদর বাড়ির অবস্থা ছিল অনেক উন্নত ওর বাবা তখন সরকারী চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে পেনশন ভোগ করছেন আর দাদা পড়াশোনা শেষ করে কি এক ব্যবসায় নেমেছেন। এ ছাড়া ওদের বিষয়-সম্পত্তি যা ছিল, তার আয়ও খুব কম ছিল না। বোঝাই, তার জোরেই শক্তিপদ ইচ্ছেমত খরচ করতে পারত। ওর চাল-চলনে যেন একটা আভিজাত্য ভাব ছিল, তেমনি কথায়-বার্তায় একটা আত্মবিশ্বাস ওর সব সময়েই প্রকাশ হয়ে পড়ত। এ ছাড়া অর্থ আর প্রতিপত্তির ওপর ওর মোহ ছিল অস্বাভাবিক। ছোটোখাটো জিনিসে ওর মন উঠত না কলেজ-জীবনের শেষ দিকে এই মোহ ওকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছিল। তখন থেকে সে ক্রতগতিতে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে যেতে লাগল, পড়াশুনা, এমন কি আমার সঙ্গেও কথা-বার্তা, মেলা মেশা পর্যন্ত বিরল হয়ে এল।

এই বছর আমরা দুজনেই বি এ পাশ করলাম। আমি ইংরেজীতে এম এ পড়া সুরু করলাম, শক্তিপদর আর পড়ার ইচ্ছে ছিল

না, কিন্তু তার আগের লিখন থেকে তাকেও এখন চেনা যায়। ট্রেন ছাড়তে অল্প কিছু দেরি আছে। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই সৌম্যকান্তের এক সহযাত্রী তাকে চিনতে পারলেন। তিনি তাকে না ডেকেই হাঁটু শক্তিপদ জানালা দিয়ে ঝুঁকে তার আর পোষাকে না। সে বাড়ি তাড়া দিয়েছে বর্ধমানের কাছে এক ছিটছোট পল্লীতে। ট্রেন ছাড়তেই সে নেমে ছেড়ে চলে গেল। আসল ঠিকানা তার নতুন বাসার যেতে বলা হয়ে থাক ঠিকানাটা পাল্টে দিয়ে গেল না আমাকে। তার ব্যবহারে হতচকিতই হয়েছিলাম। ঐ রকম একজন আঘাত সহ্য হবার কথা নয়। তাই আমিও তার সন্ধান নেবার চেষ্টা করি নি। দুএকটি দিন ইতিহাসিটিতে দেখা হয়েছিল বটে কিন্তু দুজনেই দুজনকে এড়াবার তাগ করে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছি। তারপর শুনেছিলাম সে এম এ পড়া ছেড়ে দিয়েছে। আর দেখা হয় নি তার সঙ্গে।

সংক্ষেপে এই আমাদের পূর্ব-জীবনের বন্ধুত্বের ইতিহাস, এ দুবছর পরে আমি এম এ পাশ করে কলকাতায় এক বিলিতি পুস্তক প্রকাশকের অফিসে চাকুরি নিই। আমার চরিত্রে অ্যাডভেঞ্চারের কণামাত্র কোনদিন ছিল না, তাই আজ পর্যন্ত সেখানেই চাকুরি করছি। ইতিমধ্যে পদোন্নতিও হয়েছে। বিয়ে করে আর পাঁচজনের মত সংসারীও হয়েছি। জীবন ভালোই কাটছে।

শক্তিপদর চিঠিখানা পেয়ে বেশ বিপদেই পড়ে গেলাম। চিঠিতে পূর্বের একখানা চিঠির উল্লেখ রয়েছে অথচ একমাত্র এইখানা ছাড়া আর কোন চিঠিই পাই নি। কলকাতার অফিস থেকে বা বাড়ি থেকে বহুগুলো চিঠি আসার কথা সবই পেয়েছি। তবে শক্তিপদর প্রথম চিঠিখানা না পাবার কারণ কি? ভেবে দেখলাম, কারণ একটিই আছে। ও নিজেই লিখেছে অত্যন্ত বিকারগ্রস্ত মনে প্রথম চিঠিখানা পাঠিয়েছিল। তাহলে তাতে ভুল ঠিকানা থাকা খুবই সম্ভব। এবং ঠিকানা ভুল থাকলে বিহারের মত বড় শহরে আমার মত অচেনা নগণ্য লোকের হাতে সে চিঠি এসে পৌঁছবার কথা নয়। একবার ভাবলাম একজন বাসখোলী লোকের চিঠিতে এত প্রাধান্য দিতে যাই কেন? বিশেষ করে এতদিন বাইরে কাটানোর পর এখন সোজা বাড়ি ফিরে যাওয়াই আমার একমাত্র কর্তব্য। তাছাড়া কলকাতার অফিস থেকে তাগাদাও এসেছে। আর তার জন্যেই যে এত ভাবছি। ছেলেবেলার অদ্ভুত আচরণের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু মাত্র কয়েক দিন আগে এই হোটেলেই যে বাসখোলীর পরিচয় সে দিয়ে গেছে তার পরেও তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাই কেন?

বন্ধুপ্রীতি বা পরোপকার প্রবৃত্তির প্রাবল্য টেনে ধরলাম বটে কিন্তু আর এক দিক দিয়ে কৌতূহলটা ক্রমশই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। এর ওপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল হোটেলের যে ঘরে শক্তিপদ ওঠেছিল, মাত্র দাঁড়িয়ে সেই ঘর থেকে চাপা গোঙানি আর অস্পষ্টজনক অনুচ্চারণ আলাপের কথা।

ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া সত্ত্বেও সে রাত্রিতে ঐ ঘটনার ওপর কোন গুরুত্বই দিই নি। পরদিন সকালে শক্তিপদকে ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার কৌতূহল হয়েছিল। কিন্তু সে বেয়ারাকে কথাবার্তা বাধিয়ে হঠাৎ উঠে পড়ল, সে অবস্থায় ওবিষয় তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হয় নি। এখন শক্তিপদর চিঠির সঙ্গে ঐ ঘটনার একটা যোগসূত্রের ইঙ্গিত মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কৌতূহলেরই জয় হল। স্থির করলাম ছ'টার সন্ধ্যার ট্রেনের বদলে কাল সকালের ট্রেনে যদি বওনা হতে পারি তাহলে পরের যে ছুটো দিন থাকতে পারব তার সঙ্গে আর একটা দিন জুড়ে দিলেই ঘাটশিলায় ঘুরে আসা যাবে। কৌতূহলও মিটবে আর সেই সঙ্গে বন্ধুর উপরোধ রক্ষাও করা হবে। এই স্থির করে শক্তিপদকে তখনই টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আমার কলকাতায় পৌঁছবার তারিখ জানিয়ে দিলাম।

নির্দিষ্ট দিনে কলকাতায় ফিরে এলাম। সেদিন জোড়াসাঁকোর ঘর কুয়াশা থাকায় দিল্লী থেকে ট্রেন ছাড়তে ঘণ্টা দেড়েক দেরি হয়েছিল, যার ফলে কলকাতায় ট্রেন এসে নামল প্রায় ঘণ্টা দেড়েক দেরি করে। ট্রেনে বিশেষ এ খবরটা আর বাড়িতে জানাই নি—অচেনা উপস্থিত হয়ে বাড়ির সবাইকে অবাক করে দেবো এই মতলব করে। কিন্তু অফিসে একটা তার পাঠিয়েছিলাম। তাই কলকাতায় ট্রেন থেকে নেমে বিশ্বস্ত টায়্যাক গাড়ি করে প্রায় পাঁচটা অফিসের দিকে আসতে আসতে লক্ষ্য করছিলাম আমার অফিসের কেউ এসেছে কি না। একটু এগিয়ে আসতে নজর পড়লো ডিজের প্রথম গাড়িতে স্যুট পরা লম্বা-চওড়া চেহারার একজন লোক বেড়ার গায়ে ঝুঁকে পড়ে ট্রেন আমার দিকেই চেয়ে আছে। আর একটু এগিয়ে আসতেই শক্তিপদকে চিনতে পারলাম। কী আশ্চর্য লোকটা এলাহাবাদ পর্যন্ত ছুটে এসেছে! ওকে এখানে দেখব এরকম ভাবি নি। আমি কলকাতায় পৌঁছেই ঘাটশিলা যাব এরকম টেলিগ্রামে জানিয়েছিলাম। অবশ্য ওর এতখানি পথ এগিয়ে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। শুধু এই অতিরিক্ত ব্যস্ততা দেখে প্রথমে বিরক্তি বোধ হল। কিন্তু তারপর বিরক্তির বদলে কৌতূহল হল বেশি। এমন কি ওর অনুরোধটা যে শেষ পর্যন্ত রাখব বলে দিই নি সে কথা ভেবে মনটা নিজের ওপর প্রসন্নই হয়ে উঠল।

টায়্যাক পাশ দিয়ে বেড়ার ধারে পৌঁছবামাত্র শক্তিপদ ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে প্রায় জাপটে ধরল আমায়। বলল,—তোমার ট্রেনের দেরি দেখে মুহ্যমান হচ্ছিলাম, হয়ত আজ আসতেই পারবে না। এদিকে আমাদের ট্রেনের সময়ও পেরিয়ে যাচ্ছে। টিকিট কাটা হয়ে গেছে। টায়্যাকটাও ধরে রেখেছি। চলো বেরিয়ে পড়ি। এখন বোঝার হাঙ্গামা-লাগবার সময় আর পাব না। কোন মতে হাওড়ায় পৌঁছতে পারলে হয়। এ ট্রেনটা মিস্ করলে পরের ট্রেন ছাড়তে অনেক দেরি। ঘাটশিলা ফিরে পৌঁছতে নাকাল হতে হবে। সে ভাবি হাঙ্গাম।

শক্তিপদর কথা শুনে বাক্য ব্যয় করতে পারলাম না, হাসিই পেল। লোকটার কাণ্ডজ্ঞান একেবারে লোপ পেয়েছে। বিশ-পঁচিশ দিন বাইরে কাটিয়ে আমি আজ কলকাতায় ফিরলাম। এখানে আমার বাড়ি-ঘর, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন সবাই আমাকে আশা করছে। তাছাড়া আমার অফিস আসলে এখানেই।

সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এই মুহূর্তেই আমি ওর সঙ্গে ঘাটশিলা চলে যাব এমন একটা অসঙ্গত কথা ও কি করে ভাবতে পারল। শুধু ভাবাই নয় এমনভাবে কথাটা

HALDROY & Co.

LABOUR & TRANSPORT CONTRACTORS.

Phone : { 234674 (Office) 467539 (Residence) }

বলবে যে তখনে পর্যন্ত কেউ নিশ্চয়ই ওর শক্তিপদর সঙ্গে আমার এমনি বন্দোবস্তই হয়ে আছে। কিন্তু কাহিনি কী? ওর মতিগতির যা অবস্থা তাতে আমার প্রয়োজন ও নিজে থেকে বুঝবে বা ওকে বলে বোঝান যাবে এমন কোন আশা নেই। যদি অফিসে বা বাড়িতে একবার দেখা দিয়ে যেতে চাই তাহলে ও আমাকে ছাড়তে চাইবে না, নিশ্চয় আমার সঙ্গ নেবে। সে আরো বিপদের কথা। যথা সম্ভব ঠিকঠাকভাবে এ অবস্থায় নিজের কর্তব্যের কথা ভাবছি—এমন সময় আমার অফিসের এ্যাসিস্ট্যান্ট ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াল। ফোন আসার বিরক্তি ভুলে সেই অবসরে সে নিজের একটা কাজ সারতে দিয়েছিল। তাকে দেখে তখনি কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। দেখলাম শক্তিপদ একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। অন্য দিয়ে বললাম,—পাঁচ মিনিট সময় দাও, জরুরী দু-একটা কাজ করে দিয়ে তোমার সঙ্গেই যাব।

কর্মচারীটির স্যুটকেস আর হোল্ড-অলের টিকিট দুখানা দিয়ে কাউন্টার থেকে ছাড়িয়ে আনতে পাঠিয়ে দিয়ে সাউথে এসে বসলাম। তারপর ড্রয়ার থেকে প্যাড বার করে অফিসের কর্তাকে একখানা চিঠি লিখলাম। তাতে আমার জরুরী অবস্থার কথা জানিয়ে দুদিনের ছুটি চেয়ে নিলাম। চিঠি লেখা করে বাড়িতে টেলিফোন করলাম। ওপাশ থেকে টেলিফোন ধরলেন আমার স্ত্রী। এই নিদারুণ আমার পৌঁছানোর খবর আর সেই সঙ্গে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বর্তমান অবস্থার কথা জানিয়ে ওখানেও আরো দুদিন ছুটি চাইলাম। মিনতি অর্থাৎ আমার স্ত্রী শক্তিপদর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানে না। দিল্লী থেকে চিঠিতে যেটুকু জানিয়েছিলাম সেটুকু ছাড়া। ফলে আসল ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে সে ভয়ে নিল আমিই বুঝি কোন সাংঘাতিক বিপদে পড়েছি যে জন্যে বাড়ি ফিরে দেখা করা পর্যন্ত সম্ভব নয়। এদিকে টেলিফোনে এত কথা তাকে বোঝানও যায় না। যাই হোক কোনমতে তাকে আশ্বস্ত করে ও ঠিক দুদিনের মধ্যে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টেলিফোন রেখে দিলাম।

ইতিমধ্যে আমার লোকটি যাত্র-বিদ্যুৎ বাগান করে এসে দাঁড়াল। অফিসের চিঠিখানা আর ছুটিরখানা জরুরী কাগজ তার হাতে দিয়ে আর যাত্র-বিদ্যুৎ আমার বাড়িতে পৌঁছে দিতে বলে শক্তিপদকে নিয়ে তার ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। ট্যাক্সি ছুটল হাওড়া অভিমুখে। হাতে তখনো যে সময় ছিল তা যথেষ্ট না হলেও ট্রেন ছাড়বার আগেই পৌঁছে যাব মনে হল।

ট্যাক্সিতে শক্তিপদর পাশাপাশি বসে এতক্ষণে ওকে ভালো করে দেখলাম। দিল্লীতে ওকে দেখবার পর পনের দিনও কাটে নি। এরি মধ্যে কারো চেহারার এতখানি পরিবর্তন হতে পারে কল্পনা করা যায় না। একি দৃষ্টি করেছে শক্তিপদর! দেখে মনে হয়, পনের দিনে ও পনের বছর অতিক্রম করে এল। মুখ শীর্ণ, চোখ কোটরে বসে গেছে, দুচোখের নীচে পুরু ছুটো চামড়ার থলি আরো ফুলে উঠেছে, চিবুক নীচের দিকে আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে। কপালের ওপর শিরাগুলো ফুলে শক্ত দড়ির মত পাক খেয়ে গেছে। মাথার কাঁচাপাকা চুল রুক্ষ হয়ে এলোমেলো উড়ছে। মুখে গালে বেশ কয়েক দিনের খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি-গোঁফ। কয়েক-দিনের মধ্যে মাথায় বা গায়ে তেল জল পড়েছে বলে মনে হয় না। কোটের ফাঁক দিয়ে গায়ের সাদা শার্টটা দাঁতিমত ময়লা দেখা যাচ্ছে। এই কি সেই শক্তিপদ, যার বেশভূষা আর প্রসাধনের পরিপাট্য ছিল সকলের ঈর্ষার বস্তু? পনের দিন আগে যখন দিল্লীতে তাকে দেখি তখনো সে পুরোদস্তুর ফিটফাট। হঠাৎ কী এমন ঘটতে পারে, যাতে মাত্র এই কটা দিনে একটা মোটা মানুষ এভাবে পালটে যাবে। শক্তিপদ ট্যাক্সির এক কোণে এলিয়ে পড়ে উদাসভাবে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

ওর দুই চোখে অপরিসীম ক্লান্তির ছায়া নেবে এসেছে। মনে হয় সোজা হয়ে বসবার ক্ষমতাটুকুও আর নেই। মাঝে মাঝে ডান হাতটা মুখের কাছে তুলে খোঁচা খোঁচা দাড়ির মধ্যে আঙুলের ফাঁকে নীচের ঠোঁটটা শক্ত করে চেপে ধরছিল। মনে হল ভীষণভাবে কিছু মনে করবার চেষ্টা করছে। আমি আশা করছিলাম এইবার সে কথাবার্তা আরম্ভ করবে। দু-একবার আমার দিকে ফিরেও তাকাল। কিন্তু একটু চেয়ে দেখে আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল রাস্তার দিকে। জিজ্ঞাসা করলাম কলকাতায় কখন এসেছে। ও বলল আজ ভোরেই ট্রেন থেকে নেমেছে। জিনিসপত্র?

না সে সব কিছুই সঙ্গে আসতে হয় নি। কলকাতায় বাসাতেই সব ব্যবস্থা আছে। না, কলকাতায় বাসায় কেউই থাকে না একমাত্র একজন চাকরানী ছাড়া, সেই বাড়ি দেখাশোনা করে। এইটুকু বলতে বলতেই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজিয়ে থেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে তার চিঠিখানা আমি পেয়েছি কিনা। আমি উত্তরে জানালাম তার শেষের চিঠিখানাই শুধু পেয়েছি, প্রথমখানা পাই নি। আমার উত্তর শুনে শক্তিপদ অবাক না হয়ে সহজভাবে যেন নিজেকে শুনিয়েই বললে—সেই রকমটাই সন্দেহ হয়েছিল, চিঠিতে কি লিখতে কি লিখেছি।

ট্যাক্সি এতক্ষণ বেশ জোরেই এগোচ্ছিল। একটা চৌরাস্তার মোড়ে এসে ভীড়ের মধ্যে আটকে গেল। রাস্তার দুদিকে ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ি, বাস, লরী, মোষের গাড়ি, সাইকেলরিক্সা সব মিলে তালগোল পাকিয়ে গেছে। অনেক মিনিটের মধ্যে ঘণ্টা ছাড়িয়ে গাড়িগুলো চলতে আরম্ভ করল বটে কিন্তু স্পীড নেবার মত পথ পরিষ্কার হতে আরো প্রায় দশ মিনিট কেটে গেল। ফলে হাওড়া স্টেশনে যখন পৌঁছলাম তার তিন মিনিট আগে ঘাটশিলার ট্রেন চলে গেছে।

পথে এতক্ষণ শক্তিপদর নির্বাক অবস্থায় ছিল। এখন ট্রেন ছেড়ে গেছে শুনে সজীব হয়ে উঠল যেন। তখুনি ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমাকে হেস্টোরাণ্টে বসিয়ে ব্যস্ত হয়ে কোথায় চলে গেল। মিনিট পনেরর মধ্যে আবার তেমনি ব্যস্ত হয়ে ফিরে এসে জানালে জানাশোনা একজনের প্রাইভেট গাড়ি ও তার ড্রাইভারের সঙ্গে দুজনে ভাড়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আর পনের-বিশ মিনিটের মধ্যেই আমরা সেই মোটরে রওনা হতে পারব। ঠাট্টা আমার অভ্যাস বাড়াবাড়ি ধরে ফেলে। এতখানি পথ মোটরে যাওয়ার খরচ কম নয়। এবং এত তাড়াতাড়ি না গেলেও কোন ক্ষতি ছিল না। আর পাঁচ-ছ'ঘণ্টা অপেক্ষা করলে সকালের ট্রেনে খুবই যাওয়া চলতো। মাঝ রাস্তিরে কোথাও ট্রেন থেকে নামা এমন কিছু হাঙ্গামের ব্যাপার নয়,—বিশেষ করে যেখানে যাচ্ছি, সেটা অন্তত শক্তিপদর কাছে নতুন জায়গা নয়। সেখানে সবাই তার জানা, পরিচিত। কিন্তু কোন কথাই সে কানে তুললো না, বললে,—এ তুমি এখন বুঝতে পারবে না প্রশান্ত। আমি ভিজে গামলায় কয়লা বা বিশ্বাস কর। রাত আটটার আগে আমাদের ওখানে পৌঁছতেই হবে। তোমাকে ও দুদিনের বেশি আটকে রাখতে পারব না ওখানে। কাজেই আজ রাতটা খুবই ইম্পর্টেণ্ট। অনেকটা টাকা এর কাছে কিছু নয়।

রাতে যেটুকু সময় ছিল তার মধ্যে মুখ হাত ধুয়ে সামান্য কিছু খেয়ে ও পথের জন্যে সঙ্গে কিছু নিয়ে বেলা বারটায় কিছু আগেই আমরা রওনা হয়ে গেলাম মোটরে।

সেদিন ছিল শুক্লপক্ষের দশমী বা একাদশী। সন্ধ্যার পর থেকেই চারদিকে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ছিল। শীতের কুয়াশার সঙ্গে মিশে সে আবছা আলো পথের দুধারে গাছপালা আর দূরের ছোট ছোট পাহাড় আর টিলাগুলোকে রহস্যময় করে তুলছিল। জনহীন প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে আমাদের মোটর কিন্তু বাধার তীরগতিতে এগিয়ে চলেছে। কেবল মাঝে মাঝে কোন সাঁওতালি গ্রাম বা হাটবাজার এলে পড়লে গাড়ির গতি কিছুক্ষণের জন্যে কমে আসছিল।

হাওড়া থেকে রওনা হবার পর প্রায় ঘন্টাখানেক শক্তিপদ ওর পাশের কাচের জানলাটা তুলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে আধ-শোয়া ভঙ্গিতে গাড়ির কোণে পড়েছিল। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমার শরীর-মনও ক্লান্তি আর অবসাদে ভরা। সেই রাত থাকতে শয্যা ত্যাগ করে গায়ে সোয়েটার চাপিয়ে নিজীব হাড়-কাঁপানো হিমের মধ্যে হোটেল থেকে বেরিয়েছি। অত ভোরে খালি এক পেয়ালা কফি ছাড়া আর কিছু খেতে ইচ্ছে হয় নি। সেই ঠাণ্ডায় কনট সার্কাসের সিটি বুকিং অফিস। আবার সেখান থেকে লম্বা পাড়ি দিয়ে গোদার এ্যাডেলাই। সেখানে ট্রেন ছাড়তে বেশ খানিকটা দেরি। তারপর ট্রেনে নাবার কিছু পেটে পড়েছিল বটে। মধুবনে নাবতে না নাবতেই আবার তাড়াহুড়ো করে ঘাটশিলা রওনা হবার ব্যবস্থা, এবং অফুরন্ত ট্রেন ফেল করে মোটরে ঘাটশিলা রওনা। এরপর আর শরীর বা মনের দোষ দিই কি বলে। কাজেই শক্তিপদর দেখাদেখি আমিও গাড়ির কোণে গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল শক্তিপদর গলা শুনে। তখনও সে ড্রাইভারকে সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছে। আমি সোজা হয়ে বসে কোটের বোতামটা খুলে দুকাপ চা দিচ্ছি দেখে সে আমার দিকে চেয়ে বললে, দেখ ত' তোমার কি দুর্ভোগ সঙ্গে একটা কম্বল বা র‍্যাপারও নেই। কোনটাই ত' হিসেব করে করতে পারলাম না। যাক আর ঘন্টা দুই বকুনির। তার পরেই ত' ঘাটশিলা। আগেই বাড়ি পৌঁছে যাব।

বেলায় শক্তিপদ এতক্ষণে একটু সহজভাবে কথা বলছে। আমার হাতে সময় ছিল। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে ও তারপর চাটুকু পেটে পড়তে দুজনেই একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। শক্তিপদ এবার তার নিজের কথা বলতে লাগল। প্রথমেই জানালে যে, ব্যবসায়ের কল্যাণে খনি আর ইটের কারখানার বাহিরেও সে ইতিমধ্যে তার মৃত দাদার স্ত্রী ও ভাইপোর নামে কিছু সম্পত্তি করেছে। শুধু তাই নয়, তাদের-জন্যে ঘর-বাড়ি বেচে যা ছিল তাও ওদের দান করেছে। শুধু ঘাটশিলার বাগানবাড়িটা এখনো নিজের নামে আছে। ওটা নিয়ে কি করবে এখনো স্থির করে নি।

আমি সরল বিশ্বাসে বললাম, সবই যখন তোমার ভাইপো আর তোমার বৌদিকে দিয়ে দিচ্ছ তখন ঘাটশিলার বাড়ি নিয়েই বা এত ভাবনা কেন? ওটাও ও'------

আঃ! তুমি কিছুই বোঝ না প্রশান্ত, এই তোমার একটা মস্ত দোষ, হঠাৎ শক্তিপদ যেন খেঁকিয়ে উঠল আমার ওপর।

আমি একেবারে স্তম্ভিত। কি হল কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে তাকাতেই শক্তিপদ আমার একেবারে কাছে ঘেঁসে এসে আমার হাত দুটো চেপে ধরে প্রায় কেঁদে ফেললে,—কিছু মনে করো না ভাই প্রশান্ত, জানই ত' মাথার ঠিক নেই। তারপর চাপা গলায় ফিসফিস্ করে বললে, অভিশাপ,—সর্বাঙ্গে ওর অভিশাপ লেগে রয়েছে, ও বাড়ি কি করে আমি ওদের দিই বলত'? যে সর্বনাশ ওদের করেছি সে পাপের প্রায়শ্চিত্তই আজো শেষ হলো না।

এই বলে দু-হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে একরকম আমার কাঁধের ওপরেই হেলে পড়ল। গায়ে গা ঠেকাতে বুঝতে পারলাম ওর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। এই কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যেও ওর দেহ থেকে অস্বাভাবিক একটা উত্তাপ আমার অনাবৃত হাতের ওপর যেন ছ্যাঁকা দিতে লাগল। গাড়ির মধ্যে ড্রাইভারের সামনে এরকম নাটকীয় আচরণ মোটেই সঙ্গত নয়। তাই শক্তিপদ হঠাৎ এভাবে ভেঙে পড়ায় আমার পক্ষে একেবারে স্বাভাবিক ভাব বজায় রাখা কঠিন হলেও নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করে ওকে সামলাতে লাগলাম। আদর করে ওর পিঠে চাপড় দিয়ে বললাম, ছেঁড়ি শক্তিপদ, ওরকম অধীর হলে চলবে না। তোমার সমস্যা যাই হোক, দুজনে মিলে পরামর্শ করে তার একটা সমাধান করবোই। এত ঘাবড়ে যেও না। আমার এই আশ্বাসবাণী ওর মনে কতটা আশা বা সাহস সঞ্চার করল জানি না, তবে ধীরে ধীরে ও অনেকটা শান্ত হলো বোঝলাম। পরে ওর ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে গাড়ির মধ্যে আবার কিছু বরে বলে, তাই অতি সাবধানে অন্য যাত্রীদের খোশ মেজাজের ভাণ করে নানা হাল্কা কথার অবতারণা করলাম। সে সব কথায় শক্তিপদ খুব যোগ দিল না বটে, তবে আমাদের মোটর ঘাটশিলায় পৌঁছবার আগেই ওর অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এল।

শক্তিপদর আন্দাজ মত ঘাটটার আগেই আমরা তার বাগানবাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। দূর থেকে মোটরের হেডলাইট দেখতে পেয়েই সন্তবত তার মালী ছুটে এসে সামনের গেট খুলে দিল। গেট পার হয়ে প্রকাণ্ড হাতা চক্কর দিয়ে লম্বা ঢালু গাড়ি বারান্দার নীচে এসে থামল আমাদের মোটর। সঙ্গে সঙ্গে দুজন চাকর সামনের বড় বংলো দিয়ে বেরিয়ে এসে দোরে টুকে গাড়ির পাশে দাঁড়াল। একজন এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল। শক্তিপদ ওদের কারো সঙ্গে কোন কথা না বলে গাড়ি থেকে নেমে সামনের বারান্দা দিয়ে ভেতরে চলে গেল। আমি ওর কাছে কোন সাদর অভ্যর্থনার আশা করি নি, ওর সঙ্গে সঙ্গে আমারও বাড়ির ভেতর চলে যাবার কথা। তবু ইচ্ছে করে তখনি ভেতরে না ঢুকে সামনের বাগানের দিকে এগিয়ে গেলাম চারদিকটা ঘুরে দেখার জন্যে। ততক্ষণে চাঁদের আলো আরো স্পষ্ট হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, আর সেই আলোয় বাড়িখানা আর চারপাশের বাগান সেই নির্জন পরিবেশের মধ্যখানে ছোটখাটো মায়াপুরীর রূপ ধরেছে মনে হল। শীতের সন্ধ্যার পাতলা কুয়াশা চন্দ্রালোকের সঙ্গে মিশে সর্বত্র একটা মায়াজাল বিছিয়ে দিয়েছে।

ঘুরে ঘুরে বাড়িখানা দেখলাম। প্রকাণ্ড হাতার মাঝখানে ছোট দোতলা বাড়িটা খুব ছোট নয় এবং বাড়ির স্থানে চারপাশের বাগানের সঙ্গে মিলিয়ে গৃহস্বামীর সৌখীন রুচি ও আর্থিক সচ্ছলতার পরিচয় দেয়। বাড়িটা দোতলা। দোতলার সামনে ও দুধারে চওড়া টানাবারান্দা। বাড়ির রঙ রাত্রির এ আলোয় ঠিক বোঝবার উপায় নেই। তবে রঙ যাই হোক, বাড়িখানার সর্বাঙ্গ মন লতায় এমন মুড়ে দিয়েছে যে, চারপাশের

(শেষাংশ ১৩৭ পৃষ্ঠায়)

সমুদ্র মন্থন

আনন্দের ঘরটায় ঢুকে সবাই, অর্থাৎ ঘরে যারা ছিল এই মুহূর্তে কিছুটা মেয়ে ও কিছুটা পুরুষের সংমিশ্রণে তৈরি হয়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথের ঘরের প্রতি প্রস্থান করায়, ফলে তার আসল নামটি বন্ধুমহলে প্রায় লোপ পেতে বসে। ধর্মতলার একজন উঠতি ব্যবসায়ী হিসেবে মাসিক বসন ও মুসেমান ইট পরে ছোট ছোট কড়া-পড়া দুটি হাতের মেহনতটা আনন্দেরই ছিল। তারই ফাঁকে ফাঁকে তাদের বাকী সবাইকে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে—এবার তাহলে তুমুল তর্ক বেধে যাবে। নিশ্চয়ই সেই পুরোনো প্রশ্নটা নিয়ে, যেটা নিয়ে ঐ নামের দরকার।

সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ যে যাই থাকুন, ঐতিহ্যের ধোঁয়ায় তার কোনো অভিপ্রায় নেই—এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবেই তিনি সবার দিকে ওয়াল্ডর্ফ ছড়ে দিলেন। তিনি যে শুধু ধর্মঘটেই উৎসাহী তা নয়, আন্দোলনের নিম্নে, ধর্মঘটের অস্পৃশ্য বা বেহদ্দি মানুষ সকলেরই বিরোধী পক্ষের হয়ে লড়াই-এর জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত।

যাহোক সৈনিক রোলিদারিতে ধর্মঘট ধারণার নেতৃত্ব গ্রহণ করার প্রতিক্রিয়া দাঁড়াতে কি হতে পারে, তা অনুমেয়—মায়ের অশ্রুজল, ভাইদের গঞ্জনাগঞ্জন ও বৌদিদের লাঞ্ছনার অনুরোধে তিনি কথা দিয়েছেন যে, ছমাস অন্তত বাড়িতে শান্ত হয়ে বসে তিনি পঞ্জাতন্ত্র করবেন।

প্যাকেজের উপর নীচু হওয়ার ব্যবসার তাই আজকাল সর্বদাই ধর্মঘটীদের দেখতে পাওয়া যায়—ফলে হালটি বন্ধু-বান্ধবের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছে।

বক্তা বলেন—'আজকাল শাস্ত্র পড়ছি, পড়ে পড়ে কত যে রহস্য বের করছি আপনাদের পিলে চমকে যাবে—'

বক্তার আর শ্রোতার একপাশে বসে নিম্নে সংলাপ নিয়ে আলোচনা করতে করতে হাসি ব্যবসায়ের ইতিবৃত্তে পৌঁছে দিয়েছিল—সেই যখন হাঁকিলে ফুলোর চাষ করতে কালো কালো জোয়ান বলধন লোকগুলোকে ধরে আনা একান্ত আবশ্যক হয়েছিল। তারা বললে—'ব্যাপারটা কি?'

'মহাভারতে সমুদ্রমন্থনের একটা গল্প আছে, জানিস তো?'

'জানি বৈ কি', সুকবি সৌমিত্র আবৃত্তি সুরু করলে—'

'বৃন্তহীন পুষ্প সম আপনাতে
আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী—
আদিম বসন্ত-প্রাতে
উঠেছিলে রক্ষিত সাগরে,
তব হাতে সুধাপাত্র
বিষভাণ্ড রয়ে যায় নীচে—
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু
মহাশঙ্খ ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিল পদপ্রান্তে
উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত—'

মৈত্রেয়ী দেবী

'বেশ, বেশ তবে একটা একেবারে কবি-কল্পনা—উর্বশী সমুদ্রমন্থনে উঠেছে এমন কথা ব্যাসদেবের মহাভারতে নেই।'

'বলেন কি! তবে রবীন্দ্রনাথ—'

'লোটা মহাভারতে উর্বশীর পিতৃকুলের সন্ধান না পেয়ে কবি তাকে সমুদ্রের অতলে ডুবিয়ে ছেড়েছেন আর কি—'

তরুণ বলল 'তা রহস্যটা কি?'

'তবে শোন পুরোপুরি গল্পটা বলি—গল্পটা একটা ব্রহ্মকাহিনীর মত রোমাঞ্চকর। এ গল্পের তিনটি দুকিয়ে আছে—আর একটা গল্প, যেটা আজও প্রতিদিন ঘটছে। সেই আদ্য-পুরাকালে সমুদ্রমন্থনের ফলে আজ যাঁদের আমরা দেবতা বলি, তাঁরা ও দানব প্রভৃতি আরো অনেক জাতি সুমেরু নামে—'জলবলয়ে মেরুঃ তেজোরাশিসমুদ্ভবঃ' পর্বতে বাস করলে যা ও দানবরা সেই পর্বত দূর থেকে তেজপুঞ্জের মত দেখায়। হিংসাদ্বেষ তার উপর, কিন্তু করে—সেই দুরারোহ পর্বত সাধারণ মানুষের মনেরও অগম্য। সেখানে কত নদী-তীরে কত রকমের বৃক্ষলতায় কত বিচিত্র পাখী নীড় বেঁধেছে, মণি-রত্নের আকর সেই পাহাড়ে নানারকম লতা-গুল্ম আছে, তার মধ্যে আছে একরকম গাছ যোষৌষধিবোধদিবিধীপিতম্—অর্থাৎ লতা গুল্ম বা অন্ধকারে আলো করে থাকে।

'এটা কিন্তু কবি-কল্পনা নয় একেবারেই' —শঙ্কর জোড়ন ছাটল—'যেমন অন্ধকারে জোনাকী জ্বলে ও অনেক ফসফরাসেন্ট প্রাণী আছে, তেমনি অনেক গাছও আছে—গভীর জঙ্গলে যেখানে সূর্যরশ্মি অন্ধকার, সেখানে তারা আলো করে থাকে।'

বক্সা বললেন—'সেই আশ্চর্য সুমেরু পর্বতমূলে বসে মহাভারতের কবির মতে 'উদোসিয়মশালী মহাপ্রভাব দেবরাজ' অমৃত তুলবার মন্ত্রণা করলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন অমৃত কোথায় পাব? বা কিরে সমুদ্রকে মন্থন করব?

'অর্থাৎ তখন দুর্বৃত্ত দেবতারা অমর ছিলেন না, তাঁদের মৃত্যু ছিল। এতএব তাঁরা একরকমের মানুষই ছিলেন—খুব লম্বা পরবর্তী যুগে যাঁদের আর্য নাম দিয়ে ভোলা হয়েছিল, তাঁদেরই পূর্বপুরুষ—এবং 'উদোসিয়মশালী' কথাটির মানে খোলা যায় তখনই অমৃত পরিবর্তে লোকেস্টিবেটেড। সেই দেবতা নামক জাতির দুটি নেতা নারায়ণ ও ব্রহ্ম তখন মৃত্যুকে রোধ করবার জন্য অমৃত, বানাবার পরামর্শ করলেন, সম্ভবত তাঁদের কিছু অভিজ্ঞতাও ছিল। মৃত্যু আটকায় কিসে বল দেখি?' বক্সা অর্থপূর্ণ মুচকি হাসি হাসতে লাগলেন।

রবীন্দ্র ছেলে শঙ্করের মাথায় বুদ্ধি জোগে গেল, সে বলল—'ওষুধে।'

'ঠিক ঠিক আমরা এও জানি যে সব ওষধি থেকে ওষুধ তৈরি হয়, তার বেশিরভাগই জঙ্গলে পাহাড়ে—ঐ ওষধি যখন মন্থিতশেষ ফুরে বিষে লক্ষ আকার ধরে পড়েছিলেন, তখন ওষুধপত্তর গজানোর তুলে আনতে হয়েছিল—একটা শুনতে হাস্যকর বটে, কিন্তু ওটা ওষুধপত্তর কীর্তি-কাহিনী ঘটিয়ে তুলতে তখই বলা হয় পাহাড়েই নানা লতা-গুল্ম জন্মায়, তার মধ্যে যার গন্ধাদু সঞ্জীবনীর—তাকেই ওষধি। অবশ্য ছোট বড় সব গাছ-পাহাড় থেকেই ওষুধ তৈরি হয়ে থাকে। ওষুধ তৈরি করতে সোনা প্রভৃতি নানা ধাতুও লাগে।'

শঙ্কর মাঝ থেকে বলল 'যেমন মরফলজে সোনা'—

রেমিক্স তরুণ বলল, অনেক অসুখেই সোনা প্রয়োগ হয়ে থাকে অন্ধকারেও লাগত।'

শঙ্কর বলল—'কিন্তু অমৃতের কথাটা কি হচ্ছিল?'

'একটু ধৈর্য ধর, খুলে বলি'—বক্সা অভিধানটা খুলে পাতা ওল্টাতে সুরু করলেন—'অমৃত কি না, যে খেলে মৃত্যু এমন নয়—চিরকালের জন্য না হলেও কিছুকালের জন্য মৃত্যু আটকায় মানুষ কি পেতে?'

শঙ্কর বলল—'একটু ওষুধের কথা বলছ। কিন্তু তার সঙ্গে সমুদ্রমন্থনের গল্পটা লাগাচ্ছ কি করে?'

সৌমিত্র বা সোমনাথ উত্তরে বলল—'সে উর্বশী।'

পাকাপোক্ত বাড়িদার মত বক্সা উত্তর করলেন—'সে উর্বশী। এর মধ্যে নারীঘটিত কোনো ব্যাপার নেই।—শোন বলি, সমস্ত সমুদ্রমন্থন ব্যাপারটাই হচ্ছে ঔষধ তৈরির প্রক্রিয়ার বর্ণনা।'

সত্যেন এক কোণে নিবিষ্টমনে কাগজ পড়ছিল এইবারে মুখ তুলে বলল—'বক্সা একবার ঐ দাদের ওষুধওয়ালা মালিকের ছেলের হাতে ভেড়ুয়ে পিতে দাদী হয়ে ছিলে মনে আছে, এবার পুরাণের এই আধুনিক ব্যাখ্যায়—'

বক্সা বলেন—'না রে পুরাণের সবই রূপক—এটিও একটি ফ্যান্টাসিটিক্যাল বিরাট এস্টাব্লিশমেন্টের বর্ণনা। নারায়ণ ও ব্রহ্ম দুজনেই একই জাতির মানুষ—অর্থাৎ জাতিতে দেবতা, বুদ্ধিতে যোদ্ধা—এঁরা হচ্ছেন সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষ এবং এরকমটাই বলা চলে।'

ছোট বৌদি দুপুরের কাপ নিয়ে ঢুকলেন—ট্রে'টা মাঝির সকলের হাতে হাতে দিতে দিতে বললেন—'আপনারা এবার যে আমার বর একদমই কথা বলছে না। আমার উপর রাগ করে তোমরা তা কি

● ছোট বৌদি দুপুরের কাপ নিয়ে ঢুকলেন

ভুলিয়ে ভোলে ঠকে ঠোকা যাবে, তবে আর ব্যাপারটার দিকে মন না যেতে—তাতে সব অবস্থাতেই কেউ না কেউ এরকমটেই হয়েই।'

'তাই বলে তো আর হাল ছেড়ে দেওয়া যায় না—তাহলে তো কোনো দিনই সমস্যার সমাধান হবে না।'

শঙ্কর বলল—'তাহলে সুমেরু পর্বতের উপর সেই অ্যাস্ট্রিটিক্যাল এক্সপেডিশনের কি হল, সেখানেও কি দর্ঘটনা হয়েছিল?'

'গল্পটা একবার ধরিয়ে পড়লেই বিস্তারের কথাটা বুঝতে পারবে; গল্পগুলো লেখা হয়েছে সব অবস্থার সব রকম বুদ্ধি-বিচারের স্তরের মানুষের জন্য। শিশুরা দৈত্য দানব দেবতা প্রভৃতির অলৌকিক কাহিনী শুনতে ভালোবাসে—অনেক বয়স্কও তাই—তখনকার দিনে যারা

দেব দানব কুল পিশাচ যক্ষ রক্ষ কল্পনা করে রোমাঞ্চকর গল্প পড়তে খুব ভাল লাগে, তাইতো আজকাল বহুল বিক্রিত পত্রে—বিজ্ঞানের অদ্ভুত গল্প পড়ে। তখন তো টিভিতে দেখবে বিলম্ব ছিল না, ফোটোরি মেশিনও ছিল না, একটি গল্প লিখেই ব্যাসদেবকে আলোকের ঘনোবিজ্ঞান করতে হয়েছিল।'

বৌদি খিজ্ঞাসা করলেন—'অর্থাৎ সিউটি-ফ্যাক্স কম্পানির বড়া কি বলছিলে যেন ইন্দুবেলে—এতটা খুলবে নাকি, তাহলে দেখানে আমি যাবার ব্যবস্থা করাব।'

'গল্প শোনো বৌদি গল্প শোন—তখন অমৃতের অন্বেষণে পঞ্চপাণ্ডব বিষ্ণু বললেন—মন্দর পর্বতকে তুলে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ মন্দর পর্বতে ওষধি বনস্পতি প্রভৃতি যত কিছু সবই ওষুধের কাজে লাগবে, যে সব বন্য বা গাছ-গাছড়া আছে তা প্রচুর মন্থন করতে হবে, তারপর জল দিয়ে তাকে সেদ্ধ-ফিউজ করে পিউরিফাই করতে হবে—'

'হেঁয়ালি হেঁয়ালি' কবিরাজের পৌত্র শঙ্কর লাফিয়ে উঠল—'এখন বড় বড় হাসপাতালে বা ল্যাবরেটরিতে গিয়ে শুঁতো করে কখনো বা হাত ফোর করে, এক পলাশে আর একটি বিশিষ্ট ডাক্তার তাকে পিউরিফাই করে—'

'এইবারে বোঝ ব্যাপারটা'—ধন্বন্তরি পরিতৃপ্তিতে হাসলেন—'পাহাড়ের নানা উচ্চতায় ওষধির নানা গাছগাছড়া কোথায় কোন্ সময় কোন্ রস কতটা পাওয়া যাবে—তা জানে কে? তারপর তাকে শিখতে হবে, মন্থন করতে হবে, ফুটতে হবে, মন্থন করতে হবে, সে তো সোজা কাজ নয়—করে কে? দেবতাদের সুখের অবধি, অমৃত-কোনল নেই, সুখচিন্তাবাহী নাথা, মজুরী পোষায় না যাবা! তাই অসুরদের চাই, আর চাই নাগদের, আর চাই বাসুকি রাজের ভোটের সেই আদিম জাতিদের যারা তখনও যন্ত্রের কারবার করে গায়ের শক্তি ফুরিয়ে ফেলে নি। এই অনার্য জাতিরা কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত তাই নারায়ণ ও ব্রহ্মার আদেশে অমর নাগ উঠে দাঁড়ালেন ও সেই 'বনস্পতিত পর্বতরাজ একহাতে তুলে উৎপাটিত করলেন।'

তারপর দেবতা ও অসুরগণ কূর্মের পিঠের উপর ঐ পর্বত স্থাপন করে নাগের দ্বারা সমুদ্রের মন্থন সুরু করলেন।

সৌমিত্র বললে—'গোটা পাহাড় তুলে ফেলা ইত্যাদি এসব বাড়াবাড়ি গল্প হচ্ছে না—'

'হুঃ!' লাল ছিলেন ধন্বন্তরি—'এই সব বাড়াবাড়ির ঠেলাতেই তো অর্থ গুলিয়ে যায় তা কবিরা বাড়াবাড়ি করেই বা না করবে? আধুনিক কবির লেখা পড়নি নুন, সমুদ্রের উপর সূর্য উঠছে না আকাশে যেন কে পালের পিচ, ফেলেছে—।'

সৌমিত্র আধুনিক কবি হিসাবে বাধা না দিয়ে পারল না 'আর 'যদি যদি কিঞ্চিৎধিক প্রবহ'ঃকৌমুদী হরিত হরতিমির মতিঘোরম্—এটা বাড়াবাড়ি নয়।'

'নিশ্চয়ই। দাঁতের থেকে জ্যোৎস্নার মত আলো বেরিয়ে ঘোর অন্ধকার দূর করে, এমন তো কখনো দেখি নি বাপু। তার পাশে যা দেখি, 'বলে ধন্বন্তরি আড়চোখে তাকাতেই বৌদি ভোঁস করে উঠলেন—'ধন্বন্তরি! কিন্তু কি পয়েন্ট—তারপর সমুদ্রতীরে সেই কার্ডিসিটিক্যাল অ্যাটাক চালু হল?'

'এই ঠিক বলেছ।' কফিটা এক চুমুকে শেষ করলেন ধন্বন্তরি—'তারপর মহাসমুদ্রের কথা শোনো—স্বয়ং কূর্মরাজ মন্দর পর্বতের নীচে নিজের বজ্রিন পৃষ্ঠদেশ স্থাপন করলেন—নাগরাজ মন্দর পর্বতকে বেষ্টন করলে অসুরেরা তার মুখের দিক আর দেবতারা পুচ্ছের দিক ধরে মন্থন সুরু করলেন। অসুরদের আকর্ষণে নাগরাজের মুখ থেকে নিঃশ্বাসবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র অগ্নি বেরিয়ে আসছিল। সেই ধূম্র মেঘে পরিণত হয়ে পরিশ্রমে ও গরমে পরস্ত দেবাসুরের দেহের উপর জলবর্ষণ করতে লাগল। মন্থন পর্বতের উপর যত গাছে যত ফুল ফুটে ছিল, আকাশচারিণী বৃক্ষশাখা থেকে সেই ফুল তাদের মাথার উপর পুষ্পবৃষ্টির মত পড়তে লাগল। মন্থনের সময় গম্ভীর মেঘগর্জনের মত শব্দ শোনা যাচ্ছিল·· সেই ঘূর্ণমান পাহাড়ের উপরের বড় বড় গাছগুলিতে পরস্পরের ঘর্ষণে আগুন জ্বলে উঠেছিল, তখন নীল মেঘের মধ্যে সেই আগুনের রেখাকে হঠাৎ থেকে থেকে মেঘের গায়ে বিদ্যুৎ চমকের মত দেখাচ্ছিল। মন্দর পর্বতের নানা গাছের লতার ওষধির রস নিষ্কাসিত হয়ে সমুদ্রের জলজলে পড়তে লাগল। অমৃতের ন্যায় শক্তিশালী সেই বৃক্ষলতার নির্যাসের সঙ্গে ও পর্বতোত্থিত গলিত সোনার সার তাদের সুরের ঘটল—দেবতারা অমরত্ব লাভ করলেন···অর্থাৎ একটি বৃহৎ ওষুধের কারখানার জন্য যন্ত্র সংবিধান ব্যবস্থার আগুন নেবী কিন্তুদের দুর্দম, বড় বড় খন্ড সমস্ত প্রক্রিয়ার একটি ইন্ডোনেশিক ছবি তৈরি করেছেন মহাভারতের কবি।···তারপর মূর্তিমান ধন্বন্তরি যে অমৃতপূর্ণ শ্বেত কমণ্ডলু হাতে নিয়ে উঠলেন।

এইবার শঙ্কর লাফিয়ে উঠল—'ধন্বন্তরি? সে কি আমাদেরই গোত্র পুরুষ?'

'হ্যাঁ গো ধন্বন্তরি, যিনি চিকিৎসকদের ভগবান তাঁর কাছেই বোঝ কমণ্ডলুতে কি থাকতে পারে ওষুধ ছাড়া—শ্বেত কমণ্ডলু অর্থাৎ ওষুধটাই শ্বেত—এখানে আলোর বিশেষণ আমাদের প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ এখেবারে বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ার স্ট্যান্ডার্ড আর কি—পরিষ্কার নির্দোষ নির্যাস। ওষুধ যখন তৈরি হয়েছে তখন বিষও নিশ্চয়ই হয়েছে—'

'তাতো ঘটেই'—ঘাড় নাড়লে শঙ্কর—'তত নির্যাস বের করে নিলেই অনেক বিষাক্ত পদার্থ বা ইম্পিউরিটিস পড়ে থাকে, যা ক্ষতিকর—'

'সমুদ্রমন্থনে [illegible] বিষ—যেটা অনার্য দেবতা [illegible] নেলেন—। ওষুধের পরিত্যাজ্য অংশও কখনো কখনো কাজে লাগে—যেমন সিনকোনা থেকে কুইনিন বের করে নিলে থাকে সিনকোনা ফ্রেব্রিফিউজ—তাতেও কাজ হয়, তবে যারা ঘোরে [illegible] সবাই সহ্য করতে পারে না, কিন্তু সস্তা বাজে বিক্রি হয়—কখনো বা সরলমাতে লাগে। অর্থাৎ জিনিস তৈরি হবার পর [illegible] পালার চতুর দেবতারাই সেটা বন্টন করলেন। এই কাজে কায়িক পরিশ্রম করেছে যিনি— [illegible] জাতি তার মধ্যে ঢুকলেই ফাঁকিতে পড়ে [illegible] বোঝাবেই অসুরদের জাতি বলে দাবী জানাতে পারল না। কিন্তু অসুররা সুরেরই ভাইভাই, তারা অত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নয়। তারা বলছে—সবাই মিলে মেরেছি, ভাগের বেলা কাপড়া কেন? দেবতারাও ফাঁকি দেবার দাবী খাটতে লাগলেন—অর্থাৎ আসল যেমন ঘরে আসছে তাই—আয়

নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীগৌরাঙ্গ ও প্রভুপাদ

শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিকমহাশয় বি-এল প্রণীত

।। দ্বিতীয় সংস্করণ ।।

মূল্য দুই টাকা মাত্র

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

শিকার প্রসঙ্গে

(৪৮ পৃষ্ঠার পর)

এই সব সামান্য অসুবিধার জন্যে আশেপাশের জনসাধারণ এই হাতীটির বিরুদ্ধে কোনো নালিশ জানায় নি, বরং তার টান দিকে একটি মাত্র প্রলাপ মুখটিই হাত থাকায় এই মুখলক্ষণের জন্যে হিন্দুরা তাকে 'গণেশ হাতী' বলতো এবং মুসলমানেরা 'করিম' বা বরকত্ময় জীব বলেই মনে করতো। আমি আশেপাশের ধারার পরে কয়েকবার এইভাবেই চলেছিল, কিন্তু শীতকালের শেষ দিকে তার স্বভাবের একটা আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটলো।

১৯৪৬—৭৭ সনে পাকিস্তান থেকে অনেক শরণার্থী এসে বিহারের আশ্রয় নিয়েছিল; এই রকম অনেকগুলি শরণার্থী পরিবারকে আশেপাশের কয়েক মাইল ধারের খোলা জায়গায় পুনর্বসতি দিয়ে সেখানে একটি উদ্বাস্তু বসতি স্থাপন করা হয়েছিল। ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে এই হাতীটি হঠাৎ নিরক্ষিতভাবে সেই উদ্বাস্তু বসতিতে চড়াও হতে লাগলো—প্রায় প্রতি রাতেই সেখানে ঢুকে সে উদ্বাস্তুদের ঘরের সঞ্চিত ধান, চাল এবং অন্য শস্যের খোঁজে বাঁধার ধাক্কায় তাদের মাটির বাড়ি ভেঙে ফেলে সেই সঞ্চিত শস্য খেয়ে যেতে লাগলো। আমি তখন একবার এক সপ্তাহের জন্যে কার্যোপলক্ষে কলকাতায় গিয়েছিলাম, ফিরে এসে শুনলাম হাতীটি সেই সপ্তাহের মধ্যেই উনিশখানা বাড়ি ভেঙেছে এবং তার একটি বাড়ির বৃদ্ধ মালিক সমস্ত বাড়ি ভেঙে পালাতে না পারায় তার ভাঙা বাড়ির তলায় চাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছে। উদ্বাস্তুরা এই ঘটনায় খুব শঙ্কিত এবং বিক্ষুব্ধ হয়ে আমার কাছে নালিশ জানাতে এলো এবং অবিলম্বে এই হাতীটিকে মেরে ফেলবার দাবী জানালো। ঠিক এর পরেই 'গণেশ হাতী'র আরেকটি অত্যাচারের ঘটনার খবরও পেলাম।

একদিন সে অজানা কোনো কারণে উপত্যকাবাসীর এক আত্মীয়ের শিলখানার ঢুকে তাঁর একটি সুন্দর দোতালা হাতীকে আক্রমণ করে মেরে ফেলেছে। সে বেচারীর পায়ে শিকল বাঁধা থাকায় আত্মরক্ষার জন্যে ঠিকমতন লড়াইও করবার সুযোগ পায় নি। আশেপাশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এখন এই 'গণেশ হাতী'কে মারলে অকল্যাণ হবে—এই সংস্কারবশে তাকে মারবার সপক্ষে মত দেন নি—কিন্তু এই সব ঘটনার পরে তাঁদের আর আপত্তি রইলো না। এক গুলবান নাহতই শেষ পর্যন্ত এই হাতীকে মারবার প্রস্তাবে সায় দেয় নি, যেদিন রাতে হাতীটি তাদেরই বস্তিতে চড়াও হয়ে তার প্রকাণ্ড আটচালা ঘর প্রায় ফেলে দিয়েছিল এবং গুলবান কোনরকমে ঘরের ভেতর থেকে বর্শা ছুঁড়ে আঘাত করে তাকে তাড়াতে পেরেছিল, তার পর দিন সেও হাতীকে মারার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। তার পর দিনই হাতীটিকে 'রোগুয়ে' (Rogue) বলে ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হলো এবং আমি তখনই নিজে উদ্বাস্তু বসতিতে গিয়ে পরের দিন সকালবেলার হাতীটিকে মারবার চেষ্টা করবে বলে জানিয়ে এলাম। হাতীটি তখন কালনীতে ধানা দিয়ে সারারাতই সেখানে থাকবে এবং সকাল হবার পরে জঙ্গলে ফিরে যাবে।

ঘটনাচক্রে আমার ভগ্নীপতি মনোরঞ্জন সেইদিনই আবার আশেপাশের বেড়াতে এলেন এবং এই খবর পেয়ে এবারেও আমার সঙ্গে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এর আগের বারের হাতীমারার ব্যাপারে তিনি বিশেষ কিছু সাহায্য করতে পারেন নি বলে আমাকে ধরে বসলেন যে, এবারে হাতীটিকে তিনিই মারবার চেষ্টা করবেন, আমি অধিকন্তু সঙ্গে থেকে বন্দুকটা পরিষ্কার করে দেবো। আগেই বলেছি, আমার কাছে শুধু .375 Magnum রাইফেলের জন্যে গুটিকয়েক হাতী মারবার উপযোগী hardnosed টোটা ছিল. দুজনেই যাতে ঐ টোটা ব্যবহার করতে পারি সেইজন্যে মহারাণীর অস্ত্রাগার থেকে স্বর্গীয় মহারাজার নিজের হাতের একটি .375 Magnum Holland and Holland-এর magazine রাইফেল চেয়ে আনা হলো—মহারাজা বোলদা রাইফেলের চেয়ে এই ধরণের magazine রাইফেলই বেশি পছন্দ করতেন। আমার কাছে এই রকমের মাত্র দুটি পুরোনো টোটা অবশিষ্ট থাকায় আমি সেবার কলকাতায় গিয়ে আরো নতুন টোটা কেনবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তখন কলকাতার বাজারে সেই রকম টোটা পাওয়া যাচ্ছিল না—শেষ পর্যন্ত আমার এক শিকারী-বন্ধু তাঁর নবারার সেই বলে আমাকে দশটি এই রকম টোটা

ফিরেছিলেন। সেখানকার জেলে নতুনের হতন 'ব্রেকফাস্ট' খাবার আমি মুখ হয়েই টোটাগুলি সংগ্রহ করেছিলাম, তাই নিয়ে শিকারে গিয়ে সে পর্যন্ত যে অনর্থ ঘটবে তা তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারি নি। সব শুদ্ধ বোলটি টোটা থাকলে আমরা নিশ্চিন্তমনে শিকারে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলাম—কারণ এর চেয়ে বেশি টোটা একটি হাতী মারতে কোনরকমেই লাগবার কথা নয়।

তার পর দিন সকাল ছটায় উঠে একবাটি ঘরে চা খেয়ে নিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম। এবারের শিকারের জন্যে জঙ্গলে ঢুকতে হবে না, লোকালয়ের মধ্যেই থাকবো, এই মনে করে আমি শিকারের পোষাক না পরে একটা পুরোনো কটের ট্রাউজার এবং একটা পুরোনো টুইড কোট পরে নিলাম, কারণ তখনো সকালবেলার বেশ হিম। মাফলার এবং দৌড়ঝাঁপ করতে হবে না ভেবে পায়ে 'পমারের বুট না পরে একজোড়া রাবার সোলের হাল্কা স্নিকারের জুতো পরলাম। এই ভুলের জন্যেও পরে যথেষ্ট নিজে হয়েছিল।

বেরোবার আগেই রাইফেল এবং টোটা যেন ভুলে ঠিকঠাক করে নিলাম,—যে টোটাগুলো সম্প্রতি কলকাতা থেকে আনা হয়েছিল, সেইগুলোই পাঁচটা করে এক একটি রাইফেলে ভরে এবং আমার আগের পুরোনো টোটাগুলো প্রত্যেকে তিনটি করে জামার ডান পকেটে ফেলে আমরা সাড়ে ছটার সময়ে 'ভুবন' প্রাসাদ থেকে মোটরে চড়ে বেরিয়ে পড়লাম। 'ভুবন' রাজধানীর একটু বাইরে উত্তর সীমান্তে—সেখান থেকে কলেজ টিলার পৌঁছোতে দশ-পনের মিনিটের বেশি লাগে না। ওসমান মাহুতকে আরেকজন সহী নিয়ে সাড়ে ছটার সময়ে কলেজ টিলার নীচের রাস্তায় হাজির থাকার নির্দেশ আগে থেকেই দেওয়া ছিল। আমরা কলেজ টিলার কাছাকাছি পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গেই উষান্ত কলোনীর দিক থেকে বহু লোকের সম্মিলিত চীৎকারের আওয়াজ শুনতে পেলাম এবং টিলার নীচে পশ্চিমদিকের রাস্তায় পৌঁছোতেই ওসমান ছুটে এসে খবর দিলো যে, হাতী এসেছে এবং চারিদিকে মানুষের চীৎকার শুনে টিলার মাথায় 'বীরবিক্রম' কলেজের ছেলেরা মাঠে উঠে পড়েছে।

এই কথা শুনে আমরা তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম এবং আমাদের কাছাকাছি লোকদের চীৎকার করতে বারণ করে দিয়ে টিলার গায়ে সরু রাস্তা ধরে উপরে উঠে গেলাম। টিলার মাথাটি সমান করে কেটে একটি প্রকাণ্ড বড় টেনিসের মাঠ তৈরি করা ছিল, এই ছোট্ট মাঠটির দক্ষিণ সীমানায় কলেজের ইমারত, বাকী তিনখানির তিনখানায় কলেজের ছেলেদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। আমরা যেদিক দিয়ে উঠেছিলাম তার উল্টো দিকে টিলাটি ঢালু হয়ে প্রায় একশ' গজ নেমে গিয়ে নীচের সমতল জমিতে মিশেছে, তারপর কিছু দূরে সবুজ-ঝুমি এবং দূরের পাহাড়ের মাঝখানে সীর বেয়ে বয়ে, সেই ছোট পাহাড়ী নদীটি। নদীটি প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া কিন্তু তখন তাতে জল এক হাঁটুর চেয়ে বেশি নয় এবং অনেক জায়গায়ই বালির চড়া। নদীর ওপার থেকেই আবার পাহাড়ের ঢালাই সুরু হয়েছে; সেখানে শাল, শিমুল এবং অন্যান্য গাছের বন—এই বনের মধ্যেই হাতীটি দিনের বেলায় আশ্রয় নিতো। আমরা টিলার মাথার কাছাকাছি পৌঁছে মাথা উঁচু করে দেখলাম, হাতীটি তখন ময়দানের ওপারে দাঁড়িয়ে কতকটা বিভ্রান্তভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কিন্তু তার সামনেই উষান্ত কলোনীর কয়েকশ' লোকের সমবেত প্রবল চীৎকারের জন্যে সেদিক দিয়ে নেমে যেতে সাহস করছে না। এদিকে আমরা এসে পড়ায় আমাদের দিকের লোকেরা চেঁচামেচি থামিয়ে দিয়ে চুপ করাতে হাতীটি নিরাপদ মনে করে এই দিকেই চলে আসতে লাগলো। তখন আমি মনোরঞ্জনকে তাড়াতাড়ি আমাদের ডানদিকে মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটি পার হয়ে ঘুরে গিয়ে টিলার কিনারার নীচে চুপ করে বসে থাকতে বললাম। তিনি ঐভাবে জায়গা নিয়ে বসবার পর ওঁকে আর আমার জায়গা থেকে দেখা গেল না। আমিও পশ্চিমদিকে যেখানে রাস্তা উঠে গিয়ে টিলার মাথায় মিশেছে, সেইখানে গুঁড়িমেরে বসে রইলাম। হাতী তখন উল্টো দিকে থেকে তাড়া খেয়ে এই পথেই টিলা থেকে নামবার জন্যে এগিয়ে আসছিল।

মনোরঞ্জনের সঙ্গে আমার কথা ছিল, হাতী যখন ওঁকে বাঁ পাশে রেখে আমার কাছে এগিয়ে আসবে তখন তিনি প্রথম গুলী চালাবেন, ওঁর গুলীতে হাতী না মরলে তখন আমি দাঁড়িয়ে উঠে সামনে থেকে তাকে গুলী করবো। হাতী সোজা মাঠ পার হয়ে আমার দিকেই চলে এলো—মনোরঞ্জনের ৭ টি পার হবার সময়ে রাইফেলের কোনো আওয়াজ হলো না—তবু একবার মনে হলো যেন 'ক্লিক্-ক্লিক্' করে সামান্য দুটি শব্দ হলো। যখন হাতী আমার ত্রিশ গজের মধ্যে এসে পড়লো তখন আমি নিজেই বারবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম; আমাকে হঠাৎ সামনে উঠে দাঁড়াতে দেখে হাতী থমকে গেল দিয়ে তার ডুবান পাশের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে একদৃষ্টে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগলো। আমি আর দেরি না করে তার কপালের মাঝখানে নিশানা নিয়ে রাইফেলের ট্রিগার টিপলাম—কিন্তু রাইফেল থেকে কোনো আওয়াজ বেরোলো না, শুধু 'ক্লিক্' করে সামান্য একটু শব্দ হলো। রাইফেলের ট্রিগার টিপলে যদি আওয়াজ না হয় তাহলে প্রত্যাশিত পেছনের ধাক্কা না থাকলেও তার সম্ভাবনা যেন আরো জোর করে এসে বুকে লাগে এক মুহূর্তের জন্যে হৃৎপিণ্ডকে থামিয়ে দেয়,—আমারও সেই অনুভূতি হলো। তৎক্ষণাৎ bolt টেনে 'রিলোডার' করা টোটাটিকে বার করে ফেলে দিয়ে একটা টোটা ভরে দ্বিতীয়বার আবার নিশানা করে ট্রিগার টিপলাম—আবার 'ক্লিক্' করে রাইফেল 'মিস্-ফায়ার' করলো। আমার পেছনে ওসমান তখনও চুপ করে আর উত্তেজনায় চীৎকার করতে সুরু করেছে—'হুজুর গুলী তো ছুটে না।'

আমি তাকে চাপা এক ধমক দিয়ে তৃতীয়বার টোটা বদলে নিয়ে রাইফেল তুললাম,—ততক্ষণে হাতী তার প্রথম হুঙ্কারটির ভাব কাটিয়ে উঠে আমার দিকে এগিয়ে আসতে সুরু করেছে। দ্বিতীয়বার নিশানা করে তৃতীয়বার ট্রিগার টিপবার সঙ্গে সঙ্গেই রাইফেল গর্জন করে উঠলো, হাতীও সঙ্গে সঙ্গে টাল খেয়ে প্রায় মাটিতে পড়ে গিয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় ঘুরে উঠে দাঁড়ালো, তখন তার মুখ আর আমার দিকে নয়, পূর্ব-দক্ষিণ দিকে ঘুরের পাহাড়ের দিকে ফেরানো। হাতী মাটিতে পড়ে যাওয়াতে আমি একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, কারণ আমার নিশানা ভুল হয় নি—এর কারণ পরে আবিষ্কার করেছিলাম—কিন্তু তখনকার সে-বিষয়ে ভাববার সময় ছিল না, কারণ হাতী তখন পালাতে সুরু করেছে। আমি চতুর্থবার রাইফেল তুলে হাতীর ডান কানের ছিদ্র নিশানা করে, ট্রিগার টিপলাম—আবার 'মিস-ফায়ার' হলো। তখন ম্যাগাজিনের শেষ গুলী ভরে নিয়ে যাবার হাতীর ঘাড়ের মাঝখানে লক্ষ্য করে পঞ্চমবার ট্রিগার

চালালাম—কিন্তু বেরোলো শুধু 'ক্লিক' ছাড়া অন্য কোনো শব্দ হলো না। হাতী তখন প্রাণপণে মরুদ্যান পার হয়ে ছুটছে—মনোরঞ্জনের দিক থেকেও আর কোনো আওয়াজ পেলাম না।

তখন আমিও নরম বালুতে উঠে পড়ে ওসমানের হাতে খালি রাইফেলটা দিয়ে হাতীর পেছনে ছুটলাম—আর ওসমানও আমার পেছন পেছন দৌড়তে লাগলো। ছুটতে ছুটতে আমি ডান হাত কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বাকী তিনটে টোটা খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু একটি টোটাও হাতে ঠেকলো না—যদিও জানতাম যে আমার পকেটেই কোথাও আছে সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। একবার তাড়াতাড়ি প্যান্টের ডান পকেটে হাত দিলাম, সেখানেও কিছু মিললো না—তখন আমার মনের অবস্থা প্রায় অবর্ণনীয়। শেষবারের মতন কোটের পকেট চাপড়ে শুনলাম টোটাগুলো সেখানে নেই তাঁ তাঁ আওয়াজ করছে, তখন হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে খুবোলো কোটের সেলাই আল্গা হয়ে যাওয়াতে টোটাগুলো পকেটের 'লাইনিং'-এর ভেতর দিয়ে গলে নীচে নেমে গিয়েছে। 'লাইনিং'-এর ফুটোর মধ্যে আঙুল গলিয়ে যতক্ষণে টোটা তিনটি বার করলাম ততক্ষণে হাতী ময়দান পার হয়ে টিলার ওপাশের ঢালু বার বেয়ে নামতে আরম্ভ করেছে। তখন ওসমানের হাত থেকে প্রায় ছোঁ মেরে রাইফেলটি নিয়ে টোটা ভরতে ভরতে দেখলাম, প্রায় দুশ গজ জোরে দৌড়োবার ফলে আমার হাপরের মতন জোরে নিশ্বাস পড়ছে। নিজেকে একটু স্থির করবার জন্যে দু-তিনবার গভীর নিশ্বাস নিয়ে বৃদ্ধ রাইফেল কাঁধে তুললাম, তখন হাতী আমার থেকে প্রায় নব্বই গজ দূরে চলে গিয়েছে এবং তার সোজা পেছন দিক ছাড়া আর কোনো জায়গাই লক্ষ্য করবার জন্যে পাওয়া যাচ্ছে না।

পেছন দিক থেকে কোনো জন্তুকে মারতে হলে একটিমাত্র জায়গায় গুলী করা চলে, তার নেজের গোড়ার একটি নীচে—রাইফেলের মধ্যে জোর কাঁধলে গুলী তাতে লম্বালম্বিভাবে দেহ ভেদ করে সাংঘাতিক মারাত্মক আঘাত হানে। নরম চামড়ায় যে কোনো জানোয়ারকে এইভাবে পেছন থেকে গুলী চালিয়ে মেরেই যারা থাকে, কিন্তু হাতীকে এভাবে মারবার কথা আমি কখনো শুনি নি বা কোনো শিকারের বইয়েও পড়ি নি—নিজেও কখনো কোনো হাতীর ওপরে এর আগে এভাবে গুলী চালাই নি। কিন্তু আহত শিকারকে তখন বিনোদোষার হয়ে যেতে দেওয়া যায় না—এবং ·375 magnum-এর প্রচণ্ড ভেদ করবার শক্তি আমার জানা ছিল—সুতরাং ঘনোরঞ্জনের স্থির লক্ষ্য নিয়ে হাতীর নেজের গোড়ায় গুলী চালালাম। রাইফেলের আওয়াজের পরমুহূর্তেই হাতীর গায়ে গুলী লাগবার 'ঠপ্' করে শব্দ শোনা গেল এবং হাতীও সঙ্গে সঙ্গে পেছনের পায়ের হাঁটুমুড়ে মাটিতে বসে পড়লো। কিন্তু তা' মাত্র এক মুহূর্তের জন্যে, তার পরেই সে দাঁড়িয়ে উঠে আবার ছুটতে সুরু করলো। আমার কাছে তখন মোটে দুটি টোটা বাকী রয়েছে, সুতরাং অতো দূর-পাল্লার ছুটন্ত হাতীর উপরে পেছন থেকে আবার গুলী না চালিয়ে আমি পাহাড়ের ঢালু উৎরাই দিয়ে ছুটে নামতে লাগলাম, যাতে হাতী নদী পার হবার সময়ে একটু এক ধার থেকে তাকে পেলে শরীরের অন্য কোনো মর্মস্থলে গুলী করতে পারি।

কিন্তু ঘণ্টেক পা দৌড়োবার পরেই বাঁ পা ঢুকে গিয়ে আমি লোহা ডিসবাজী খেয়ে ছিটকিয়ে পড়ে গেলাম; সঙ্গে সঙ্গে 'চড়াৎ' করে তখলো কাঠি ভাঙবার মতন একটা শব্দ হলো এবং প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক 'শক্'-এর মতন একটা তীব্র যন্ত্রণায় আমার মাথা ঘুরে গেল। মোটা ভাগ্যক্রমে আমি ডিগবাজী খেয়েও বসা অবস্থাতেই মাটিতে পড়েছিলাম এবং রাইফেল হাতেই ছিল, ছিটকিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটায় নি। পায়ে তখন অসহ্য যন্ত্রণা, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা হলো না,—ঝুঁকে-বসেই দেখলাম, হাতী টিলার নীচের সবচেয়ে আরশ্যে পৌঁছে কয়েকটি গাছের একটা ঝাড়ের পেছন দিয়ে ছুটে নদীর পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই ঘটনার সময়ে আমার পেছন পেছন আরো বহুলোক ছুটে আসছিল, তাদের মধ্যে বক্সের হকেটলের হাজরও অনেকে ছিল। তারা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমার কাছে পৌঁছিয়ে আমাকে ধরে দাঁড় করালো, তখন তাদের দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে একপায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতেই আমি ফিরে গেলাম, যেখানে গুলী খেয়ে হাতী বসে পড়েছিল।

চলতে সুরু করেই নদীর ধার থেকে একবার রাইফেলের শব্দ শুনলাম, কিন্তু সেখান থেকে কি হচ্ছে কিছু দেখা গেল না। যেখানে হাতী পড়েছিল সেখানে গিয়ে দেখলাম তার পঞ্চাশ পাঁচেক সামনে থেকেই রক্তের একটি মোটা ধারার একটানা চিহ্ন নদীর দিকে চলে গিয়েছে—ঠিক যেন একটা মোটা নল থেকে গড়িয়ে পড়েছে এমনি রক্ত,—আর তার মধ্যে আশপাশের লাল লাল ফেনার ফুচ্‌কিতে ভরা। বুঝতে পারলাম আমার দ্বিতীয় গুলী পেছন থেকে ঢুকে হাতীর বিশাল দেহ লম্বালম্বি ভেদ করে তার ফুসফুস ছিন্ন করেছে, তা না হলে সেখান অত রক্ত অমনধারা বেরে পড়তে পারে না। এই চিহ্ন দেখে মনে আশা হলো যে, এরকম মারাত্মক আঘাত নিয়ে হাতী বেশিদূর যেতে পারবে না, নদী পার হয়ে পাহাড়ের ওপরের বনের মধ্যে ঢুকে অনতিদূরেই কোথাও দাঁড়িয়ে পড়বে, এবং তাহলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাকে বিশ্রামরত অবস্থায় পাওয়া যাবে। কিন্তু তখন এমন রোখ চেপে গেল যে, হাতীর নিজে থেকে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা না করে তখনই তার পেছনে অনুসরণ করে আরেক গুলীতে তাকে শেষ করে দেব ঠিক করলাম।

হাতী কোন জায়গা দিয়ে নদী পার হয়েছে সেই খোঁজ নিতে অল্প লোকের কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নদীর কিনারায় পৌঁছলাম—সেখানে গিয়ে দেখি, মনোরঞ্জন নদীর ধারে বসে উত্তরাঞ্চলের মতন সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন এবং মোহন্তর উৎসাহের কোঁকেই নিজের ধোঁয়ায় লম্বা চুল ধরে টানছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, হাতী যখন প্রথম তাঁর পাশ দিয়ে যায় তখন তিনি দু'বার গুলী করবার চেষ্টা করেন কিন্তু দু'বারেই 'মিস্-ফায়ার' হয়, তাতে তিনি এমন হতভম্ব হয়ে পড়েন যে, যতক্ষণ আমার সঙ্গে হাতীর লাফানোর নাটকটুকু ঘটছিল, ততক্ষণ আর তিনি গুলী চালাবার চেষ্টাও করেন নি। হাতী যখন দৌড়ে পালাতে সুরু করে তখন তিনিও আমার পেছন পেছন ছুটে এসেছিলেন এবং আমি পড়ে যাবার পর নদীর ধার পর্যন্ত ছুটে গিয়ে হাতী নদী পার হবার সময়ে কয়েকবার রাইফেল চালাতেও চেষ্টা করেছিলেন,

অমর ওয়েলডিং সপ
গ্যাস কাটার্স
শালিমার (কয়লা ডিপো) হাওড়া
৪০, কোরশোর রোড

কিছুদূরেই নদী পার হয়ে যাবার পর একটি মাত্র ছাড়া আর সব ট্রেইলস্ অদৃশ্য হয়ে গেল—সেই ট্রেইলটাও বড় তাড়াতাড়ি বনের ভেতর ঢুকে পড়েছে যে আমরা কোথায় যাচ্ছি তা জানা সম্ভব নয়। তবে কোথায় যাচ্ছি তা তিনি বলতে পারলেন না—তাঁর কাছে তখন আর মাত্র একটি টোটা অবশিষ্ট ছিল। তখন আমি বন্দুকটি হাতে নিয়ে পড়ে থাকলাম, মনোরঞ্জন পাহাড়ের নিচের দিকে নেমে যত শীঘ্র সম্ভব একটা খোঁড়া হাতী নিয়ে আসবে, কারণ আমার আর চলবার অবস্থা ছিল না—বন্দুকটা হাতে নিয়েই ভেবে পায়ের ব্যথা ভোলবার চেষ্টা করতে লাগলাম। নদীর ঠিক ওপারেই একজন খাসিয়া পাহাড়ের ঢাল ছিল, সে তখন আমার কাছে এসে ঘটনার খোঁজ নিয়েই আমি তার ওপরে ভার দিলাম, এপারের লোকেরা যেন কেউ হাতীর খোঁজ করতে নদী পার হয়ে ওপারে না যায় তার ওপরে কড়া নজর রাখতে। আর সেই সঙ্গে অন্য লোকটিকে পাঠালাম, চুণি চুণি রক্তের চিহ্ন ধরে পাহাড়ের ওপরে গিয়ে দূর থেকে দেখে আসতে হাতীটি জঙ্গলের ভেতর কতদূর গিয়েছে। লোক কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে খবর দিল যে হাতীটি ওপারের জঙ্গলের ভিতর প্রায় সিকি মাইল দূরে একটা বড় গাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে অবসন্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই পর্যন্ত রক্তের ধারা যাবার চিহ্ন রয়েছে। আমরা তখন তখনের জন্যে অপেক্ষায় রইলাম।

প্রায় আধঘণ্টা পরে তখন একটি মোষ ছোট খুন্কী হাতী ঘোড় হয় সাড়ে ৫ ফুটের বেশি উঁচু নয়, নিয়ে ফিরে এসে জানালো যে, পিলখানার অন্য সব হাতী তখন জঙ্গলে চরতে গিয়েছে, এইটিকে ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। সেল না। এ হাতীটি তখনো কোরাদী নেবার জন্যে ব্যবহার করা হয় না বলে এর কোনো শিক্ষাই নেই, সঙ্গে কোনো মাহুতও আসে নি শুধু একজন ষোল-সতের বছরের ছোকরা 'পাতাওয়ালা' তাকে চালিয়ে এনেছে। তখন জনেক সার্চলাইট খুঁজে করে তার ঘর থেকে একটা পাতলা পুরোনো শাড়ী নিয়ে এলো—সেইটাকে এই বাচ্চা হাতীর পিঠে বিছিয়ে জীন দিয়ে আঁট করে বেঁধে নিয়ে আমি আহত শিকারকে অনুসরণ করবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। মনোরঞ্জন প্রথমে আমার এই প্রচেষ্টায় খুব আপত্তি করেছিলেন,—তাঁর মতে আমার এই চলচ্ছক্তিরহিত অবস্থায় এবং মাত্র তিনটি পুরোনো টোটা নিয়ে, এই ক্ষেপা বন্য হাতীর অনুসরণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক,—তাছাড়া হাতী যখন জঙ্গলের ভেতরে ঢুকিল হয়ে পড়েছে এবং সম্ভবত কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্ত পাত হয়ে নিজেই মারা যাবে, তখন 'মিছিমিছি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তাকে ঘাঁটাতে যাওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমার কিন্তু তখন যেন পেয়ে বসেছে, কিছুতেই অনুসরণ করে হাতীটাকে শেষ করবার জন্যে,—আগের হাতীটির মতন এও অনেক দূরের জঙ্গলে চলে যেতে পারে এই আশঙ্কা তখন আমাকে পেয়ে বসেছিল। মনোরঞ্জনকে বললাম যে, তা'হলে আমি একাই যাবো, এই বলে আমি মাহুতদের সাহায্যে হাতীর পিঠে উঠে বসলাম। তখন মনোরঞ্জনও আমার পেছনে হাতীতে উঠে বসলেন এবং সবশেষে পেছনে বসলো। তখনও—আর পাতাওয়ালা আমাদের নির্দেশমতন হাতীটিকে চালাতে লাগলো। আমরা যখন নদী পেরিয়ে ওপারের চড়াইয়ের পথ ধরলাম তখন অন্য মাহুতটি আমাদের ইসারা করে দেখিয়ে দিল, আন্দাজ কোনখানে আহত হাতীটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। আমরা সেদানুযায়ী রক্তের চিহ্ন ধরে বরাবর পথ যাবার পর আমাদের হাতীটিকে একবার থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে বৃত্তাকারে এগিয়ে চললাম, যাতে আহত হাতীটিকে হঠাৎ সামনাসামনি এগোতে পারি,—যেন সে আগে থেকেই আমাদের আসবার শব্দ শুনে আমরা কাছে পৌঁছবার আগেই গভীর জঙ্গলের ভেতর পালিয়ে না যেতে পারে। তাছাড়া তাকে খতম করবার জন্যে শেষ গুলীটি সামনের দিক থেকেই মারতে হবে—পেছন দিক থেকে এগোলে সে সুবিধা পাওয়া যাবে না।

এইভাবে প্রায় সিকি মাইল ঘুরে গিয়ে আমরা সেই পাহাড়টির বাঁধার পৌঁছে গেলাম; সে জায়গাটা প্রায় সমতল এবং গাছপালা অনেকটা কম বলে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। সেইখানে থেমে চারিদিকে নজর মেলে হঠাৎ দেখতে পেলাম, আমাদের বাঁ দিকে সেই প্রায় খোলা জায়গাটার ওধারে পঞ্চাশেক দূরে একটা বড় গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আহত হাতী এক-দৃষ্টে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে—তার কান দুটো তখন সতর্কতার নিশানের মতন বাঁধার দুধারে সোজা করে ছড়ানো। আমাদের আর বেশি কাছে এগোনো চললো না, কারণ জায়গাটার অনেকগুলো বড় বড় শুকনো গাছ পড়ে থেকে সে জায়গাটা সহজে পার হয়ে যাবার পথ ছিল না—তাছাড়া তখন আরো কাছে এগোতে গেলে আমাদের শিকার ঘুরে বন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাবার সম্ভাবনাও ছিল।

সুতরাং আমি তখনই পাতাওয়ালাকে হাতী নিয়ে বরে দাঁড় করাবার ইসারা করে রাইফেল তুললাম। রাইফেল তুলেই দেখলাম বাঁ বারের একটা ছোট শিমুল গাছের একটা ডাল ঝুলে পড়ে আমার নিশানা নেবার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করছে। তখন আমাদের হাতীকে আরো এক-বশ এগিয়ে দাঁড় করানো হলো, এর মধ্যে আহত 'মখনা' খোঁড়ার দেখবারের মতন লড়াই করবার জন্যে গাছের ওলা থেকে বেরিয়ে পা এগিয়ে এলো। কিন্তু তখন আর বোধহয় তার আক্রমণ করবার মতন শক্তি ছিল না—বরোক্ষ কয় এগিয়ে এসেই সে দাঁড়িয়ে পড়লো। আমি ততক্ষণে তার কপালের মাঝখানে লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টিপেছি কিন্তু আমার 'মিস্-ফায়ার' হ'য়ে আমার প্রায় হৃৎপিণ্ড বন্ধ হবার মতন হলো। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে দ্বিতীয়বার আমার শেষ গুলীটি বলে ছুড়ে দিয়ে, মনে মনে ভগবানের কাছে এই নীরব প্রার্থনা জানিয়ে আবার রাইফেল তুললাম—ওদিকে 'মখনা'ও এক মুহূর্ত বেশ তাকিয়ে থেকে নিজের ডানদিকে ঘুরে গেল। তার ঘোরার সঙ্গেসঙ্গেই আমি তার বাঁ কানের ছিদ্রপথ লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলাম—ভগবান বোধহয় আমার নীরব প্রার্থনায় কর্ণপাত করেছিলেন,—রাইফেলের প্রচণ্ড আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই হাতীর প্রকাণ্ড শরীর মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। সেই সঙ্গেই পেছন থেকে ভগবান চেঁচিয়ে উঠলো—'হাতী পড়েছে, হাতী পড়েছে।'—এ খবর অবিশ্যি আমাদের কাছে চেঁচিয়ে জানাবার দরকার আর ছিল না। আমরা মাটিতে পড়া গাছের ফাঁকে ফাঁকে কোনরকমে আমাদের হাতীটিকে চালিয়ে মৃতপ্রায় হাতীর কাছে গিয়ে তার পিঠের দিকে দাঁড়ালাম। তখন মনোরঞ্জন তাঁর টোটাটি বার করে আমার হাতে দিলে আমি নিজের রাইফেলে ভরে সেই শেষ টোটাটিও মাটিতে পড়া হাতীর মাথার পেছনে চালালাম—যদিও তার বোধহয় আর দরকার ছিল না। এরপরে আর সকলে হাতী থেকে নেবে ধরাধরি করে আমাকেও নামালো, চারদিকে ঘুরে হাতীটিকে আমরা সবাই ভাল করে দেখে নিলাম। ঐ প্রকাণ্ড সুন্দর গহনের জন্তুটিকে এমন এইভাবে প্রাণহীন হয়ে পড়ে থাকতে দেখে আমার দুঃখ এবং ব্যথা হ'তে লাগলো—সাফল্যের আনন্দ যেন অনেকখানি

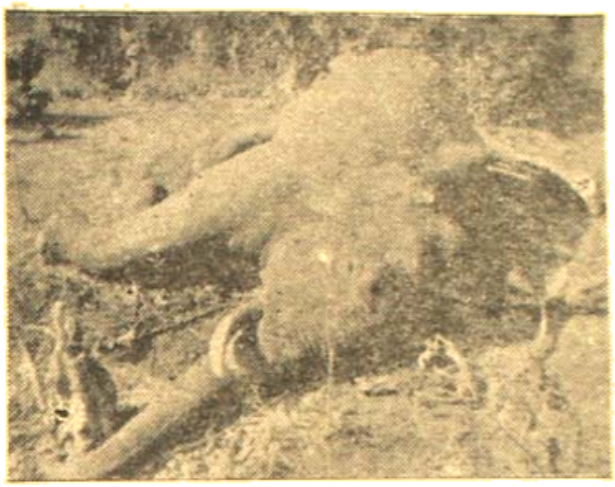

● শেষ পর্যন্ত হাতীটি বন্দুকের গুলীতে

চলে গেল। মনে মনে বেন নিজের দুরবস্থায় আমিই বৈজ্ঞানিক ভিরে হাকে উদ্দেশ করে বললাম—'যদি তুমি উহাদের ওপরে এমন অত্যাচার না করতে তাহলে তোমাকে কেউ মারতো না; সবাইকার অভিশাপ নিয়ে তুমি আরো বড় হয়ে অনেক বছর এ জঙ্গলের হাতীদের দুঃখপতি হয়ে থাকতে পারতে,—আমাকে বাধ্য হয়েই এসব করতে হলো, তুমি আমায় দোষ নিও না।'

মরা হাতীটির দেহ পরীক্ষা করে আমার প্রথম গুলীটি কার্যকরী না হবার কারণ জানা গেল। আমার নিশানা হাতীর বক্ষপঞ্জরের ঠিক জায়গায়ই হয়েছিল, কিন্তু গুলীটি মাংসপেশী ফাবার সময়ে তার একটু সামনের দিকে ওঠানো দাঁতের ঠিক আগাটুকু ছোঁয়াতে সামান্য বেঁকে গিয়ে লক্ষ্যস্থানের হাঁকি-হিসেব যা ধারে লাগে এবং মস্তিষ্ক ভেদ না করে তার পাশ ঘেঁষে চলে যায়। হাতীর মস্তিষ্ক এতোই ছোট যে, এই সামান্য লক্ষ্যের গোলমালেই বিফলতা আসতে পারে। সেই আঘাতে হাতীটি মুহূর্তকয়েকের জন্যে বেসামাল হয়েই আবার নিজেকে সামলে নেয়। গুলীর আঘাতে দাঁতের আগাটিও সামান্য একটু ভেঙে গিয়েছিল। দ্বিতীয় গুলীটি ঠিক সেজন্যে হল দিয়ে ঢুকে প্রায় সাত-আট ফুট মাংস ভেদ করে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছেছিল—পরে আর গুলী না করলেও এই আঘাতেই রক্তক্ষরণ হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হতো। শেষ গুলীটি যা কানের ছিদ্রের ঠিক পেছনে লেগে মগজে ঢোক দিয়েছিল, তাই হাতী সেখানেই পড়ে যায়। হাতীর দাঁতটি পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চি লম্বা ছিল; সেট পনের ইঞ্চি এবং ওজন ছত্রিশ পাউণ্ড ছিল। এই শিকারের বিশ্রামদিন পরে বীরভূমের বন্দুকের লিসেন্সিপালের উৎসাহে হাতীর দন্তটি বন্দুকের B.ological Laboratory-তে রাখা হয়েছিল।

এই শিকারের সময়ে আমার পায়ে যে ছোট লেগেছিল তা খুব সামান্য নয়। বাঁ পায়ের বাঁট (ankle) জীবনভোরে বাঁকিয়ে যাওয়া ছাড়াও তার ডোরার বাইরে চামড়ার হাড় একদিকে কেটে গিয়েছিল। এখনে দেখতে পাওয়া যায় নি, কারণ আমেরিকার হাসপাতালের X-Ray-র যন্ত্রই ধরতে পেরেছিল তখন। আড়াই মাস পরে কলকাতায় ডাঃ মিত্রকে যখন দেখানো হয়, পায়ের ঘাটা হাড় তখনো জোড়া লাগে নি—ফলে ব্যথা এবং খোঁড়াও বন্ধ নি। ওখানে এবং অন্য মানুষদের মতে 'ধরা' হাতীকে মারবার জন্যে আমার যে 'ভুল' হয়েছিল তারই জন্যে আমাকে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। তাদের উপদেশ শুনে মৃত হাতীর আত্মার উদ্দেশে কিছু 'ফিডি' দান করলে আমার কোনো উপকার হতো কিনা, পরীক্ষা করে দেখে নি বলে সে-বিষয়ে কিছু বলতে পারবো না, তবে ঘাটা হাড় জোড়া লাগবার পরও ঐ পা টি সম্পূর্ণ ঠিক হতে আমার প্রায় সাত মাস লেগেছিল। সেদিন যদি তাড়াতাড়িতে শিকারের দুই পরে ঘাওয়াতে অবহেলা না করতাম তাহলে বোধহয় দুর্ভোগ ঘটত না। এই দুটি হাতী শিকার করে আমার হাতে-কলমের অভিজ্ঞতা কিছু বেড়েছিল। প্রথম হাতীটির শিকার থেকে বুঝলাম, অন্ধকারে চর্চের আলো ফেলে হাতী শিকারের মধ্যে অনিশ্চয়তা অনেক, বিশেষ করে উচ্চশ্রেণীর যদি হাতীর সামনে দাঁড়াতে সাহসে ঘাঁটা পড়ে তাহলে। হাতী অন্ধকারে চার্চ যদি স্থির না থাকে তাহলে টিপসই করা হয়ে গুলী চালানোও মোটেই সহজ নয়। এ-কথাগুলি অভিজ্ঞ মানুষ আগে থেকেই বলে দিয়েছিল, কিন্তু ঐ হাতীটিকে মারবার আগে কোনো উপায়ই আমার হাতে ছিল না। দ্বিতীয় হাতীটিকে শিকার করবার সময়ে আমার একটি রোমাঞ্চকর শিকার-অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল—পুরোনো এবং বিশ্রামের অযোগ্য ঘোটা দিয়ে কখনো কোনো বিপজ্জনক জন্তুকে শিকার করতে যেতে নেই এ-বিষয়টিও আমার অজানা ছিল না, কিন্তু এক্ষেত্রেও আমার নতুন ঘোটার জন্যে অনিশ্চিতকাল অপেক্ষা করে থাকা সম্ভব ছিল না যে নতুন ঘোড়ার ঘোটা নিয়ে শিকার করতে গিয়ে অমন অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে, সেকথা সময়ে পূর্বে ভাবতে পেরেছিলাম কি, সেকথা অবশ্য বোধ করবার পুরোনো ঘোটা আমার যে বন্ধু সেওয়ান, তাকেও বিশ্বাসকরে তিনি সেবারে নিজে নতুন অবস্থায় ঘোড়া কোনো থেকে কেনেন নি,—অন্যরকম কোন সেওয়ান তাঁর ঘাড়ে নতুন বলে চাপিয়েছিল, —ঘোড়ার পেছনে আগে ঘোড়ার পেছনের ঘোড়াগুলিকে ঘোড়া-মতে চড়তে বার দিতে। আমার সেওয়ানের ঘোড়া নেহে নতুন বলেই হয়ে নিয়েছিলাম এবং তাদেরই ঘাড়ে চড়ে যাবে আমরা বেরিয়েছিলাম,—অন্যের নিজের পুরোনো ঘোটা দুটি ব্যবহার করতে হবে বলেই মনে করি নি।

আমি অনেক সময়েই পায়ে হেঁটে বন্য জন্তু শিকার করে থাকি, বিশেষ করে সম্বর্গণে। হাতীই এই ভাবে শিকার করেছি—তবুও সেইদিন তাদের আমার দুটির কাছে স্পষ্ট বলে গিয়েছিলাম যে, আর কখনো ভাল ঘোটা না নিয়ে বিপজ্জনক জন্তু শিকার করতে যাবো না। ১৯৩১ সনে আমার শেষ হাতী শিকার করবার সময়ে এই প্রতিজ্ঞাটি ওদের অবহেলা করেছিলাম, কিন্তু ভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত ভগবান উদয় হয়ে নতুন ঘোটা নিয়েই সেই শিকারে যাই; নইলে সেদিনকার পরিস্থিতি হয়েছিল তাতে ঠিক সময়ে গুলী না চললে আমার আজকের এই শিকার-কাহিনী লেখা হতো না।

কিন্তু সেটা এখনো অন্য গল্প—আজকের মতন এইখানেই শেষ করছি।

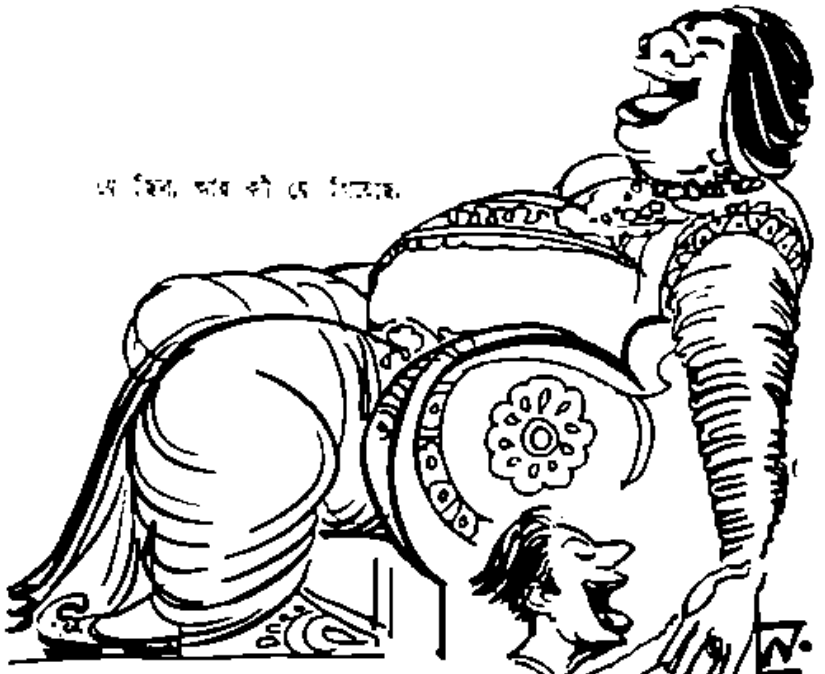

অভিলাষের বাবুবিলাস

সুশীল রায়

যে ছিল, আর কী যে ছিল।

কিছুই বুঝতে পারি নে। আর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে হয়।

অভিলাষ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, বলে, 'হেড ট্রাম-বাসে ঝুলে অফিস করতে যাই, চাটুজ্জে ছেড়ে বর্ষার দিনে বাড়ি ফিরি, জীবনে আর স্বাদ গোদরেজ ছে। হ্যাঁ, ছিল বটে সেকাল।'

বললাম, তা ছিল বটে। ট্রামও ছিল না, বাসও ছিল না বলে অনুমান করি কিন্তু হাটুজ্জে? তার বুকি ছিল না?

'ছিল।' অভিলাষ উত্তর দেয়। তারপর একটু দম নিয়ে, তার মত লম্বাটে লোকও একটু চোখ একটু ছোট করে বলে, 'সেও ছিল আরও একটা ছিল।'

'বিয়ের কথা বলছ?' তার মুখের দিকে তাকাই।

মুখে বুঝি তার জল এসে'ছিল, কষ্টটুকু যেন গুষে নিল, তারপর বলল, 'স্মৃতি। সঙ্গে ছিল স্মৃতি।'

'একলা তো স্মৃতি আছে। থাকলেই হয়।'

অভিলাষ আপত্তি জানিয়ে উঠল, বলে উঠল, 'তোমাদের বাংলা ডিকশনারিতে আছে ওটা। বাস্তবে নেই। কিন্তু ছিল বটে ওসব এই

বাংলাদেশেই। কৃষি ছিল, তাঁর ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু ছিল না খাওতাল, ছিল না অ্যাওালের ভয়। এখন আঙুলোখে কারও দিকে চাইলেই দুর্নাম রটে যাবে। কিন্তু সেকালে নাম হত যদি কৃষি—'

উত্তেজনায় দুই হাঁটুর উপর হাতের থাবা দিয়ে যেন তবলা বাজাতে লাগল অভিলাষ।

অভিলাষ বলল, 'শোনো, কিছুই তো জানো না দুনিয়ার, শোনো তবে বলি—

ঘুড়ী ঘুড়ী জল যায়
আকড়া ফলদলি ঝরিয়া পানে
আঁচাহে বনভোজন
এই নবরা বাবুর লক্ষণ।

সেই বাবু-ঘুম পেরিয়ে গেল, উঠে গেল ফলদলি, উঠে গেল ঝরিয়া। তবু বেঁচে আছি আমরা। আমরা পাবত, না, বুঝাও—কি আমরা, তা তেবেই পাই নে।'

অভিলাষের মুখে সর্বদা এই বাবু-কাহিনী। এক-একটা কাহিনী শুনতে এক-একটা রাত কাবার হবার জোগাড়, কোনো-কোনো দিন আবার আপিস কামাই হবারও উপক্রম হয়।

কোনো বিলাস নেই অভিলাষের, কিন্তু এই একটি আছে, এই বাবু-বিলাস। যদি সাধ্য থাকত তাহলে তাকে এই যুগ থেকে উপড়ে নিয়ে সেই পুরনো কালের বাটিতে পুঁতে দিয়ে আসা যেত। তাহলে সে যে অবশ্যই ফুঁই ফুঁড়ে একজন পরম ধনীয় বাবু হয়ে উঠত, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা সম্ভব নয় বলে আমরা তার বর্ণিত লাইনগুলি কান পেতে শুনি। সে যা বলে তার সবই সত্যি ঘটনা মনে সে দাবি করে বটে, কিন্তু আমি এ সবই তার খানানের কৃতান্ত বলে স্থির সিদ্ধান্ত করে রেখেছি।

অভিলাষ বলে, 'যাঁর মত বাবু ছিল সেকালে তিলকচন্দ্র।'

সেই তিলকচন্দ্রের কাহিনী বলতে লাগল অভিলাষ।—

অযোধ্যাবতী নগরে রাজচক্রবর্তী নামে একজন অতি বড় কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। জ্ঞানে-বুদ্ধিতে-বিবেচনায় তাঁর জুড়ি নাকি কেউ ছিল না। তিলকচন্দ্র এই রাজচক্রবর্তী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র।

আইন-আদালত-বিষয়ে পারদর্শিতার জন্যে রাজচক্রবর্তী মহাশয়ের খুব নাম। তাঁর এই সুনাম চতুর্দিকে রাষ্ট্র হওয়ায় ক্রমে তাঁর নাম গিয়ে পৌঁছল সুলতান অহম্মদ খলিফার কানে। এমন একজন কর্মচারীকে কেন তিনি তাঁকে আফিমের কুঠির দেওয়ানি-পদে নিযুক্ত করলেন।

আফিমে পেশাও হয় যেমন, আফিমের কারবারে লাভও হয় তেমনি। ভারতবর্ষে খুব অল্প খরচে আফিম তৈরি হয়, আর সেই আফিম চালান যায় চীনদেশে। এতে উত্তরোত্তর সুলতান খলিফার প্রভূত ধনবৃদ্ধি হতে লাগল।

কিন্তু রাজচক্রবর্তী-মহাশয়ের মন ওঠে না। তাঁর ইচ্ছা, লাভের অঙ্ক আরও বড় হোক। এই জন্যে তিনি অনেক কল-কৌশল করে নেকি আফিম তৈরি করতে লাগলেন। কিন্তু আফিম নেকি হলেও তা আফিমই, কেন না সেটা তো আফিমই। সুতরাং এতে নেশার কোনো ব্যত্যয় ঘটল না। নেশা যখন এতে ছাড়ই তখন এ জিনিস সস্তা জিনিস বলেই সকলে গ্রহণ করল। তার ফলে রাজচক্রবর্তী-মহাশয়ের আশানুরূপ ফলে লাভালাভি কলাগাছ হল।

কিন্তু সেই কলাগাছে ফুল ধরে না। রাজচক্রবর্তী-মহাশয় নিঃসন্তান। এত ধন-ঐশ্বর্যভোগ করবে, তাঁর বংশে বাতি দেবে এমন একটি প্রাণীর দেখা নেই।

নিজের উপর তবলা পরিত্যাগ করে তিনি দৈবের উপর নির্ভর করা স্থির করলেন। তিনি যাগযজ্ঞ করতে আরম্ভ করলেন। বিবিধ উপচারে ও ষোড়শ উপচারে তিনি দেবস্তুতি করতে আরম্ভ করলেন।

তাঁর এই ঐকান্তিকতায় তুষ্ট হয়ে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর আরাধ্য দেবতা। রাজচক্রবর্তী-মহাশয়ের ঘুচে ঘর-আলো-করা এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হল।

এই পুত্রই তিলকচন্দ্র।

কদলীবৃক্ষে ফল দেখা দিল। কলায়-কলায় চন্দ্রের আকার ধরিতে লাগল। তিল পরিমাণ তিলকচন্দ্র তাল পরিমাণ বৃহৎ হয়ে উঠতে লাগল।

এই পুত্রটির আবির্ভাবে রাজচক্রবর্তী-গৃহে আহ্লাদের সীমা নেই। দেওয়ানজী তাঁর ভোগাধাবার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে বহু দানধ্যান করলেন। এবং, এবং—

অভিলাষ বলে চলল, যা বহুলা করা যায় না, এমন বাহুল্যও অনুষ্ঠিত হল। দেওয়ানজীর গৃহে দুটি অদ্ভুত কাণ্ড হল—সেখানে টিকটিকির নাচ হল এবং ছেঁকের গান হল। কথাটা বাজের মত শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু ব্যাঙের গান কি আমরা শুনি নি, না, শুনি নে? ঘাটে-ময়দানে, জলায়-জঙ্গলে

বলে তারা গায় বটে, তাদের জন্যে আসর কেউ বসায় না। কিন্তু তিলকচন্দ্রের মত পুত্র লাভ করে দেওয়ানজীর আনন্দ এমন অপরিসীম হয়েছিল যে, তিনি ঐ ছেঁকেদের জন্যে আসর বসিয়েছিলেন। ছেঁকেরাও পরম আনন্দে সারা রাত্রি মাতিয়ে তুলেছিল। সেই গানের সঙ্গে না মিলিয়ে মিলিয়ে নাকি নাচ করেছিল অনেক টিকটিকিও।

তিলকচন্দ্র যখন দুই বৎসর বয়স শিশু তখন প্রথম সে হাতেখড়ি নেয়। এত অল্পবয়সে যে হাতেখড়ির কারণ কেবল এমন অপূর্বরূপে যে, সকলের বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

দেওয়ানজী তাঁর পুত্রের হরফ-পরিচয় দেখে বলতে লাগলেন যে, তাঁর বংশের গৌরব রক্ষা যে এই শিশু করতে পারবে, এ-বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

পুত্রের ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে এত উজ্জ্বল বলে বোধ হল যে, পুত্রের কোনো দোষকেই তাঁর দোষ বলে মনে হল না।

কিন্তু দোষ বলে মনে হবে কেন, তিলকচন্দ্র বর্ধিষ্ণু হয়ে উঠতে লাগলেন: বহু-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত লোকের তাঁর খাতির চাহিদার বাড়ি হল।

তিনি অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকে পোষণ করতে আরম্ভ করলেন। পিতার বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক তিনি তখনও হন নি। কেন না পিতা তখনও বর্তমান।

কিন্তু তিলকচন্দ্রের জানাই বলতে হবে—তাঁর বর্ধমান প্রতিভা স্ফুরণের সর্ববিধ সুবিধা লাভের নিশ্চিতই রাজচক্রবর্তী-মহাশয়

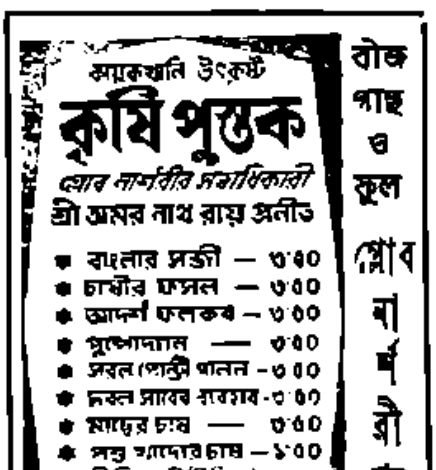

ঈশ্বরচন্দ্রের মনে [illegible] করে প্রশ্ন জাগল।

এই ব্রাহ্মণ ছেলেটির নাম তিলকচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্যে সে বহু পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে গিয়েছে, কিন্তু কেউ তাকে ভর্তি করে নেননি। তাই সে ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে এসেছে।

পাশের আরেকটি লোকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, 'ওই ব্যক্তি তিলকচন্দ্রের দূরে আত্মীয় হন বলে।

এই কথাতেই ঈশ্বর বৃত্তিভোগী এই ভয়ে তিলকচন্দ্রের দরখাস্তে স্বাক্ষর করতে কি না বিষয়ে কণ্ঠিত হয়ে উঠলে তাঁর তিলকচন্দ্রের প্রশংসা করেন। প্রার্থনাপত্রে তিলকচন্দ্র লক্ষ্য করেন, তিনি ইতিমধ্যে নাম ও বিবরণ লিখে রেখেছেন।

এমন-কি, সংস্কৃত পণ্ডিত অধ্যাপকদের অধিকাংশ নয়—ইংরেজ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে—তাঁর মত তিলকচন্দ্রও ইংরেজী জানেন, এর অর্থ কি

তিলকচন্দ্র সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কিসের অর্থ?'

অধ্যাপকদের বলেন—

'ইনি ইংরেজী জানেন
সেই জন্যে ইনি সাহেব
ইংরেজীতে বলেছেন বলে,
ইংরেজ হয়েছেন।'

তিলকচন্দ্র একটু চিন্তা করেন, চারদিকে একটু দৃষ্টিপাত করেন, তারপর বলেন, 'এর অর্থ পাওয়া গেছে। ইংরেজী জানা লিখিত হল, এতে সাহেব হওয়ার সীমা নেই; রামের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হয়ে রাজপুরুষেরা ক্রন্দন করতে লাগল—রাম লিখিত হয়েছেন, রাম লিখিত হয়েছেন।'

সভাস্থ সকলে হর্ষধ্বনি করে উঠল। সংস্কৃতে তিলকচন্দ্রের বুৎপত্তি যে এতটা হয়েছে, এ ধারণাই কারও ছিল না। সকলে বলতে লাগল—'সাধু সাধু সাধু।'

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন পণ্ডিত তখন সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর মনে একদিন তিলকচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি গিয়ে পৌঁছল। ঈশ্বরচন্দ্র একটু চিন্তিত হলেন। তিনি এতকাল সংস্কৃত চর্চায় রত আছেন, কিন্তু এমন ব্যক্তির নাম কখনো শোনেন নি, এতে তাঁর বিস্ময়ের অবধি রইল না। অনেক খোঁজ করে তিনি সংবাদ সংগ্রহ করলেন অধ্যাপকদের।

অধ্যাপকদের এসে উপস্থিত হলেন ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, 'এ কি শুনছি বটেশ্বর? এমন পণ্ডিত লোক কলকাতায় আছেন, এ সংবাদ আমাকে আগে দাও নি কেন?'

অধ্যাপকদের ম্লান হেসে বললেন, 'আমি তাঁর বৃত্তিভোগী পণ্ডিত। তাঁর তুলনা করতে পারব না। তিনি অর্থবান্ ব্যক্তি, তিনি যে বাক্যের যে অর্থ করবেন তাই আমাদের শিরোধার্য।'

অর্থাৎ, কি-কি বাক্যের কি-কি অর্থ তিলকচন্দ্র করে থাকেন তার বিবরণ দিলেন অধ্যাপকদের।

বিবরণ শুনে একটু ম্লান করলেন ঈশ্বরচন্দ্র, তারপর ক্রমেই তিনি রুষ্ট হয়ে উঠলেন। বললেন, 'যেখানে ব্যক্তির বৃত্তি গ্রহণে আপত্তি সেই করবে না। কিন্তু ঐ বৃত্তির জন্যে নিজের মনোবৃত্তিকে বিসর্জন করলেই বৃত্তিভোগী নয়। যে অন্ধ তাকে জানতে দিতে হবে যে সে অন্ধ।'

কিন্তু সে কার যে কতটা অন্ধ তা প্রকাশ করে বললেন অধ্যাপকদের। বললেন, 'লোকটা অন্ধ। কিন্তু সে কি পরিমাণ অন্ধ তা আপনি ধারণা করতে পারবেন না। শুধু অর্থ তার নয়, ঐ জন্যেই তার দগ্ধ হয়েছে প্রবিষ্ট।'

অর্থ তার প্রকৃত নয়, পিতার দ্রুত ঐশ্বর্যের সে অধিকারী। ঐশ্বর্যে প্রকৃত অর্থ সে কিছু করতে চায়, এই কারণেই আরবী পারসী সংস্কৃত ইংরাজী ইত্যাদির যে ধারাই তার সম্মুখে উপস্থিত হোক, তৎক্ষণাৎ সে তার একটা প্রকৃত অর্থ করে বসে।

বিবরণ শুনে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, 'এমন লোকের সংসর্গে অধিকক্ষণ থাকা যোগ্যতর যুক্তিযুক্ত নয়। এতে নিজের বুদ্ধিনাশের সম্ভাবনা আছে।'

ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে এইরূপ বাক্যালাপ করে অধ্যাপকদের বিদায় গ্রহণ করলেন

তিনি বিদায় গ্রহণ করলে, ঈশ্বরচন্দ্রের উপদেশও তিনি গ্রহণ করলেন, এদিকে বৃত্তিগ্রহণও করে যেতে লাগলেন।

পিতার উপার্জিত অর্থের দ্বারা পুষ্ট তিলকচন্দ্র পণ্ডিতম্মন্য ও শাস্ত্রিবহুলতার দ্বারা প্রত্যহ প্রকাশিত হয়ে আরও স্ফীতপুষ্ট হয়ে উঠতে লাগলেন। কিন্তু যেন যেন, তাঁর মনে ক্রমে ক্রমে একটু খেদ ও একটু গ্লানি জমে উঠতে লাগল।

এ গ্লানি আর কিছুর জন্যে নয়। তিলকচন্দ্রের ঐশ্বর্য অগাধ, সম্মান অপরিসীম, তবু কিছুকাল যাবৎ তাঁর মনে হচ্ছে যে, তাঁর পিতা চাকুরি করে ঐশ্বর্যবান ও খ্যাতিমান হয়েছেন, সমাজে সম্মানলাভ করতে হলে চাকুরি করা অতি আবশ্যক। এইজন্য তিনি তাঁর উমেদারদলের সঙ্গে পরামর্শ করতে আরম্ভ করলেন।

ভাগ্নীপতির কিনার বরাবর বিদেশী বণিকেরা বাণিজ্য করে চলেছে। তিলকচন্দ্র সেইসব পর্তুগীজ ও ফিরিঙ্গির বণিকদের সঙ্গে যোগাযোগ-স্থাপন-মানসে তাঁদের খোঁজ-খবর করতে লাগলেন।

তিলকচন্দ্র তাঁদের খোঁজ করছেন জানতে পেরে সকলের ধারণা হল যে, তিনি বুঝি এবার সওদাগরী কাজে নিজেকে নিয়োগ করার মনস্থ করেছেন। এই সংবাদ রাষ্ট্র হওয়া মাত্র দলে-দলে কৃষ্ণের মত বহুলোক তিলকচন্দ্রের আশ্রয়ে এসে জমায়েত হল। এদের বেশির ভাগ ব্যক্তিই বিদেশী বণিকদের দ্বারা কর্মচ্যুত। তারা নতুন কর্মের খোঁজে এখানে এসে তিলকচন্দ্রের উমেদারগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে ওদেরই অঙ্গ হয়ে উঠল।

তিলকচন্দ্রের নিকট দ্বারের কোন কর্মের আশা যে নেই, একথা তাঁর বুঝতে পারল না। তিলকচন্দ্র নিজেই যে কর্মের প্রত্যাশী—একথা তিনি প্রকাশ করেন না। লোককে বৃথা আশ্বাস দিয়ে প্রতারণা না করলে তাঁর সভাপর্বক লোক সংগ্রহ হবে না বিবেচনা করেই তিনি বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপার নিয়ে বৃহৎ বৃহৎ কাজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।

উমেদারদের মধ্যে এইসব বিষয় নিয়ে অনেক কানাঘুষা আরম্ভ হয়ে গেল।

আদরের ঘরের এক কোণে বসে উমেশচন্দ্র বলল, 'কি শুনছি হে? বাবু নাকি সোনাগাজীর নবাব হচ্ছেন এবার।'

বিনোদচন্দ্র বলল, 'না হবে কেন। বাবুর মত এমন বিদ্বান ও তেজীয়ান লোক যদি নবাব না হবেন, তবে হবে কে?'

নবাব না হয়েই যার নতুন খ্যাতি রাষ্ট্র হল, সকলে বাবু-প্রসঙ্গ উত্থাপন করার সময় বলে—নবাব তিলকচন্দ্র।

উৎসব ও অনুষ্ঠানে ঘরোয়া
মনের মতন সাজাবার জন্য
ঘোষ ডেকরেটর্স
৮৫/১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬
ফোন: ৩৪-৬৪০১

কিছুকাল পরেই শোনা গেল, বাবু নবাবী প্রত্যাখ্যান করেছেন, তিনি তাকে সুবন্দোবস্ত ইজারা করেছেন।

কথাটা অবিশ্বাস করার নয়। কেন না, পরদিবস বাবু বন্দরে উপস্থিত হয়েই চাকরকে হুকুম করলেন—'আমার জামাজোড়া পাগ ইত্যাদি পোষাক তৈয়ার রাখ, কল্য দরবার যাইব।'

এই কথা শুনে সকলে আহ্লাদিত হল। বাবুর নিকট কোনো একটা কর্মের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যারা দিনের পর দিন এখানে পড়াশুনা করছে তাদের কেউ কালীঘাটে পূজা মানত করে, কেউ সত্যপীরের শিরণি দিতে চায়, কেউ ইষ্টদেবতার কাছে বাবুর মঙ্গল প্রার্থনা করে।

উমেদারদের ও কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে নানারূপ চাপা আলোচনা হয়। বাবু যে সুবন্দোবস্তের দেওয়ান হতে চলেছেন—এবিষয়ে কারও মনে কোনো সন্দেহ থাকে না।

তিলকচন্দ্র লাল-পোষাক পরে প্রস্তুত একজন নবাবের মত বারাণসীর গাড়িতে আরোহণ করলেন। লাল পাগড়ি পরা চারজন ব্রজবাসী তাঁর পোষাকরূপে সঙ্গে চলল।

বাবু রাজকার্যে বহির্গত হলেন বলেই সকলের ধারণা। বাবু নিজেও অবশ্য তাহাই মনে করেছেন।

খবর শুনে গাড়ি চলল। পোস্তার বাজারের কাছে এসে গাড়ি থামল। এখানে কাজী হাদী সাহেবের খেজুরের দোকান।

বাবু গাড়ি থেকে নামলেন। হাদী সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে, হাদী সাহেব বাবুকে ফরাস জন্য একটা চৌকি দিলেন।

তাঁদের মধ্যে এবিষয় কথোপকথন হল—

হাদী সাহেব বললেন, 'অতি বড় পদবী। তুমি বড় মোটা হয়েছ। তোমার কত টাকা আছে? এখনে বাজারের সুদ কমতি হল কেন, এ বিষয়ে বাণিয়ারা কি বলে।'

তিলকচন্দ্র বললেন, 'এখনে নাকি নতুন একজন কাজী আসছেন? একথা কি সত্য? লড়াইয়ের খবর কি? ঘাটে-ঘাটে এত জাহাজ আসছে কেন।'

এখানে এবিষয় আলাপ-আলোচনা করতে-করতে তিলকচন্দ্র ব্রজবাসীদের ডাকলেন, তারা এসে তাদের একজনকে হুকুম দিলেন, 'মোরা দিবোরে ঘরে আছে কি না দেখ। আনতনি বস্ত্রিত সাহেবে ঘরে হাবিয়া খান কি না দেখ।'

দ্বিতীয় জনকে হুকুম করলেন, 'দেখ, এরাও সাহেব আছেন কি না, আমি তাঁর নিকট যাব।'

এই প্রকার কর্ম সমাপন করে জিনিস-বাজার ঘুরে বাবু যখন পুনঃ প্রত্যাবর্তন করলেন তখন সকলে চটস্থ—প্রথম পরদের দিন, কিছু না খেয়ে বাবু দুষ্টিতে গিয়েছিলেন, কত প্রকারই না তাঁর হয়েছে এবং কত ছাড়াই না তিনি হয়েছেন!

সকলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাবুর পরিচর্যায় রত হলেন।

বাবু নবাব হবেন, বাবু সুবন্দোবস্তের দেওয়ান হবেন—উমেদারদের বরাত ফিরে যাবে, তাদের কর্মসংস্থান হবে, এই আনন্দেই তাদের দিন কেটে চলেছে। ক্রমে-ক্রমে তাদের সকলেরই হুঁস ফিরে এল। তারা বিশ্লেষণ হল। তবু তলপা তারা ছাড়ে না। বাবুও তাদের ছাড়েন না। তাদের ছেড়ে দিলে সভার শোভা নষ্ট হবে।

কিন্তু তিলকচন্দ্রের জীবনের একটা দিক। তার আরও একাধিক দিক আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে ফুর্তি।

রবিবার বাগানবাড়িতে কাটে তার সন্ধ্যা, এক-একটা রাত্রিও বিশ্রাম আরামে কেটে যায়। ভাগীরথীর জলে নৌকা ভাসিয়ে কলকণ্ঠের কাকলি চুমে ফুর্তির জোয়ার উছলে ওঠে। বাবুজীবনের যতপ্রকার আনন্দ-আহ্লাদ আছে, তার কোনোটারই কর্মতি নেই তিলকচন্দ্রের জীবনে।

অভিলাষ আমাদের বলে যেতে লাগল এই বাবু-উপাখ্যান। আমরা বাবুর বৈষয়িক জীবনের একটু আভাস পেলাম বটে, কিন্তু বাবুর আসল চেহারাটা যেন দেখতে পেলাম না। আমাদের আক্ষেপ থেকে গেল।

বললাম, 'অভিলাষ। তোমার এত বাবু-প্রীতি। কিন্তু কই বাবুর আসল নীতির কথা কিছু বললে না?'

'সেটা তো বেহ্দা।' অভিলাষ বলল, 'বেহ্দার কথা কত জানতে চাও? বানিয়ে-বুনিয়ে হাজার রকম বেহ্দাকাহিনী খাড়া করানো যায়। তা আর শুনে কি করবে?'

আমরা বললাম, 'বলো কি হে, সেইটেই তো আসল হুদের কথা—বাইনাচ চাই, বারবনিতার বৃত্তান্ত জানতে চাই। বলো, বলো—'

অভিলাষ বলল, 'ওসব আমি ভালো করে গুছিয়ে বলতেই পারব না। ওসব তোমাদের বলবে—'

কার যেন নাম করল অভিলাষ। নামটা ঠিক ধরতে পারলাম না।

●

জল

(১১ পৃষ্ঠার পর)

হাবিব মুতাবাল্লির সহীর কলিজাটা পরদে উকুশ আঁকা দিয়েছিল। সবারে সে মনের সবদে রেখেছিল, বিশেষতঃ হাবিবকে।

মুতাবাল্লির আপত্তি তোলবারাদের হাবিবকে বলেছিলেন। লাইব্রেরী বিরাট জলযোগ ও চায়ের আয়োজন রাখ। হাবিবের সম্মুখে বাহির হতে হবে। অতএব যাত্র ৫ মি তিনি নিজেই উপস্থিত।

'এ কি করেছেন? এত খাবে কি করে?'

'বেশ থাকবেন বাবা,
আর করে যা অসময়ে খাওয়া
হবে? চলেই যাবি
'এখন হাঁহাঁ—ওঁকে আগে বিয়ে করি?' মুতাবাল্লির প্রস্তাব সবার অলিতে হাসির রব উঠিল।

এটা বিয়ে হবে কি। আমি
অবশ্য কোরান পড়ি না যে হে মত
জানাতে হবে।'

চাঁদের হাবিবের মুখ
বিবাহ?

সেই কি—! এক বাঁকা
একটুও না খাবাইবা—?

মুতাবাল্লি হাবিবের
তাড়াতাড়ি আয়োজন করিবেন

'মানে নিকাহ দিতে হবে।'

কিন্তুরে হাবিব হয় খুশর মত করিল।
মাদেটা না।

মুতাবাল্লি হাবিবকে কইতে চাহিলেন। মুতাবার সঙ্গে হাবিবের আলাপ হইয়াছে। পল্লীগ্রাম বেড়িয়া সিদ্ধিকের আসার দিন অভিসারিকা মুতাবা কোরানের সুক্ষ্ম ব্যাখ্যা করিয়া হাবিবকে বিবাহিত হাবিব-সাক্ষাৎকারে হাবিবের কলিজার হইতে সে নিমন্ত্রিত পরে গেল, একথাও তাহারা জানেন। আবার মুতাবা-প্রেমানুরূপ নিখিলও তখ যাদ পুরে হবা পরিয়া গেছে। এখানে পিতার কোরাণ শ্রাদ্ধবাসরের তাহার নিয়ত অনুষ্ঠান ঠিক মতের মত সুস্পষ্ট প্রতিভাত। মুতাবাল্লির অভিলাষী রায়পুকুর মেজরেদে নিখিলের বয়সের সভায় আসিয়াছিল। তাই মুতাবাল্লিসহ হাবিব মোহরর মুতাবার নিখিলের সহিত বিবাহ-সভায় এবন বিবর্ণ হইয়া উঠিয়া নিরুত্তর। তিনি তাড়াতাড়ি জানাইলেন,—

'নিখিল অফিসের কাজে বাইরে যেতে হবে কিনা বলে এসেছে।'

প্রভাত হাসি রোধ করিতে পারিল না। বলিল, 'ওরাকী মেয়ে।'

'ওই বাড়ি—বাড়িতে আছেন?'

হাসিমের প্রশ্নে সুচরিতা হাসিয়া বলিল, 'পাগল! ওখানে বৌ-ঠাকরুণ ছাড়া আর কেউ থাকতে পেরেছে? ছোকরাদাদার বাড়ি তালা বন্ধ আছে। তবে নিতা বাড়ি আছে একবার।'

হাসিমের চাঞ্চল্যের আজকে যেন অবধি নাই। বিয়ারে। অভ্যাসের বাড়িবাড়ির প্রভাবে আজকে সেই নিখিলেশের মুক্তি-অন্বেষণে। কিন্তু, এই সময়ে সুচরিতাকে পাইয়া এই ভয় সে অন্তরে গ্রহণ করিল। কিভাবে এরকম পরিচিত মানুষ পাইয়া, হাসিম তাহাকে পার না।

অবশ্য সুচরিতাই ছাড়া কে আছে। যেমন জোর তেমনই ছাড়া মালতী।

না, না। অনেক—অনেক উৎকর্ষ-শালিনী মালতী। প্রীলতার রূপে প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু গৃহ নির্মাণ ও সন্তানপালনে সেই রূপকুঁড়ির প্রতিশ্রুতি শেষ হইয়া গিয়াছে। মালতী আজও সুন্দরী। শ্রী ও সংস্কৃতিতে পরিপক্ক এক নারী। যাদবী নূতন যুগের, পুরাতনের আলো নয়।

সাবিত্রী বলিলেন, 'আপনি যা করেছেন ভালোই করেছেন। কিন্তু আপনাকে তাঁরা স্নেহ করেন। সেদিক দিয়ে ভাববেন।'

কিন্তু কি শুধু? ললিত-লবঙ্গলতা মালতী কি মুক্তীমার কাছে একবারও তাহার কথা তুলিবে না? মালতী না তুলিলেও মুক্তীমাও হয়তো বলিতে পারেন। এই তো মোগলের হাতে আসিয়াছে।

হাসিমুখে হাসিম বলিল, 'সুযোগ যা ভালোরে আমার একবার কলকাতা যেতে হবে। তখন যেয়ে দেখা করব। বলে দেবেন।'

পক্ষিরাজে সকলনাশ হাসিমের পা মাটি ছুঁইল না সেদিন। দমদমার হয়েছুত পুতুলা। কলিকাতায় যাইবে। এতদিন পরে হাসিম বুঝি খবর পাঠাইতে পারিল। সুচরিতার সহিত চিঠির সাহায্যে যোগাযোগ সে রাখিয়াছিল আশায়। চিঠিতে কাটাছেঁড়া রায়বাড়ির খবরটুকু পিপাসিত হৃদয়ে তুলিয়া ধরিত চোখের সম্মুখে। খণ্ড-খণ্ড সংবাদ তুলার জল যোগাইত।

যথা: 'বাড়িতে গিয়েছিলাম কাল। ওঁরা সকলে ভাল আছেন। মালতীরা থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল। দেখা হয় নি।'

যথা: 'কাল সন্ধ্যায় চিঠি লেখার। হঠাৎ কাজ থেকে আসবার জন্য ব্যস্ত। চিঠিতে কথা টেলিফোনে জানাতে বলেছিল ওদের বাড়ি। টেলিফোন ধরল মালতী।'

ইচ্ছাকৃত মালতী-প্রসঙ্গের পশ্চাতে সুচতুর সংযোগী মনের প্রকাশ করিয়া ধরিল। কিন্তু লজ্জায় 'প্রেমপত্রে যে নিজে উত্তর করিতে পারিত না। চিঠিলেখার অনেক কবিরে যতই হাসিমের প্রগাঢ় আগ্রহ। কিন্তু আসল এখানে প্রতিহত করিয়া যে চিঠি লিখিত। সুচরিতাকে। নানা অজুহাতে দেশের হালচালের খবর জানাইত অধিবেশনকে।

অধিক চিঠিলেখক না। উত্তর সে দিত, কিন্তু খুবই বিনয়ে। হাসিমের তৃষ্ণা নিবৃত্তির পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তাই সে নিজের স্বভাব অতিক্রম করিয়া সম্পূর্ণ অনাত্মীয়া, স্বল্পপরিচিতা সুচরিতাকে চিঠি লিখিত। সুচরিতা অকপটে মালতী-সংবাদ জানাইত বেজায়। সেগুলি সারাদিন নাড়াচাড়া চলিত হাসিমের। সে কৃতজ্ঞচিত্তে জানিত সুচরিতা কলমাবরী। দুরুহে স্বাক্ষরনের সুযোগ দিয়াছে। সময় হাসিমকে সুযোগ পাঠাইয়াছে।

কেন? কি লাভ? তাহার বিবাহ স্থির, সে আর কতদিন? সুচরিতা লিখিয়াছে, মালতীর বিবাহ পিছাইয়া গেছে, বিলাতের বিবাহ আগে হইবে না এরমধ্যে হইবে বলিয়া। তাছাড়া পাত্র শর্টকোর্স একটা লইতে বিদেশ গিয়াছে সম্প্রতি নাকাল ছয়েক মাসের জন্য।

ঈশ্বর এ পত্র হাসিমকে করুণা করিয়াছেন। হ্যাঁ, ঈশ্বর, আল্লা বা খোদা নয়। সমগ্র মানুষের মাথার উপর যে এক এবং একটি মাত্র বিশ্বাসক্তা, তাহাকে হাসিম প্রেয়সীর হৃদয়ের ঈশ্বর ভাবিবে। তাহার নিজের এই কি? সে পৃথক-পৃথক বিভক্ত ধর্মতে বিশ্বাস করে না। দুই এক মানবধর্ম তাহার ইষ্ট।

আসবার মহিলার জন্য হিন্দু দেবতাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হাসিম প্রেয়সীর জন্য তাহাদি ধর্মকে আলিঙ্গন করিতে পারে।

নিখিল বিরোধিতা বিবাদ করিল। যে গতি তাহার স্পৃহা তাহার মধ্যে অবজ্ঞার প্রতি প্রেমে দেখা দিয়াছিল, শেষ পর্যন্ত তাহা গতি ভাঙিয়া ছাড়িল। একটা কাজ অন্তত নিখিল করিয়া গেল। গতি তাহার কাজ। আর কি?

এবার জোরার আর একটু প্রবল হও না।

সাবিত্রী বলিলেন, 'হাসিম কেমন খুশি হয়ে উঠল নিখিলের বিয়ের কথা শুনে? এবার ওই দিকে সুচরিতাকে বিয়ে করতে পারবে।'

প্রভাত হাসি নিজের হাবভাব বাক্যভঙ্গি ওভারকোট ওভারকোট বলিল, 'সুচরিতাকে অনেকদিনের যে নিখিল পছন্দ করত।'

সাবিত্রী মুখোমুখি চাকর বিরাজমোহনকে ডাকিতে যাইতেছিলেন। মুসলমান হাসিমের ব্যবহার থালাস্ত্র সানো প্রয়োজন। এখন কিরিয়া বলিলেন, 'কি বুদ্ধি তোমার! সাবে কি আমার কপালে ছেলে বিবাগী হয়ে যায়? যদি একটু দেখে রাখতে এনেছ হ'ত না। এরকম চাইলে কি বিয়ে হয়? সুচরিতা ওকে একেবারে পছন্দ করত না।'

খুড়াবাবার অবাক হইলেন, 'কেন, নিখিল তো চমৎকার ছেলে।'

সাবিত্রী কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন। পোটা সকাল কাটিল আতিথি-সেবায়। এখন বিরোধ স্বামীর সঙ্গে তর্কাতর্কি করিয়া লাভ নাই।

অতি-প্রসন্ন মুখখানি হাসিমের তাঁহার চোখে ভাসিতে লাগিল। প্রতিজ্ঞা নিখিলেশ করিয়া যাওয়াতে—হাসিম এত খুশি। তাঁহাদের যাবার দিনে সে কিভাবে-কৌশলে উপস্থিত হইবে বলিয়াছে।

হাসিমের ভাল ছেলে। আচারপরায়ণা সাবিত্রীও হাসিমকে হৃদয়বেরে বিবাহে আশীর্বাদ জানাইতে প্রস্তুত। ও তো কোন বিশেষ সমাজের নয়, ও জগতের।

কিরিয়া আসিলেন সাবিত্রী আবার ঘরে, নিরাজমোহনকে গোলবারান্দায় ডাকিয়া দিলেন। এখন বাসন-চোপড় হাতে পুকুরে যান সাবিত্রীর রান্না চড়াইবেন। সকালে হাসিম আসিয়া পড়ায় জলাদি রান্না হয় নাই।

তিন-চারদিনের মধ্যেই যাত্রা করিতে হইবে। অবশ্য বিশ্রামবেলা আজ পড়াশুনার সুযোগ নাই। বিছানাপত্র গোছে দিয়া বাঁধিয়া তুলিতে হইবে।

নিজেকে কর্মব্যস্ত সাবিত্রী শোবার ঘরে ঢুকিলেন। কেন কলকাতা যাই, কলিকাতায় স্থিত কেন?

বাড়ির কর্তা অনেকবার কলিকাতা যাতায়াত করিয়াছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় সহরে কেমন স্থিত?

সাবিত্রী শোবার ঘরে বাড়ির কর্তাকে পাইলেন না। পাশের ঘরে দুই ছেলের। দু'খানি তক্তপোষে ফণীন্দ্র ও ইন্দ্রের শয়ন করিত। পাশের ঘরে বসু। মধ্যে মধ্যে

সেই ঘরে দাঁড়াইয়া আছে একটি বিধবার ছোট ছইটি ছেলে। উহাদের পক্ষে সমস্ত আকাশ আমীর স্নেহশূন্য। বিধবা বন্ধুর সঙ্গে আমীর সহিত ছোড়-খাটো ঘরে বিরহ বলিয়া কেউ মনে করিবে না।

আবার দেখেন যেখানে বাস্তবিকই। বিয়ে-বিয়ে করেই থাকেন। তা হে, নিজের তো ছাই-পাই নেই, পরের দিকে তাকে রাখেন ঠাঁকাই, ঘরে আসে যায়। ছেলে দুটো রাস্তার বাইরে

লাবিত্রী নিজের মনে কাপাইতে কাপাইতে ছেলেদের ঘরে ঢুকিয়া দাঁড়াইয়া রোগেন।

ছাতের সুতো ছিঁড়িয়া আসিবে। ঘরের মেঝে যে ঘুরে ঘুরিতেছে অনুভব। মুহূর্ত ঘরে ঢুকিয়া ছড়ানো ঘরিয়া মণির ছোটোখানির দিকে চাহিয়া আছেন, উহার ঘুমের কথা কোনদিন লাবিত্রী ভাবিয়া দেখেন নাই।

জীর্ণ বৃদ্ধ, বয়সের প্রকাশে ছইয়া গেছে। লাবিত্রী ভাবিলেন ছেলে ঘুমি একদম উহারই, মেয়ে ঘুমি একদম উহারই মেয়ে। চলাফেরা স্বাধী নিশ্চুপ। নিশ্চুপতার

ঘুমিয়ে উঠে একদম ঘুমি ঘরের ঘরের দিকে।

ছাতের মেয়ের সমুদ্রের ছাতে লাবিত্রীর চোখ ঘুমিল

এই ছোটবির জীবন থেকে লাবিত্রী কোন মুক্তা পেল না। নিশ্চুপতার পরিমল বয়সের অভাবনীয়তার কাছে অনেকের নিজেদের বিস্তার ও পরস্পরী নিজের প্রার্থনা দেখেছেন। একদিন এই ছেলে লাবিত্রী ছিল, আবার লাবিত্রীর মুখের সমান নিজেরে, সে কথা আজ অবশ্যুপ্ত।

মেয়ে ঘুমি ঘুমিয়েছেন। ছেলেও ঘুমিয়েছেন। ঘুমি ছেলেদের ঘুমিতে চাহেন নাই। নিজেদের ঘুমীতে নিজেরা সমান হয়ে লাবিত্রীর—স্বামী নয়, তাঁর লাবিত্রী ঈশ্বরে ঘরের ঈশ্বরে। লাবিত্রী ঈশ্বরীর সঙ্গে। ঘরেরি বর্তমান জোরদারের প্রকাশের ঘুমী আজকের লাবিত্রী ছেলেদের দেবার নেহলাভ করে যে। তাই আজ লাবিত্রী একেবারে ঘুমিয়ে ঘরে বসিলেন। ঘুমা লাবিত্রী ঈশ্বরীর ঘুমিয়ে সমর্থন করিয়া পুরোপুরি ঘরের ঘুমিলেন।

আজ হঠাৎ লাবিত্রীর মনে হইল মনের

আনুন। [illegible] রাতেরটার সঙ্গে না খাইয়েছেন।'

[illegible]

[illegible]

সাবিত্রী ঘরটার চারের উপর হইতে চারখানি সরাইয়া ঘাঁড়কে তোষের জল মুছিলেন। সরকার কর্মচারীদের অনুভূতি তুলিয়া রাখিতে আদিলেন।

'হাঁ। ঘিউ-মেখিনের মধ্যেই রওনা হবো। এখন তো তোর কিঁয়ার থাকে না। হয় আজ বন্দর থেকে ওনে টিকিটের ব্যবস্থা করে আসবে।'

'আপনিও চলেছেন! কাঁপারে লম্বা ধাকবনে মনেয়া।'

এই এক ভয়ানক বিশাল মাঠেঘাটে আজকাল ভরে। এবই বিলাপবহিত ধারণ ধানের ক্ষেতে, ক্ষেতের শস্তে। প্রাচীন নিশ্চিত জনে ভণ্ডণ্ড হইয়া ভাসিতেছে। সেখানে নূতন কোনও তীর কোথায়?

লোকেই নবীনা পৃথিবীর মত আর একটি পৃথিবী কই সৃষ্টি হইল। নবীনা ধরিত্রী জলে ভাসমান। ঢেউ ছাড়া শুধু ভাসিয়া নিয়েছে, নড়ে চড়ে নাই। গড়ে নাই কিছু। সাবিত্রী বলিলেন, 'আবার আসবে। তয় কি? ভয়-ভাবনা সবই চলে যাবে। পশ্চিমের সরকার আর ভারত সরকারের মধ্যে কথাবার্তা চলছে।'

'কওচেন খুড়ীমা, সত্যি নাকি? ও মা তবে গা আবার আসের লাগাল হইবো?' ঘুরার মুখ আবার উজ্জ্বল।

'চা রে চা। ভগবানের সঙ্গে মাইনুষের কথা চলছে।'

ঘুরে বৌ হাসিয়া ফেলিয়া আকাশে প্রণতি জানাইল।

'তবে বা ভগবান দিন দিব্যানন্দে। খুড়ীমা, জাঁকে বুঝা শোনছেন না? ছিকো, ছিকো।'

'কেন? কি হ'ল আবার?'

'চাঁদু না, অনাথ সরকারের বৌ, পাবনা চল্যা গিছে শোনছেন না?'

'হ্যাঁ, অনাথ বারা যাওয়ার পরেই তো বাড়ি বেচে চলে গেছে। একা মানুষ, ছেলেপিলে নাই। ওখানে মা-বাবার বাপ আছে। ওদের কাছে থাকবে।'

'না গো, না খুড়ীমা। চাঁদু যা কয়ছে কি শোনেন। মেয়ার নজর যাই। ছিকো, ছিকো।'

অসহিষ্ণু সাবিত্রী বলিলেন, 'বলতে হয় বলো। তখন থেকে এরকম 'ছিকে-ছিকো' করেই তো সময় কাটালে। আমার মনে হয় নি। চাঁদু চলে।'

ঘুরে বৌ সরতে হইয়া বলিল, 'কই খুড়ীমা, সরেই তো আছি। চাঁদু না একটা বিয়া করছে।'

'বিয়ে? চাঁদু? বিধবাকে বিয়ে করল কে?'

'পাশের পরে এক বিধবা আছে, তেতা হাসপাতাল টিকা দিতা ছদ্দুর বাজারে চাকা করছে। বিধবা বুড়া হয় নাই। বয়স কালে বিয়া করে নাই। সেইজাই উয়াক বেহাবিবা করছে। কওচেন, আমাগারের দেশের লোক, তার তুই রাইবাড়ির দরকারের বৌ। তোর কি পিরবিত! নাপী, এমনি কাজত্তা করা লোক হালালি! না হয়, উয়ার লাগে থাকতিস্। বিয়া করলি ক্যান?'

ঘুরে বৌ-এর বর্ণজ্ঞান প্রচুর। রক্ষিতা থাকাটা তাহারা নিন্দার্হ মনে করে না। বিধবা বিবাহ নিন্দার্হ মনে করে।

সাবিত্রী ধীরে ধীরে বলিলেন, 'অনাথ এটাই ভাল বাসত, বৌ-বৌ করে পাগল হত। বরবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ত একজনকে ঘিরে করে বসল।'

ঘুরে বৌ সৈঁটার উপরে বসিয়া বলিল, 'বা রে কপাল। বৌ-বৌ করাই অনাথ দাদাভার পেরাণ গেল বা। সকল সময় চাঁদু ঘ্যান ঘ্যান করত, কুড়ার হাতে পড়ছি। খাওনের সুখ নাই। বিবেরাতির বাহু বাহু কয়া মরত। মনে লয়, বেহুবা হয়া বাহু খাবের পাবখানেন বইল্যা আবার বিয়াতা করল। হা রে অনাথ দাদা!'

প্রেম! প্রেম! তার কি আছে আর? এইতো প্রেমের বোঝ। এতই সহজে যায়।

অনাথ চাঁদুকে সুখে রাখিবার চেষ্টার অপরিসীম প্রয়াস পাইত। কিন্তু কিভাবে কত তাড়াতাড়ি চাঁদু অনায়াসে সম্ভোষবিকৃতি বর্ণ করিয়া বসিল?

নিশ্চিন্তেন্দ্র মুক্তা ঝিনুকে বাধার করিয়া পল্লীগ্রাম বেড়াইতে আসিল। কী আকুলি-বিকুলি তার। আবার কয়েকমাসের মধ্যে কন্যাসিনী-বিবাহ করিয়া আসিল।

মোকা-জেলের প্রেমে বাসিনী পাগল হইয়া আবার কেবল বিত্ত অন্তকে বিবাহ করিয়া পূর্ণলক্ষ্মী সাজিয়াছে। মাথার ছোট ছোট চুলগুলো তৈলচিক্কণ, বিহি কলের শাড়ির আঁচল মাথায় তুলিয়া ঢাকা। হাতে-গলায়-কানে সোনার গয়না। নবর বেরে 'মা-মা' বলিয়া অস্থির, পিছে পিছে ঘোরে।

কিভাবে লোকে ভোলে! তাহলে তাঁহার কি এখনও সুখের আশা আছে? বন্ধুবাসিনী পুতুলকে হয় তুলিয়া দূরতে হইবে কি?

সাবিত্রী জলখাবার দিয়া ঘুরে বৌকে কিছু মাছ-টাকি বানাইতে শ্রান্তরার জন্য অপরাহ্নে ডাকিলেন। কলিকাতার জন্য খাবার প্রস্তুত করা দরকার। খালিহাতে খুড়ীমা উপস্থিত হইতে পারেন না।

জলের ঘরস্রোতে বাঁধা কিঁয়ার কম্পিত। মোটা মোটা লোহার শিকল ও কাছির দ্বারা বাঁধা তীরের খোঁটায়। একটা সাধারণ শিকলে বাঁধা। চলা হইলে শক্ত কাঠের পাটাতনে উঠিতে হয়। অবাধ-অগাধ জলস্রোতে কিঁয়ার বিলম্বিত। সতর্কপায়ে ওঠ, যাত্রী। পা পিছলে হইলে জলস্রোতে নিমজ্জমান।

বালসহ, লোকজন ক্রত উঠিতেছে। সাবিত্রীরা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকেট করিয়াছিলেন। কিন্তু হাবিবের উপস্থিতি-হেতু সেকেণ্ড ক্লাস স্পেশাল ক্লাসে পরিণমিত। জমাদার বস্তির-বাজিরা বন্দুকে করিয়াছে। জনতা কৌশলে নিয়ন্ত্রিত।

হাবিব নিজে বালসহ তদারক করিয়া সাজাইল। বেঞ্চে ক্যাবিনের শতরঞ্চ বিছাইয়া বসিবার গদী চাকিল নিজের হাতে। তারপর 'আসছি' বলিয়া তীরে গেল।

সাবিত্রী স্বামীকে বলিলেন, 'জলের সীমা নেই। সবলে ভটছ। কিন্তু ভরোসের লোক নেই। দেখতেই বা কি সুন্দর! একটু ভাবকর্ক, কিন্তু বেন কর্কশ। যেমন মুখচোখ, তেমনি লালিত্য। চোখ দুটি কি টানা-টানা!'

মুভাষহাশয় সঙ্কুচিতচিত্তে ম্যাজিস্ট্রেটের সেবা গ্রহণ করিতেছিলেন। এখন বলিলেন, 'মাস্টার খুবই ভাল তাই চেহারায় লালিত্য আছে।'

ইতিমধ্যে হাবিবের আর্দালীর আরও দুইটি সুটকেস হাতে প্রবেশ।

'এ কি?'

আর্দালী সেলাম করিয়া বলিল, 'সাহেব দিয়েছেন।'

ইতিমধ্যে ব্যস্তভাবে হাবিব আবার প্রবেশ করিল। পেছনে লোকের হাতে একগাদা পেপে-কলা। সাহেব, বারান্দা 'ভর-ভর' করিয়া অস্থির।

'এই যে কলাগুলো রাখুন, খুড়ীমা। পথে

কাজে লাগবে। ফোকানীই এনে দিল। আমি—আমি খাই নি।'

'কেন বাবা, এমন করে বলছেন? ওতে কি ছোঁয়া লাগে? আপনি আবার এত ভয় কিসের কেন?'

সাবিত্রীর কথায় হাসিব বলিয়া উঠিল, 'না, মা। আমার তো ইচ্ছা করে। আপনারা কত দাওয়াত খাওয়াবেন।'

বুড়োবাপের বলিলেন, 'আপনার আর্শীর্বাদী এই ছুটো নোট রেখে গেল।'

হাসিবের ভাবভঙ্গি রঙ্গিত হইয়া উঠিল, 'আমি আপনাদের অনুমতি না চেয়ে নিয়েই ছুটো পাঠাবার জন্য সঙ্গে পাঠিয়েছি। অসুবিধা হবে না তো?'

ছেলে মা-বাবাকে তুলিতে দিতে আসিয়াছিল। বলিল, 'কি বলছেন, বিশ্বাস হয়? এ তো কিছুই নয়।'

সাবিত্রী কৌতূহল প্রকাশ করিলেন, 'কি আছে এতে?'

'আছে পাথরের সন্দেশগুলোর ছোট্ট সন্দেশ আর রাধাপ্রসাদের ক্ষীর। বইবাহু দিলে আমার খুশি হত। কিন্তু টিন ভর্তি জল নেওয়া মাছ নিতে অসুবিধা হবে বলে পাঠালাম না। আমি কখন যাব নিয়ে যাব?'

'কবে যাবেন?'

ছেলের প্রশ্নে হাসিব বলিল, 'এখানকার কাজ একটু কমলেই যাবো। ফলেন উদ্যেন।'

কিস্তির হাড়িকার লগ্ন উত্তীর্ণ। সাবিত্রী সাহেবের আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে। ম্যাজিস্ট্রেট অনুমতি না দিলে সে হাড়িতে পারে না। ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় জ্ঞাপন করিল হাসিব। কিন্তু নায়ীর পা ছুঁইল না সে। নত হইয়া করজোড় করিল।

হাসিব নামিবার সঙ্গে সঙ্গে পাটাতন তোলা হইল। কিস্তি দুলিয়া উঠিল।

পাড়ে সতৃষ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া হাসিব চাহিয়া রহিল। নদীর জলে এক হংসদূত সে প্রেরণ করিত। মনস্তত্ত্বী কী বুঝিতে পারিবে? এখানে জল সুসংবাদবাহক।

সাবিত্রী ক্যাবিন ছাড়িয়া ডেকে দাঁড়াইয়া অশ্রুভরা চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

চিরদিনের বাসরাত্রি ফেলে ফেলিয়া কোন নূতনের অভিসারে বৃদ্ধ বয়সে শ্বশুরে চলিতেছেন?

হাসিব অগ্রসর হইল, উচ্চকণ্ঠে আবার বলিয়া উঠিল, 'বলবেন আমি শীঘ্রগির যাব।'

সেই জলে এই জল মিশুক।

ছিন্ন

'The woods are lovely, dark
and deep
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep
—R. Frost.

গল্পটা এখন বর্ষা অন্বেষণ করুন।

আউটরামঘাটে স্টীমার ধরে বহুক্ষণ সূর্য অস্ত গেছে। ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপের ধোঁয়া কেমন ম্যাড়মেড়ে, বেগুনী জলে ধোঁয়া অথই যেন। গঙ্গার জলে ধোঁয়া অথই। ধোঁয়া তার ধোঁয়ার রঙ, জলের এত জলের স্রোতের মধ্যে হারিয়ে পারে নাই।

অন্ধকার পুকুরের সিমেন্টের যে কথা ওই উর্ধ্বগামী ধোঁয়ার বৃত্তগুলির মধ্যে ছোট ছোটগুলির আকারে মিশিয়েছে। পঙ্কের জল অন্বেষণে তাপীরথীর জলে মিশিয়াছে। হাসিবের হৃদ পদ্মাপার হইতে গঙ্গাপারে আসিয়াছে।

দুদের প্রতীক্ষাব্যাকুল অপরাহ্ণ সন্ধ্যায় নামে। তারা ইটের পঞ্জরে দেয়ালিনী ফোটে। কিন্তু মালতী ফোটে না দিনের অন্তিম দুদের মাথায়।

কোথায় সে মালতী পুষ্প! মহমনসিংহ গীতিকার জন্মানন্দ চন্দ্রাবতীতে স্নান করিয়া দিয়াছিল মালতী ফুল। জন্মানন্দ ধর্ম ত্যাগ করিয়াছিল, মুসলমান হইয়াছিল। তবু চন্দ্রাবতী তাকে ভোলে নাই।

হাসিব অপরাধ করিয়াছে না কি? বিবর্মী হওয়া কি অপরাধ? সে মানবতার ধর্মে দীক্ষিত, তাকে অন্য ধর্মে দীক্ষা করাটা ঠিক নয়। মালতী বয়সে নবীনা হইলেও তীক্ষ্ণবুদ্ধি-প্রবীণা। বোঝা উচিত।

সুভদ্রা নিজের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়াছে হাসিব প্রথমেই। সুভদ্রা বলিয়াছে এখন রায়বাড়ি বেশি যাতায়াত না করিয়া কাব্য-গ্রন্থের মুদ্রণব্যাপারে ব্যস্ত আছে বলিয়া হাসিব পাঠাতো দিয়া থাকে।

এবারে বিদেশ যাইবার জন্য তাগিদ আসিয়াছে। হয়তো বহু দিনের জন্যই দেশ ছাড়িতে হইবে।

গঙ্গার ধারে হাসিব বসিল। মাথার উপরে নীল আকাশ। সুভদ্রা যেন তাকে এমন আশা দিল? কিন্তুতে মালতীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ।

রায়বাড়িতে এবার গৃহিণী, বধূ ও কন্যারা সকলেই হাসিবের সহিত আলাপ করিয়াছেন। সেই পাইকারী ব্যবস্থায় মালতীর দর্শন ও সাক্ষাৎ করার মন তবে না। অন্তরঙ্গনে কিরিয়াছিল হাসিব। মালতীর জন্যই যাওয়া আসিয়াছেন বিদেশী কুটির অর্জনার্থে। বিদায়ের আয়োজন চলিতেছে।

মালতী চিরদিনের মত অন্যের মালকে কুটিতে হয়। এবারে যদি একটু কথা বলিত। সুভদ্রা বলিয়াছে মালতী না কি এই বিবাহে অসম্মত। বুঝিয়া মালতীকে বলার সাহস পায় না সে। মালতীর অন্যমনস্কতার সুযোগ, চকিতের আইবার দেখা। অতি সুলভ। হাসিবও বুঝি বুঝিয়া পায় না। সে মন বুঝিয়া আইবার করে: মালতী সুখী হবে।

প্রায় শেষ-দৌহন, বিদায় পুকুরে বিবাহে মালতী মুখ ফুটিয়া না। হয়তাতি তখনই মত দিবে না, আত্মীয়-স্বজনের অমতের মালতী অসুখী হইবে। তাই নাই।

নিকুঞ্জে মালতী-সন্ধানে হাসিব আশ্বাস জানাইয়াছিল। 'আমার সঙ্গে দেখা করে যাবে, কোন ছল খেলা উচিত হবে না।'

সুভদ্রা বলিয়াছিল, 'আমি বলব না আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে, আমি ওকে চিঠিতে জানিয়েছি। এই ভরা বর্ষায় পদ্মার কয়েকদিন গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াবেন। কোন বিপদ হবে বলে মনে হয় না, কারণ তাহলে মালতী সুখী হবে।'

শেষ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়া হাসিব বলিয়াছিল, 'যাব।'

সুভদ্রার ঘর। সুভদ্রা হাসিব ও নিজের মধ্যে ছোট্ট টেবিলখানা রাখা নিয়া সরাইয়া উহা সাজাইয়াছিল সযত্নে।

একটা কবিতাপ্রেমী সাহিত্যের পত্রিকা মুহূর্তে কলঙ্কিত চায়ের রঙ ধরিল। ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বক্তব্যের সূত্রটা বলিল, 'যাব, তাহলে। মনে তো যাচ্ছেন এদিকে।'

তীব্র দৃষ্টি সুভদ্রার; কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ। জমেই আচরণ রুক্ষ হইতেছে। হাসিবের

কাটিং, মেসিনিং, ফোরজিং
এবং
ষ্ট্রাকচ্যারালস্ কাজের জন্য
অনুসন্ধান করুন
কোয়ালিটি
ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস
মাকড়দহ রোড, দাশনগর, হাওড়া
৩৩৬৩৪৬ —ফোন— ৬৫২৩০৩

মনে হইত কেমন যাদুমন্ত্রে দৃপ্তা মিত্র সুভদ্রা যেন হামিদের সোপিওসেক্সের উদ্যোগী। ভাইনীর ন্যায় যেন সে প্রাণসার হরণ করিয়া লইবে। চেহারাও রুক্ষ, তীব্র। যেন ডাইনী-মন্ত্রে কেউ লাবণ্যময়ী দ্বিপ্রযৌবনা সুভদ্রা মিত্রকে ডাইনী করিয়া দিতে পারে।

হামিদ সুভদ্রার সঙ্গে সঙ্গে সলজ্জে আসন ত্যাগ করিয়াছিল। বলিল, 'মিস মিত্র, আপনার মত শুভার্থী বন্ধু আমার কেউ নেই, জানি। কিন্তু যেখানে কোন আশা নেই, সরে যাওয়াই কর্তব্য।'

'আশা নেই যে বলছে?' জলদগম্ভীরে হামিদের শান্ত-কঠিন ভাব যেন জাগাইয়া দিতে চায় সুভদ্রা, 'চিরটা কাল ধরে যারা বাড়ির বেরেরা মেয়েদের বিদ্রোহ করতে প্রথার বিরুদ্ধে, পরিবারের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে। পারে নি তারা। আমি দেখতে চাই সত্যিই কেউ পারে কি না। বালতীর সঙ্গে সঙ্গে একটা জেনারেশন শেষ হয়ে যাবে। যা করবার এখনই করা দরকার।'

'কিন্তু, বিদ্রোহের লক্ষ্য কি?'

আবেগভরে সুভদ্রা মিত্র সেটার গলা কাঁপাইয়া দম ভরিয়া বলিল। তাঁর কণ্ঠ কম্পমান দুলিয়া গেল সে উত্তর দিল, 'সুখ। জীবনের লক্ষ্য সেটাই।'

অতএব আজ জলের ঘরে প্রত্যাঘাত হামিদ। সে ঘুরে চলিয়া যাইবে। হাতেকলমে দাঁড়াইয়া দুঃখ করার পরিকল্পনা। লিখিয়া লেখকে স্নায়ুদলের শিক্ষা দিবে। জীবনের উদ্দেশ্য তিন তাই। কিন্তু, ভাগ্যচক্রে কর্মে মুক্ত হইতে হইয়াছিল।

বালতী-সাক্ষাৎকারের পূর্বাহ্নের দিনগুলি কি নিশ্চিন্ত, স্বস্তিভরা দিন! কাজ, কাজ, কাজ! ক্লান্ত বলিয়া কোন বস্তু ছিল না। সকালে নির্জনবাস দিন জাগিত, রাত্রে আরামে আলস্য ও একঘেয়েমীর দ্বারোদ্ঘাটন করিলে সে প্রান্তক্লান্তির বশ হইত। সেই আরামের অবসরীবন দিনে সে আশ্রয় চায় না।

ভালবাসা, প্রেমাবিহ্বল প্রেম তাকে বন্ধন করে, করুক। প্রেমের পায়রাজাল সে প্রতিহীন হইবে না, কখনই না। পায়ে কাঁটার খোঁচা, তবু এ পথে তাকে চলিতে হইবে।

এক প্রতিশ্রুতি আছে। যেদিন দৃষ্টি মেলিয়া প্রথম সূর্য দেখিল হামিদ, প্রথম তারা দেখিল—তখনই আকাশে শোনা গেল কোন অনাহত ধ্বনি: তোমার এ জীবন অন্যের জীবনের জন্য। খোঁজ, খোঁজ সেই দুঃ-জীবনের জন্য তার।

প্রতিশ্রুতি, এতদিন নির্বাক ছিল। হঠাৎ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। শেষ পর্যন্ত হামিদকে সন্ধান করিতেই হইবে।

গন্ধার জল, তলিয়াছে হামিদ, আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটায়। তবে কেন দুরাশার দুরন্ত গোলাপের কাঁটার এখন ক্ষত-বিক্ষত?

এখানে তার নাবাই না।

এখানে এই জীবনের সমাপ্তি ঘটাই না? শুধু কোন একজন বন্ধুদের নাম মুছিয়া যাইবে। আর কোন ক্ষতি নাই।

আকাশ, তুমি কেন নির্বাক? বালতীকে নূতন সংযোজন করিব, এমনি কথা ছিল। কিন্তু আজ আমি শক্তিহীন।

বাতাস, তুমি বিদায় বল। সমগ্র জীবন দিয়া আমি সেবা করিব আমার দেশের, আমার সুজলা-সুফলা অখণ্ড ভারতবর্ষের, এমনি কথা ছিল। কিন্তু কোথায় সেই স্বপ্ন? সেই আদর্শ? আমি নিস্তেজ, আমি পরাভূত।

সেদিনও হামিদ গঙ্গাতীরের ঘাসে

মতোকে চিৎকার। প্রায় তিন-চার দিন পরার তীরে পরচারণ-ক্লান্ত হামিদ হতাশ। যেন সে খোজন ক্রোশ পথটিন করিয়াও পায় নাই ক্লান্তের বন্ধ।

এর চেয়ে হাসবাড়ির বসিবার ঘরে চোখের দেখা মিলিত তো। আর কতদিন নির্জনা করি সাজিয়া প্রতীক্ষায় থাকা চলে?

পাশে হামিদ। গলার জলে লোহার লাশিয়া। ওরবলে, ক্লান্তে, ও ক্লান্তবলা বালতী।

'ও!' একাক্ষরে কথা বলিয়া বালতী স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

'এই জন্যেই তোমাকে লাজিরে বেড়াতে এনেছি' বুঝলে খুকী? যেতে ওঠো, যেতে ওঠো। মন স্থির করে ফেল।'

সুভদ্রার নীরস কথায় নিজের ক্লান্ত-উচ্ছ্বাস দমন করিয়া হামিদ প্রতিবাদ করিল, 'আমিও গঙ্গার ধারে বেড়াতে এসেছি, আপনারাও এসেছেন। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। এ সমস্ত কথা বলছেন কেন?

ক্ষুণ্ন করিয়া হাসিল সুভদ্রা, 'বুঝা ভাল, বিশ্বাস হল। বালতী বোকা নয়। ওর মুখের দিকে চাইলেই বুঝবেন। আর কোন ছলনার প্রয়োজন নেই।'

অস্তগামী সূর্যের সমস্ত রশ্মি দুইচোখে ধরিয়া বালতী হামিদের দিকেই তাকাইয়া আছে। কোন দ্বিধা বা ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই। বিজয়িনীমূর্তি তার।

হামিদ মুহ্যমানের, অপার আনন্দে চাহিয়া রহিল। সুভদ্রা নীরবে উঠিতে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'যাক, আমার একখানা রচনা তবু নিষ্ফলা হল না।'

'ঠিক করে ফেলুন, নিশ্চিন্ত হই। কাল-বিলম্ব না করে, হোটেলে যেয়ে ঘিনিসপত্র নিয়ে আজ রাত্রের গাড়িতে চলে যান দেশে। সেখানে তো আপনি রাজা। ওখান থেকেই পাটনে তুজনে চলে যাবেন। তাছাড়া একবার কুলত্যাগ করে ফেলতে পারলে হাসবাড়ি থেকে কেড়াতে চাইবে না।' সুভদ্রা নিশ্চিন্তস্বরে বলিল।

'কিন্তু আমার কি উচিত হবে এটা, ওঁরা বিশ্বাস করে আমাকে স্নেহের সঙ্গে নিজের করে নিয়েছেন। অমির, দীপঙ্করের আমি বন্ধু, ওঁদের অনুমতি না নিয়ে আমি কি করে—না, তা হয় না।'

সুভদ্রা বিদ্রূপ করিল, 'প্রেম শাস্ত্রে ভুল আছি, আপনি কবে নীতি শেখালেন? দাবালিকা মেয়ে। নিজে আপনার সঙ্গে যাবে। মতামত কি? আপনি কি চান সন্তার মত বালতী চির অনুঢ়া থাকুক, আর আপনি সৌভদ্রের মত বেলেল্লাপনায় ছুটে বেড়ান?'

হামিদ নাথা নত করিয়া নীরব রহিল। সুভদ্রা এবার চিবাইয়া বলিল, তবে কি আপনি চান যে বালতী আত্মহত্যা করুক? আপনি বিবেক ও উচিত্যের বোঝা পিঠে বেঁধে পিতৃপ্রেমের তীর্থযাত্রা করেন?'

'কিন্তু ওঁর মনে আমার কথাও তো হয় নি?' তথাপি দ্বিধাগ্রস্ত হামিদ ইতস্তত করিতে লাগিল।

অধীরভাবে সুভদ্রা বলিয়া উঠিল, 'কি বলা? একটা ছলে যে কথা আপনি বলবেন, আমি একবিন্দিটে সেব করে দিচ্ছি। আপনি বালতীর চেয়ে বয়সে অনেক বড়? বালতী তা জানে। আপনি মুসলমান? বালতী তা মেনে নিয়েছে। না হয়, শুদ্ধির বিধান দিয়ে দিচ্ছি হোক!'

এতক্ষণে বালতী কথা বলিল, 'কিন্তু দরকার নেই। আমি ধর্ম-জাত মানি না।'

সহস্র ক্ষুণ্ন সুধাগ্রাসনে পরিতৃপ্তি হামিদের। প্রতিশ্রুতি বিফল হয় নাই। এই তো জীবনের জীবন।

গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া অতি কোমল কণ্ঠে হামিদ বলিল, 'যদি আপনি—তুমি নষ্ট ধর্ম-জাত মানো, তবে আগে ওঁদের জানিয়ে দেবার আপত্তি কি?'

বালতী একটুক্ষণ চিন্তা করিল, তারপর বলিল, 'আমি ওঁর হোটেলে যাচ্ছি। আপনি একটু জানিয়ে দেবেন, তারপর এখানেই—' বালতী হঠাৎ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। আবার তীক্ষ্ণ কিশোরী।

'এখানেই রেজেষ্ট্রী হবে, বলতে চাও?' সুভদ্রা বালতীর মুখের কথা তুলিয়া বলিল, 'বন্ধ বুদ্ধি বা'র করনি। হোটেলে যাওয়া মানেই কুলত্যাগ, তোমাকে কে ফেরায়? আমি খবর দেবার ভার নিলাম।'

'ওঁর যাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন। আমার উপর যেন রাগ না করেন। একটু স্নেহ পাই যেন।' হামিদ অনুনয় জানাইল।

জলের দিকে চাহিয়া ছিল সুভদ্রা। গঙ্গার জলে তখন সন্ধ্যার ছায়া।

'বলব। সব—ই বলব। বালতী, আমি বড় খুশি হয়েছি, তুমি কোন ব্যাপারে আপোষ করতে চাইলে না। হামিদকে 'হেজেক্ট' নাম দিয়ে লোনার পাথরবাটি তুমি পেলে না। তুমি—তুমি ওঁকে গড়ে তুলতে পারবে। তোমার ক্ষমতা আছে।'

সুভদ্রা হাসিয়াই ফেলিল, 'তোমাদের এখন থেকেই বিদায় দেব ছেলে উপহার এনেছিলাম। তোমরা আশীর্বাদের থালা খুলে দেখেছ, বালতী। এবার সত্যি আশীর্বাদ করো।' একটোড়া ক্লান্ত বলা।

'ওঠানি;' বালতী প্রণাম করিল। স্বপ্নাতির নিবিড় হইতে এই একটিমাত্র আশীর্বাদী তার পাওনা।

'আর নিজের হাতে, সাহেবের কাজে রাখতে নেই। এটি ব্যবহার করবেন।'

সোনার ব্যাগে গাঁথা মুক্তার হারছড়ি সুভদ্রা হামিদের হাতে দিল।

'এ কি! বালতীকে নিজেন দিন, আমাকে কেন?'

সুভদ্রা হাসি হাসিল, 'হারছড়ির জামাই-এর পাওনা, বৌয়ের যৌতুক, বৌয়ের আংটি, বৌয়ের হাতে দেবি। কিছুই ছুটল না দেখে রহা হল।'

এবার সুভদ্রা তাগিদ দিল, 'হোটেলে চলে যান। চলুন আমার গাড়িতে পৌঁছে দিই। না,—আমি আর দেরি সহ্য করতে পারব না। উঠিয়ে নিন দিন।'

'আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না। কেন আপনি এত বড় হলেন, এত মহিমময় দিয়ে!' হামিদ ক্ষুণ্ন করিয়া কৃতজ্ঞ কণ্ঠে কহিল।

'কেন বলছেন?' সুভদ্রা হাসিল, 'বাঙালী ভাইকে যে আমার কাছে আপনারা চলে যান। আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

অন্তরালে কাঁদিতে আকাশের নীচে গঙ্গার দিকে সুভদ্রা রহিয়া গেল। একা।

কৃতজ্ঞতার হামিদ বালতীর হাত ধরিয়া পথের দিকে অগ্রসর হইল।

মুসলমানের স্পর্শে আবার কি ব্রাহ্মণকন্যা অশুচি হইয়া উঠিবে না?

প্রাচীন ব্রাহ্মণবংশের ক্রন্দনে ধ্বনিয়া ওদের দিকে চলিয়াছে সুভদ্রা। অন্তরাবনে পুরাতনের চিত্ত এমনি করিয়া ধ্বনিয়া নবীনা ধ্বনিরী জন্ম লইতেছে। প্রথমে কেবল জল, তারপরে শস্য-শস্য।

হামিদ জানে না, কোনদিনও কেউ জানিবে না, কবীর সুভদ্রা পিতার ভাবী জামাতার জন্য রক্ষিত উপহার নতিটি সুভদ্রা হামিদের হাতে তুলিয়া দিল।

সুভদ্রার পৃথিবীতে আজ ফেরেল-জল।

নিষ্কৃতি

(১০ পৃষ্ঠার পর)

তবু বড়টা কঠিন হয়ে উঠেছিল।

হয় তো দুরের সেই কাহিনি মনের মধ্যে কাজলী আসন নিতো, কিন্তু পর পর দু'তিনটে দিন, বাবা আসছিল, ওরা অন্য রকম বলেছিল।

বন্দনা পুলোবরের থেকে নেমে এসে দেখতে পেয়েছিল, ওরা মেয়েটাকে সারদার কাছ থেকে এনে নাচাচ্ছে এবং দু'জনের হাসির হল্লোড়ে ঘর গমগম করছে।

কত বড়, কত সুন্দর!

এ ওদের ভাল লাগে না?

ওদের এই প্রাচুর্যপ্রচুর সবটুকু বাড়ির বাইরে খরচ করে আসতে ইচ্ছে হয়? এই আলো, এই হাসি, এ যে যেখানে সেখানে ধরা থাকে, এর শক্তি যে ইট-কাঠেও সঞ্চিত হয়, সে কথা কি ওরা জানে না? বুঝতে পারে না?

বন্দনা নামতেই সোমেন মেয়েটাকে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছে, 'যা, এবার নিজের লোকের কাছে যা। বুঝলে মিষ্টি আমাকে ও দু'চক্ষে দেখতে পারে না। বিলকুল পর ভাবে।'

বন্দনা মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে হেসে উত্তর দিয়েছে। 'তার জন্যে বেশি আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। দু'দিনেরই আদে-দুদে মিশে যাবে।'

হ্যাঁ এই রকম কথাটাই বলেছিল, তবু মনে হচ্ছিল মুখের সেই পাথুরে রেখা কেটে গেছে।

সোমেন সেদিকে কৌতুকমিশ্রিত চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেছে, 'আচ্ছা মিষ্টি তোমার ঠাকুরঘরটা তো অনেকদিন হোয়াইট ওয়াস্ হয় নি, মনে হচ্ছে—'

বন্দনা হেসে উঠেছে, 'ও বাবা ঘরবাড়ির এত তুচ্ছ ব্যাপারে দেখার মত দৃষ্টা মন তুই আবার হঠাৎ জোগাড় করলি কি করে? তোর আবার এসব মনে থাকে না কি?'

'বাঃ, কি ভাবো তুমি আমায়?' সোমেন বেশ সন্দেহের ভাণে বলে, 'সেই যেবার তুমি যখন কি যেন যোগে কাশী গিয়েছিলে, আমি তোমার বাড়িটা সবত্ন রং করিয়ে রাখি নি?'

কথাটা সত্যি, ইন্দ্রাণি যখন 'আসন্ন অবস্থা' নিয়ে বাপেরবাড়ি গিয়েছিল, তখন বন্দনা বলেছিল নতুন বংশধর আসবে, প্রথম দুবছর বাড়িতে রং লাগানো বারণ।'

হেসে হেসে বলেছিল, 'হোক ব্যাটা? নিজে তো চলতে শুদ্ধি করতে!'

'আহা তা' থাকে না?' এসব তোর হেসে হবে, আর বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে? কেন তুই পারবি না ভেবে মনে মিছরী লাগাতে?'

সোমেন দু'হাত জোড় করে নমস্কার করেছিল।

'হাতজোড় করলি যে?'

বলেছিল বন্দনা।

সোমেন হেসে বলেছিল, 'ঠিক ওটা ছাড়া আর কিছু মনে এল না।'

'রোদ তো তোর চালাকি বের করছি। এত বড় ছেলে হলো, বাবা হলেন, কিন্তু মর্ম নেই। তোকে করাতেই হবে।'

এই বন্দনা ছিলেছিল। তুবে মিষ্টি ঠিক করে এক্সিকেট করে, বালমশলা আনিয়ে রেখে, দু'দিনের জন্যে তবে কাশী গিয়েছিল বন্দনা। তা' এসে প্রসন্নই হয়েছিল সোমেনের কার্যকারিতায়।

সেই কথা তুলেছে সোমেন।

বন্দনা হেসে উঠেছে সে কথা শুনে।

বলেছে, উঃ! একখানা রেকর্ড!'

বলেছে, 'বোহাই বাবা আমার পুজোর ঘরে আর তোমার মিষ্টী তোকাতে হবে না, বেশ আছে।

এই পুজোর ঘর সম্পর্কে চিন্তাটা যে চিরাচরিতই নয়, কেবলমাত্র মিষ্টিকে একটু প্রশ্রয় করার চেষ্টা, সে কি আর বুঝতে পারে নি বন্দনা? পেরেছে এবং সোমেনের উদ্দেশ্যটা ঠিকই সিদ্ধ হয়েছে। প্রসন্ন হয়েছে বন্দনা।

মেয়েটাকে উদ্দেশ করে বলেছে, 'দেখ মুন্নু তোর বাবা এবার 'বাঁদুর' হচ্ছে।'

ইন্দ্রাণী অবশ্য সে প্রসঙ্গে বলে উঠেছিল, 'ওটা আপনার মিথ্যা স্বপ্ন মিষ্টি. ছেলে 'নরাঁচিকা'। ওই বস্তুটি কোটি-কল্পকালেও 'বাঁদুর' হবে না। যা বানিয়েছেন তাই থাকবে!'

বন্দনার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, তবু বন্দনা সেদিন পরিবেশ নষ্ট করে নি। তবু হেসে হেসে বলেছিল, 'তা' তাই থাকাই উচিত, যার জন্যে বানিয়েছি তার উপযুক্ত হওয়াই তো দরকার!'

শাস্ত্রী নয়, বন্দনা। ঠাট্টার সম্পর্ক!

অবশ্য কিছু বড় নয়, ঘরের থেকে যার বয়স-চারের বড়। ঠাট্টা-তামাসা চলতেই পারে। চালিয়েছিল কিছুক্ষণ। তারপর ওরা প্রায় অনুমতি নেওয়ার ভঙ্গীতে 'জানান' দিয়ে বেরিয়েছে একটু।

কিন্তু এই হোসলার ঘরই বা কতক্ষণ? এদের পরমায়ু তো এতটুকু বাতাসেই ফুরোয়। তাই দিন-তিনেক পার হতেই যে যে সেই।

আবার আর্দ্র বন্দনার ভক্তে আগুন। তাই অত্যন্ত দুস্তর মনে লাগল।

বন্দনাকে নামতে দেখেই বাঁপা পা গুটিয়ে বসে কোণে কথা খুঁজে না পেয়ে বলে ওঠে, 'কি ঠাকুর, আর কয়লা চাই, চাই তো—জল।'

তবে ঠাকুরও বিভিন্নদিনের সাড়া পেয়ে কথা-পুঁথিতে এত সাড়া তুলেছে যে, বাঁপার বাঁপানিক্ষিপ্ত কণ্ঠ তার কানে যায় না। বরং শব্দটা আরো বাড়ায়।

বন্দনা তীব্র কটাক্ষে মেয়েটাকে একবার দেখে নিয়ে চেপে ধরে সারদাকে।

'এই সারি, ওটাকে চাপড়ে চাপড়ে খুব পাড়াচ্ছিস যে? খাবে না?'

সারদা উঠস্থ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'ঘুম তো খেয়েছে—'

'ঘুম খেয়েছে তো—ঘরে যেতে! কাল বলেছি না, রাতে একটু করে রুটি বানাতে হবে, সন্ধ্যেবেলা খুব পাড়াস নি। বিকালী হয়ে গেছে সে কথা?'

সারদা বিড়বিড় করে বলে, 'বাঁচা ছেলে রাত্তির আটটা অবধি ঘেপে থাকতে পারে?'

'কি বলছিস বিড়বিড়িয়ে লক্ষ্মীছাড়ি?'

বলা বাহুল্য পুরনো লোক বলেই এ হেন বধূর সম্বোধনের সাহস! নতুন লোক হলে 'লক্ষ্মীছাড়ি' শুনলেই বলবে 'তবে তোমার বাড়ি ছাড়ি।'

তবে সারদাই কি আর খুব একটা প্রসন্ন হল? হ'ল না।

সারদা একটু চড়া সুরেই বলে উঠল, 'বিড়বিড়িয়ে বলব কেন, স্পষ্ট করেই বলছি, রাতায় রাতায় বন্ধ হয়, উনুনগুলোর প্রাণ যায়। বৌদিদি নন্দদের ওপর 'আকোচ' করে বাচ্চা ছেলে বেড়াতে বেরিয়ে যাবে, তুমি তাদের ওপর 'আকোচ' করে তিন ঘণ্টা ঠাকুরঘরে বসে থাকবে, যাতে বাচ্চাটারই প্রাণ যায়।'

'কি বললি?'

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে বন্দনা চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমি আক্রোশ করে ঠাকুরঘরে বসে থাকি?'

সারদা এদের বাড়ির অধ্যবসায় জানাই ছিল ইশানীং। রাতে যাওয়া-যাওয়া হবে রাত-দুপুরে।...তাতে আবার রাত! কেউ ভেবে একটা কথা শুধোয় না, সন্ধ্যে থেকেই তো বাড়ি ঘুরঘুপুরী, হাই তুলতে তুলতে প্রাণ যায়। ঘুরঘুটে পুরনো বাড়ি!

'ঘর ছাই' যাক সে, তাহলেই মন বেপরোয়া,

তাই সে বেপরোয়া মেজাজের সুরে উত্তর দেয়, 'তা' কি করতে বলে থাকো তুমিই ভালো। আমরা চর্মচক্ষে যা দেখছি তাই বলছি। এই লাও মেয়েকে কোলে থাওয়াতে পারো থাওয়াও।'

বলে সহসা সেই প্রায়-ঘুমন্ত মেয়েটাকে কোল থেকে তুলে মাটিতে বসিয়ে দেয়।

মেয়ে।

কিন্তু মেজাজেই তো [illegible] হয়ে যায় না?

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা তার প্রতিশোধ নেয়। অর্থাৎ কেঁদে সুরু করে।

কিন্তু যে 'অবলা' 'অসহায়' 'বেচারী' জীবন ও স্বিরোধিকে সম্পূর্ণ 'নিরস্ত্র' প্রমাণিত করে দিয়ে সে তার বিশ্বজয়ী দুর্ধর্ষ সহায় শক্তি নিয়ে মেতে যায় বীর-বিক্রমে।

চীৎকার! চীৎকার! তার উপরে চীৎকার! থামবার লক্ষণমাত্র নেই।

এরই তো এই ব্যাপারটা অসহ্য।

কিন্তু যে 'বেচারী' নয় নয়, এটা প্রমাণিত করতে গিয়ে যখন তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে, সেটা যে প্রলয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, তা কার অবিদিত। অতি সহনশীল ব্যক্তির, অতি শীতল মস্তিষ্কও ফেলে দেতে পারে সেই প্রতিশোধ-পরায়ণতায়। তার উপর যদি এহেন একটা অসমানজনক কারণে সেটা ঘটে, কে পারে মাথার ঠিক রাখতে?

কল্পনা মেয়েটাকে থামাবার কৌশল প্রয়োগ না করে যা করলো করে নি, তাই করে বসে। '...চুপ কর, চুপ কর বলছি পাজি মেয়ে—' বলে সশব্দে দুটো চড় বসিয়ে দেয় তার পিঠে

হয় তো শুধু মেয়েটার ওপরই ফেলে গিয়ে নয়, সুরঞ্জনাকে যে তার এই দুঃসাহসিক স্পর্ধার উপযুক্ত ভিরস্কার করা যাচ্ছে না, 'দূর হয়ে যা' এখুনি, বেরিয়ে যা এই মুহূর্তে—' এসব বলা যাচ্ছে না। সেটাই হয় তো মেজাজচ্যুতির প্রকৃত কারণ!

কিন্তু কারণটা কে জানে?

এই সদাসতর্কের চক্রান্তে যে যা করছে সেই কাজটাই দেখে লোকে, কারণটা দেখে না।

দেখতে পায় না বলেই নয় শুধু, দেখতে চায় না বলেই।

"কারণটা দেখতে পেলেই তো 'অজ' গুলো গুরু হয়ে যায়, অপরাধগুলো গুরুর ধারায়।

তবে?

কে চায় 'অজ' আখ্যা অর্জন করে নিজের অপরাধকে লঘু করে নিতে?

'তুমি এই করছো।' এটাই শেষ কথা!... কল্পনার ভাগ্যে সেই শেষ কথাটাই জোটে পড়েছিল ওদের, বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে!

মেয়ে কাঁদার বদলে একেই গলাটাকে তুকিয়ে ফুলেছিল মেয়েটা, তার উপর সহসা চিরস্নেহময়ী পিসির এই অবিশ্বাস্য বিশ্বাসঘাতকতার কথায় তখন শেষশক্তি প্রয়োগ করল সে, আর সঙ্গে সঙ্গেই 'কঁকিয়ে' উঠে বমে গেল।

মাইকের এই দুঃসহ ঝঙ্কারের আবির্ভাব ঘটল। সোমেনের আর ইন্দ্রাণীর।

কল্পনা বাহ্যজ্ঞান হারালো এবারে অনুভূতি হলেও বুঝতে এক মুহূর্তও দেরি হল না ওদের। এক ঝোঁকার সঙ্গে সঙ্গে মাইকের জোরে জোরে যে চড়টা একবার বিড়াল্লাভিতে চেটে মেলে নিল, সেটা মধুর রস নয়।

'ব্যাপারটা কি।'

সোমেন ছুটে এগিয়ে এলো।

কিন্তু ইন্দ্রাণী যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

জীবনে কি এত বড় লজ্জার অবস্থায় পড়েছে কল্পনা?

রাঁচীর সেই বাড়িটা থেকে মেঘিন 'বাবা নীচু করে বেরিয়ে এসেছিল, সেদিন মনে হয়েছিল কল্পনার এর মত লজ্জার অবস্থায় বুঝি ত্রিভুবনে কেউ কোনোদিন পড়ে নি।...

মনে হয়েছিল শুধু গাড়ির দরজা পার হয়ে গাড়িতে ওঠার সময়টুকু যদি ভগবান তার শরীরটাকে অদৃশ্য করে দিতেন!

সেদিন লজ্জাটা ছিল যেন শরীরটাকে ঘিরেই। একবার যদি সেই শরীরটাকে কৌতূহলী প্রতিবেশিনীদের চোখ থেকে অদৃশ্য করে নিয়ে গাড়িতে উঠতে পারে, কল্পনা বুঝি তার সমস্ত লোকটাকেও সামলে নিতে পারবে।

কিন্তু আজকের এই লজ্জা সেদিনের নয়।

এ হচ্ছে মনের লজ্জা! কল্পনার অসহিষ্ণু চিত্তের দৌরাত্ম্য উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে এই লজ্জা!

এত উগ্র অসহিষ্ণু মেজাজ কল্পনার যে, একটা কুসুম-সুকুমার কচিশিশুকে নিষ্ঠুর আঘাত হানতে দ্বিধা করে না?...পৃথিবী অন্ধকার দেখা চোখে প্রথম মনে হল কল্পনার, তখন হয় তো তাদের অনুপস্থিতিতে এ রকম ঘটনা হামেশাই ঘটে।

তারপর। মুহূর্তের জন্যে মেয়েটার অবস্থাও ভুলে গেল। কিন্তু ভুলতে সে কেন? সে তো সেই চড় মেরে সুস্থ হয়েই আছে।

তখনই জোরে জোরে একটা নাড়া দিয়ে কল্পনা চেঁচিয়ে উঠল 'ওঠ, ওঠ, ওঠ বলছি এখুনি।'

কাকে? কে জানে, হয় তো ঝীকে, হয় তো সাক্ষাতেই!

তারপর?

তারপর সমস্ত পৃথিবীটা কি দুলে উঠল?

কে জানে।

শুধু কল্পনা দেখে মেয়েটা একটা প্রবল আকর্ষণে তার কোল থেকে চলে গেছে তার বাপের কোলে।...কল্পনা শুনতে পেল একটা অচেনা গলা কাদা কাদা, 'আর অমন করলে কি হবে! ও তো মরেই গেছে।'

গলাটা অচেনা?

হ্যাঁ অচেনা বৈকি।

সেই আকাশ আলো খুকী খুকী গলা তো নয়। এ গলা তার কি করে চিনবে!

কি হয়ে অবিশ্যি যায় নি মেয়ে!

তবে আমবার আগেই কাজ টাজ সারল!

ফিরে তাকাবার আগে একটা ঘুর তুলল।

আর তখন সাক্ষাতেই সহকর্মীর লঘুক্রিয়াটা হয়ে গেছে।

তা হোক?

একদণ্ডও কি কল্পনা সেজন্যে লজ্জা আফসোস বোধ করবে, 'সরকার হয়ে গেছি' বলে ভদ্র মানুষেরও লাগ হয়।'

না কি আগে হাত তুলবে বলে, 'বাবা, বাবা, সাক্ষাতের সামনে তোমার মেয়েকে মারি না, একটা কিল মেরেছি, অমনি তোমার চোখে পড়ে গেল।'

মনুষ্য-মনুষ্যের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে ফেলে, ওই সহজাত বুদ্ধিটাই দেবে? পরিবেশকে আবার পূর্ববাসনে আনবে?...

কিন্তু কল্পনা কি মানুষ নয়?

একদা যে তার রক্তমাংসের মেয়েটাকে অদৃশ্য করতে চেয়েছিল বলেই কি রক্তমাংস তাকে প্রত্যাঘাত দিয়েছে?

না দেয় নি। রক্তমাংস হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজন, সে তার পাওনা আদায়ের সময় তাকিয়ে দেখে না কি দিচ্ছে গাইকের! ওজনটা দিচ্ছে।

বাজন রাখে না, বস্তুটাই কি দেখবে?

দেখে না

তাই মেয়েটা সেই স্বাভাবিক চেহারায় ফিরে এল, ফেটে পড়ল কল্পনা:

বলল, 'লজ্জা করে না? লজ্জা করে না

● লক্ষ্য করেন ? লক্ষ্য করে না তোমরাও ?

তোমাদের ? তোমাদের এই সব হাল-চালের তো আঠারো আনা চাঁ দিয়েছে একটা মানুষের মাথায় ! তার ওপর আবার একটা কাঁচি ফ্রেঞ্চের সঙ্গতি, ভাবতে তোমাদের চুঁ হয় না—যে মানুষটার কতটার সীমাটা কতদূর ! সবসময় মুখোমুখি দাঁড়ি কিছে দিয়ে যা আসিতে—'

মা কথাটা শেষ করতে পারে নি বন্দনা, তার আগেই ঘণ্টা বিদায়াভ্যর্থনা করেছিল। যেন কে জানে, হঠাৎ ঝাঁচল থেকে চাবির গোছাটা খুলে ওদের দিকে ফেলে দিয়ে দ্রুতপায়ে আবার এবঘরা থেকে লোকা তিনতলাতেই উঠে গিয়েছিল সে।····

তারপর কি করেছিল জানে না।

ঘরে এসে শুয়ে পড়ল বন্দনা যে উঠে গিয়ে ফেরে দরজাটাও তুলে দেল।····

ওদের টেলিফোনটা বন্ধ না, তবু বহরের একেবারেই যায় বন্দনা। চিরকাল তো পাশাপাশি সঙ্গে থেকে এসেছে। আলাদা হলেও এক সঙ্গে।

ওরা তো ওই ভাবতে জানে নি!

তার মানে ওরাও যায় নি হয়তো। ফেরেটাও ওদের মতোই শুয়েছিল তাহলে। অবশ্য ওর বিছানাপত্র সব বন্ধ-ঘরে।

লজ্জায় বন্দনা 'ছি ছি' করে ওঠে।

যে ভুলে গেল বলে। সোমেনের মৌরসে বন্ধুরাই যে সবসময় মুখোমুখি জমে ঘরের ঠিক বাইরে—

মুখটা ঘুরে আসতে চাইল বন্দনা।

'বিচ্ছিরি হয়েছে ওরা। বড় বেশি ঘরমুখো হয়ে গিয়েছিল। মায়েরা হয়তো ওরা বেশিই ঘরমুখো। কিন্তু খুব লাভ-লোকসান যায় না।···ঘরই ভেবে ভেবেছে, না তো বাইরে যায়।

অবশ্য নয়ও।

ওরাও ছোট থেকে যে ভাবে ঘরেই থাকে আসেও না হয়তো।

বন্দনা জানে, ওরও তো বন্দনার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল।···

ঘড়িতে সময় গুরুত্ব নিয়ের পায়ের চলিছে আর ওদের সাড়াই সাড়া হচ্ছে করে ভেবে নীচে নামল বন্দনা। একবারটা ভেবেও একটু তিরোস করতে ইচ্ছে হলেও এটুই দস্তা করল।···

নীচে নেমে এসে প্রথম বাবুঠাকুরকে প্রশ্ন করল, সকালে কে কাল খায় নি ?

'চা খেয়েছেন তো ?'

খেয়েছেন ?

খেয়েছেন তো ?

ঠাকুর-চাকরটা কি ঠাপছে ?

সে কি মুখ ফুটে বলা করতে চাইছে ?

আর তোলো কথা না বলে তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে ঘরে দিয়ে ঘনকে সাজাল।

আয়নায় মুখটা-চুখটা বিস্তর করে সাবধা ফুটল ফুটল ?

এ প্রশ্ন অভ্যাবত !

চিরদিন এ সংসারের ফুটনো বন্দনাই ফুটে এসেছে ! একবার বলে একেবারে চ'কেলার ফুটনো ফুটে যেত। হঠাৎ তার পোকে লাগল।

অনেক কিছু ফেলা হয় নি।

তবে কি বন্দনা না খেয়ে আছে বলে ইচ্ছাটির এই সুবিবেচনাপূর্ণ ফয়-সিদ্ধান্ত।

তাই সম্ভব। তবে উপোস কি বন্দনা করে না বন্দন ?

কিন্তু যত নষ্টের মূল ওই লাইলাটাকে নিজের জায়গায় দেখে আশ্বস্ত-বন্ধুত জলে গেল বন্দনার। তীব্রস্বরে বলে উঠল, 'তুই আবার সকালবেলা সর্বাঙ্গী হয়ে এলি যে ?'

সারদা কাজের অপমানের শোধ তুলল। সাজা বড়গাছে নৌকো বেঁধেছে।

সারদা মরুণ মুখে বলে, 'তা যখন যা হুকুম হবে তাই করতে হবে ! আমার ওপর বৌদিদির হুকুম হল, 'আজ থেকে তুই ফুটনো ফুটে দিবি !'

রাঙাবাহাদুর

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

নিশ্চয়ই তো ঠাকুরকে চান, স্নান, ভোগ, কলনা ওঁর ঘরে দিয়ে চাবি আঁচলে বেঁধে চলে গেল।'

চাবি আঁচলে বেঁধে। কোথায় ছিল চাবিটা?

ওঃ!

সত্যব্রতের মুখ বেদনায় নীল হয়ে এল।

আকাশের দিকে একবার তাকাল কলনা। বুঝতে পারল না।...

ভেতরে মূর্তি ঘরে আর একজন এল।

মন অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'যা সারলাই কুটনোটা কুটে রেখে এবার যেতে। ভেবে দেখলাম, সত্যি আপনার ওপর বড় অন্যায় করা হচ্ছে। মাসকাবার তো কম নয়।... বাইরের ব্যাপারগুলো আপনার তাঁরে একটু বুঝিয়ে দেবেন, তেল নাং এই তুচ্ছ কাজগুলো আমিই করে নিতে পারবো। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে একটু পুজোপাঠ করতে পারবেন!'... চলে যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল ইন্দ্রাণী, কিশোরীর চাপল্য মুখে রেখে বলল, 'ও হ্যাঁ খুকুর ছবিগুলো বাঁধানো হয়ে গেছে, আনার কেন—'

বালানের ঘেরাটোপেই বন্ধ ঘড়িটা। অজ্ঞাতসারে তার দিকে চোখটা পড়ল।

বাজে ছটা!

সাড়ে সাতটার সময় ঘর খুলে!

না, কলনার আর বলার উপায় নেই, 'হ্যাঁমা এ কি আক্কেল, সবার না হতেই বাইরে দিয়ে বেরোচ্ছো?'

না, উপায় নেই

মুক্তির অসহিষ্ণুতায় সে অধিকার হারিয়েছে কলনা। অনেক অধিকারই হারিয়েছে। সহিষ্ণুতাই শক্তি, সহিষ্ণুতাই অধিকারের আসন। কণিকের ভুলে তবে এতকাল হারিয়েছে, কি সব হারিয়েছে।

ঘড়িটার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কলনা একটু ধীর হেসেই বলে 'মুক্তি মিলিছে?'

ইন্দ্রাণী এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়ায় যায়।

বলে, 'মুক্তির কিছু না। অনেকদিন ধরে একটা অন্যায় চলে আসছে, ভগবান হয় তো যেরাটোপ হঠাৎ খসিয়েই দিলেন, সে অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করাই ভাল।'

ইন্দ্রাণী চলে গেল।

ইন্দ্রাণীর পিছন দিকটা দেখতে পেল কলনা।

আর সবকিছু ভুলে গিয়ে হঠাৎ মনে হল কলনার—ইন্দ্রাণীর শাড়ির পাড়টা কি চওড়া। এক চওড়া পাড় শাড়ি ছিল ইন্দ্রাণীর? পরেছিল কোনোদিন এর আগে?

●

যে ভাবেই কিনা আপনার স্নেহের দানকে অস্বীকার করবো, সে শক্তি আমার নেই। আপনার কাছে হাত পাতা আমার নতুন নয়। তার মধ্যে লজ্জারও কোনো কারণ দেখি না। লজ্জা পাচ্ছি অন্য কারণে। আপনি আমার ক্ষতি করিয়ে নিলেন, এমন কথাও আপনার মুখ থেকে আমাকে শুনতে হল!

—ক্ষতি করছি না?

—তোমার, কেমন করে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

রাজাবাহাদুর মৃদু হেসে চাপা সুরে বললেন, তার তাক্তার, তোমার ঐ ল্যাবরেটরীটাকে ঘিরে নিজের পর দিন তুমি কি কর, কি আছে ঐ ঘরের ওপাশে না। সে সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই, করণা করবার মত বিদ্যেও আমার পেটে নেই. তা আমি জানি আমি তো কোন ছার, অনেক মহা-মহা পণ্ডিতেরও নেই। কিন্তু তোমার ঐ সাধনার দানটা যে কত বড়, সেটুকু বোঝার মত বুদ্ধিও এ ঘটে নেই, একথা মনে করো কেন?

নিশানাথ ভীষণ অপ্রস্তুতে পড়ে গেল। দাঁতে জিভ কেটে বলল, ছিঃ ছিঃ, কি যে বলেন, তার ঠিক নেই। আমি বুঝি তাই বলেছি? আপনি বড়—

ডাক্তারের কথা শেষ হবার আগেই তার মুখ বন্ধ হয়ে ডুবিয়ে দিয়ে হেসে উঠল রাজাবাহাদুর—নিছক নিজের স্বার্থে সেই সন্ধেবেলা থেকে অন্তত কিছুদিনের জন্যে তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সে লোকসানের কি তুলনা আছে?

—এখানে আপনার ভুল হল, রাজা-বাহাদুর। লোকসান তো নাই, বরং বিজনেসের দিক থেকে আমি অনেকখানি লাভবান হলাম, এত বড় সুযোগ কজনের ভাগ্যে জোটে? কিন্তু এর মধ্যে আপনার নিজের স্বার্থটা কি এখনো জানতে পারি নি।

—আজ থাক, সে কথা আরেকদিন বলবো।

সে 'আরেকদিন' কদিনের মধ্যেই এসে গেল। নিজের প্রাসাদে নয়, নিশানাথের ল্যাবরেটরীর নিরুত্তাপে বসে নিতান্ত সহজ সুরে রাজাবাহাদুর তাঁর এই বিচিত্র অভিযানের গোপন উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করলেন। সেটি যে 'মাধ্যাকর্ষণ', সে আভাস তিনি আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। ডাক্তার তার জন্যে নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিল। মনে মনে তার একটা কাঁচিত ছবিও তৈরি করিয়ে রেখেছিল। তবুও পর মনে হল তার কল্পনাশক্তি কত দীন এবং তাকে যে তার প্রকাশের বাহন করা হয়, তার মধ্যে কোনো সত্তা নেই; আসলে সে অনেক পিছনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে। সমুদ্রোত্তীর্ণ কীটাণুগুলোকে যে বাজে এবং যে ভাবে নিরোগ করা হবে, 'মাধ্যাকর্ষণ' নামক নিরীহ বিশেষণ দিয়ে তার প্রভাবের এক অংশও ব্যক্ত করা যায় না। তাকে পুরোপুরি প্রকাশ করবার মত ভাষা বিশেষণ এখনো তৈরি হয় নি।

তারা দুজন ছাড়া সেখানে আর কেউ উপস্থিত ছিল না। দিন কতগুলো যায়। নিশানাথ সঙ্কোচে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল যেন যেকোনো মুহূর্তে তারা সঙ্কোচে প্রতিবাদ করে উঠবে। তারপর মনে হয়েছিল, ওরা নিষ্প্রাণ, জড়পদার্থ কিন্তু সে নিজে তো জড় নয়, পরিপূর্ণ চেতনাসম্পন্ন মানুষ। তবু প্রতিবাদ করতে পেরেছিল কি? পারে নি। তার ভিতর থেকে একজন একটা মাথা তুলে দাঁড়ালেও, আরেকজন প্রবল শক্তি দিয়ে তাকে গলা টিপে মেরেছিল। প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টি অনেক বেশি শক্তিমান।

একবার মনে হয়েছিল, সে ডাক্তার; মানুষের কল্যাণ তার ব্রত, তার একমাত্র লক্ষ্য মানুষকে ব্যাধিমুক্ত করা, জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা। তারই জন্য তার এই দুরূহ সাধনা, এই বিপুল আয়োজন। সে আদর্শ থেকে স্খলিত হলে আর রইল কি? পরক্ষণেই সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে জেগে উঠল লোভ,—অর্থ, খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। বড় হতে হবে। নৈতিক আদর্শকে আঁকড়ে ধরে একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে হাত-পা গুঁড়ে কোনো রকমে বেঁচে থাকবার জন্যে তার জন্ম হয় নি। প্রচলিত ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং পাপ-পুণ্যের সংস্কার দিয়ে তৈরি যে বন্ধন, তার পাশ কেটে তাকে বেরিয়ে যেতে হবে। তার নির্ধারিত ভবিষ্যৎ সেই দিকেই তাকে টেনে নিয়ে চলেছে।

তা যদি না হবে, তোমার কোন্ নিশানাথ সাহিড়ী, মেডিক্যালে অনেকের প্রবল চেষ্টাতেই যে দ্বিতীয় স্থানে এসে রয়েছিল, তুমি

● এই যেমন যাও

...পেয়েই যে মতে
...রে যেমন যেমন
...ওপরেতার

...কারণ। এই অবাস্তব অনুপস্থিতির পিছনে
...নিশ্চয়ই অবশ্যই বাঁচিত আছে;
...যেমন বিজ্ঞান, যা তাকে যেমন
...চালাই হবে। এই তার আবিষ্কারের
...ওপরে।

মানুষের অন্তরে 'অ্যাম্বিশন' নামক পদার্থটি ('উচ্চাকাঙ্ক্ষা' বলা যেতে, কিন্তু ইংরেজির ঘুরপাক শব্দটি বড় 'নিরপ') আগুনিখার মত ঊর্ধ্বগামিত। একবার জ্বলে উঠলে নিজের শক্তিতেই সেটে চলে এবং চলতে চলতে পথের দুধারে যা কিছু পায়,—

...ভাবনা, বিচারবিবেচনা, হিতাহিতজ্ঞানের বাঁধনকে—সব আগুনে দিয়ে যায়। নিশানাথের মনের মধ্যে যখন সেই প্রক্রিয়া চলছিল, রাজাবাহাদুর তার সঙ্গে কিছুকাল যেন যোগ রাখলেন। বললেন, এটা যে সাধারণ লোকের কাজ নয়, তা আমি জানি। তাদের কাছে এর নৈতিক দিক আইনের দিকটাই বড় হয়ে দেখা দেবে। তার বাইরে তাদের দৃষ্টি পৌঁছয় না। কিন্তু আমি তো তেমন ...

...কাছে আসি নি। আমি বিজ্ঞানী, যে সাধারণ লোকের অনেক ওপরে, তার চেয়ে বড় কথা, সে বৈজ্ঞানিক। আমার এই সমস্যাকে সে বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে দেখবে, সে বিশ্বাস আছে বলেই সবকিছু তাকে বলতে পেরেছি। তা না হলে এসব তো কাউকে বলবার নয়।

কোনো ব্যক্তি কিংবা ঘটনা লাহিড়ীর মনে তখনো থেকে থাকে, এরপরে আর তার সেরকম হইল না। উত্তুঙ্গ উচ্চাশার কাছে হার হল ভবদ্বিধির।

দুসপ্তাহের মধ্যেই পশ্চিমাঞ্চলের সেই বিশেষ শহরের উদ্দেশে রওনা হল নিশানাথ লাহিড়ী। ভারতবর্ষের মধ্যে তখনকার '—' ইন্সটিটিউটই তখন একমাত্র গবেষণাগার সেখানে যেসব বীজাণু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। দুনিয়ার বিখ্যাত, আধুনিক এবং কৃতী গবেষক সেখানে কাজ করছিলেন। অত্যন্ত জোরালো এবং বিশেষ বিশেষ সুপারিশ ছাড়া ডিরেক্টর কাউকে গ্রহণ করতেন না। সেই গোপন গণ্ডির মধ্যে তার প্রিয়তম ছাত্রের জন্যে একটি স্থান সংগ্রহ করা ডাক্তার মুস্তাফির মত ভারত-বিখ্যাত চিকিৎসাবিদের পক্ষেও সহজ হয় নি। বহু চেষ্টার ফলেই শেষ পর্যন্ত সেটা সম্ভব হয়েছিল। নিশানাথের প্রতিভার উপর তাঁর গভীর আস্থা ছিল এবং সেটা যে অপাত্রে ন্যস্ত হয় নি, তার প্রমাণ কিছুদিনের মধ্যেই পাওয়া গেল। ডিরেক্টরকে খুশি করতে লাহিড়ীর বিশেষ বেগ পেতে হয় নি।

।। দুই ।।

রাজাবাহাদুরের পিতার যখন মৃত্যু হয়, ছোটকুমার তখন শিশু। তার কয়েক বছর পরে রাণীমাও স্বামীর অনুসরণ করলেন। প্রাচীন রাজবংশের ঐতিহ্য অনুসারে রাজাবাহাদুর তার কিছুদিন আগে একটি সুন্দরী কিশোরীর পাণিগ্রহণ করেছেন। স্বয়ং নির্বাচন রাণীমাই করেছিলেন। তেমন কোন বড় ঘরের মেয়ে নয়। একমাত্র রূপের জোরেই এখানে তার প্রবেশাধিকার। রূপের সঙ্গে ঐশ্বর্যের কিসব ঘটলে তার মধ্যে যে উগ্র অসুখ বা তার চেহারা ফুটে ওঠে, এ মেয়েটির তা ছিল না। তার মধ্যে মুখশ্রী স্নিগ্ধোজ্জ্বল তারকান্তি এবং বিনম্র শেষ- স্নেহলোভনের মধ্যে একটি মধুর কমনীয়তা ছিল। সম্ভবত সেইটাই রাণীমাকে আকৃষ্ট করে থাকবে। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি আত্মীয়-পরিজন, আশ্রিত, অন্যান্য,

অবশ্যই বিশেষ সম্বন্ধন পান নি। নববধূ প্রথমেই পা দিয়েই সেটা জানতে পেরেছিল। স্বামীর কাছ থেকে, বাড়ির বা অন্যদের বিশেষ কোনো যত্নটা বা অনাদর সে পেলেও, নিজেও যে ঐ দুলদুক এবধাও তার বুঝতে বাকী ছিল না। তার ফলে তার মনে প্রথম থেকেই যেমন একটা অপরাধী-সুরও সঞ্চার পড়ে উঠেছিল। দীর্ঘদিন ঘর করবার পরেও সে মনোভাব সে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে একটা অলঙ্ঘ্য দূরত্ব বরাবর বজায় রেখে গেছে।

ছোটকুমারের প্রকৃতি ছিল তার জ্যেষ্ঠের ঠিক বিপরীত। ঐশ্বর্য-বিলাস কিংবা আভিজাত্য-গৌরব তাকে কোনোদিন আকর্ষণ করে নি। রাজপ্রাসাদের বিচিত্র-বহুল জীবনযাত্রার অনন্য প্রবাহ থেকে নিজের মনটাকে মুক্ত রাখবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা বিধাতা তাকে যেন জন্মসূত্রে থেকেই দিয়েছিলেন। শিশুকাল থেকে সেখানকার সব কিছুর উপর তার নীরব ঔদাসীন্য ভৃত্যমহলেও আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নববধূ এসে যখন দেখল, এত বড় প্রাসাদের কোনো মহলে তার জন্যে সাদর অভ্যর্থনার প্রতীক্ষা নিয়ে কেউ অপেক্ষা করে নেই, তখন সকলের চেয়ে আলাদা এই কিশোর দেওরটির প্রতিই একটি অলক্ষ্য আকর্ষণ অনুভব করে থাকবে। সে নিজেও তখন কিশোরী। কৈশোরের যাওয়া-থর্ম তাদের নিকটতর বয়বার সুযোগ দিয়েছে। ক্রমক্রমে বৌরাণী এবং ছোটকুমারের মধ্যে যে প্রগাঢ় সখ্যবন্ধন গড়ে উঠেছিল, এইখানেই তার সূত্রপাত।

রাণীমার মৃত্যুর পর সে বন্ধন দৃঢ়তর হয়। বৌরাণী তাঁর এই আদরোলো, উদাসীন দেওরটির মাতৃস্থানও অধিকার করেন। স্নেহ ও মাতৃত্বের সে এক বিচিত্র সংযোগ। কিন্তু তার মিলিত শক্তিও এই মুক্তিছাড়া মানুষটিকে বেঁধে রাখতে পারল না। স্নেহ, প্রীতি, ঐশ্বর্য, বংশমর্যাদা—সব বন্ধন অনায়াসে ছিন্ন করে ছোটকুমার যেদিন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এল, কিছুতেই তাকে নিরস্ত করা গেল না, বৌরাণী সেদিন একটি কথা বলেন নি, একফোঁটা চোখের জলও তাঁকে কেউ ফেলতে দেখে নি। আত্মীয়-পরিজনেরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রেখেছিল। ভৃত্য ও আশ্রিতমহলে কানাকানি পড়ে গিয়েছিল—দেওরের ওপর বড় যে টান, এইবার সব বোঝা গেছে। কেউ বলেছিল—সব কিছু যে লিখে পড়ে দিয়ে গেল ছেলেটা। আজ তো তার সুখের দিন, কাঁদতে যাবে কোন দুঃখে!

সেইদিন থেকে বৌরাণীর মুখে ছোটকুমারের কোনো উল্লেখ একবারও শোনা যায় নি যেন কিছুই হয় নি, এমনিভাবে সব কিছুর মধ্যে নিজেকে তিনি আরো নিবিড়ভাবে নিবিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আগে মাঝে মাঝে বাইরে যেতেন। তাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শুধু কাজ আর কাজ, বিশ্রামহীন নিরলস ব্যস্ততা যে দেখেছে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। শুধু রাজবাহাদুর বুঝেছিলেন, এ কর্মব্যস্ততা সবটাই বাহ্যিক, ভিতরে কোনো প্রাণের প্রেরণা নেই। একজনের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তার সবটাই বোধহয় নিঃশেষ হয়ে গেছে।

এর অনেকদিন পরে ভাই-এর কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, লোকে জানে, আমাকে সে তার সবস্ব দিয়ে গেছে। কিন্তু দিয়ে গেছে, সে খবর কেউ রাখে না। সে কথা শুধু আমিই জানি।

সেই যে একদিন পিতৃ-পিতামহের প্রাসাদতোরণ পিছনে ফেলে বেরুবার বেরিয়ে এসেছিল, তারপর আর একদিনের তরেও ছোটকুমার সেদিকে ফিরে তাকায় নি। তাকে এসেছে অনেকবার, প্রতিবারই দূত ফেরে সাদরের প্রত্যাখ্যান করেছে। রাজাবাহাদুর এসেছেন। এ পালঙ্কে তাঁর পাড়ি জোকে না। বড় রাস্তার মোড় থেকে গলিপথটুকু হেঁটে পার হয়ে, অতিকষ্টে দুই সিঁড়ি বেয়ে, ছোটো ঘরটায় উঠেছেন এসে লোভলায়, অপ্রশস্ত বসবার ঘরে। অনুযোগ দিয়েছেন, অভিমান প্রকাশ করেছেন, কখনো স্নেহ আবেদন জানিয়ে দুদিনের জন্যে একবারটি ঘুরে আসবার অনুরোধ করেছেন। একটি দুঃখপূর্ণ বিনীত হাসি ছাড়া আর কোনো উত্তর পান নি। কখনো বৌরাণীর নাম করে বলেছেন, তোকে একবার দেখতে চেয়েছে। বলেছে, যেমন করে পার, ধরে নিয়ে এসো।

এবার জবাব দিয়েছে ছোটকুমার—তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলবেন, সময় হবে না।

—কি কাজকর্মে ব্যস্ত আছ যে সময় হবে না?—হেসে উঠেছেন রাজবাহাদুর। এ প্রশ্নের আর উত্তর আসে নি।

প্রথমদিকে তাঁর আসাটা ছিল ঘন ঘন। ভাইকে বাড়ি নিয়ে যাবেন আর না যাবেন, একবার করে দেখে যেতেন। ক্রমশ তার ব্যবধান বেড়ে গেছে। ইদানীং কয়েক বছর তাঁর দেখা পাওয়া যায় নি। হ্যাম্পোর্ট বা অন্য কোনো অজানা পাখির খোঁজ-খবর নিয়েছেন। তাদের সেটাও ক্রমশ বিরল হয়ে এসেছে।

অনেকদিন পরে সকালের দিকে ছোটকুমারের বাড়ির সামনে মোটর আসবার শব্দ শোনা গেল। তার কাছে যারা আসে, (বড় একটা কেউ আসে না) কারো গাড়ি নেই। পরাণবেদে চৌকুমার হল। বারান্দা থেকে মুখ বাড়িয়ে একলক্ষে তাকিয়েই ছুটে গেল বাবুদের কাছে। ছোটকুমার তখন পড়বার ঘরে। পরাণে ব্যস্ততায় চুকতে দেখে তার মুখের দিকে সে জিজ্ঞাসু করে তাকাল, রাজবাহাদুর! কথাই নীচে নেমে গেল সবটা বুঝতে।

এত ছোট গাড়িতে রাজবাহাদুরকে কখনো চড়তে দেখা যায় নি। বেশ ঘাই হচ্ছিল মানতে। ড্রাইভারের সঙ্গে গঙ্গাচরণকেও এগিয়ে দিতে সাহায্য করতে হল। আগের চেয়ে অনেকটা কাঁপলও হয়ে পড়েছেন। কুমার আছে কিনা জেনে নিয়ে পরাণের কাঁধে হাত দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন।

বারান্দায় পা... ছোটকুমার অভ্যাসের বাহ ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে চলল। যেতে যেতে অনুযোগের সুরে বলল, একটা খবরও তো দেন নি?

—কাকে খবর দেব? তোমাকে? সুস্থদেহে বললেন রাজাবাহাদুর, কি লাভ হত?

ছোটকুমার যেন কথা খুঁজে করে চলেছিল, তেমনিভাবেই চুপ করে রইল।

রাজাবাহাদুর বসে সুস্থ করে নিলেন। ঘরে ঢুকে সামনে যে চৌকিটা পেলেন, তার উপর বসে পড়ে প্রসন্নমুখে বললেন, খুব রোগা হয়ে গেছ, না? ওটা কিছু না।

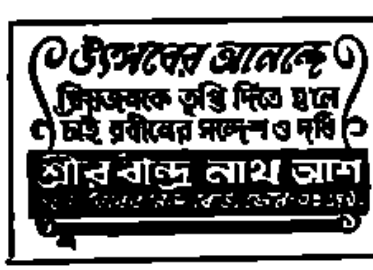

সিমলার কড়াপাক
সিমলা সুইটস্
৫৯, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

শরীর অসুস্থ ভাবেই আছে। ঘণ্টাখানেক চুপচাপ শুয়ে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু—কারও কোনও কথা শোনার মুখের উপর দৃঢ়ভাবে দৃষ্টি স্থির করে নিজে যেন বুঝতে পারলেন, বোঝে তো কেমন ভালো বোঝছি। হাত ফেলে দুটোর পড়ানো হচ্ছে? কেমনের যে কেউ নেই। আ—হা, আমিও পড়ানো নিয়ে এসেছি।

পকেট থেকে একখানা বই বের করে হাত বাড়িয়ে বললেন, এই নাও।

—কি ওটা?

—পড়েই দ্যাখ।

ছোটকুমার বাইটা খুলে চিঠিখানার একবার চোখ বুলিয়েই শুষ্ক মুখে বলল, কি হয়েছে বৌরাণীর?

—কি করে জানব? মুখফুটে কিছু বলে তো? দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলে সেই এক কথা—কিছু হয় নি আমার। কত করে বললাম, একবার কোলকাতায় চল। মুক্তকির মত অবশ্য ডাক্তার বলছে হাতের নয়ো। হবলার হলে আরো বড় কাউকে দেখানো যেতে পারে। কিছুতেই রাজী হল না। তাপ যখন কোলকাতায় ফিরছিলাম, ঐ চিঠিখানা দিয়ে বলল, ঠাকুরপোকে দিও; আর একবারে সঙ্গে করে নিয়ে এস।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে বললেন ট্রেনের সময় হয়ে এল যা, জামা-কাপড়টা বদলে আয়। গঙ্গা……

গঙ্গাচরণ পাশের কোন ঘর থেকে সাড়া দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে জোড়হাত করে দাঁড়াল। রাজাবাহাদুর হুকুম দিলেন, একটা সুটকেসে 'ছোটো'র জিনিস-পত্রগুলো গুছিয়ে নে। বেশি কাপড় নে।

ছোটভাইকে নাম ধরে বড় একটা ডাকতেন না। অন্যের কাছে উল্লেখ করবার বেলায় বলতেন, ছোটকুমার; ডাকবার সময় তাকেই একটা সম্মান ও সম্ভ্রমের রূপ দিয়েছিলেন—'ছোটো'।

ছোটকুমার চিঠিখানা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর মুখ তুলে বলল, আজ তো আমার যাওয়া হবে না।

—কেন?

—একটা বিশেষ কাজ আছে।

—কি কাজ?

—যাঁর কাছে ফেল শিখি, তাঁর আজ আসবার দিন। সন্ধ্যেবেলায় আসবেন।

—কি শিখিস?

—ফেল; ফলাদীপায়া।

—তা দিয়ে কি হবে?

কুমার চুপ করে রইল। রাজাবাহাদুর বললেন, ঘরের উল্টো দেয়ালে কোন্ দেশের ম্যাপ টাঙান?

—ইংরেজ।

—বেশ তো একটা চিঠি লিখে রাখ—বিশেষ জরুরী কাজে বাড়ি যাচ্ছি। উনি এলে গঙ্গা সেটা দিয়ে দেবে।

—তা হয় না। আমি বলে কাল যাবো। আপনাকে আর অপেক্ষা করতে হবে না।

—যাবে তো?

কুমার একটু হাসল। রাজাবাহাদুর উঠে পড়ে বললেন, দেখো। তা না হলে আমাকে আবার ছুটতে হবে। নটা পঁচিশে ট্রেন। আমিও যাচ্ছি। টিকেট করে রাখবো। তাহলেও অন্তত মিনিট পনর সময় হাতে রেখে যেও। ঠিক আটটায় এখানে গাড়ি আসবে।

—গাড়ি লাগবে না।

—কেন? অসুবিধা বোধ আসতে পারবে। আমি তো তাতে করেই এলাম।

ছোটকুমার মাথা নেড়ে বলল, দরকার নেই। এখান থেকেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেবো।

নামের অজ্ঞাতসারেই রাজাবাহাদুরের কপালে কুঞ্চন দেখা দিল। রাজপরিবারের কেউ কোনোদিন ট্যাক্সিতে ওঠে না। তবু এ নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করলেন না। বুঝলেন, এ 'না' কে 'হাঁ' করানো যাবে না।

রাজাবাহাদুরকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ছোটকুমার ধীরে ধীরে সিঁড়ি কটা পেরিয়ে তার লাইব্রেরীর কামরায় ফিরে গেল। কিছুক্ষণ আগে যে বইখানা পড়ছিল এবং খোলা রেখেই চলে গিয়েছিল পাশের ঘরে, সেটা তেমনি পড়ে রইল। পড়বার টেবিলে আর কিছুর যাওয়া হল না। কোণের দিকে একটা ইজিচেয়ার ছিল। তারই কোলে নিজেকে এলিয়ে দিল। মিনিট কয়েক পরে জামার পকেট থেকে বের করল এক একখানা ধার ছেঁড়া খাম, যার ভিতরকার বস্তুটির সঙ্গে এইমাত্র তার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে গেছে। তবু সেই ছোট কাগজখানাই তুলে খুলে আরেকবার তুলে ধরল চোখের উপর।

গোটা গোটা অক্ষরে লেখা কয়েকটি মাত্র লাইন—

কল্যাণীয়েষু

ঠাকুরপো,

বিশেষ থাকব আমার শরীরটা বিশেষ ভাল যাইতেছে না। তোমাকে একবারটি দেখিতে ইচ্ছা করে। যত শীঘ্র হয়, অন্তত একবার আসিও। ইতি—

আশীর্বাদিকা

তোমাদের বৌরাণী।

আনমনে ধীরে ধীরে চিঠিখানা আবার ভাঁজ করে মুঠোর মধ্যে রেখে বেশ অনেকক্ষণ পড়ে রইল ছোটকুমার। বৌরাণীর চিঠি! বৌরাণী তাকে ডাকছে! বহু বছর পরে! কিন্তু এ কথা কটির মধ্যে তাকে যেন কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। 'ঠাকুরপো' সম্বোধনটি কানে বড় নতুন ঠেকছে। এ বাড়িতে আসবার পর প্রথম প্রথম কয়েকদিন মাত্র ঐ নামে তাকে ডাকতে শুনেছিল। তারপর আর শোনে নি। হঠাৎ একদিন দাদার বড় 'ছোটো' বলতে মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল, আজ আর মনে করতে পারে না। কেমন একটা আশ্চর্য তার ছিল তার নিজি কণ্ঠের এই ছোট কথাটুকুর মধ্যে। আজও ঘুঁকান ভরে আছে। চিঠি যদি এল, তার উপরে ঐ সম্বোধনটুকু ছুঁড়ে দিলে কি ক্ষতি হত? একবার মনে হল ঐ দুটি অক্ষরের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক একদিন জড়িয়ে ছিল, আজ তার অবসান ঘটেছে বলেই, তারও প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে। হয়তো সেই কথাটিই বলতে চেয়েছে বৌরাণী।

তাই যদি হয়, তবে আর ফিরে কি লাভ? যেখানে যা কিছু বন্ধন, সবই তো একদিন নিজেহাতে ছিন্ন করে চলে এসেছিল। ঐ একটি জায়গায় শুধু পারে নি। একটা অসাধ্য সূত্র হয়ে রেছে। কাঁস হলেও তার ধার বড় তীক্ষ্ণ। অগোচরে থেকেও নিজের বেদনার অস্তিত্ব কোনোদিন ভুলতে দেয় নি। আজ যদি তার একটা দিক কালক্রমে কিংবা অন্য কোনো কারণে বিলীন হয়ে গিয়ে থাকে, আর একদিক থেকে সেই ছিন্নসূত্র জোড়া দিতে যাওয়া নিরর্থক।

সহসা আবার হাতের চিঠিখানার দিকে নজর পড়তেই ছোটকুমারের সমস্ত চিন্তাস্রোত ঐ একটি ধারায় গিয়ে মিলিত হল। সমস্ত ক্ষোভ অভিমান ছাপিয়ে উঠল একটিমাত্র দুর্ভাবনা—কি অসুখ বৌরাণীর? কি জানি কেমন আছে?

অকস্মাৎ যে কেন তাকে সজোরে ঠেলে তুলে দিল। কাল নটা পঁচিশে গাড়ি। তার আগে অনেকগুলো কাজ সেরে নিতে হবে।

যে-তাঁবায়, যেন করেই আসুক, রৌশনীর রোগশয্যার ডাক তার কাছে অলঙ্ঘ্য—এই সময় সত্যেটাই সবকিছু ছাপিয়ে ছোটকুমারের অন্তরের নতো প্রতিভাসিত হল।

ন'টা পঁচিশের গাড়িটা ধুবলাহার যায়নী। বরাবরই বেশ ভিড় থাকে। তাছাড়া, তার মিনিট দশেক আগে ঠিক পাশেই একখানা ডাউন লোক্যাল এসে দাঁড়ায় এবং তার গহ্বর থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসে এক-পাল উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান ভেলিপ্যাসেঞ্জার। এই ছুটো বিপরীতমুখী স্রোতের সংঘাতে মাঝখানের প্ল্যাটফর্মে যে ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়, তার ভিতর থেকে নিজের সেটাকে উদ্ধার করে গাড়ির কামরায় পৌঁছে দেওয়া শক্তির প্রয়োজন।

ছোটকুমার যখন সেই সুকঠিন শক্তি-পরীক্ষায় নামবোনামব করছে, হঠাৎ মনে হল, কে যেন তার পিছন থেকে মাথের ঠিক নীচে একটা সূচ ফুটিয়ে দিলে। 'উঃ' বলে তৎক্ষণাৎ ফিরে তাকাল, কিন্তু সেই জনারণ্যের ভিতরে এমন কোনো লোক চোখে পড়ল না, যাকে এই বিশেষ কার্যের সঙ্গে জড়িত করা যেতে পারে। ব্যাপারটাকে মনে মনে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল। কার এমন কি গরজ পড়তে পারে তার গায়ে সূচ ফোটাবার? পিন্-জাতীয় কিছু একটা কাপড়ে হাতে লেগে থাকবে হয়তো। ভিতরে যাত্রার হঠাৎ বেগ বেড়ে গেছে।

আহত স্থানটায় তখন রীতিমত জ্বালা করছে। গাড়িতে উঠে দেখতে হবে, কি ব্যাপার, এই কথা ভেবে সেই দিকেই পা বাড়াতে যাবে, এমন সময় চোখে পড়ল, গঙ্গাচরণ ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে। চোখে মুখে ব্যস্ততার চিহ্ন, তাকে দেখে কুমারের মুখেও চিন্তার ছায়া পড়ল। গঙ্গার তো তার সঙ্গে যাবার কথা নয়। কাছে আসতেই জানতে চাইল, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

গঙ্গাচরণ একখানা খাম এগিয়ে ধরে চাপাগলায় বলল, বিনু এসে দিয়ে গেল। বৌরাণীর চিঠি। বলল, খুব জরুরী খবর আছে এর মধ্যে। আর বলেছে, এ চিঠির কথা রাজাবাহাদুর যেন জানতে না পারে।

ভিতের মুখ থেকে একটুখানি সরে গিয়ে তাড়াতাড়ি খামের মাথাটা ছিঁড়ে ফেলল ছোটকুমার। আগের মত এ চিঠিখানাও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সুর একেবারে আলাদা।

ভাই ছোট্ট,

এর আগে যে-চিঠিটা পেয়েছ, তার অক্ষরগুলো আমার, কিন্তু কথা আমার নয়। তবু লিখতে হয়েছিল। স্নেহ, তা উপেক্ষা করো না। সে চিঠিতে তোমাকে আসতে বলেছিলাম। এবার বলছি, এসো না। বলতে আমার খুব লেগেছে, কতবার তোমাকে দেখি নি, বল তো? তবু বলছি, আমার মাথা খাও, তুমি এসো না।

ইতি বু—।

বৌরাণীর নাম বুলবুল। তারই অনুরোধ সে।

সমস্ত চিঠিখানার মধ্যে যে শঙ্কা ও ভয়ের ঘোর ঘনিয়ে আছে, ঐ ছোট্ট অক্ষরটিও যেন তার থেকে মুক্ত নয়। ছোটকুমার নিষ্পলকনেত্রে দৃষ্টিটা সেই দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চিঠিটা মুড়তে মুড়তে খাটে বসতে যাবে, ধড়মড়িয়ে উঠল, এ কি! তোশকের তলায় পিঠ রক্ত ফিরেছে! লোকটা কি তাহলে কিছু একটা ফুটিয়ে দিয়ে গেল?

—কোন্ লোকটা! চমকে উঠল ছোটকুমার।

চাদরটা, কালো মতন একটা লোক। যা ভিড়, গায়ে হাত দিয়ে ফেলি, তাই ঐদিক থেকে আমি চার তোলার দিকে নজর রেখেছি। মনে হল, সেই লোকটা যেন তার হাতটা ডুবুক তোলার হাতের ওপর দিয়ে পড়ল। তারপর আর কিছুতে সন্দেহ নেই।

কুমার কি একটা বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। ঠিক পিছনেই রাজাবাহাদুরের কণ্ঠস্বর—কি হল। এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস? এখনি যে গাড়ি ছেড়ে দেবে।

—আপনি উঠে পড়ুন। আমি যাই।

—কোথায় যাবি?

—বাসায়।

—কেন?

গঙ্গাচরণ বলে উঠল, এইমাত্র কে একটা লোক ওর পিঠে কি যেন ফুটিয়ে দিয়ে গেল। রক্ত বেরুচ্ছে।

রাজাবাহাদুর চিন্তিত মুখে উকিলের মুখে বললেন, সে কি! কই দেখি?

জামার পিছনটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে বললেন, তুই দেখেছিস লোকটাকে?

—আজ্ঞে ঠিক চাঁদর দেখি নি। দূর থেকে মনে হল যেন—

—দূর হোল! গাঁজার বোধের একটু বেশি হয়ে গেছে।

কুমারের দিকে ফিরে বললেন, ও কিছু না। পোকায় কামড়েছে মনে হচ্ছে। গাড়িতে চল জামাটা খুলেই দেখা যাবে, কি হয়েছে। আমার ব্যাগে আইডিন আছে। লাগিয়ে দিলেই সেরে যাবে। ঐ, লাফ দেবে গাড়ি ছেড়ে দিল। আর মেটে পাঁচ মিনিট আছে গাড়ি ছাড়তে।

—আজ আর ইচ্ছে করছে না। আরেক দিন যাব।

—তোরও কি পরার ঐ ধাঁজাখুরি গল্প শুনে মন খারাপ হয়ে গেল?

—না, তা নয়। শরীরটা বিশেষ ভালো লাগছে না।

সত্যি নাকি? সঙ্গে সঙ্গে সুর বদলে গেল রাজাবাহাদুরের। তাহলে আর দেরি করে কাজ নেই। সোজা জমাদীপুরের বাড়িতে চল। ওখানে গে এর ব্যবস্থা-তবস্থা।

—এখন থাক; পরে, যদি দরকার হয় যাবো।

বলেই ছোটকুমার নিজের মাথার ছাতে পা বাড়াল। রাজাবাহাদুর পিছন থেকে বললেন, আমিও তাহলে সেরে নেমে আসি। যেন কার্জিক, বাস স্ট্যান্ডেই যেন একটা ওষুধের দোকান আছে। সেখানে হাতে ব্যাণ্ডেজ ও তুলোটুলো একবার দেখিয়ে নেওয়া যাবে।

[illegible] মুহূর্তের জন্য পাওয়া গেল, ঘটনার গতি হঠাৎ থেমে গেছে। এ অবিশ্বাস্য পরিণতি শুধু বিস্ময়কর নয়, নিষ্ঠুরতম ছলনা। সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রের অনুভবশক্তি সহসা হারাল। এইখানে একখানা ট্যাক্সির টিকিট কিনে, ছিন্ন ভিন্নভিন্ন খুঁজে নিয়ে আর একটা 'চিঠি'-এর জন্য অপেক্ষা করতে হত না। সোজা সদরে গাড়ি হেঁকে একদণ্ডে এগিয়ে গিয়ে এ সমস্যার চূড়ান্তে ফেলে অন্ত করে ফিরতে পারতেন। সকলের নানা কর্মে রত যেসব ছাত্র পাঠ্য গল্প-উপন্যাসকে নিছকবাঁধনে টানিক হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন, তাঁদেরও এই পর্যন্ত এসে পাতা মুড়ে

কোষ-সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ

কোষকৃমি, একজিমা, চৌদ্দা প্রভৃতি চিকিৎসার জন্য চিকণপুর এবং হাবিবপুর কেন্দ্র হাসপাতালের পরিচালনে ঐ ভেষজাগারের সাইনবোর্ড দেখিয়া বোতলায় আসুন।

"দি ন্যাশনাল ফার্মেসী"

১৪৩১, চৌরঙ্গি চিকণপুর রোড, কলিকাতা-৭৭
ফোন—৩৪-৬৫৮৮

● প্রোচরণ বলে উঠল, এইমাত্র কে একটা লোক ওর পিঠে কি যেন ছুঁড়ে দিয়ে গেল।

যেতে পথ ফিরে দেখার দরকার হত না। অন্যমনস্ক বজ্রার কেবিনে ঢুকতে ঢুকতেই মনস্থির করে ফেলেন।

কিন্তু পরক্ষণে যে বিশ্ববিখ্যাত-কবিতা বৃদ্ধিদীপ্ত মানুষের বহু-যত্নরচিত পরিবর্তনা একটিমাত্র অনুচ্চারিত শব্দে ওলট-পালট করে দেন, তাঁর অভিপ্রায় ছিল অন্যরূপ। তাই ডাক্তার মুখুজ্যেকে পাওয়া গেল না।

রাজাবাহাদুর মনে মনে তাঁর প্রত্যাশিত ঘটনাগুলোকে পর পর সাজিয়ে রেখেছিলেন, এবং কার কোথায় কখন কি প্রয়োজন হবে, সব সেই অনুসারে স্থির করা ছিল। স্টীকে চাপ দিয়ে চিঠি লেখানো, লেখানো হাতে করে ছোট গাড়ি নিয়ে একটা বিশেষ স্বরে তাই-এর বলায় গিয়ে ওঠা, নানা অভিনয়ের জাল ফেলে তখনই তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা, সে চেষ্টা ব্যর্থ হলে অন্য দিন-নির্বাচন, তার সঙ্গে একটি বিশেষ ট্রেনের সাহায্য গ্রহণ—সবই তাঁর পূর্বপরিকল্পিত। তার মধ্যে ঐ নটী পঁচুকের গাড়ির তুলিকাও বিচ্ছিন্নভাবে অপ্রধান ছিল না। ঐ রকম ভিড়ের আড়াল না পেলে যত পাকা হাতই হোক এবং যত কম সময়ই লাগুক সকলের অলক্ষ্যে ইনজেকশন পর্বটার নির্বিঘ্ন ও সফল সমাধান সম্ভব হত না।

এ পর্যন্ত সবই পূর্ব-প্রস্তুত নির্ঘণ্ট অনুসারে উতরেও চলেছিল। তোল বাহাল এর পরের ধকায়। গাড়িতে উঠবার পূর্বমুহূর্তে ছোটবৌমার বেঁকে বসা—সে যাবে না। ছ'ওড়া কৈশনের ভিড়ের ভিতর কিসের না কিসের সামান্য একটা খোঁচা—সেই তুচ্ছ জিনিসটা যে ওর কাছে এত বড় হয়ে উঠবে, রোহাণীর শেষ-শয্যায় আহ্বান পর্যন্ত তার কাছে ছায় মানবে, এই আকস্মিক ঘটনা রাজাবাহাদুরের হিসাবের মধ্যে ছিল না। এর জন্যে দায়ী ঐ 'ফক্স-আপদটা'। কে জেনেছিল যে ঠিক ঐ মুহূর্তে ঐখানটিতে তার আবির্ভাব ঘটবে এবং তারই কথায় কুমার রাজা ও রোহাণীর সব উপরোধ উপেক্ষা করে ফিরে যাবে। তাও যদি তাকে ভবানীপুরের প্রাসাদে ফিরে যাওয়া সম্ভব হত, ব্যাধিচক্রের সামান্য পরিবর্তন ঘটলেও শেষ পর্যন্ত কার্যোদ্ধার আটকে থাকত না। কিন্তু সেখানেও রাজাবাহাদুর ব্যর্থ হলেন। সেই ব্যর্থতার জ্বালা ক্ষণিকের তরে হয়তো তাঁর চোখের তারায় ফুটে উঠে থাকবে। গাড়ির শব্দ পড়তেই সে চমকে উঠল। কিন্তু সে কোথা তখনো জানে না, সে নিজেই এই রাজ-রোষের লক্ষ্যস্থল এবং অদূর ভবিষ্যতে নিজের জীবন দিয়ে তাকে তার অসতর্ক হঠকারিতার মূল্য দিতে হবে।

হতভাগা প্রোচরণ। সে যে নিমিত্তমাত্র, যে বস্তুটি তার নলিনকে শেষ মুহূর্তে কৈশন থেকে ফিরিয়ে এনেছিল, তার নির্ঘোষ যাদব, এই সত্যটি যদি রাজবাহাদুর জানতে পারতেন, হয়তো তাকে অকালে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হত না। জানতে তিনি পেরেছিলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরি

(বেরোন ১৫৩ পৃষ্ঠায়)

বস্ত্রশিল্পে
অগ্রগতি

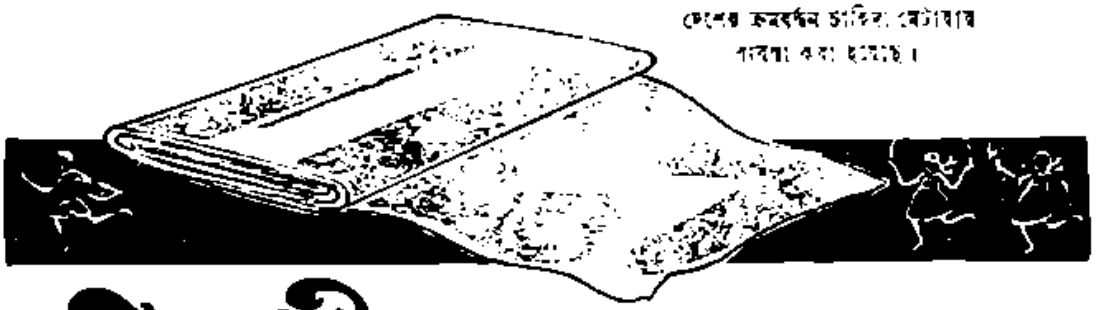

লক্ষ্মী কটন মিলসের পরিচয়
আজ ৫০ বছরেরও উপর বস্ত্রশিল্পে দৃঢ়ি পাড়ী
আর মানোন্নয়ন বস্ত্রশিল্পে নতুন নতুন
শুধু চাহিদা মেটাইতে সেইসঙ্গে আমরা
দিয়েছি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি আর
প্রয়োজনও বদলেছে আর সেইসঙ্গে বস্ত্রশিল্প কটন
মিলে ও নিজেকে সজ্জায়িত করেছে। সম্প্রতি
নানারকম নতুন বহুমাত্রি আমদানী করে
দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার
ব্যবস্থা করা হয়েছে।

লক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেড্

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—শাখা সমূহ

বোম্বে মাদ্রাজ - দিল্লী নাগপুর
বেজওয়াডা শ্রীনগর গৌহাটী

নতুন জীবনের
নতুন প্রয়োজন !

নতুন জীবনের দাবী মেটাতে নবজাতকের জননীকে পুষ্টিকর টনিকের ওপর নির্ভর করতে হয়। সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ ভাইনো-মল্ট ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনে। সন্তান প্রসবের পূর্বে ও পরে সমভাবে উপযোগী।

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

ভাইনো-মল্ট

শ্রাবণের কান্নার শেষে
আশ্বিনের আশ্বাস এল,
খৈ-খৈ বর্ষার সমুদ্র
পেরিয়েই তো
শরতের আলো-কলমল দ্বীপ।
দুঃখ থেকে সুখে,
নিরাশা থেকে আশায়
এবং ব্যর্থতা থেকে সফলতায়
উত্তরণের স্বপ্ন
সকলের জীবনে
সার্থক হোক।

পূর্ব রেলওয়ে

For imported and indigenous steel materials
For export of steel and scrap etc.
For pipe and pipe fittings.

CONTACT

AMIN CHAND PAYARE LAL

IMPORTERS & EXPORTERS OF STEEL AND INDUSTRIALISTS

Central Office

135 Canning Street
Cable : APEEJAY.

Head Office

Tanda Road,

24, Barada Street,
Bombay.

Jivan vihar Building,
Parliament Street,
New Delhi.

27, Shambudos Street,
Madras.

Sector 18-B,
Chandigarh.

পি, দে এণ্ড কোং

★ কাগজ ব্যবসায়ী

★ প্রতিষ্ঠিত আমদানীকারক

★ এক্সারসাইজ বুক নির্ম্মাতা।

★ কেমারেল মর্ডার সাপ্লায়ার এবং কমিশন এজেন্টস

৪২এ বিডন রো, কলিকাতা-৬

ইয়ংবেঙ্গল ॥ সাময়িক পটভূমি

বিনয় ঘোষ

'The ancients are the ancients, we are the people of today'.
—Moliere.

মানবসমাজের ইতিহাসে প্রবীণ-নবীনের দ্বন্দ্ব চিরন্তন ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব, জাতিবর্ণগত দ্বন্দ্ব, সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব, এসব দ্বন্দ্বের যে একদিন অবসান হবে অন্তত তা কল্পনা করতে বাধা নেই। মানুষের অন্তর্নিহিত আদ্যন্ত দ্বন্দ্ব হতে এই সব দ্বন্দ্বের মূল পর্যন্ত সন্ধানেই উপড়ে ফেলা যাবে। কিন্তু যতদিন মানুষ থাকবে, সমাজ থাকবে, এবং মানুষ ও সমাজ উভয়েরই অগ্রগতির ইতিহাসের বিজ্ঞান অনুযায়ী প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না, ততদিন পুরুষানুক্রমে নবীন-প্রবীণের বিরোধও বর্তমান থাকবে। মানুষ ও প্রকৃতির সংগ্রাম এবং নবীন ও প্রবীণের সংঘর্ষ—এই দুটি ক্ষেত্র থেকে সমাজের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়ে চলেছি।

উনিশ শতকে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য আদর্শ-সংঘাতের ফলে সমাজে যে মতবিরোধের চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল, স্বভাবতই তার প্রতিভূ হয়ে উঠেছিলেন নবীন তরুণের দল। এই তরুণদলকে তখন অনেকে বলতেন 'ইয়ং বেঙ্গল', কেউ কেউ বলতেন 'ইয়ং ক্যালকাটা'। রামমোহনের মৃত্যুর ঠিক পরে, উনিশ শতকের দ্বিতীয় পূর্বে এই তরুণদলের বিকাশ হয়। এঁরা সকলে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং সেখানে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে নতুনের পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন। শিক্ষকদের মধ্যে যিনি ছাত্রদের এই নবচেতনার দীক্ষা দিয়েছিলেন তিনি বাঙালী নন, একজন স্কটিশম্যান, যদিও প্রায় ছাত্রদেরই মতো তরুণ, আর বয়সের দিক দিয়ে তিনজনের মাত্র কয়েক বছরের বড়। হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদেরও কয়েকজন বাঙালী শিক্ষকও ছিলেন বলে তাঁদের 'ইয়ংবেঙ্গলিয়ান'ও বলা হত। ইয়ং বেঙ্গল বলতে বাংলার যে তরুণদল আমাদের আলোচনার বিষয়, তাঁরা 'ইয়ংবেঙ্গলিয়ান'।

এই তরুণদের মধ্যে প্রায় সকলেই অসাধারণ প্রতিভাবান ছিলেন, যদিও একদিকে যা একথাকে সকলের প্রতিভার সমান বিকাশ হয় নি। কিন্তু প্রতিভাও মানুষের আসল পরিচয় নয়, পোশাকী পরিচয় মাত্র। মানুষের আসল পরিচয় 'চরিত্রে'। চরিত্রগুণে তরুণ ইয়েংবেঙ্গলরা তখনকার বাঙালীসমাজে নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয় ছিলেন। সততা নির্ভীকতা মূল্যবোধ দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণের এমন আশ্চর্য সমন্বয় হয়েছিল তাঁদের চরিত্রে যা সাধারণ চরিত্রে সর্বদাই দুর্লভ। সাময়িক খ্যাতি প্রতিষ্ঠা ও কীর্তির মিথ্যে থেকে সকলের পক্ষে সমত্নে অবিচলিত হওয়া সম্ভব হয় নি, হতেও পারে না। কর্মক্ষেত্রের বিচিত্রতার জন্য প্রত্যেকের প্রতিভা ও চরিত্রগুণের প্রয়োগে পার্থক্য ঘটেছে এবং সেই পার্থক্যের জন্য তাঁদের লোকপ্রতিষ্ঠারও তারতম্য ঘটেছে। বেতালবেতে রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা রামগোপাল ঘোষ যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, হরচন্দ্র ঘোষ বা প্রসন্নকুমার ঠাকুরী বা অন্যেরা তা লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকচক্ষে এই তরুণদলের সকলের চারিত্রিক প্রতিষ্ঠা আজও সমানভাবে দীপ্তিমান। রামতনু রামমোহন, রামগোপাল এবং রামকমল বা হরচন্দ্রের মধ্যে তিলমাত্র প্রভেদ নেই। এমন কি তাঁরা উভয়ে মতো হঠাৎ একদিন হয়ে গিয়ে গিয়েছিলেন, যেমন রামকমল ঘোষ, কি যাদব মল্লিক, তাঁরাও এই স্বীকৃতি লাভ করতে পারেন।

অবশ্য এই তরুণেরা কম লাঞ্ছনা অপমান ও অত্যাচারই না সহ্য করেছেন প্রতিপক্ষের কাছ থেকে! প্রতিপক্ষদের মধ্যে প্রবীণেরাই প্রধান ছিলেন, কিন্তু সকলেই যে প্রবীণ ছিলেন তা নয়। গতানুগতিকতার বেড়াজাল ভেঙে, চিরাচরিত বাঙালীর কাছাকাছি এসে যাদের 'মন ফেটে যায়, এবং সমাজের প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতার উপর যাদের আস্থা নষ্ট হয়, সেই সমবয়সী লোকও তরুণদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। প্রতিপক্ষদলের বিপুল শক্তি—অর্থের শক্তি, সমাজ নেতৃত্বের শক্তি, এবং সকলের উপরে একতার ঐতিহ্যের শক্তি। এই প্রচণ্ড সংঘবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে একদল তরুণের সংগ্রাম নবযুগের বাংলার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছে। কিন্তু কোথা থেকে এই তরুণেরা শক্তি পেয়েছিলেন? কোথায় তাঁদের শক্তি ও প্রেরণার উৎস? যদিও এই তরুণদলের প্রায় প্রত্যেকেই ডিরোজিয়োর উৎসাহী ভক্ত ছিলেন, তাহলেও কেবলমাত্র তাঁদের আদর্শের সংগ্রামে কোনরকম পারিবারিক সমর্থনলাভের আশা ছিল না, সেই কারণে তাঁদের অর্থবল ছিল না, লোকবলও তো ছিলই না। একমাত্র সম্বল ছিল ঐ 'আদর্শ'। বিশ্বস্তর আদর্শের দুঃসাহসে সমাজকে প্রত্যেক করে যে কতদূর পর্যন্ত তাকে তোলপাড় করতে পারে, ইতিহাসে তেমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বাংলাদেশের সমাজকেও সেইভাবে তোলপাড় করেছিলেন 'ইয়ং বেঙ্গল' দল, এবং কেবল 'আইডিয়া' বা আদর্শের জোরে। কি সে 'আদর্শ', কি সেই 'ভাবধারা', যা তাঁদের ব্যক্তিসত্তার মূল পর্যন্ত নাড়া দিয়েছিল, এবং যা অবলম্বন করে তাঁরা সেই সব সমাজের বুকে উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষোভের সমুদ্রীন হয়েছিলেন? এই আদর্শের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে ইয়ং বেঙ্গল দলের চরিত্র ও কার্যকলাপ বিচার করা যায় না। তাঁরা অনেক ভুল করেছিলেন, সামান্য ভুল নয়, রীতিমত ভুল। এক-একটি ভুল ওজনে অনেক ভারী। [তরুণের ভুল ভুল, ইতিহাসের ভুল

একদলের সেই ভুল সংশোধিত হয়ে যাওয়ার পর। ভুলের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল ঐতিহ্য যারা গড়ে তোলে তারা, বিশেষ করে মানব-সমাজের ইতিহাসে সত্যের ভুলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে ভুলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকেও প্রতিবারই অনেক বেশী শক্তি সঞ্চয় করেছিল। 'ভুল' আর 'নিন্দা' এক নয়। সক্রেটিস ভুল করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে কখনও একটিবারের জন্যও নিন্দার আসরে টেনে নিয়ে বিদ্রূপ আঘাত করেন নি, সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য যে সমস্ত চরম শব্দ তাঁকে ব্যবহার করতে হয়েছিল, তার মধ্যে কোন-রোম শব্দ যে তাঁর বিরুদ্ধে তা তাঁরা একদম বলতে পারেন নি। পরে তাঁকে বিষ দিয়ে মেরেছিলেন। কিন্তু সেই ভুল শব্দই ইতিহাসের কাছে অমার্জনীয়। তাই ভুলের পরিবর্তে কোন গ্লানি তাঁদের স্পর্শ করতে পারে নি। যে সব সত্য সমাজে ও জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন, সেইসব সত্যের জন্যের মধ্যেই তাঁদের অসংখ্য ভুল ও সংশয়ের জন্য ঘোষিত হয়েছে। আজও সম্পূর্ণ হয় নি, ভবিষ্যতে হবে।

যে আদর্শে ইয়ং ফ্রেঞ্চ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, সেই আদর্শের স্বরূপ কি তা জানা দরকার এরপরে তাকে স্বাধীনচিন্তা ও স্বাধীনযুক্তির আদর্শ বলা যায়। এই চিন্তা ও যুক্তির প্রথম বৈশিষ্ট্য হল মানববিমুখতা। অর্থাৎ মানুষ, মানুষের পার্থিব জীবন এবং মানুষের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বলতে-অবলম্বনে এই চিন্তা ও যুক্তির উদ্ভব। এই চিন্তাধারা থেকেই 'প্রগতিতত্ত্ব' (Theory of Progress) ও প্রগতিদর্শনের Philosophy of Progress) উদ্ভব হয়েছে। ইতিহাস সমাজ ও সভ্যতার যে ধারাবাহিক অগ্রগতি হচ্ছে এবং এই ধারাবাহিকতার অবিচ্ছিন্নতার মধ্যে যে একটা রীতি আছে, এমন কোন ধারণা আদিকাল যুগে মানুষের ছিল না। মানুষ ও সমাজের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে আগে যে ধারণা ছিল সেটা প্রত্যক্ষ বিষয়গত ধারণা, তার পিছনে কোন যুক্তি-সৃষ্টি সংবর্ধিত, কার্যকারণ সম্বলিত তত্ত্বজ্ঞান বা দর্শন ছিল না। মানবেতিহাসের অগ্রগতি সম্বন্ধে এই তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হয়েছে আধুনিক যুগে, মানুষের চিন্তা যখন পারলৌকিক ও ঐশীশক্তির থেকে মুক্ত হয়েছে। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের যুগের এই প্রগতিতত্ত্বের পূর্বিকাশ সম্ভব হত কি, যদি তার জন্য মানুষের মনোজগতে যে বিপ্লব সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন ছিল, তা হয় নি। মানুষের মনের আকাশ তখনও সর্বত্র অবাস্তবিকতা ও অতিপ্রাকৃতিকতার ঢাকনাতে আচ্ছন্ন ছিল। এখানে-ওখানে ছিন্নভিন্ন দু-একটি তারার ঝিকিমিকির মতো নতুন চিন্তার দুটি নয়া নয়া বিচ্ছুরিত হত বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার জমাট মেঘের অন্তরালে তা অন্তর্ধান করে যেত। একথা ঠিক যে প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও চিন্তাধারা যে নবীন সব প্রাথমিক বস্তুভাগারে প্রচুর সেবা যোগান দিয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল যে প্রাচীন ক্লাসিকাল যুগের উপর নবযুগের মানুষের এই আস্থা ক্রমে অটল অন্ধ দৃষ্টি ধারণ করছে। প্রাচীনের প্রতি পুনরাবৃত্ত যখন এইভাবে অচল হয়ে উঠল, তখন তার প্রগতিক উজ্জীবনশক্তিও নিঃশেষ হয়ে গেল। অগ্রগতির প্রেরণাদান তো দূরের কথা, ক্রমে তা মানুষের মনকে পশ্চাদ্‌মুখী করতে চাইল। এই সময় চিন্তাজগতে আবার এক সংকট দেখা দিল, রেনেসাঁসের পরে, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে। প্রাচীনের একাধিপত্য খর্ব করার প্রয়োজন হল।

প্রাচীনের একাধিপত্যের এই 'সংকটকালীন' ইংলণ্ডে নিয়ে ফ্রান্সিস বেকন,

● ফ্রান্সিস বেকন

রেনেসাঁসের প্রমুখ নায়কেরা। তাঁরা বললেন, সেকালে অনেক কিছু ভাল ও সুন্দর ছিল বলে তা হয়ে থাকলে চলবে না। অতীতের দিকে সমস্ত দৃষ্টিশক্তি নিবদ্ধ থাকলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে উঠবে, চলার পথ যাবে হারিয়ে। আমার মোহগ্রস্টিকে অত দৃঢ় করে অতীতের কবরে প্রোথিত করলে সেমান জীবনের উপর আস্থা খুঁজে পাওয়া যায় না, এমন কি চলার শক্তিটুকুও শেষ পর্যন্ত ফুরিয়ে যায়। এগিয়ে চলাই হল জীবনের ধর্ম, এবং সেই ধর্ম পালন করতে হলে অতীত ও প্রাচীনের মোহবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া আবশ্যক। এই মুক্তির আহ্বান প্রথম বেকনের কণ্ঠে ধ্বনিত হল, তারপর দেকার্তে গ্যালেলিও প্রমুখ মনীষীরা আরো স্পষ্ট ও দৃপ্তকণ্ঠে এই আদর্শ ঘোষণা করেন। প্রগতিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল যে প্রাচীনের একাধিপত্য খর্ব করা প্রয়োজন ছিল তা নয়, তার সঙ্গে আরও অন্তত দুটি গুরুতর কর্তব্য ছিল অবশ্যপালনীয়। একটি হল অলৌকিক পারলৌকিক জগৎ থেকে ঐহলৌকিক জগতের দিকে মানুষের চেতনা ও দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা। রেনেসাঁসের কালে অবশ্যই তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু কোন বলিষ্ঠ জ্ঞান-তত্ত্বের ভিত্তির উপর তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। নবযুগের চিন্তানায়কদের অন্যতম কর্তব্য হল ঐহলৌকিক জীবন ও চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠত্বকে নতুন বলিষ্ঠ বস্তুবাদী জীবন-দর্শনের উপর মজবুত করে স্থাপন করা। আরও একটি কর্তব্য হল, জ্ঞানরাজ্যে বিজ্ঞানের প্রভু উদ্বোধন। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথ প্রস্তুত না করলে জ্ঞানরাজ্যে মানুষের অধিষ্ঠান স্থিতিত হয়ে আসে এবং মানুষ আবার আদিম অজ্ঞানতার যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই ডুবে যাবে। বেকন-দেকার্তেরা বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথ তৈরি করে জ্ঞানরাজ্যের পথ বন্ধনহীন করে দেন। চিন্তারাজ্যে, জ্ঞানরাজ্যে এবং কর্মলোকে মানুষের ঐহলৌকিক অধিষ্ঠান তাদের থেকে আরম্ভ হয়।

কামান, বারুদ, কম্পাস, ঘড়ি, ছাপাখানা, বন্দুক, বাণিজ্য—একে-একে এদের আবিষ্কারে রেনেসাঁসের পরে এক নতুন ভুবন মানুষের চোখের সামনে জেগে উঠল। এই সময় চিন্তাজগতের কলম্বাস-রূপে বেকনের আবির্ভাব হল। তিনি লিখলেন Advancement of Learning (১৬০৫), New Methodology (১৬২০), New Atlantis (১৬২৪)। 'নিউ মেথডলজি' বেকনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে স্বীকৃত। এই গ্রন্থের প্রথমার্ধে বেকন তাঁর মানসচিত্রজিকে

রূপায়িত করলেন। চিত্রটি হল—পাল তুলে একটি জাহাজ চলেছে, পুরনো জগতের দীমানা হারকিউলিসের স্তম্ভ দুটি পার হয়ে অকূল অতলান্তিক মহাসাগরের দিকে জ্ঞানরাজ্যের সন্ধানে। মহাসাগরের বুকে এক অজানা দ্বীপ বেনসালেমে তিনি এক নতুন বৈজ্ঞানিক সমাজ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। বাইবের অনভ্য লোকদের সেই বিজ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু বিজ্ঞানের কর্মীদের বাইবের জগতে তথ্য অনুসন্ধানে যেতে কোন বাধা নেই। এই দ্বীপে বেকন যে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার তৈরি করবার কল্পনা করেন তার নাম দেন 'সলোমন হাউস'। এই বিজ্ঞানমন্দির অপূর্ব পরিবেশে স্থাপিত হবে। তার চারিদিকে থাকবে হ্রদ, উদ্যান, ফোয়ারা, টাওয়ার থেকে আরম্ভ করে ছুরী, শব্দমুর, দীপশুম্ভ, প্যাগোডা এবং আরও অনেক কিছু। প্যালারীতে থাকবে নতুন জগতের আবিষ্কারক কলম্বাস থেকে আরম্ভ করে নানাযুগের যন্ত্র ছাপাখানা কাঁচ কাগজ ধাতু শিল্পকলা প্রভৃতির আবিষ্কারকদের প্রতিমূর্তি। পরবর্তীকালে ইংলণ্ডে ইরোবোপে ও আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক আকাদেমি, ইনস্টিটিউট ও মিউজিয়াম বেকনের এই কল্পিত 'সলোমন হাউসের' মডেলেই গড়ে উঠেছে দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রয়াল সোসাইটির অজানা দ্বীপে বেকন যে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা কল্পনা করেছিলেন, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে সমস্ত পৃথিবী সেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে।

নিরপেক্ষ ও একাগ্রমনে পর্যবেক্ষণ করাই হবে বিজ্ঞানীর অন্যতম কর্তব্য। কিন্তু তার জন্য, বেকন বললেন, নীল আকাশের মতো পরিষ্কার মন চাই, কুসংস্কারের একটি মেঘও তার উপর দিয়ে আনাগোনা করবে না। কুসংস্কারগুলিকে তিনভাগে শ্রেণিবদ্ধ করে বেকন তাদের নাম দিলেন 'Idols', বাংলায় 'ভূত' বলা যায়। অসত্য ভুল প্রত্যয় ও ধারণার 'ভূত' অনাদিকাল থেকে মানুষের মস্তিষ্কে ভর করে রয়েছে, তাড়াবার শত চেষ্টা করেও তাদের তাড়ানো যায় না। এই ভুল ধারণাগুলিকে তিনশ্রেণীতে বেকন ভাগ করেছেন, কতকগুলিকে বলেছেন, 'Idols of the Tribe', অর্থাৎ জাতিগত বা গোষ্ঠীগত কুসংস্কার। বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভিন্নভাবে দীর্ঘকাল ধরে বিভক্ত এবং প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠীর কতকগুলি নিজস্ব কুসংস্কার আছে, সেগুলি সহজে ছাড়া যায় না। কতকগুলি কুসংস্কারকে বেকন 'Idols of the Den' বলেছেন এগুলি হল মানুষের ব্যক্তিগত কুসংস্কার। মানুষ সমাজে বাস করে ঠিকই, 'কিন্তু সমাজের মধ্যে প্রত্যেক মানুষ আবার তার নিজের একটি গুহা বানিয়ে তার মধ্যে ঘুটিয়ে থাকে। এই ব্যক্তিগত গুহাজীবনেও কতকগুলি কুসংস্কার দেখা যায়, সেগুলি ইচ্ছা করলেই ছাড়া যায়। আরও কতকগুলি কুসংস্কার আছে যেগুলিকে বেকন Idols of the Theatre বলেছেন। এগুলিকে চিন্তার গোঁড়ামি বলা যেতে পারে। কোন কোন মানুষের মনকে কতকগুলি চিন্তাধারা (প্রধানত দার্শনিক) বহুকাল ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে দেখা যায়। মানবসমাজের চলতিপথের সেই গতীর কুয়াশা ভেদ করে কোন নতুন আলোকরশ্মি প্রবেশ করে সেখানে স্থান নেই। আর একপ্রকার কুসংস্কার আছে যাকে বেকন 'Idols of the Market' বলেছেন, অর্থাৎ বাজারের কুসংস্কার। সমাজে বাস করতে হলে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাবের বিনিময়, পণ্যের বিনিময়, টাকার বিনিময় সর্বদাই করতে হয়, সমাজটা বিনিময়প্রধান বাজার হয়ে ওঠে। বিনিময়কর্মে বহু ভুলভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক, এবং সেই ভুলভ্রান্তি থেকে বাজারে, অর্থ সমাজে, যত বিচিত্র সব ভুল ধারণার উৎপত্তি হয় সেগুলিও একজাতীয় কুসংস্কার হয়ে ওঠে, যা মানুষ সহজে ছাড়তে পারে না। এই চার রকমের ভূত বা ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কারের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত হতে পারলেই মানুষের পক্ষে বিজ্ঞানের সাধনা করা সম্ভব হবে। বিজ্ঞানের সাধনা শিশু জ্ঞানের ভিত্ দৃঢ় হতে পারে না, এবং তা না হলে মানবজাতির আমলের ফুসকা গাঁথতে তার দিয়ে মানুষের পক্ষে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সত্যতার পথে বেশিদূর অগ্রসর হওয়াও সম্ভব হবে না।

বেকনের এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে হবস্ (Hobbes), লক্ (Locke), স্পিনোজা (Spinoza) প্রমুখ দার্শনিকরা এবং ফরাসী এনসাইক্লোপিডিস্টরা আরও অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত করেন। ইংলণ্ড থেকে বেকনের ভাবধারার সঙ্গে ফ্রান্সের ডেকার্তের ভাবধারার মিলনের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বস্তুবাদের উৎপত্তি হয়। এই দেশ থেকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাবিদ্যা বস্তুনিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদদুষ্ট মানসিক জড়ত্বের বিরুদ্ধে সমুখসংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। ভল্তেয়ার, দিদেরো, হ'লেবাখ, হেলভেটিয়াস্ হবার্ট, স্পেন্সার প্রমুখ এনসাইক্লোপিডিস্টরা সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়ালেন। স্বাধীন-চিন্তাবাদী (Free thinkers) এবং জ্ঞানবাদী দার্শনিকদের (Philosophers of Enlightenment) উদ্ভব হল। হবস্ তাঁর Leviathan গ্রন্থে, 'Captivity of the understanding' বা 'বিচারবুদ্ধির বন্দিদশার' বিরুদ্ধে যেভাবে

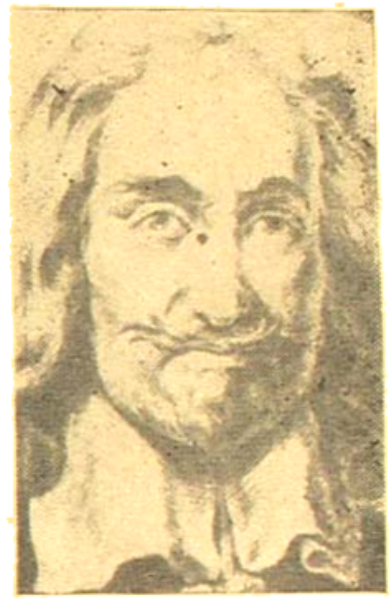

বেকন, হেগেল করেন; স্পিনোজা তাঁর 'Tractatus' গ্রন্থে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেন যে, ধর্মীয়ভাবে চিন্তা করা এবং বিচারে বিশ্বাস মহাপাপ প্রকাশ করা প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার। সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করলে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করা মানুষের প্রাথমিক কর্তব্য। এই 'চিন্তার স্বাধীনতার' উদ্ভব হয়ে চারিদিকে 'বিতর্কসভা' বিতর্কসভা গড়ে-সমিতি কফিহাউস গড়ে ওঠার এবং সেখানে নানাবিধ বিষয়ে অবাধে আলোচনা, মতের আদান-প্রদান, তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হল। মানবসমাজের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই প্রথম এই জাতীয় 'Collective thinking' ও 'Collective discussion'-এর সূত্রপাত হয়। চিন্তাজগতে এক বৈপ্লবিক ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়।

জ্ঞানোদয়ের আদর্শ ব্যাখ্যা করলেন দার্শনিক কাণ্ট (Kant)। তিনি বললেন: 'Enlightenment is the liberation of man from his self-caused state of minority. Minority is the incapacity

understanding without
ther. This state
self-caused when its
lack of under-
a lack of determina-

tion and courage to use it without the assistance of another. Dare to use your own understanding! is thus the motto of Enlightenment.'

এটি কাণ্টের একটি বিখ্যাত উক্তি। এর অর্থ হল: মানুষের নিজের আরোপিত নাবালকত্ব থেকে মুক্তিলাভই হল জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। অন্যের নির্দেশ বা আদেশ ছাড়া নিজের বিচারবুদ্ধি পরিচালনার অক্ষমতাকে নাবালকত্ব বলে। এই নাবালকত্ব বেশীরভাগ এই কারণে যে এর মূল বিচারবুদ্ধির অভাব নয়, অন্যের সাহায্য ভিন্ন সেই বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের অক্ষমতা। এইজন্য জ্ঞানের চরম লক্ষ্য হল, নিজের বিচারবুদ্ধি সাহস করে প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জন করা।

এই নতুন জীবনদর্শন ও চিন্তাধারা পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য, ইয়োরোপ বা এশিয়া, কোন অঞ্চলের মানুষের একচেটে নয়। দার্শনিক চিন্তা বা বৈজ্ঞানিক চিন্তা কখনও তা হতে পারে না। সমগ্র মানবজীবন নিয়ে যে চিন্তা এবং যে বিজ্ঞানের আবির্ভাব, দেশ ও জাতি নির্বিশেষে বিশ্বমানব তার উত্তরাধিকারী। সামাজিক অবস্থার বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন দেশে ও মানবগোষ্ঠীর মধ্যে চিন্তার সুবহুতার এবং এমনকি কারুর হয়ে থাকে না। কোথাও সুর উচ্চগ্রামে ধ্বনিত হয়, কোথাও নিম্নগ্রামে, কোথাও একটানা একঘেয়ে সুর দীর্ঘকাল ধরে ধ্বনিত হতে থাকে। তা হলেও, মানবচিন্তার প্রবাহ বাধাবন্ধহীন। অবাধগতিতে দেশ থেকে দেশান্তরে তার স্রোত বয়ে যায়। মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের পর মুদ্রিত পুঁথিপত্র যখন চিন্তার বাহন হয়ে উঠল, দেশ-বিদেশে চিন্তার আদানপ্রদান তখন আরও সহজ বৃদ্ধি পেল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর যে কয়েকজন মনীষীর চিন্তাধারার আভাসমাত্র দিয়েছি, তাঁদের কালে চিন্তার ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই ঘুচে গিয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দী শেষ না হতে হতেই বেকনের Essays-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় (১৫৯৭)। ১৬২৫ সালের মধ্যেই Essays-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং ১৬২৬ সালে এপ্রিল মাসে মৃত্যু হয় বেকনের। তাঁর মৃত্যুর কারণটিও চমৎকার। প্রচণ্ড তুষারঝঞ্ঝির মধ্যে বসে তিনি একটি কাটা মুরগির মধ্যে তুষারও ভর্তি করছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, মাংস যা ঠাণ্ডার মধ্যে থাকলে মৃতদেহে জৈবিক অপচয়ক্রিয়া বিলম্বিত হয় কিনা। আধুনিক ফ্রীজের পরীক্ষা বলা চলে। পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁর নিজেরই ঠাণ্ডা লেগে যায় এবং তার ফলে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির একত্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে দেখে গিয়েছেন। মুদ্রণযন্ত্রের শৈশবকালেই যদি মুদ্রিত গ্রন্থের মাধ্যমে মানবচিন্তা এই গতিবেগ অর্জন করে থাকে এবং বেকন (১৫৬১—১৬২৬) নিজেই যদি তা লক্ষ্য করে গিয়ে থাকেন, তাহলে পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরাধিকারীদের যে চিন্তার প্রসারণ ও বিস্ফোরণ সম্বন্ধে আগে উল্লিখিত হতে হয় নি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নতুনের এই চিন্তাধারা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে বঙ্গদেশগতিতে ভারতে ও বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে। ইয়ং বেঙ্গল দল এই ভাবধারার উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশব্যাপী প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে ইংরেজিশিক্ষার প্রথম বিদ্যালয় হল হিন্দু কলেজ। 'It was the very first English Seminary in Bengal, or even in India, as far as I know' (Duff). ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয় কেবল ইংরেজিশিক্ষার নয়, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রথম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের প্রথমী ও বিদেশী পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকমণ্ডলের উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু কলেজ হবে 'The main channel by which real knowledge may be transferred from its European sources into the intellect of Hindusthan' (Wilson) হিন্দু কলেজ বাস্তবিকই তাই হয়েছিল, এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার প্রবাহপথ সুগম ও প্রশস্ত করে দিয়েছিল। ইয়ং বেঙ্গল দলভুক্ত প্রত্যেকে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। যেমন তাঁদের ডিরোজীয়ান বলা হয়, তেমনি হিন্দু কলেজীয়ানও বলা যেতে পারে।

ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক ছিলেন। ১৮২৬-২৭ সালে যখন তিনি শিক্ষক নিযুক্ত হন তখন তাঁর বয়স সতেরো-আঠারো। ছাত্রদের মতই তিনি তরুণ ছিলেন এবং ইয়োরোপের নব্যচিন্তার প্রবর্তকদের বাণী তিনিই এদেশের ছাত্রদের কানে পৌঁছে দেন। তিনি নিজে যেমন অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন, তাঁর বাঙালী ছাত্রদের মধ্যেও অনেকে তাই ছিলেন। ডিরোজিওর কাব্যপ্রতিভা, বিদ্যাবুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় তো ছিলই, তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারেও ছাত্ররা মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তিনি ছিলেন চতুর্থশ্রেণীর ছাত্রদের সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক, কিন্তু চুম্বক যেমন লোহা আকর্ষণ করে তেমনি তিনিও অন্যান্য শ্রেণীর ছাত্রদের আকর্ষণ করে কাছে টেনে আনতেন। বিদ্যালয়ে পদার্পণ করলেই সকলশ্রেণীর ছাত্ররা তাঁকে ঘিরে ধরত। ডেভিড হেয়ারের কথা মনে হয়, কিন্তু ডিরোজিও ও হেয়ারের আকর্ষণশক্তির মধ্যে পার্থক্য অনেক। হেয়ারের নম্রস্নেহভরা প্রত্যক্ষ প্রকাশ ছাত্রদের আকর্ষণ করত। ডিরোজিও মহানুভব ছিলেন বটে, কিন্তু তা প্রকাশ করে ছাত্রদের প্রিয় হবার প্রয়োজন তাঁর হয় নি। ছাত্রদের সঙ্গে তিনি ঠিক সহপাঠী বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন। তাঁর প্রতিভা, চিন্তাধারা ও জীবনদর্শন ছাত্রদের কাছে সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। তিনি যেন লক হ্যুম হিউম কাণ্ট প্রমুখ দার্শনিকদের শ্রদ্ধাশিষ্য ছিলেন বলা চলে এবং তাঁর ছাত্রদেরও তাই করে তুলতে চেয়েছিলেন। ডেভিড হেয়ারের ইংরেজি জীবনচরিতে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখেছেন:

Of all the teachers Mr. H. L. V.

Derozio gave the greatest impetus to free discussion on all subjects, social moral and religious. ...He used to impress upon his pupils the sacred duty of thinking for themselves—to be in no way influenced by any of the idols mentioned by Bacon—to live and die for truth.

হেস্টিংসও লালবিহারী দে তাঁর আদেবজাতার ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ কলেজের এই তরুণ ছাত্রদল সম্বন্ধে লিখেছেন:

The young men brought up in the Hindu College began to study the works of Bacon, of Locke, of Berkeley, of Hume, of Reid, and of Dugald Stewart. A thorough revolution took place in their ideas. As was not unnatural, the minds of the young men of the Hindu College bounded from one extreme to the other. From implicit faith in the religion of their forefathers they rushed into blank scepticism. They began to reason, to question, to doubt.

প্রশ্নের একটি কিরিস্তিও দিয়েছেন লালবিহারী দে। 'আমাদের পূর্বপুরুষদের মতো কেন আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করব?' 'ঈশ্বর বলে যে কিছু আছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণই বা কি?' 'ধর্ম কি? আমরা যে ধর্ম ধর্ম করি তা কি পুরোহিত-যাজক-মোল্লাদের স্বার্থজড়িত শঠতা ছাড়া আর কিছু বলা যায়?' 'মানুষের খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে নানাবিধের কুসংস্কার থাকবে কেন? কেন - আমরা যুক্তিসঙ্গত যা ইচ্ছা খেতে পারব না? খাওয়ার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কি?' 'প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে যা লেখা আছে তা অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে হবে কেন?' 'লেখাটি যখন মানুষেরই লেখা, এবং মানুষমাত্রেই যখন ভুল করতে পারে, তখন শাস্ত্র নির্ভুল হল কেমন করে?' 'প্রাচীনকালের লোকেরা আমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানীগুণী ছিলেন তাই বা কে বললে? সুতরাং তাঁদের কথা আমরা নির্বিচারে কেন নেব কেন?'

এই ধরনের সব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ডিরোজিওর তরুণ ছাত্রদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হত। ইয়োরোপে স্বাধীনচিন্তার প্রাতঃকালে ঠিক একই ধরনের সব প্রশ্ন নিয়ে প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্ক হয়েছে। J. B. Bury তাঁর The Idea of Progress গ্রন্থে এই স্বাধীনচিন্তার উন্মেষপর্বের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশে ইয়ং বেঙ্গল যুগের পরিবেশের সঙ্গে ইয়োরোপের এই স্বাধীন চিন্তার উন্মেষপর্বের সাদৃশ্য থেকে সাদৃশ্য দেখা যায়। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে যখনই অবসর পেতেন তখনই এইসব বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলতেন, আলাপ-আলোচনা করতেন। বেকনের চারপ্রকারের মানসিক ভ্রমের কথা তিনি তরুণ ছাত্রদের মনে গোড়াই ধরে দিয়েছিলেন। নিজের বিশ্লেষণী প্রয়োগ করে সবকিছু নিজে যাচাই করার স্বভাব অর্জন না করলে মানুষ যে কিসের থেকে হলেও, মনের দিক থেকে সে কখনও স্বাধীন হতে পারে না—

● হিউম

ছাত্রদের কাছে কাণ্টের এই বিখ্যাত উক্তির পুনরাবৃত্তি করতেন ডিরোজিও। তিনি তাঁর তরুণ ছাত্রদের মনের দিক থেকেও সাবালক করতে চেয়েছিলেন। বাংলার তরুণরা, যারা উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রথমপর্বে, এইভাবে মনের দিক থেকে সাবালক হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরাই 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত। বয়সের দিক থেকে তাঁরা হয়ত অনেক কাঁচা ছিলেন, এমন কি 'নাবালক' ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাই মনের দিক থেকে শিক্ষার গুণে হঠাৎ তাঁদের 'সাবালক' হয়ে ওঠাটা সেই সময় দেশের অনেকের কাছেই, বিশেষ করে প্রবীণদের কাছে, খুবই বিসদৃশ মনে হয়েছে। মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিহাসের চলার পথে রূপান্তরের সময়ে এরকম অনেক বিসদৃশ ঘটনা ও দৃশ্য উৎকীর্ণ হয়। সমাজের চলন থামতে হলে এই বিসদৃশতা এড়িয়ে চলা যায় না।

ইয়ং বেঙ্গল দলের আবির্ভাবের সামাজিক পটভূমিকা রচিত হয়েছে উনিশ শতকের প্রথম পর্বে। ডিরোজিও ও তাঁর তরুণ ছাত্রগোষ্ঠীর দলের উনিশ শতকের প্রথম দলকে অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রত্যেকের বাল্যকাল ও ছাত্রজীবন কলকাতা শহরে কেটেছে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পরিবেশ এই সবার তাঁদের মনে অন্তত খানিকটা যে প্রভাব বিস্তার করেছে তাতে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে কলকাতা শহর তখন আধুনিক যুগের নবজীবনের মহাকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। তার উন্মেষপর্বেই ইয়ং বেঙ্গল দল জন্মেছেন।

উনিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরকে যদি এই উন্মেষপর্ব বলে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে ইয়ং বেঙ্গলের মানসিক রূপায়ণের ধারাটিকেও এই সময়ের ঘটনাবর্তে সন্ধান করতে হবে। সমাজে অনেক ঘটনা প্রত্যহ ঘটে থাকে, সকল ঘটনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য একরকম নয়। ছোটবড় অনেক ঘটনার ভিতর দিয়ে একটা যুগের আকৃতি ও প্রকৃতি ধরা পড়ে। এরকম কিছু ঘটনার বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে ইয়ং বেঙ্গলের সামাজিক আবেষ্টনের আভাস পাওয়া যায়। কলকাতা শহরে যে নতুন সমাজ তখন গড়ে উঠছিল, সারা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিচার করা যায় না। শহরের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু তাহলেও বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন বলেও এই সমাজকে বিচার করা সম্ভব নয়। বাংলারই একটি প্রতিচ্ছবি ছিল কলকাতার সমাজ। যে পুরাতন সমাজের গায়ে আঘাত লাগছিল, কলকাতা শহরে তার ভিত্তিটিও ছাঁচিমত চুনসুল ছিল। তাকে নিঃসন্দেহে সারা বাংলার প্রতিচ্ছবি বলা যায়। অবশ্য নতুন-পুরাতনের সংঘাত তখন কলকাতার সমাজজীবনকে যতখানি আলোড়িত করেছিল, কলকাতার বাইরে বাংলার গ্রাম্যজীবনকে ততখানি করে নি। সাধারণত তা করে না। তার ভরু সময় লাগে। সামাজিক জীবনের সর্বাধিক সংঘাতমুখর ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়, তার বিস্তারশক্তি বহু ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বারা নির্ধারিত হয়। সেই ঘটনার

প্রতীয়মান হইল, সমাজে যাহারা নূতন হয় 'সাহেবিয়ানা' তাহারা কিছুতেই ছাড়িতে পারে এবং উৎসবাদিতেও ইহাদের ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। পূর্বোক্ত ঘটনা ব্যতীত আমাদের দেশেও অনেকটা তাই হইয়াছে। নূতনের অবশ্যম্ভাবী পথ প্রস্তুত হয় নি, বহু বহু বাধাবিপত্তি তাহার পথ ও গতি রোধ করিতেছিল। উনিশ শতকের বহু ভাল আদর্শ ও সম্ভাবনাই আজও আমাদের দেশের জনসাধারণের সহযোগে সমাজকে প্রসারিত হয় নি। কিন্তু সেকালে স্বরূপ, আজকের আকাশের আলোয় নয়। ইংরেজের শাসনাধিকার পরিবেশে আমাদের বিচার্য। উনিশ শতকের প্রথম পঁচিশ-তিরিশ বছরের কয়েকটি ঘটনা দিয়ে এই পরিবেশের প্রকৃতি আমরা বুঝতে চেষ্টা করব।

জুলাই ১৮০০। ব্রজমোহন সভ নামে জনৈক অপরাধীকে ফাঁসীতে লটকানো হয় লালবাজারে, প্রকাশ্য স্থানে। ব্রজমোহনের অপরাধ, সে ফ্রেঞ্চিস সাহেবের বাড়ি থেকে একটি হাতঘড়ি চুরি করেছিল। উনিশ শতকের সূচনায় কলকাতা শহরে সাধারণ চুরির অপরাধে লোককে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হত প্রকাশ্য দিবালোকে। আইনকানুন ও বিচারপদ্ধতি তখনও নব্যযুগের অধিকারে উত্তীর্ণ হতে পারে নি।

ডিসেম্বর ১৮০১। গঙ্গাসাগরে সন্তান উৎসর্গ করার প্রথা ছিল। অনেক মানত করে, বড়োমা ছেলে প্রথম সন্তানটিকে গঙ্গার বুকে উৎসর্গ করবে। অবশ্য কখনোই তাদের বাধ্য করা হত না। তবে এইভাবে গঙ্গার বুকে নিক্ষেপ করে তার নিষ্পত্তি হত। মার্টেলো নামে কোন সাহেব তাঁর কয়েকজন ইয়োরোপীয় বন্ধুবান্ধব নিয়ে ১৮০১ সালে ডিসেম্বর মাসে গঙ্গাসাগরে বেড়াতে গিয়ে এই দৃশ্য দেখেছিলেন। সাধুসন্ন্যাসী, কবির ও অন্যান্য যাত্রীরা সকলেই সাহেবদের দেখে ভয় পেয়েছিল এবং গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন করতে ইতস্তত করছিল। এই কারণে তাদের ভয় হয়েছিল যে সাহেবরা গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত শিশুকে উদ্ধার করবে, জলচর হতে দেবে না, এবং তাহলে তাদের ব্রত উদ্‌যাপনে বাধা পড়বে। সামাজিক প্রথার এই চিত্রও মধ্যযুগের, উনিশ শতকের প্রারম্ভেও বেশ প্রচলিত ছিল দেখা যায়।

ফেব্রুয়ারি ১৮০০। এপ্রাদের অঞ্চলে অনুষ্ঠিত একটি আতসবাজীর উৎসবের বর্ণনা। [illegible] হইবে যোগ দিয়েছেন। নিচে যান বন্দী রোজ সেদিন উৎসবের অঙ্গ ছিল। এইসব উৎসব-অনুষ্ঠানে নবাবী আমলের কোর্ট-কাছারীর সঙ্গে নতুন ইংরেজ আমলের সাহেবী আদব-কায়দাও মিশে গিয়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের সুর মিশ্রণের চেষ্টার কথা কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।

উনিশ শতকের প্রথম পর্বে কলকাতা শহরে নাগরিক রূপায়ণ হয়েছে ধীরে ধীরে। গোড়ার দিকে নগরায়ন কমিটি ও লটারি কমিটির উদ্যোগে এই নাগরিক রূপায়ণের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। মেঠো অন্ধ অলি-গলি, যাঁহাতক ধানক্ষেত জলা-ডোবা-জঙ্গল ইত্যাদি অপসারিত করে লটারি কমিটি কলকাতা শহরের রাস্তাঘাট ট্যাঙ্ক-ডরাম তৈরি করেছিলেন। তার ফলে নগরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারের সুযোগ হয়েছিল এবং যানবাহন ও শহরবাসীর চলাচলের বাধাও অনেকটা দূর হয়ে গিয়েছিল। ট্যাঙ্ক স্কয়ার, কর্নওয়ালিস স্কয়ার, ওয়েলিংটন স্কয়ার, কলেজ স্কয়ার তৈরি হল শহরের শোভাবর্ধনের জন্য। আশপাশে নীচু জমি, খানাডোবা ইত্যাদি ভরাট হল তাতে এবং লম্বা-লম্বা টানা রাস্তা বাধার কাজও হল। নতুন যেসব রাস্তা তৈরি হল—সার্কুলার রোড, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, ধর্মতলা স্ট্রীট, বহুবাজার স্ট্রীট, ওয়েলেসলি স্ট্রীট—সেগুলি সব সুদীর্ঘ সরলরেখায় যতো বিস্তৃত, পরস্পর সমকোণে করে সোজা চলে গেছে, লক্ষ্য হল শহরের একটি বিশেষ কেন্দ্রে মিলিত হওয়া। এই কেন্দ্রটি হল পশ্চিমে গঙ্গাতীরবর্তী নতুন দুর্গ ফোর্টউইলিয়ম থেকে নতুন শাসন-বাণিজ্যকেন্দ্র ট্যাঙ্ক স্কয়ার (আধুনিক ডালহৌসি স্কয়ার) পর্যন্ত। সমস্ত রাস্তা যেখে মিলিত হওয়ার মতো কলকাতার রাস্তাগুলি মিলিত হল ফোর্টউইলিয়মে ও তার এস্প্লানেডে, গভর্নমেন্ট হাউসে ও ট্যাঙ্ক স্কয়ারে। নতুন সহর ও তার শাসকদের প্রাধান্যকে হল সামরিক সেনাবাহিনী, বাণিজ্য ও ব্যুরোক্রাসি। * এদের এই প্রাধান্যকে লক্ষ্য করেই কলকাতার নতুন নগর-পরিকল্পনা রচিত হল। অনেকটা পশ্চিমের baroque city-র মতো পরিকল্পনা। ল্যুইস মামফোর্ডের (Lewis Mumford) ভাষায় বলা যায়, 'it altered the urban picture from the short-range world of the medieval city, with its walking distances, its closed vistas, its patchwork

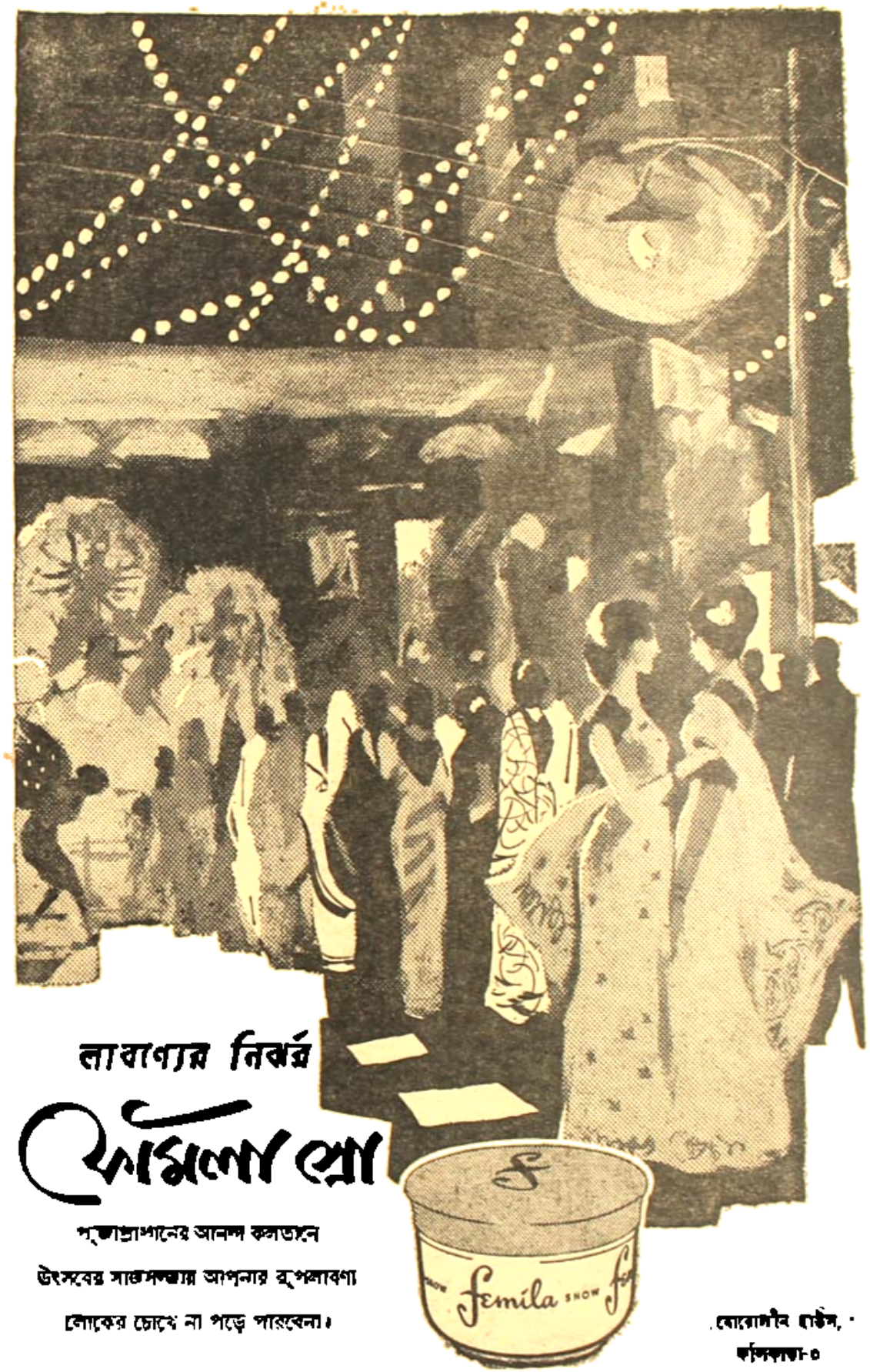

লাবণ্যের নির্ঝর

ফেমিলা স্নো

পূজোদ্ভাশনের আনন্দ কলতানে
উৎসবের সাজসজ্জায় আপনার রূপলাবণ্য
লোকের চোখে না পড়ে পারবেনা।

বোরোসীল হাউস,
কলিকাতা-৩

space, to the long-range world of baroque politics, with its long-distance gunfire and its wheeled vehicles and its increasing desire to conquer space and make itself felt at a distance' (The Culture of Cities London 1944, p 87).

মধ্যযুগের শহরের দুটি ছিল বৈশিষ্ট্য। সব সময় ঔরংজেবের আমলের মতো বড় বড় প্রাচীর, ছোট ছোট গবাক্ষ, সরু সরু প্রবেশদ্বার। সমাজজীবনের গতিশীলতা মধ্যযুগের শহরের সমাজে প্রতিফলিত হয়। নবযুগের রাজনীতি শক্তি, অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা যখন ক্রমবর্ধমান গতিশীল হল, তখন নতুন শহরের চেহারাতেও সেই গতিশীলতা কিছুটা প্রতিফলিত হল। বড় বড় উঁচু প্রাচীর ভেঙে গেল, ঔরংজেবের আমলের সরু সরু ছোট ছোট দরজার পরিবর্তে প্রশস্ত পথ, মধ্যে মধ্যে খোলা জায়গায় আলোবাতাসের খেলারও ব্যবস্থা হল। বাড়িগুলিও হল খোলা মতো সরল, প্রাসাদের কৃত্রিমতাতেও এই সরলতার প্রাধান্য ফুটে উঠল। সৈন্যদের শোভাযাত্রা, সামরিক কুচকাওয়াজ, চক্রযানের চলার গতি সোজা-সোজি প্রশস্ত পথে ঘটবে বাধাবন্ধহীন হয়, ঔরংজেবের আমলের মতো বাঁকা হয় না। এই কারণে বৈষয়িক অ্যাকিটির মূর্তিমান প্রকাশ হল নতুন রাজধানী-শহর, এবং আঠার শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে কলকাতা শহরের বিকাশেও তার প্রভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠল। সেকালের শহরের দিন ফুরিয়ে গেল। মামফোর্ড বলেছেন: '....city building was no longer, for a rising class of small craftsmen and merchants, a means of achieving freedom and security. It was rather a means of consolidating political power in a single centre directly under the royal eye and preventing such a challenge to the central authority from arising elsewhere, in scattered centres, more difficult to control. The age of free cities, with their widely diffused culture and their relatively democratic modes of association, gave way to the age of absolute-cities: a few centres that grew immediately, leaving other towns either to accept stagnation or nullify themselves in hopeless gestures of imitations' (op. cit, p 81).

ছোট ছোট নগরের দুই কেন্দ্রে বিরে যে বড় নাগরিকের দুই এল। এককেন্দ্রিক শক্তি, অর্থনীতিক শক্তি এবং তৎসহ সামাজিক নিয়ে সাংস্কৃতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিও কেন্দ্রীভূত হবার দুই এল। পুরাতন নগর, তার বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলা ভাবের নিয়ে বর্তমান হল। নতুন শহর তার নতুন শক্তি ও শিক্ষা নিয়ে নতুন জীবনের পথে অগ্রসর হবার আহ্বান করল। কলকাতা শহর যখন পরিবহন-বিকাশে মধ্যযুগ ছেড়ে আধুনিক যুগে পদার্পণ করছিল, তখন ইয়ং বেঙ্গল দলের আবির্ভাব হল।

মধ্যযুগের চালচলন, রীতিনীতিপ্রথা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য তখন বাংলাদেশে পুরোমাত্রায় ছিল বলা চলে, এবং বাইরের গ্রামাঞ্চল থেকে যাঁরা নতুন কলকাতা শহরে তাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন তাঁরা কেউ নবযুগের জীবনাদর্শ নিয়ে আসেন নি। সকলেই মধ্যযুগের পরিবেশে মানুষ এবং সেই পরিবেশের শিক্ষাদীক্ষা ও আদর্শই বহন করে শহরে এসেছিলেন। ইংরেজদের সান্নিধ্যে নানাবিধকর্মে কারকর্ম করে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভাগ্যলক্ষ্মীর দ্বারা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, অর্থাৎ বিত্তশালী হয়েছিলেন, তাঁরাই হলেন কলকাতা শহরের আদি-নাগরিক (আঠার শতকের) নাগরিক অভিজাততন্ত্রের। (urban aristocracy)। মহারাজা নবকৃষ্ণের পরিবার, রাজা সুখময় রায়ের পরিবার, ঠাকুর পরিবার, এবাবিক বেনিয়ান ও বেনিয়ানদের পরিবার, শেঠ বসাক ও মল্লিক পরিবার এই নাগরিক অভিজাততন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। কুল-কৌলীন্য ছিল মধ্যযুগের অভিজাত্যের অন্যতম মানদণ্ড। তার পরিবর্তে বিত্তবৈভবের দুই হল নবযুগের প্রধান মানদণ্ড। তার ফলে সমাজজীবনে বেশ কিছু পরিবর্তনের সূচনা হল। পূর্ব সামাজিক অভিজাত্যের সঙ্গে আজীয়তার যে সাযুজ্য ও সংহতি ছিল, অভিজাত্যের বিবর্তনের ফলে সেই সাংস্কৃতিক সংহতিও নতুন শহরে নষ্ট হয়ে গেল। নতুন এক বিত্ত-সংস্কৃতির বিকাশ হল নব্য-অভিজাতদের পোষকতায়, যা আধুনিক ও নয়, পুরাতনও নয়, পুরাতনের বিকৃতি মাত্র। তার একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে কবিওয়ালা, হাফ-আখড়াই ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়। অভিজাত্যের সামাজিক প্রকাশভঙ্গির মধ্যেও পুরাতনের সাযুজ্য লোপ পেয়ে গেল, উৎসব-পার্বণে বিকৃতরুচি বিলাসের উদ্ভট বিলাসিতা প্রকট হয়ে উঠল। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজের দ্বারা পূর্ণ বঙ্গভূমি শহরে এই বিকৃতরুচির আমোদে ছোট একটা যুগ পেয়েছে। কোম্পানির আমলের অর্থযুগের সাহেবরা, যাঁদের 'The Nabobs' বলে ইংলণ্ডবাসীরা অভিহিত করেছিলেন, তাঁরা এই ছোট প্রতিবেশে বসতে লেজে না ভাসিয়ে দিয়ে এদেশের নবাবী রীতি অনুকরণ করতে অগ্রণী হয়েছিলেন। সাংস্কৃতিক ও নৈতিক বিকৃতির স্রোত আঠার শতকে যতটা প্রবল ছিল, উনিশ শতকের প্রথম থেকেই ধীরে ধীরে তা মন্দীভূত হতে থাকে। উনিশ শতকের সূচনাতেই ফোর্টউইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার পর থেকে যে সব ইংরেজ রাজকর্মচারী এদেশে আসেন, তাঁদের সঙ্গে ক্লাইভ-হেস্টিংসের আমলের ইংরেজদের পার্থক্য অনেক। বংশগত পার্থক্য, চরিত্রগত পার্থক্য, বিদ্যাবুদ্ধিগত পার্থক্য। ইংলণ্ডের সমাজসংস্কার ও সামাজিক উদারতার যুগের আদর্শ নিয়ে তাঁরা এদেশে আসেন। এখানকার সমাজজীবনেও তাঁরা সেই আদর্শ প্রয়োগ করতে প্রয়াসী হন। তাছাড়া উনিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই আর দুটি ঘটনা ঘটে, যাতে আঠার শতকের বিকৃতরুচি জীবনের প্রবাহ খানিকটা কলুষমুক্ত হয়। অন্তত তার পাশাপাশি আরও একটি নতুন খাতে ভিন্নমুখী জীবনের স্রোত বইতে আরম্ভ করে। সুস্থ ও বলিষ্ঠ জীবনের স্রোত, তার গতি নতুন সূর্যোদয়ের দিকে। সেই জীবনের দর্শন অন্যত্র, সৃষ্টি অন্যত্র। তার শক্তির উৎসও অন্যত্র। নবযুগের বিদ্যাবুদ্ধি ও যুক্তির শক্তিই তার উৎস। এই নতুন জীবনসাধনার আহ্বান বয়ে আনলেন রামমোহন রায়। উনিশ শতকের প্রথম দশকের মাঝামাঝি থেকেই রামমোহন কলকাতা শহরে স্থায়িভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সংস্কার-কর্মের প্রতিষ্ঠিত আরম্ভ হল। ঠিক এই সময় স্থাপিত 'হিন্দু কলেজ'—নবযুগের বাংলার নবীনদের মহাতীর্থ। এই প্রথম দশকের মধ্যেই ইয়ং বেঙ্গলদের উদ্ভবানীর ধারা তাঁদের সফলের জন্য হয়। অধিকাংশই কলকাতা শহরে অন্তরঙ্গ করেন, দীক্ষান্তর ডিরোজিও পর্যন্ত, দু-একজনের জন্ম হয় কলকাতার বাইরাবাড়ি গ্রামে। ডিরোজিও ১৮০৯, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ১৮১০, শিবচন্দ্র দেব ১৮১১, রামনাথ শিকদার

(বাকিটা ১৫১ পৃষ্ঠায়)

প্রতিচ্ছায়া

(১০১ পৃষ্ঠার পর)

পায়ে-পায়ে তার সঙ্গে সেখানে যাঁড়াতে থাকা যায়। তারপর মন হঠাৎ বড় নিজে নিজে সব একাকার হয়ে যেতে। ঘোমটার ফাঁকে ফাঁকে উঁচুনিচু বেণুনী রঙের কপাল ফুটে ওঠা ঘামে শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

চিরজীবন শহরে কাটান মানুষের চোখে এরকম পরিবেশ ও দৃশ্য স্বভাবতই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। আমার অবস্থাও প্রায় তাই। বাড়ির একটু তফাতে সেতু ঘিরে বেঁধে গ্যারাজ ও তার পাশে একখানি ঘর চাকর-বাকরদের জন্যে। কোন কোণে লোহার ঘোরান সিঁড়ি উঠে গিয়ে দোতলার বারান্দায় এক কোণে মিশেছে। বাইরে এ সিঁড়ি খানসামা বাবুর্চির ব্যবহারের জন্যে থাকা যায়। বাগানটাও সুন্দরভাবে সাজান ও পরিচ্ছন্ন। বাগানের মাঝখান দিয়ে লাল কাঁকর বিছান পথে চলার পথ এঁকে-বেঁকে লম্বা বিনিয়ে চলে গেছে।

কতক্ষণ পায়চারী করছিলাম জানি না। হয়ত দশ-বার মিনিটের বেশি নয়। এমন সময় শক্তিপদকে ব্যস্ত হয়ে এদিকে আসতে দেখে জানালার খড়খড়ি থেকে মুখ সরিয়ে এলাম।

—কী আশ্চর্য, তুমি সেই থেকে বাইরে রয়েছ! এতক্ষণ বাবুর্চিকে খাবারের ব্যবস্থা বোঝাতে গিয়ে আমারও খেয়াল ছিল না একদিকে। আমি জানি এসব তোমাকে ঘুইয়েফিরে নিয়ে বেড়িয়েছে। দু-দুটো চাকর এদিকে রয়েছে, কারো খেয়াল হল না তোমার কথা। এই বলে একরকম টানতে টানতে আমাকে নিয়ে বাইরের ঘর পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো তার প্রশস্ত ড্রইংরুমে।

ড্রইংরুম পার হবার সময় চোখে পড়ল নীচের অত্র প্রাশস্ত ঘর ঘরের দরজা বন্ধ, আর দরজার বাইরে রঙীন পুরু পর্দা ঝুলছে। ঘরের একপাশ দিয়ে দোতলায় ওঠবার চওড়া কাঠের অর্ধ-গোলাকার কাঠের পালিশ করা সিঁড়ি। সিঁড়ি পুরু কার্পেট দিয়ে ঢাকা। দুজনে দুজনে দেখলাম—সেখানেই একটা ছোট টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম আর কিছু সুখাদ্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একটা আসবাবপত্রের খালান-পতনের ঘনীভূত দুইং-রুম যেমন হয়ে থাকে। এরপরে একটা লম্বা বারান্দা ও তাতে বেশ কিছু সাজিয়োর দেখা ও নির্দিষ্ট হইও দেখলাম ও দেখে একটু বিস্মিতই হলাম, কারণ শক্তিপদদের ঘরে সাজিয়োর বই দেখতে পাব এ আশা মোটেই করতে পারি নি। বরঞ্চ পড়ার চাহিদা বাড়ানোর মতো একমাত্র ব্যবস্থা বই ছাড়া কোন সাজিয়োর বই বসানো কিংবা বা ধার করে পড়তে দেখি নি। বরং যারা পড়ত তাদের সে বিষয়ে সকলকে চোখেই দেখত।

চায়ের টেবিলের সামনে শক্তিপদ আমাকে বসিয়ে নিজে ধরে আর একটা চেয়ারে। তারপর চা ঢালতে ঢালতে বলল,—আমার ঘর-টর সব পরই পরে আছে বহুকাল। এখন এখানেই বসে চা খাই, আর তিনতলা সাজি ওপরের বারান্দায়। এই বেশি সুবিধে, কি বল? চা খেয়ে ওপরে তোমার ঘর দেখিয়ে দিই। সাঁতারমেকে বলেছি তোমার জন্যে খুতি পাঞ্জাবী আনিয়ে রাখতে। তারতোড়োর তুমি তো সঙ্গে কিছুই আনতে পার নি। হাত-মুখ ধুয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে নাও তো। তারপর যা করতে হবে, বলা যাবে। রাত তো পড়ে রয়েছে।

খেলাম শক্তিপদ ইতিমধ্যে কেমন সন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে। মাত্র ঘণ্টা তিনেক আগেও তার যে চুপচাপ ও বিরস অবস্থা দেখেছিলাম এখন তার কিছু চিহ্নও নেই। অল্প সময়ে ওর মানসিক আর হাবভাবের পরিবর্তন দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। তাই নতুন করে বিস্মিত হলাম না বরং রাস্তটা ভালোয় ভালোয় কাটবে ভেবে আশ্বস্তই হলাম। চা আর সামান্য কিছু খেয়ে শক্তিপদর সঙ্গে সোজা ওঠে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠে চোখে একটা লম্বা বারান্দা। বাঁ-হাতে তিন-চার ঘুঁইয়ে সামনাসামনি দুখানা দোরে ঘর। বাইরে লম্বা বারান্দা। দুদিকের রেলিংও ঘুরোনো ওঁচুতে আরো ঘর রয়েছে, সেগুলোর দরজা বন্ধ। প্রথমে শক্তিপদ আমাকে নিয়ে ডানদিকের ঘরে ঢুকল। এটা তার বেডরুম, দামী কার্পেটে মোড়া। একপাশে প্রশস্ত খাটে পুরু বিছান বাহারে বরফ দিয়ে ঢাকা। খাটের পাশে ছোট টেবিলের ওপর দু-একখানা বাঁধান বইখাতা আর টুকিটাকি দেখা যাচ্ছে। দুঁইয়ের দেয়াল ঘেঁষে সোফাসেটি দুটো এই ঘরের বড় আকর্ষণ। খাটের মাথার কাছে একটা কারুকার্য করা স্ট্যাণ্ডের ওপর সুদৃশ্য আয়নায় ঘেরা শ্যাম্প খাটের অন্য পাশে দরজার দুঘেঁষে বেশ বড় আয়না বসান একটা ড্রেসিং টেবিল যাতে প্রসাধনের সব সরঞ্জামের বাহুল্য করা যায়। টেবিলের সামনে একটা ঘূর্ণি-ঘাঁটি চেয়ার। ড্রেসিং টেবিল দুঁইয়ের আরো দূরে জানলার সামনে একটা ইঁজিচেয়ার তার পাশে একটা বড়ো বাঁ দিয়ে বাইরের বারান্দায় যাওয়া যায়।

শক্তিপদ এক আঙুলে দেখিয়ে বলল ছিল এখন আমাদের ঘুরে একটা পশমী বাথরুম ঘর ভরে তাঁকে বুঝিয়ে আসবার বন্ধ করল। আমার কি মনে হয় ভালো খুলে কালো মাঝের চলন-বলন একবার আলো যায় ঘরে নিয়ে আবার ভালো বন্ধ করল। তারপর আমাকে নিয়ে ঘরে ঢেকে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকে বলল, তোমার ঘর। তাড়াতাড়ি স্নেহের বলে নয়, আমি অনেকক্ষণ আমার ঘরের কথা বলছি। এরের বারান্দায় সেই বাথরুম, ঘরের

পূজায় রেডিও | শ্রেষ্ঠ পাখা | উপহার ট্রানজিষ্টার

কুকার প্রভৃতি নগদে ও সহজ কিস্তিতে পাইবেন

এলায়েড রেডিও ইণ্ডাষ্ট্রীজ

১২৩ এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিঃ ৬। ফোন : ৫৫-৪৬২৬

হলে মুখ-হাত ধুয়ে নাও। এই বলে সে বেরিয়ে গেল। এরপর খাট, আলমারী, টেবিল, চেয়ার সব সাজান, কাচ-মোছা। ঘরটার তার একপ্রস্থ আসবাবপত্র, আলোয়ান, তোয়ালে ঘরে ঘরে রাখা হয়েছে।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে আমা-কাপড় বদলে গায়ে আলোয়ানটা জড়িয়ে বারান্দায় শক্তিপদর কাছে ফিরে এসে দেখি সে ডেক-চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় সিগারেট টানছে। বারান্দার রেলিংয়ের গায়ে ব্র্যাকেটে ঝোলান একটা ল্যাম্প। তার কিঞ্চিত আলোয় ভালোভাবে দেখা না গেলেও বুঝতে পারলাম বারান্দাটা নিয়মিত ব্যবহার হয় না। বেতের বাহে ধারে ধুলোবালি জমে রয়েছে। বসবার একপাশে কিছু আবর্জনা সরিয়ে রাখা হয়েছে। বারান্দার একপ্রান্তে একটা সিঁড়ির মুখ দেখা গেল। বোঝা গেল নীচে যে তোষাল মোছার সিঁড়িটা দেখেছিলাম সেটা এখানেই উঠে এসেছে। আরছু আলোর আর কিছু পরিষ্কার দেখা গেল না।

ইসারায় শক্তিপদ পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে সেখানে বসলাম। একবার উঠে গিয়ে সে আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে এল। তারপর পাশ থেকে চামড়া-বাঁধান খাতাখানা তুলে নিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, পড়।

আমি তৎক্ষণে শক্তিপদর আসল ব্যাপারটা জানবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। তাই তার খাতা বাড়িয়ে দেওয়ার অর্থ বুঝতে না পেরে অধৈর্য হয়ে পড়লাম। নিতান্ত ঘোরপ্যাঁচ করার জন্যে ও' বাড়িয়ের ছেড়ে এই ঘাটশিলায় ছুটে আসি নি। আমি চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ হাঙ্গামা মিটিয়ে কালই কলকাতায় ফেরা হতে। তবু মনের বিরক্তি চেপে ঘোরপ্যাঁচ হাল্কা সুরে বললাম,—কি ব্যাপার হে, বুড়ো বয়সে শেষ পর্যন্ত কবিতা লেখা ধরলে নাকি? এটা ও' দেখছি কবিতার খাতা। পরে পড়লেও চলবে। আমি বলছিলাম কি যেজন্যে এখানে আসা সেই বিষয়েই কিছু শুনলে ভালো হত না? সময় ও' অল্পই।

এর উত্তরে শক্তিপদ আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল,—ওতে কবিতা নেই, যা জানতে চাইছ তাই আছে। একটু থেমে আবার বলল, বেশি কষ্ট করতে হবে না, যেখানে যেখানে স্লিপ গোঁজা আছে সেইগুলো পড়লেই হবে।

এবার আমার নার্ভাস হবার পালা। খাতা খুলে কি দেখব যে জানে! নিজেকে তৈরি হবার জন্যে একটু সময় দরকার। কথা বোঝাবার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করলাম সামনে যা হল এল। বললাম,—আচ্ছা শক্তিপদ বাড়িঘর ও' বাগিয়ের চমৎকার, ঘর-দোরও সুন্দর সাজান দেখছি। কিন্তু এমন সুন্দর বারান্দাটা যেন নেগলেক্টেড বলে মনে হচ্ছে। কেন বলত?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শক্তিপদ জবাব দিল,—ধা ঠিকই ধরেছ প্রশান্ত। ইদানীং এদিকটায় আসাই হয় না। বারান্দায় আসবার ঐ যে দরজাটা দেখছ ওটা বহুদিন থেকে বন্ধ ছিল। আজ তুমি এসেছ, মনটা অনেকদিন পরে ভালো বোধ হচ্ছে। তাই সীতারামকে বললাম দরজাটা খুলে এখানে বসবার জায়গা করে দিতে। কিন্তু এবার ওটা পড়তে আরম্ভ কর।

খাতাখানা খুলে একটু চোখ বুলিয়েই বুঝলাম এটা একটা ডায়েরী। জিজ্ঞাসুনেত্রে শক্তিপদর দিকে চাইতেই সে ঈষৎ হেসে বললে,—খুব অবাক হচ্ছ নিশ্চয়ই। মাসে কিছুদিন ঐ অভ্যাসটা হয়েছিল। তবে নিয়মিত কবে লেখা হয়ে ওঠে নি। বহুদিন আর লিখিও না। এই শেষ এবার বেশ গম্ভীর হয়ে আমার চোখে চোখ রেখে আবার বলতে সুরু করল,—কিন্তু শোন প্রশান্ত, আমার ডায়েরী পড়বার আগ্রহ তোমার একটুও নেই তা আমি বুঝি, সেজন্যে তোমাকে ওটা পড়তে দিই নি।...তাহলে খুলেই বলি শোন।

ইতিমধ্যে দেখলাম ওর গলার স্বর বলতে যাচ্ছে, চোখের চাউনিও আর আগের মত স্বাভাবিক নেই,—কেমন একটা সম্মোহিত ভাব।

এদিক-ওদিক চেয়ে ডেক-চেয়ারখানা আরো কাছে টেনে আনল। তারপর আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে গলা নামিয়ে বললে,—ভূত-প্রেতে বিশ্বাস কর তুমি?—আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে খাতার পাতা উল্টে একটা জায়গায় আঙুল রেখে বললে,—দেখতে পাচ্ছ লাল কালিতে আণ্ডার লাইন করা? কে করেছে বলতে পার? আমি ও' করি নি। লাল কালি কখনো ব্যবহারই করি না আমি। চাকর আর মালী ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ নেই। তারা কেউ নিশ্চয় আমার বইখাতা নিয়ে পড়তে বসবে না। তাহলে?

যেখানে শক্তিপদ তখনো সেই জায়গায় আঙুলটা চেপে ধরে আছে। ওর চোখ দুটো আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ। কারো সামনে বসে তার ডায়েরী পড়া কারো পক্ষেই সুখের বা সহজসাধ্য নয়। অবস্থাটা আমার মোটেই ভালো লাগল না। কিন্তু শক্তিপদর হাত এড়ান তখন আর সম্ভব নয়। অতএব সে চেষ্টা না করে খাতাখানা টেনে নিয়ে পড়তে সুরু করলাম। শক্তিপদর হাতের লেখা,—'কতদিন আর দুই নৌকায় পা দিয়া অপেক্ষা করিব? যাহা করিবার তাহাকে শেষ করিতে হইবে,—বড় কঠোর বা দুঃসাধ্যই হোক...' এই দুই ছত্রের নীচে লাল কালি দিয়ে আঁকাবাঁকা লাইন টানা। লেখাটা আমার কাছে সম্পূর্ণ হেঁয়ালি।

খাতাটা ওকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু শক্তিপদ আবারও সে সুযোগ দিল না। সে কিপ্রহস্তে খাতার আরো দু-তিন পাতা উল্টে আর একটা জায়গা দেখিয়ে খাতাখানা আরো এগিয়ে ধরল। সেখানেও কয়েকটা লাইনের নীচে মোটা করে লাল কালির দাগ। মাঝে মাঝে কয়েকটা শব্দ কালো কালি দিয়ে কাটা,—'তাহাদের দিকে তাকিয়া চলে যাইব' আমি তাহাদের কাপড়ের ছাড়া আর কিছু মনে করি না'। ভাগ্য আমার মোপাসাঁর গল্প চিনিয়েছে—কিন্তু এ পরীক্ষায় আমি কখনো স্বীকার করিব না।...শুধু সুযোগের অপেক্ষা।...কোন রাস্তাই আমি জানিব না। মেহ ভক্তি ধরা যায়া কোন দুর্বলতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না।... সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া সুযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে।'

এই পর্যন্ত পড়ে আমি সারা শরীরে ও মনে কি রকম একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। তাড়াতাড়ি খাতাখানা বন্ধ করে পাশের টেবিলে ফেলে দিয়ে একটু জোর দিয়েই বললাম,—বাপ বাছা ভাই, এসব আমার পড়ার কোন মানেই হয় না। বলেই বুঝতে পারলাম একটু বেশি রূঢ় হয়েছি। অবশ্য দেরার জন্যে গলা নামিয়ে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম,—আর আণ্ডার লাইন করা নিয়ে তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? তোমার এ খাতায় যখন তুমি ছাড়া আর কেউ হাত দেবার নেই তখন আণ্ডার লাইনও তুমিই করেছ। আমরা কি এইসব ছোটখাটো কাজের কথা সব সময়েই মনে রাখি? কত সময় কত ভুল হয় আমাদের। তাছাড়া এত বড় বাড়িখানায় একা একা কাটাও, চাকরকে কায়া বলে ভুল হওয়াও

কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। অনেকেরই অনেক সময় হয়ে থাকে।

শক্তিপদর কিছু হেসে ফেলার ও কান্না-ভাবেই আমার কথাগুলো শুনছে। অবস্থাটাকে আরো সহজ করে নেবার জন্যে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে আলোয়ানটা গায়ে জড়াতে জড়াতে বললাম,—চল হে, একটু বেড়িয়ে আসা যাক এমন সুন্দর জ্যোৎস্নার রাতটা ঘরে বসে কাটিয়ে লাভ কি?

শক্তিপদও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। মনে হল আমার কথায় রাজি হয়েছে। খাতাপত্র তুলে নিয়ে ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল,—চল ভাই যাওয়া যাক। ঘরে বসিয়াই যেন হাঁফ ধরে। তবে মনটা নিশ্চয় হালকা হয়ে গেছে। ওকথায় টাকা করে লাভ কি? চল একেবারে রাওলা থেকে ঘুরে বেড়িয়ে পড়ি। ফিরতে একটু দেরি হলে ক্ষতি নেই।

শক্তিপদর প্রস্তাবটা ভালোই মনে হল। সারা বিকেল অনিয়ম করে কেটেছে। এখন শেষ ভরে খেয়ে নিলে আরাম করে ঘুমোন যাবে। সেই সঙ্গে আরো একটা দিক ভেবে নিলাম—শক্তিপদর মনের অবস্থা কখন কি রকম হয়ে তার কিছু ঠিকঠিকানা নেই। ওর বর্তমান চেহারা যা দাঁড়িয়েছে দেখে মনে হয় নিশ্চিন্ত থাকাও ঠিক হবে না। আমি যখন কাছে রয়েছি সেদিকটা দেখাও আমার কর্তব্য।

আকাশের মাঝে মাঝে ছাওয়া-ছাওয়া মেঘে ঢুকলাম। যে পথ দিয়ে মোটরে এসে শক্তিপদর বাড়িতে ঢুকেছিলাম তার উল্টো পথ ধরে মিনিট পনের এগিয়ে শক্তিপদ ডানদিকে মোড় ঘুরল। এ রাস্তাটা আরো ফাঁকা। ঘন এঙ্গুত লাগলায় লোকজনের বসতি তেমন করে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত বাড়িঘর আর দেখা গেল না, শুধু উঁচু-নীচু ঢেউ খেলান জমি আর তার মাঝে মাঝে ঘুনো গাছের ঝোপ। দিনের বেলা কুয়াশা কোপগুলোকে ঘিরে থাকায় দূর থেকে সেগুলো এক-একটা এক এক রকম অদ্ভুত আকার ধারণ করেছে। চাঁদটা ঘষিও এতক্ষণে আকাশের অনেকখানি ওপরে উঠে গিয়ে জ্যোৎস্নার ধারা ছড়িয়ে দিয়েছে, তবু ঘন কুয়াশার পর্দা ভেদ করে জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ রূপ দেখার উপায় নেই কোন দিকে।

এতক্ষণ শক্তিপদ পথের দুধারে বাড়ি ঘরগুলোর পরিচয় দিতে দিতে চলে যাচ্ছিল। লোকালয় ছাড়িয়ে এসে শক্তিপদর কথাও সেই সঙ্গে কমতে কমতে শেষে সে একেবারে নীরব হয়ে গেল। ক্রমশ চলার গতি তার কমতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে তার সঙ্গে গতি মিলিয়ে চলা এই ভরা পেটে বেশ কষ্টকর হয়ে উঠল। মনে হল,—এমন চন্ চন্ করে হাঁটা মুফ করলে কেন বলত? এত তাড়াতাড়ি কি আছে। হোমার গতি একটু কমাও ভাই, পেরে উঠছি না।

আমার কথা যেন ওর কানেই গেল না। গতি ওর কমলো না বরং আরো বেড়ে গেল। ওর সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে আমি প্রায় ছুটতে আরম্ভ করলাম। আচমকা পথ, নাকে মাঝে ঝোপঝাড়ের ওপর পা পিছলে পড়ে যাবার উপক্রম হচ্ছে, আমি হাঁফিয়ে উঠেছি। আর রৈ রাখতে পারলাম না। চেঁচিয়ে উঠলাম,—শক্তিপদ, শোন, এ তোমার কি পাগলামী হচ্ছে! তুমি যদি না থাম আমি বাড়ি ফিরে চললাম, এখনো বলছি।

কিন্তু কে শুনবে আমার কথা। সে একবার ফিরেও চাইল না। বুঝতে পারলাম শক্তিপদর আজ শুদ্ধবুদ্ধি নেই। তার চলার বেগ দেখে মনে হচ্ছে কোন এক অদৃশ্য শক্তি তাকে ক্রমাগত ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। কোন দিকে একবারও চাইছে না সে, একমাত্র সামনের দিক ছাড়া। এত জোর করেও তাকে ধরতে পারছি না। ওর মন মন নিশ্বাস নেওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, শক্তিপদও হাঁফিয়ে উঠেছে।

এই পাগলের পেছনে ধাওয়া করতে গিয়ে কোন্ দিকে যাচ্ছি খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দেখতে পেলাম আমরা এসে পড়েছি একটা নদীর ধারে। পাহাড়ের নদী, তার মাঝে মাঝে জলের রেখা চাঁদের আলোয় চিক চিক করে উঠছে আর কোন কোন জায়গায় লালা বালি দুধের ফেনার মত ছড়িয়ে আছে নদীর বুকে। ঘন কুয়াশার আড়ালে জলের রেখা আর বালি মিশে একাকার হয়ে গেছে এমনভাবে যে, হঠাৎ দেখে বোঝা যায় না কোনখানটায় জল আর কোনখানে বালি। নদীর কিনারে পৌঁছেছিলাম মাত্র কয়েক মুহূর্ত, পরমুহূর্তে দুধ ফিরিয়ে দেখি শক্তিপদ আরো কয়েক হাত দূরে এগিয়ে গেছে নদীর পাড় ধরে। আমার ধৈর্যশক্তি ফেলে ছোরে পা ফেলে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। মনে হল এবার যেন ওর গতি মন্থর হয়ে এসেছে। কাছে যেতেই ওর পা একটু একটু টলছে। কোন শব্দ না করে ছুটে গিয়ে ওকে ধরে ফেললাম। যদি এখনি শান্ত হয়, এই ভেবে ঠাণ্ডা মাথায় ওর ডান হাতটা ধরবার কৌশলটি দিয়ে বাঁহাতে হ্যাঁচকা টানে এক বিকট বীভৎস চিৎকার করে উঠল,—কে? কে তুমি? খুন করতে চাও আমাকে?

আমি ওর ঐ মূর্তি দেখে আর চিৎকার শুনে কি করবে স্থির করতে না পেরে ওকে জাপটে ধরবার চেষ্টা করে চেঁচিয়ে বললাম,—এ তোমার হল কি শক্তিপদ, আমি যে প্রশান্ত, চিনতে পারছ না?

শক্তিপদ সে কথায় কান না দিয়ে চিৎকার করে উঠল,—কে প্রশান্ত? তুমি তো নয়! খুন করতে এসেছ আমাকে? কিন্তু আমি তা হোমায় খুন করতে দিচ্ছি না। খুন করতে চাই নি কিন্তু নিজেকে রক্ষা করা।

আমার আমি তোর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ওকে জাপটে ধরতে গেলাম। কিন্তু পারলাম না। ওর দেহের এখন আমার থেকে অনেক বেশি তাছাড়া আমি ওকে খুন করতে যাচ্ছি এই ধারণার আতঙ্কের জন্যে ওর দেহে শক্তি তখন দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। ওর বিকট এক ধাক্কা খেয়ে আমি ছিটকে মাটির ওপর আছড়ে পড়লাম। সেই সুযোগে শক্তিপদ টলতে টলতে সেই উঁচু-নীচু পথের ওপর দিয়ে যেন পাগলের মত ছুটতে লাগল। নদীর ধারে শক্ত ঠাণ্ডা আর কাঁকরের ওপর আছাড় খেয়ে মনে হল শরীরটা বুঝি গুঁড়ো হয়ে গেল। হাত-পা ছড়ে জালা সুরু হয়ে গেছে। বন্ধুবরের

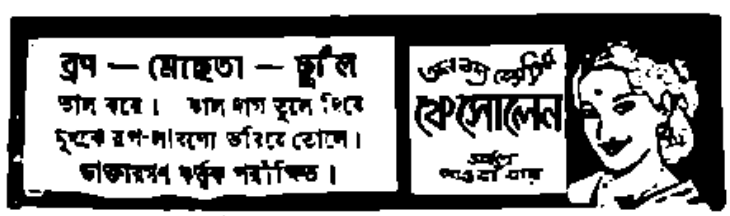

● ··· তুমি কি আমায় খুন করতে এসেছ ?

ওপর তর দিয়ে পড়ার নাম্বটা বেঁচে গেছে। কিছু ওঁবার জন্য হাঁফিয়ে ফেলেছি। দেখতে পেলাম শক্তিপদ টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছে একেবারে নদীর ধারে গিয়ে থেমে। এখুনি ওকে থামান দরকার, নাহলে নির্ঘাত ও পা ফসকে নদীর মধ্যে গড়িয়ে পড়বে। চিৎকার করে লাভ নেই, বরং আরো বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা। কোনমতে নিজেকে উঁচিয়ে সাবধানে ওর পেছন পেছন যেতে লাগলাম। হঠাৎ ফুলগাছটা ঘরে দাওয়ার চালের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পেছন থেকে সেই আলো পড়ে শক্তিপদর আর আমার সামনে আমাদের দুটি ছায়া পড়ি করল। আমরা দুজনেই টলতে টলতে চলেছি উঁচু-নীচু পথ ভেঙে, ছায়া দুটিও চলেছে টলতে টলতে। আমাদের দুজনের মাঝখানে দুরত্ব দশ-বার হাতের বেশি নয়। হঠাৎ ভেবে দেখলাম আমাদের দুজনের মাঝখানে তৃতীয় একজনের ছায়াও এঁকেবেঁকে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ওপরের দিকে চেয়ে দেখলাম ঘরি আকাশে কোন মেঘের টুকরো নেই যা এদিকে ওদিকে কোন বড় গাছ প্রায় ভালপালা মেলে দিয়ে থাকে। কিন্তু না, কিছুই চোখে পড়ল না। সীমের আকাশ, মেঘের কোন চিহ্ন নেই। সেখানে। ধারে কাছে কোন গাছপালাও নেই। ভয় করলাম, বাঁধানের তৃতীয় ছায়াটা ক্রমশ শক্তিপদর নিকটবর্তী হচ্ছে। শক্তিপদ যেন একবার ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে চাইল—পরমুহূর্তেই হোঁচট খেয়ে আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ল নাটির ওপর। শক্তিপদর ছায়াটা নাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেল। তৃতীয় ছায়াটি হল অন্তর্হিত।

স্থির হয়ে দেখলাম
দুটো হাতের ওপর মুখ থুবড়ে
পড়ে আছে মনে হল
সারাদেহ থরথর করে কাঁপছে। চিৎ করে ঘোরাতে চেষ্টা করলাম। শক্তিপদর দু' চোখই খোলা রয়েছে আর দু' চোখেই আতঙ্ক ফুটে। ওর নাক-মুখের কাছে হাতটা রাখতে বুঝতে পারলাম নিশ্বাস পড়ছে। চলে তাড়া দূর হল বটে, কিন্তু এই ঝাঁড়ার মধ্যে রাত্রির ওপর ওকে কতক্ষণ আগলে রাখা যায়? অন্য কোন উপায়ও নেই। আমি একা শরীরেও ওকে তুলে নিয়ে চলতে পারব না, আর এখন ও যাবার ধারার অবস্থা আছে। এখানে চিৎকার করে গলা ভাঙিয়ে ফেললেও কারো সাড়া পাবার আশা নেই। অগত্যা সেই ভাবেই বসে রইলাম।

এইভাবে কতক্ষণ কেটেছে জানি না। ঐ অবস্থায় আচমকা দুটি ঝিরে শক্তিপদর পাশে শুয়ে কখন তন্দ্রা এসেছে, হঠাৎ মানুষের গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম। ঘুরে চেয়ে দেখলাম দুটো মূর্তি এই পথে এগিয়ে আসছে। চাঁদের আলো তখন ম্লান হয়ে এসেছে। এ অবস্থায় কারুর সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই। চাঁদাতে বা ডাকাতও হতে পারে। তাছাড়া এত রাত্তিরে কেই বা নদীর ধারে আসতে যাবে? এ অবস্থায় চিৎকার করে ডাকতেও সাহস হল না। ইতিমধ্যে মূর্তি দুটো আরো কাছে এগিয়ে এসেছে। দেখলাম দুজনেই দুটো টর্চ জেলে চারদিকে আলো ফেলছে। মুহূর্তে আশা ও আতঙ্কে বুক চিপচিপ করতে লাগল। হয়ত এরা শক্তিপদর চাকর, তাহলে এ যাত্রায় রক্ষা পেলাম। আর তা না-হলে? হঠাৎ 'সীতারাম' শব্দটা কানে এসে পৌঁছাল। সীতারাম শক্তিপদর পুরনো চাকর। চেঁচিয়ে ডাকলাম ওদের। সীতারাম আর বাবুর্চি কাছে এসে দাঁড়াল। দুজনের হাতে দুটো লাঠি আর টর্চ। শক্তিপদকে ঐ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে দুজনেই কেঁদে ফেলল।

আমি ওদের ধমক দিয়ে নিরস্ত করে বললাম, ভয়ের কিছু নেই। এখুনি সাহেবকে তুলে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে, আর ডাক্তার ডেকে আনতে হবে। দেরি হয়ে গেলেই বিপদ হতে পারে। ওরা দুজনে ধরাধরি করে অনেকটে শক্তিপদকে যখন বাড়িতে এনে শোয়াল রাত তখন দুটো। ওদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম, বাইরখানের

(বাকিটা ১৪১ পৃষ্ঠায়)

রত্নাকরের রত্ন সন্ধানে

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

উনবিংশ শতকে 'বিজ্ঞানের উৎসাহী 'বিশ্বাস করো' সাহিত্যিক জুল ভার্ন বৈজ্ঞানিক বাস্তবানুগ যেসব উপন্যাস লেখা করে গিয়েছেন, তেমনি [illegible] আজ হয়ে থাকবে। '৮০ দিনে ভূপ্রদক্ষিণ', 'আশ্চর্য দ্বীপ', 'চন্দ্রলোকে যাত্রা', 'সাগরিকা' এগুলো তাঁর কল্পনাপ্রসূত। পড়ে আজকে ছয় দশকের বৈজ্ঞানিক দুরদৃষ্টি দেখে। আজকের দুনিয়ায় তাঁর সেই বহু কাল্পনিক বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। ভূপ্রদক্ষিণ করতে ৮০ দিনও লাগে না। চন্দ্রলোকের পথে মানুষ ইতিমধ্যে ছোট ছোট পা পা করে এগিয়ে যাচ্ছে। সাগরিকার নায়ক ক্যাপ্টেন নিমো সমাজের অন্যায়-অবিচারের প্রতিকারের জন্যে 'নটিলাস' নামে পৃথিবীর মত ডুবোজাহাজ নিয়ে মহাসাগরের অতল তলে পাড়ি দিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন নিমোর নটিলাসের মাধ্যমে জুল ভার্ন [illegible] সাগরতলের দুনিয়ার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞান আজ তাঁর সেই কল্পনাও বাস্তবে রূপায়িত করেছে।

ভূপদার্থবৈজ্ঞানিক বছরের গবেষণা কার্যক্রমের একটি প্রধান বিষয় ছিল সামুদ্রিক গবেষণা। উত্তর ও দক্ষিণ মেরু মহাদেশ থেকে আরম্ভ করে সারা দুনিয়ার প্রত্যেকটি সাগর-মহাসাগর নিয়ে গবেষণা করার ব্যাপারে আটটি [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

● সুমাত্রার পশ্চিমে ভারত মহাসাগরে ভূকম্পন প্রতিরোধ চক্র

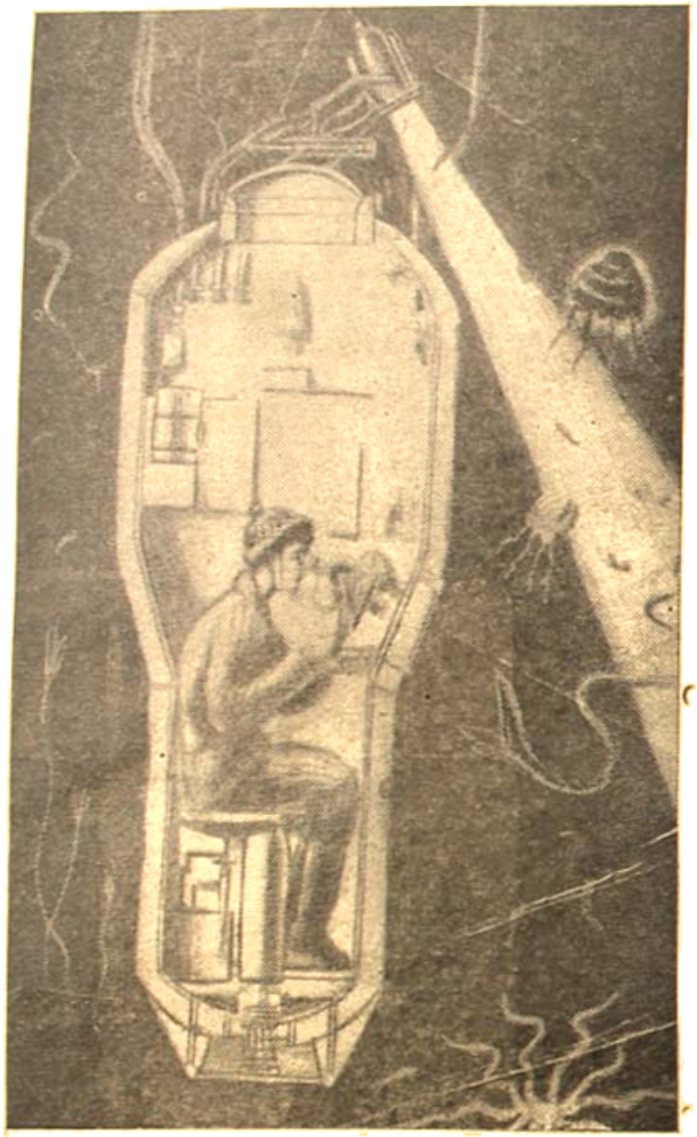

● নেক গবেষণা বেত্রে সমুদ্রের ৭০০ মিটার নীচে পর্যবেক্ষণকক্ষ

পেয়েছেন যার গভীরতা হচ্ছে ৩০৬০ মিটার অর্থাৎ তিন মাইলের মত।

আজকের দুনিয়ায় পৃথিবীর চুম্বকশক্তি-প্রতিরোধী একমাত্র জাহাজ হচ্ছে 'জারিয়া'। মহাযুদ্ধের আগে অবশ্য এই ধরণের একটি জাহাজ আমেরিকার ছিল। কিন্তু 'কার্নেগি' নামে সেই জাহাজটি ১৯২৯ সালে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। তারপর এই ধরণের জাহাজ আর হয় নি। নাবিকদের জানার পিতলের বোতাম এবং হেলে পিতলের বল্টস্ থাকে এই জন্যে যে, পিতল হচ্ছে চুম্বক-প্রতিরোধী। জারিয়া জাহাজের যে অংশ জলে ডুবে থাকে সেটি পিতলে মিড়ে মোড়া; লঙ্গর, কলকব্জা ইত্যাদি সবই পিতলে মোড়া। জারিয়া জাহাজ তার ৩০ হাজার মাইল সমুদ্র ভ্রমণের পথে ভারতবর্ষের কয়েকটি বন্দরে আসবে। জারিয়ার কর্তব্য হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরে ভূ-তত্ত্বের চৌম্বকশক্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

তবু ও জারিয়ার অন্য সহকর্মীদের নাম হেনা, লোমনোসফ, ওয়েইকফ, সেবাস্তোপল সেভিয়েত (সেভিয়েত মানে এখন সোভিয়েত বিজ্ঞানবহী ১৯২০ সাল থেকে আরম্ভ করে উত্তর মহাসাগরের বহু গবেষণার সাহায্য করে। ১৯৬২ সালে আর্কটিক মহাসাগরে ভাসমান বরফের চাপে জাহাজটি ডুবে যায়। এবং তিতিয়াজ।

ভারত মহাসাগরের গভীরে

'তিতিয়াজ' জাহাজখানি ১৯৫৯ সাল থেকে ভারত মহাসাগরের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে আসছে। আজ সে কুলে এসে ভিড়েছে আমাদের এই বন্দরকাতায়। ভারত মহাসাগরে এর আগেও সে আর একবার এসেছিল। এইবার নিয়ে তার তেত্রিশবার সাগরযাত্রা হল। কলকাতায় এই ধরণের জাহাজ এর আগে আর আসে নি।

প্রশ্ন উঠতে পারে মহাসাগর নিয়ে বিশেষ করে ভারত মহাসাগর নিয়ে এত মাথা ঘামানোর সার্থকতা কোথায়। সামুদ্রিক বিদ্যাচর্চা আজকের নয়। যুগ যুগ ধরে মানুষ সমুদ্র নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আসছে। আজ সে মহাসমুদ্রের এত রহস্য জেনে ফেলেছে, এমন কি চাঁদের পিঠ সম্পর্কেও অনেক কিছু সন্ধান পেয়েছে কিন্তু ভূ-তত্ত্বের চারভাগের তিনভাগ সম্পর্কে সে এখনো বিশেষ কিছুই জানে না। অথচ মহাসাগরের গর্ভে মানুষের পক্ষে কল্যাণকর কত অফুরন্ত সম্পদ যে লুকিয়ে আছে তার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। অনিঃশেষ তাপপারমাণবিক শক্তি-আধার, অপরিমেয় খনিজসম্পদের অধিকারী এবং অফুরন্ত জৈব আহার্যের উৎস এই মহাসাগর।

মহাসাগরকে না চিনলে, না জানলে আমাদের দুনিয়ার একটা বিরাট অংশকেই চেনা-জানা হোল না। সোভিয়েতের অন্যান্য বিজ্ঞানব্রতীর মত তিতিয়াজও ব্রত গ্রহণ করেছে সেই সমুদ্রকে চেনা-জানার ব্রতের।

ভারত মহাসাগর প্রাচীনকাল থেকে, বনস্পতি ও চাঁদ সদাগরের আমল থেকে প্রাচী ও প্রতীচীর যোগসূত্রে হয়ে জাহাজ চলাচলের পথ যেয়ে রিয়েছে। কিন্তু তবু ভারত মহাসাগর সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। ভারত মহাসাগরের গর্ভের মানচিত্রের অধিকাংশ জায়গাই এখনো অচিহ্নিত হয়ে রিয়েছে। তিতিয়াজ গত তিন মাস ধরে ভারত মহাসাগরে ঘুরে ঘুরে সমুদ্রের রহস্য উদ্ধার করছে।

ভারত মহাসাগরের উত্তর ভাগে আরব উপসাগরে তিতিয়াজের বৈজ্ঞানিকরা সাগর-গর্ভে এক সাড়ে তিন কিলোমিটার (২·২ মাইল) উঁচু পর্বতমালা আবিষ্কার করেছেন। সেই পর্বতমালার উত্তর-পশ্চিম দিকের ঢালুতে

৪০০০ মিটার গভীর খাদ আছে (প্রায় তিন মাইল)। ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন জায়গায় ভিত্তিয়াজ জাহাজ এরকমের আরো বহু পাহাড়-পর্বত আবিষ্কার করেছে।

ভিত্তিয়াজের বিজ্ঞানী অভিযাত্রীরা ভাগটি দলে বিভক্ত। সামুদ্রিক পদার্থবিদ্যা (ফিজিক্স), ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ইত্যাদি বিজ্ঞানের শাখা-উপশাখার ভিত্তিতে এই দলগুলি গঠন করা হয়েছে। জলরাশি ও জলপ্রবাহ পরীক্ষা করা, সমুদ্র ও আবহমণ্ডলের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সাগরতলের ভূপ্রকৃতি, বিভিন্ন জলজ প্রাণী, মাছ ও জৈবপদার্থের সংখ্যা ও সন্ধান, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা, এই হচ্ছে তাঁদের কাজ।

ভিত্তিয়াজের ফলাফলবিজ্ঞানীরা আরব উপসাগরের পূর্বভাগে এক আজব ব্যাপার দেখেছেন। সমুদ্রের ১২৪ থেকে ১০০০ মিটার পর্যন্ত গভীরে তাঁরা হাইড্রোজেন-সালফাইড বিশ্রিত জলপ্রবাহ দেখতে পান। এই রাসায়নিক পদার্থটির অনুপাত যেখানে যত বেশি, সেখানে জলে অক্সিজেনের পরিমাণ তত কম। কোথাও কোথাও অক্সিজেন নেই বললেই চলে। এই আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখনো পর্যন্ত এক কৃষ্ণসাগর ও দু-একখানে সাগর ছাড়া আর কোথাও এই ধরনের ব্যাপার দেখা যায় নি।

গত ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি ভিত্তিয়াজ ভারত মহাসাগরের দক্ষিণভাগে চাগস দ্বীপপুঞ্জের 'ডিয়েগো গার্সিয়া' নামে প্রবাল দ্বীপের এলাকায় সফর ফেলে সেখানকার জৈববাস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। চাগস দ্বীপপুঞ্জ সাধারণ জাহাজ চলাচলের পথ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত বলে কোন জাহাজ বড় একটা সেদিকে যেঁষে না। আদিম দ্বীপবাসীরা সোভিয়েত অভিযাত্রীদের খুব আদরযত্ন করে, তাদের ডাব দিয়ে আপ্যায়িত করে। তেমনি অভিযাত্রীরাও কালো-আদমিদের সঙ্গে কবনবন্ধন করতে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। এই ধরনের ডাব তারা এর আগে আর দেখে নি। সোভিয়েত নাবিকরা তাদের সঙ্গে করে জাহাজে নিয়ে গিয়ে একটি টেক্‌নিকালার ছবি দেখান। সে অভিজ্ঞতাও তাদের জীবনে এই প্রথম।

দ্বীপবাসীদের সাহায্য নিয়ে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকরা সেখানকার সাগরতলের থেকে জলজ প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করেন, তার মধ্যে এমন জীবও আছে যা বিজ্ঞানের কোন গ্রন্থেই নেই।

ডিয়েগো গার্সিয়া প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ থেকে পূর্বদিকে ভেসে চলতে চলতে বৈজ্ঞানিকরা এক জায়গায় সমুদ্রতলের সাহায্যে বুঝতে পারেন যে, সেখানে জলের তলায় বিরাট এক আগ্নেয় পাহাড় সফর ফেলেছে। জাহাজ সেইখানে থেমে জলের নীচে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, পাহাড়ের তলার জল কালো মলের ম্যাগনেনিজ ধাতুপ্রলেপে পরিপূর্ণ।

ভূপদার্থ-বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সমুদ্র আবিষ্কার উত্তর পূর্ব উপকূলের কাছে অভিযাত্রী তুলনায় ও রোমালী জাতের ম্যাকারেল মাছের বড় বড় ঝাঁক দেখতে পান। এই দুটি মাছ অবশ্য উপাদেয়। সুতরাং ঐ জায়গায় মাছ চাষের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলে প্রচুর লাভ হতে পারে।

সাগরতলে ভূস্তরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয় বিস্ফোরকের সাহায্যে। বিভিন্ন নির্বাচিত স্তরে বিস্ফোরণ ঘটালে যে শব্দ-প্রবাহের উৎপত্তি হয়, সেগুলি বিশেষ শব্দঘরে রেকর্ড করা হয়। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ভারত মহাসাগরে বহু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করা হয়েছে। আজ যেখানে ভারত মহাসাগর, অতীতে এক সময় সেখানে এক মহাদেশ ছিল, যার অবলুপ্তি ঘটেছে

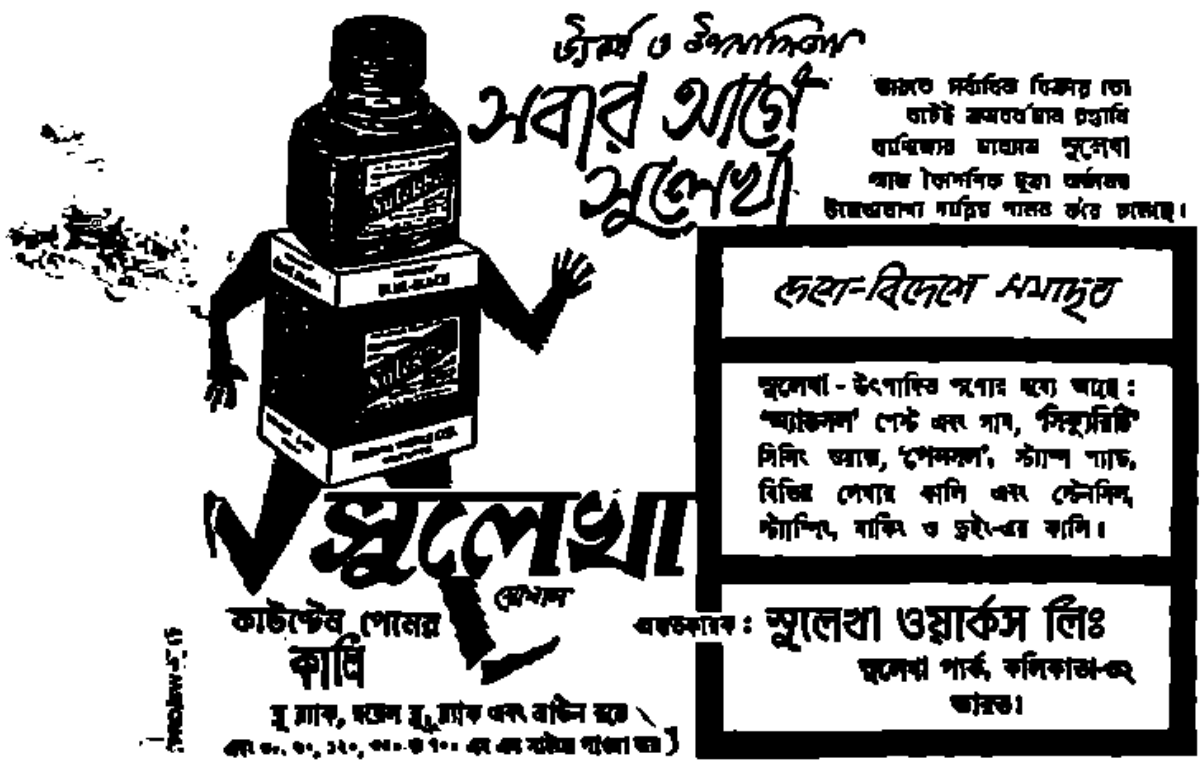

বিজ্ঞানীরা বাঁধানুকের প্রেমেই মুগ্ধের নয়। সেই অবশুপ্ত নাগরাজের অবদান ও সম্ভাবনা নির্ণয়ে এই গবেষণার উদ্ভব

বিজ্ঞানীদের গবেষণা শুধু মহাসমুদ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তাঁদের ক্ষেপণি-বিজ্ঞানীর সন্ধান থেকে পৃথিবীর চারটে উপগ্রহগুলির এবং ক্ষেপিয়েরের মানমন্দির-গুলি থেকে ছবাশয়ের যে অংশগুলি দেখতে পাওয়া যায় না, সেগুলির আলোকচিত্র তুলেছেন।

এরকমের সমীক্ষাতেই দেখাই যাবে হবে বিজ্ঞান মতের পরে 'ক্লিভিয়েন্ড' জাহাজ ভারত-মহাসাগরের মধ্যবর্তী জায়গায় সমুদ্রের তলার মাঝামাঝি বাঁধানুকের সন্ধান পেয়েছে। সেই স্তূপ তৈরি হয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বাঁধানুকির মধ্যবর্তী ১০ লক্ষ বছর আগেকার ছাইয়ের জীবাশ্মীভূত নীল সংগ্রহ করা গিয়েছে। এক একটি নীল প্রায় চার ইঞ্চি লম্ব আজকালকার বড় বড় জাহাজ তিন লক্ষের মত হয়, কিন্তু সেগুলির নীলের দৈর্ঘ্য ২ ইঞ্চির বেশি হয় না। ভারত-মহাসাগরের তলায় এই সব আগ্নেয়গিরি স্তূপ ২৫০০ থেকে ৮০০০ মিটার পর্যন্ত উঁচু অর্থাৎ সোনে দুই মাইল থেকে ৫ মাইল। ঐ এলাকায় বহু নতুন ধরনের প্রাণীরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

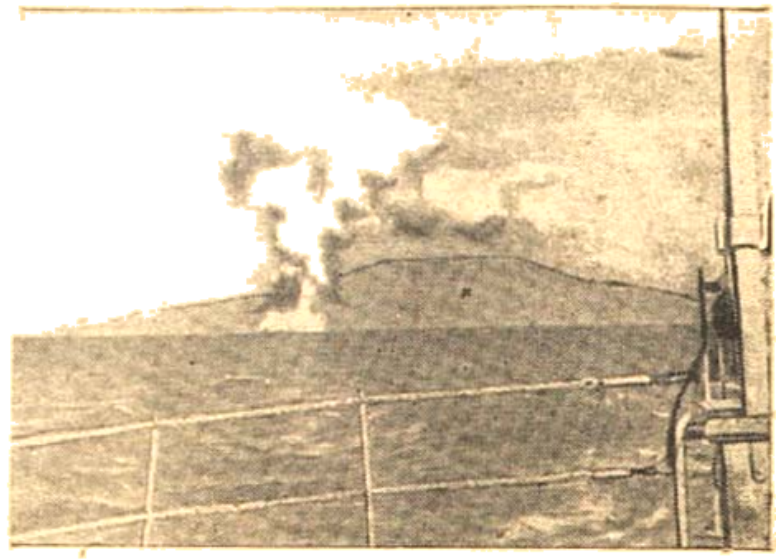

● অতলান্তিক মহে বিজ্ঞানীরা মিথাইল সোনালোরেকের সামনে ১৯৫৮ সালে এক নতুন বাঁধের অনুসন্ধান।

বৈজ্ঞানিক ডুবোজাহাজ-সেভেরিয়ানকা

ক্লিভিয়েন্ড জাহাজ এ পর্যন্ত ৫০ হাজার মাইল সমুদ্রযাত্রা করেছে এবং সেই সঙ্গে অসংখ্য জায়গায় লক্ষ ফেলে পরীক্ষা চালিয়েছে। এ কাজে সে আরো মাস ছয়েক মহাসাগরে থেকে তারে স্বদেশে ফিরে যাবে।

এইবার আর একটি জাহাজের কথা বলব, যেটি মহাসমুদ্রের গভীরে গবেষণা করার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। সেটি একটি ডুবোজাহাজ। কশ নৌবহরের এই ডুবপূর্ব ডুবতরীটিতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বিয়ে সাজিয়ে সাগরতলের রহস্য সন্ধানে লাগানো হয় ১৯৫৮ সালে। জাহাজটির নাম 'সেভেরিয়ানকা'। এই ডুবো গবেষণাগার সম্পর্কে রুশদেশী বিজ্ঞানপত্রিকা 'বিজ্ঞান ও জীবন' মন্তব্য করে :

'সমুদ্রবৈজ্ঞানিক ডুবোজাহাজ! এমন আশ্চর্য কথাও আজ শুনতে হবে এবং তার কৃতিত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের, কারণ সমুদ্রবিজ্ঞানের সমুদ্রের উপর থেকে সমুদ্রের গর্ভে নিয়ে যাবার ব্যাপারে সেই সবচেয়ে আগে অগ্রণী হল। আজ নানান বিষয়ে জানবার জন্যে ঐ জাহাজে করে অনায়াসে সমুদ্রের নীচে নামের খাসবহলে চলে যাওয়া সম্ভব হবে।'

সত্যিই মানের খাসবহলে যাওয়া সম্ভব হয়েছে এবং মানের সম্পর্কে অনেক কিছু নতুন করে পাওয়া গিয়েছে। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে একদল বৈজ্ঞানিক ও নবজ-বিজ্ঞানী নিয়ে সেভেরিয়ানকা উত্তর মহাসাগরের বারেন্টস্ সাগরের মধ্যে তলিয়ে যায়। জাহাজে আছে হাজারো রকমের যন্ত্রপাতি যেমন জলের তাপ ও লবণাংশ মাপবার পারমাণবিক যন্ত্র, জলের তেজস্ক্রিয়তা মাপবার যন্ত্র, মানের উপস্থিতিসূচক পরখন যন্ত্র ইত্যাদি।

ক্যাপ্টেন নিমোর নটিলাসের মত সেভেরিয়ানকার গায়ে দুপাশে দুটি এবং উপরের দিকে একটি জানালা আছে, সেই জানালা দিয়ে সমুদ্রগর্ভে সার্চলাইট ফেলে আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র তোলা যায়।

কল্পিত 'নটিলাস' যে পথ দিয়ে মেরুতে গিয়ে জাল হয়ে যায়, আজকের 'নটিলাস' সেভেরিয়ানকা নরওয়ে উপকূলের কাছে ঠিক সেই পথ দিয়েই ঘুরে এসেছে এবং সমুদ্রের তলার মেরু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শহীদ পার্লিনু জাহাজকে নমস্কার জানিয়ে এসেছে।

রুশিয়ার সর্বাধুনিক সমুদ্রবৈজ্ঞানিক জাহাজ 'লেনিন' সাগরতলের ইতিহাসে নতুন যুগের অগ্রদূত। সাধারণ জাহাজের যে জলপথ পার হতে ১৫০ টন কয়লা লাগে, সেই পথ মেরে পরমাণুশক্তিচালিত লেনিনের লাগে মাত্র কয়েক গ্রাম ইউরেনিয়াম। টাইটানিক জাহাজ যে ভাসমান ডুবোপাহাড়ের আঘাতে ভেঙে গিয়েছিল, সেরকম ডুবোপাহাড় লেনিনের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এতদিন উত্তর মহাসাগরের জল জমে বরফ হয়ে জমে গেলে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যেত। এবার লেনিন জাহাজ সেই বরফ কেটে পথযাত্রী তরীর যাতায়াত অক্ষুণ্ণ রাখবে এবং সেই সঙ্গে বেতার-গবেষণার সাহায্য করবে।

'Thou hast commited
Fornication : but that was in
another country—'

মনের ভিতরে ঘর

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

হিথ স্ট্রোর থেকে ডুবার স্ট্রিট কথা ট্রিলার্ডের বক্তৃতাটি—এখন যে সব কিছুই ছিল না।

এক-একটা স্কাইলার্ক ডানা কাপটে অনেক দূরে উড়ে যাচ্ছিল। আর তখনও কখনও দু-একটা চঞ্চল কাকলি করেক মুহূর্তের জন্য নির্জন সবুজ ঘাসে ঠোঁট ঘষছিল।

এলোমেলো বাতাস আর এপ্রিলের ঝলমলে রোদ্দুর বড় বড় গাছের গায়ে গড়িয়ে পড়ছিল—লুটোপুটি খাচ্ছিল। সেই সব পুরনো গাছ আবার যৌবন ফিরে পেয়ে ঘুমন্ত সবুজ আওরাজ তুলেছিল।

মার্বল আর্চে হাইড পার্কের কাছাকাছি ফুটপাতে আদিনাথ একটা সিগ্রেট ধরালো। দূরের গাছগুলো দেখল। কাছাকাছি অনেক মানুষ ছিল। একজন 'চক-আইস্—চক-আইস্' বলে খুব জোরে চিৎকার করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল।

একটা রঙচঙের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল আদিনাথ। ঠাণ্ডার কথা মনে ছিল না কিন্তু তার বুকের মধ্যে কনকন করে উঠল। আবেশে চোখ দুটো ছোট হয়ে এল। আর তখন আদিনাথ নিজের নিশ্বাসের শব্দও শুনল।

মার্বল আর্চে ঠাণ্ডার যৌবনের পুরনো গাছ দেখতে দেখতে হঠাৎ কিছু সময়ের জন্যে আদিনাথ ভুলে গিয়েছিল যে, তার সঙ্গে আরও একজন আছে। এখন হঠাৎ তার যৌবনের কথা মনে হল।

'বোকা, চক-আইস্ খাবি?'

'না', জোরে জোরে মাথা নাড়ল যৌবন।

'চা, কফি—কি খেতে ইচ্ছে করছে বল?'

'কিছু না।'

'তবে চল আমরা পার্কের ভেতরে যাই।'

যৌবন কথা বলল না। আদিনাথের সঙ্গে চুপচাপ হাঁটতে লাগল। তার পাশে-

পাশে টেনে নেবার সঙ্কেত। কিন্তু যখন ইচ্ছে থুয়ে সে এক-একবার 'পিছিয়ে পড়ছিল। কিন্তু অনিমেষ তার হাত ধরে হাসে আবার নিজের পাশে টেনে নিচ্ছিল।

'তোর কি হয়েছে খোকা?'

'কিছু না।'

সিনেমা দুজনের ভালো লেগেছিল। অনেক আস্তে আস্তে বেরিয়ে বেরিয়ে ভীড় হালকা হয়ে এল। ইংরেজ কাপলটার খুব তাড়াতাড়ি ভীড় মুছে যাচ্ছিল। আধিনাথ চোখ মেলে একবার চারটাই দেখে নিল। ঘন-উজ্জ্বল মাঠ এখানে-ওখানে অনেক ছেলেমেয়েকে বুকে করে রেখেছিল। ওরা শুয়ে ছিল, বসে ছিল। হাসতে-হাসতে কথা বলছিল। একজন আর একজনের মুখের কাছে মুখও আনছিল।

অনিমাথ বলল, 'এখানে আসবার পর তুই একেবারে চুপচাপ হয়ে গেছিস! কেন? কষ্ট হচ্ছে কোথাও?'

একবার মুখ তুলে আধিনাথকে দেখল গৌরীন। তাড়াতাড়ি আবার মুখ নামিয়ে নিল। একটা অদ্ভুত ভাবে এখন আধিনাথের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পারছিল না। পার্কে যে সব ছেলেমেয়েরা যেভাবে উপভোগ করতে করতে মনের উল্লাসকে পরস্পরের কাছে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করছিল, গৌরীন তাদের দিকে তাকাতে পারছিল না।

আধিনাথ গৌরীনের পিঠে জোরে হাতের চাপ দিয়ে আবার বলল, 'কথা বল খোকা।'

'হ্যাঁ, ভালো লাগছে।'

'তা হলে অমন কাদা-কাদা মুখ করে থাকিস কেন সব সময়?'

আধিনাথ এমন করে বলবার পরেও চুপ করে থাকল গৌরীন। মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে ঘাসের ওপর পা ফেলল। একটা কথা যা সে আধিনাথকে বলতে চাচ্ছিল, 'তোমাকে ছেড়ে আমি আবার হয়ে গেছি'—তা স্পষ্ট করে তাকে বলতে পারবে না বলেই গৌরীন চুপ করে ছিল।

কিন্তু সে কিছু না বললেও আধিনাথ হয়তো তার মনের কথা অল্প অল্প বুঝতে পারছিল।

আধিনাথ বুঝতে পারছিল যে, গৌরীন এখানে আসবার পর তার বন্ধুর চোখা ছেড়ে কিছু হয়ে গেছে। বেশ্যার ঘরে যখন যারা যায় তারা সঙ্গে করে পয়সা ছাড়া যেন কিছু আনে না। বেশ্যাও তার সঙ্গে কিছুক্ষণ—তার দাম চুকিয়ে দিন অবধি একটা নির্লিপ্ত মানুষের মতো ব্যবহার করে এসেছে—এখন সেই এক লোক বিনিময়ে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে এত এলোমেলো—এত দুর্বল—এত অসহায় হয়ে উঠল কেমন করে!

সে-সময় আধিনাথের নিজের কাছেও হয়তো এমন একটা বিস্ময়—একটা অদ্ভুত আবিষ্কার। কিন্তু এই ভাবনা আধিনাথকে বিচলিত করছিল। যন্ত্রণা দিচ্ছিল।

তাই বেশি কথা বলছিল আধিনাথ। কথা বলে-বলে সে তার মনের আর আবিষ্কারের অনেক এক সঙ্গে অনুভব করছিল।

হাইড পার্কের একদিকে একটা ফাঁকা-ফাঁকা জেলের জল সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছিল আর সেখানে ছেলেমেয়েরা এক-একটা নৌকো নিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। আধিনাথ লেকের কাছে এসে থামল। গৌরীনের দিকে তাকাল।

'খোকা, নৌকো চড়বি?'

'না।'

'কেন? তোর কি হয়েছে?' একটু উত্তেজিত হয়ে আধিনাথ বলে উঠল, 'এমন মুখ করে এখানে কেউ থাকে না। আমি যখন প্রথম এখানে এসেছিলাম—' আধিনাথ হঠাৎ চুপ করল।

আধিনাথের কথা শুনে মুখ তুলল গৌরীন। তার চোখে কৌতূহল ফুটে উঠেছিল। আধিনাথকে প্রশ্ন করবার সাহস তার এতক্ষণ ছিল না কিন্তু একটা জিজ্ঞাসা তার দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে আধিনাথ। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার জন্য সে আবার একটা সিগ্রেট ধরাল, 'চলি খোকা, প্রথম-প্রথম এখানে এসে কিছুই ভাল লাগে না। বড় একা-একা মনে হয়। দেশের কথা মনে পড়ে। এদের সঙ্গে মানাতে খুব কষ্ট হয়—'

ধোঁয়ার লম্বা হচ্ছিল না আধিনাথের। তার খুব গরম লাগছিল। এই লেখে একদিন ভুবার করেছিল—শিমুল তুলোর মতো—ভিজে দেশলাইর মতো নরম ভুবার! কোন-কোন অসতর্ক মুহূর্তে সেসব কথা মনে হচ্ছিল আধিনাথের। আর সে তখন অন্যদিকে দেখছিল।

'আমি তোকে হয়্যাণ্ড পার্কের প্রাইভেট বোর্ডিংহাউসে রেখে যাব না। তখানে থাকতে তোর ভাল লাগবে না আমি জানি।'

একবিন্দু চুপ করে থেকে আধিনাথ আবার বলল, 'আজই সাজের পর তোকে আমি সেন্ট্রিসের একটা বাড়িতে নিয়ে যাব। যাযাকে বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয় ভাল ইংরেজের বাড়ি। একটা ভাল বাড়িতে পেয়িংগেস্ট হয়ে থাকলে দেখবি এই সব কিছুকেই তোর একেবারে অন্য রকম লাগবে—তুই সব ভুলে যাবি।'

হঠাৎ জোরে হেসে উঠল আধিনাথ।

'প্রাইভেট বোর্ডিংহাউসগুলো বড় ঘাঁটি-ঘাঁটি। ওখানে থাকলে তোর সব সময় নিজেকে বিদেশী বলে মনে হবে,' আর একবার সে চারপাশে তাকিয়ে নিল, 'তা মনে হলে তো চলবে না, তোকে অনেকদিন থাকতে হবে এখানে। পড়াশুনো শেষ করতে হবে।'

ওরা আবার হাঁটতে সুরু করেছিল। কিন্তু গৌরীনের একটা হাল্কা-হাল্কা আরামে বলতে ইচ্ছে করছিল। এখন তার চক-আইস্‌ও খেতে ইচ্ছে করছিল। তবুও সে আধিনাথকে তার ইচ্ছার কথা বলতে পারল না।

আধিনাথ বলল, 'খোকা, তোকে এখানে রেখে আর ঠিক সাতদিন পরে আমি চলে যাব। তারপর তুই একা থাকবি। একটা কথা শোন, এখানে তোর যা ভাল লাগে তুই তাই করবি—' অনেকক্ষণ ইতস্তত করল আধিনাথ। একটু ঘুরে রঙ-বেরঙের ফুল হাওয়ায় দুলছিল, তা দেখতে দেখতে বলল, 'যদি তোর কখনও বাউকে ভাল লাগে তা হলে আমার কথা ভেবে তার সঙ্গে আর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিস না—তার কাছে মিথ্যা কথা বলে একটা ভাঁড়ুর মতো এখান থেকে পালিয়ে যাস না।'

যেন একটা শক্ত কাজ খুব সহজে করতে পেরেছে এমন ভাব নিয়ে আবার আধিনাথ হাসল। সে এখানে এসে গৌরীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাচ্ছিল। তার আর একটা রূপ যা গৌরীন জানে না তা সে এখানে তাকে তাজা রোদের মতোই স্পষ্ট করে দেখাতে চাচ্ছিল। ঘরদার একটা পিঞ্জর থেকে আধিনাথ যৌবনের আনন্দলোকে পৌঁছে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল।

আর একবার চমকে উঠল গৌরীন। আর একবার মাথা তুলল। তারপর আবার মুখ নামাল। আধিনাথ দেখল তার মুখ লজ্জায় খুব করুণ হয়ে গেছে। আর হয়তো, আধিনাথের মনে হল, গৌরীনের চকিত দৃষ্টিতে প্রগাঢ় বিস্ময়ও ছিল।

অকারণে হো-হো করে হাসল আধিনাথ,

'খোকা জানিস, আমাদের দেশের মানুষগুলো এখানে কখনও-কখনও ভীষণ ভয় পায়—কখন জানিস?'

'না।'

'যখন তাদের দেশে ফিরে যাবার সময় হয়। ওই দেখ খোকা কত ছেলেমেয়ে—' আদিনাথের খুব ইচ্ছা হচ্ছিল, তার হাতে হাতে যে-অনুতাপ জমা হয়েছিল, আজ তা হলফুড় করে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

'খোকা?'

সৌরীন আদিনাথের মুখের দিকে তাকাল। কথা বলল না। কিন্তু তার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল। আদিনাথের সঙ্গে এদেশে এসে তার চোখের সামনে থেকে একটা রহস্যের জাল ছিঁড়ে যাচ্ছিল। আর কখনও-কখনও তার কথা শুনতে-শুনতে সৌরীনের মার কথা মনে পড়ছিল। তখন তার খুব দুঃখ হচ্ছিল। সে বড় গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল।

'আমার কথা শুনছিস?'

'হ্যাঁ।'

বুক-পকেট থেকে লাল ওঁড় করা রুমাল বের করে আস্তে একবার কপালে বুলিয়ে নিল আদিনাথ, 'ওই দেখ, ওই যে জলের ধারে, এদিকে গাছের ছায়ায় ঘাস ঢেকে আছে ওরা হল লাভারস্—'

আদিনাথ এখন সৌরীনের দিকে তাকাতে পারল না। একটা অস্বাভাবিক ঘোরে সে কথা বলে যাচ্ছিল। কথা বলতে-বলতে সে সৌরীনের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাটাও ভুলে যাচ্ছিল। যৌবনের দীপ্তিতে, চিত্ত রেখার বহিমায় তার চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

'খোকা?'

'হুঁ?'

'এখানে একটু বসবি?'

'না।'

'এখনও লাঞ্চের আধঘণ্টা দেরি—কিছু খাবি?'

'না।'

আদিনাথের গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। সৌরীন সঙ্গে না থাকলে হয়তো সে পার্কের কোণায় একটা ছোট ঘরে একা-একা বসে অনেকক্ষণ ধরে বিয়ার খেত। সে-ইচ্ছা এখন প্রবল হচ্ছিল আদিনাথের।

'এই জায়গার সবার তুই কোথায় যাবি, সেখানেই দেখবি মানুষ—অসংখ্য মানুষ। সব বয়সের ছেলেমেয়ের ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এরা কেন বাইরে আসে জানিস খোকা?'

আবার সেই এক ছোট্ট উত্তর দিল সৌরীন, 'না।'

'এই সব ছেলেমেয়ের কাছে—যারা পাশাপাশি বসে আছে, যাদের ওপর পড়ন্ত রোদ তাদের কাছে হাল্কা রোদ হল অঘ্রানের মতো। ওরা এই রোদের আমেজ নিজেদের খুব স্পষ্ট করে দেখে নেয়।'

'দেখ খোকা, তুই বড় হলে সংসার করতে-করতে একটা সময়ের দামী জিনিস আস্তে-আস্তে হঠাৎ একদিন হারিয়ে যায়—তা কি জানিস?'

'না।'

একটু চুপ করল আদিনাথ, 'ও হল যৌবন। এদেশে এরা যৌবনকে অনেকদিন ধরে রাখবার চেষ্টা করে,' আপনার মতো কেন আদিনাথের মুখে ওপরও পড়েছিল, 'কিন্তু কেউ-কেউ—যারা আমাদের দেশ থেকে অনেকদিন আগে এখানে আসে তারা তাদের যৌবনকালেও ভয় পেত—জীবন ভয় পেত—কিসের ভয় জানিস?'

'না।'

আদিনাথ খুব জোরে হাসল, 'হারাবার ভয়—একটা মিথ্যা অহঙ্কারের ভয়। তারা ভাবত, একটা সম্পর্ককে অস্বীকার করতে পারলে আর সব মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক চিরকাল পাশাপাশি থাকবে।'

খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলছিল সৌরীন। হাওয়া সোঁ সোঁ শব্দ করছিল। সেই শব্দে আদিনাথের কথা কেটে-কেটে যাচ্ছিল। সৌরীন তার সব কথা শুনতে পাচ্ছিল না। কিন্তু প্রত্যেকটি কথা শোনবার ইচ্ছায় সে অধীর হয়ে উঠেছিল। তাহলেও আদিনাথের দিকে তাকাতে পারছিল না সৌরীন। তার খুব সঙ্কোচ হচ্ছিল।

'খোকা, শুনছিস?'

'হ্যাঁ'

'তোকে আমি একদিন হ্যাম্পস্টেড হীথে নিয়ে যাব। হ্যাম্পস্টেড হীথ এত ঘোলাটেলা নয়। গাছগুলো খুব ঘন—বড় বড়। সেখানে দেখবি—হয়তো এখনও পাহাড়ের মতো একটা খুব উঁচু জায়গা আছে—'

'খোকা, একদিন তুই এদিকে বনেও যাস। একেবারে জঙ্গল। সেখানে বড় বড় গাছের নীচে বসে তোর মনে হবে তুই ছাড়া এই পৃথিবীতে আর কোন মানুষ নেই।'

এতটা বলে আদিনাথ থামল। একটা স্মৃতি—একটা সুখ হয় মনে আসছিল। কিন্তু সব কথা স্পষ্ট করে সৌরীনকে বলবার ভাষা সে খুঁজে পাচ্ছিল না। যে-যৌবন একদিন মেঘের মেঘে আর ফুলের ভরসায় এখানেই ফেলে গিয়েছিল আদিনাথ—সে-যৌবন এক-এক ঋতুর আর কর্তব্যের চাপে তারই সময়ের গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল তা কেন সে আবার এখানে হঠাৎ ফিরে পাচ্ছিল।

তখন থেকে-থেকে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল আদিনাথ। সে সৌরীনের দিকে তাকাতে পারছিল না। আদিনাথ শুধু নিজের নিশ্বাসের শব্দ শুনছিল। মনের মধ্যে একটা গতি অনুভব করছিল।

'খোকা?'

'কি?'

'এখনও চুপ করে আছিস? কথা বল। আমাকে তোর যা খুশি জিজ্ঞেস কর?'

সৌরীনের মুখ দেখে মনে হল আদিনাথকে তার কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই। কিন্তু তার খুব চাঁপা লাগছিল। মনে লাগছিল কোট-টাই খুলে ফেলবার ইচ্ছে হচ্ছিল। তা হলেও আদিনাথের সঙ্গে চুপ করে হাঁটছিল সৌরীন। তার মুখ থেকে বিস্ময়ের রেখাটাও মুছে গিয়েছিল।

'খোকা', অনুচ্চস্বরে আদিনাথ ডাকল, 'আর, এরার ঘাসের ওপর অল্পক্ষণ বসি। লাঞ্চের সময় প্রায় হয়ে এল। আর একটু পরেই আমরা হাইডপার্ক কর্নার ছেড়েছেড়ি যাব। তারপর ঠেলাগাড়ি ঘোরতে থাকব, সে-বাড়ি যদি তোর ভাল লাগে তাহলে তুই ভাল থেকে কোনো খাবি।'

বাধ্য ছেলের মতো সৌরীন ঘাসের ওপর বসে পড়ল। ঘাসের সঙ্গে সঙ্গে একটু ঘুম-ঘুম একটা আভা দেখাচ্ছিল সৌরীনের কিছু ভাল লাগল না। তার বড় একা-একা লাগছিল। এখনও সে আদিনাথের সঙ্গে সহজ হতে পারল না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল আদিনাথ। এখানে বসে আবার সে সৌরীনের কথা ভুলে যাচ্ছিল। খুব শক্ত করে সে সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে রেখেছিল সন্তর্পণে ঠোঁট থেকে, ঘাসের ওপর থেকে সে আস্তে-আস্তে মুক্ত হচ্ছিল। আর তখন বুকের মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করছিল আদিনাথ।

যে-পরিপূর্ণতার স্বাদ সে সংসারের জীবিতে একদিন গ্রহণ করতে পারে নি—এখন এখানে এসে সেখানে আদিনাথ মুখোমুখি সৌরীনকে গ্রহণ করতে চেয়ার জন্যে

মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল। সে সৌরীনের মতো নিজেকে আবার নতুন করে ছুটির দুপুরে ভাবছিল। তাকে ঘিরেই আহিনাথ তার সব অনুভূতি দুলে ফেলবার ইচ্ছায় ব্যাকুল হচ্ছিল।

'খোকা!'

'ঁ?'

'এখনও ঘোলা হয়ে আছিস কেন? বাড়ির জন্যে মন খারাপ করছে?'

'না।'

'তোর খুব একা-একা লাগছে, না?'

সৌরীন ইচ্ছে করেই আবার জোরে জোরে মাথা নাড়াল, 'না না।'

আহিনাথ সৌরীনের একটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে হেসে বলল, 'একদিন এখানে তোর অনেক একা-একা লাগবে—তোর কথার ঠিক থাকবে না। নিজেকে এত নিঃসঙ্গ মনে হবে যে, তুই ভাববি তোর খুব বড় অসুখ হয়েছে। তোর আমার কথা মনে থাকবে না। বাড়ির কথা মনে থাকবে না। তোর কিছু ভাল লাগবে না। খোকা, তুই কি করবি তখন?'

আহিনাথ সৌরীনের উত্তর শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল। সে একদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু এখনও কোন কথা বলল না সৌরীন।

'বল খোকা—কথা বল!'

'আমি পড়াশুনো করব,' একটা পাখির মতো একসুরে খুব তাড়াতাড়ি কথা বলল সৌরীন।

'সে তো সকলেই করে,' মাথা দোলাল আহিনাথ। জোরে হাসল। সে আরও স্পষ্ট করে সৌরীনের সঙ্গে কথা বলতে চাইল, 'খোকা, এই-এ মুহূর্তে ঘরে বন্ধ হয়ে এখানে নীচ কাটানো যায় কিন্তু প্রীতি কাটানো যায় না—'

মুখ তুলে একবার সামনে তাকাল আহিনাথ। অনেক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। ঘোর দেখল। গাঢ় দেখল। এক নীতের রাত্রে একটা টিউব ট্রেনের কথা তার মনে হল। প্রীতির বিছেদে ফিউনারেল্স্-এ দীর্ঘকাল স্থায়ী সোদ্রিনির কথাও সে ভাবল।

একটা মুখ, সোনালী চুল, নীল-নীল চোখ আহিনাথের মনের অতল থেকে হাইডপার্কের কলস্বান ঘোরে ছায়া ফেলছিল। ঘরোঘরো আবেগে স্পষ্টস্বরে একটা খুব পুরনো কথা একেবারে নতুন করে আহিনাথ আবার শুনতে শাচ্ছিল, 'আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'খোকা, এ'ইল্যান্ড—এই দেশ তোকে ঘরের বাইরে টেনে আনবেই। যদি তুই একা এইসব জায়গায় আসিস, তখন তোর নিজেকে একটা অনাথের মতো মনে হবে। মনে হবে প্রত্যেকেরই কথা বলবার সঙ্গী আছে—শুধু তোরই কেউ কোথাও নেই—' আকাশের দিকে তাকিয়ে আহিনাথ দুঃখভরে বলল, 'তেমন অবস্থা তোর যেন কখনও না হয়!'

আহিনাথের পাশে খুব জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল সৌরীন। আহিনাথ তার সঙ্গে যতই অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করছিল সে ততই ভয়ে-ভয়ে তফাতে দূরে সরে যাচ্ছিল।

এখন সৌরীন সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে পড়তে চাচ্ছিল। নৌকোয় অনেকদূর ভেসে যেতে চাচ্ছিল। হুহু করে কথা বলতে চাচ্ছিল।

কিন্তু আহিনাথকে সে তার কোন ইচ্ছার কথাই বলতে পারল না।

হাইডপার্ক কর্নার হেডোর্ড থেকে লাফ মেরে ট্রিকদের সৌরীনকে সঙ্গে নিয়ে বাসে উঠল আহিনাথ। ঘোর পড়ে আসছিল। আকাশ হঠাৎ ঘনঘনে হয়ে গেল। হয়তো দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়বে।

খুব অল্প পথ। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। টিউব ট্রেনে এলে ওরা আরও তাড়াতাড়ি চেলসিতে পৌঁছে যেত। কিন্তু সময় কম লাগবে বলে ইচ্ছে করেই আহিনাথ বাস ধরেছিল।

রাস্তার নাম সিমুর ওয়াক। খুব ছোট রাস্তা। এপাশে-ওপাশে ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি। পাড়াটা খুব ভাল লাগল না আহিনাথের। এইসব বাড়িতে পেয়িংগেস্ট করে সৌরীনকে ছেড়ে যেতে তার মন সরল না।

কিন্তু কোন করেছিল বলেই এগিয়ে যাচ্ছিল আহিনাথ। নম্বর খুঁজছিল। ঘর দেখে ফেললেই হবে, পছন্দ হয় কি। রাস্তার বাঁ দিকে শেষ বাড়িটা আহিনাথ দেখল, পনেরো নম্বর।

দোতলা বাড়ি। বাইরে থেকে দেখলে হঠাৎ একলা মনে হয়। গেট নেই। রাস্তা থেকে কয়েক ধাপ উঠলেই কলিংবেল চোখে পড়ে। আহিনাথ সৌরীনকে কলটা দেখাতে। নিজে একবার বাড়ি দেখল। ওদের ঠিক এই সময় এখানে আসবার কথা।

'ইয়েস?' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল।

চমকে উঠল আহিনাথ। বয়স কোন বাঁধাধরা নয়—একটি মেয়ে—খুব কম বয়স। বিনীত স্বরে প্রশ্ন করল। মেয়েটি সৌরীনকে দেখে কি এক কৌতুকে প্রথম মেয়েটি মৃদু-মৃদু হাসছিল।

'মিসেস টেলার্স আছেন?' আহিনাথও হাসল। সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'আমি ওঁকে কোন করেছিলাম। আমাদের ঘর দেখতে আসবার কথা ছিল।'

'ভেতরে আসুন,' একটু ইতস্তত করে মেয়েটি বলল, 'কিন্তু দুজনের থাকবার মতো ঘর তো আমাদের নেই। আমি খুব দুঃখিত—'

'না না, আমি থাকব না,' হাসিমুখে তাকে থামিয়ে দিয়ে আহিনাথ বলল, 'এই ইয়ংম্যান—আমার ছেলে এখানে থাকবে। আর ইউ হ্যাপি নাও?'

মেয়েটি সরাসরি বলল, 'ইয়েস। আমার সঙ্গে আপনারা ওপরে আসুন। এপাশেই ঘর।'

কার্পেটমোড়া কাঠের সিঁড়ি। ওরা তিনজন আস্তে-আস্তে উঠতে লাগল। আগে-আগে মেয়েটি যাচ্ছিল। তারপর আহিনাথ। সবশেষে সৌরীন। কার্পেট থাকলেও ওদের জুতোর খসখস শব্দ হচ্ছিল।

আহিনাথ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখানেই থাক?'

'হ্যাঁ, মিসেস টেলার্স আমার মা।'

'তোমার নাম?'

'অ্যাকলিন।'

'বাঃ, সুন্দর নাম,' বিনীত উচ্চারণে আহিনাথ বলল, 'তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম।'

ঘর দেখবার আর দরকার ছিল না। অ্যাকলিনকে দেখেই নিশ্চিন্ত হল আহিনাথ। সৌরীন এখানেই থাকবে।

তাহলেও ঘর দেখতেই হল। ছোট ঘর। খুব খারাপ নয়। খাট ওয়ার্ডরোব আয়না ছোট টেবিল চেয়ার—সবই আছে। আহিনাথ বারবার অ্যাকলিনকে দেখছিল।

'খোকা?'

সৌরীন মাথা তুলে আহিনাথের দিকে দেখল।

'পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে থাকতে পারবি?'

'হ্যাঁ।'

'হ্যাঁ, খুব অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলল

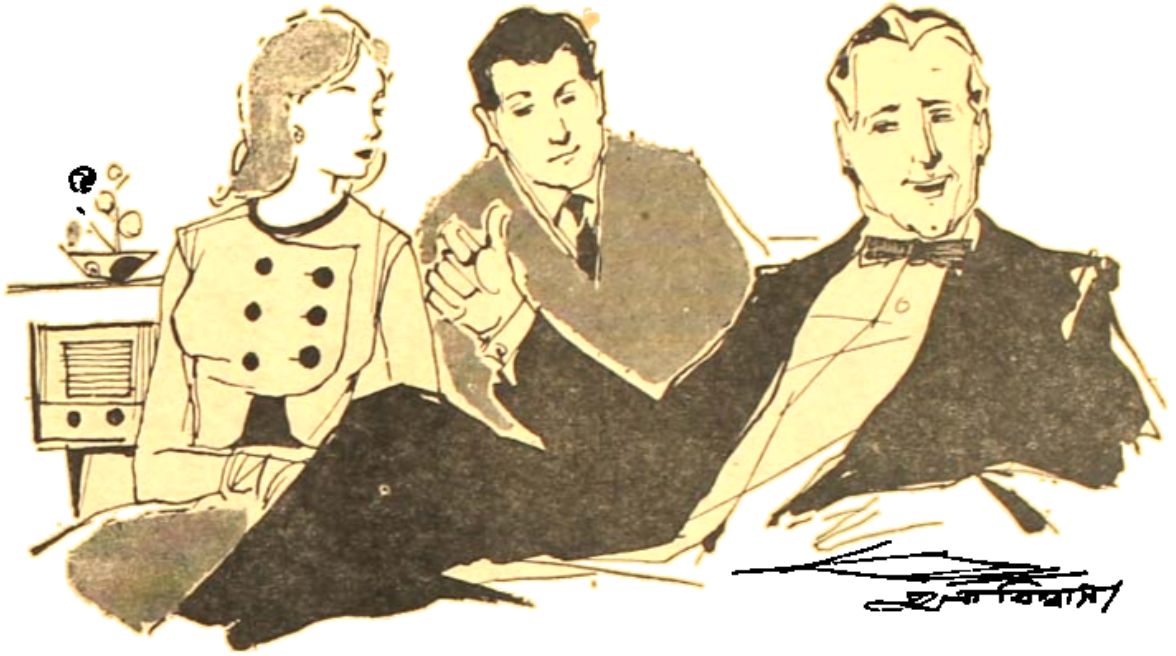

● তোমার বন্ধুর নাম কি ?...

আদিনাথ, 'কাল সকালেই এখানে চলে আসবে। ওকে জ্যাকলিন ?'

'ইয়েস ?'

'তোমার হাতে টাকা দিয়ে যাব ?'

'দিতে পারেন। নীচে ড্রয়িংরুমে চলুন। আমার মা বিশ্রাম করছেন। আমি তাঁকেও ডেকে দিচ্ছি।'

'চল।'

ছোট বাড়ি অবশ্যই বড় হলেও ড্রয়িংরুম সুন্দর করে সাজানো। ওদের বসতে বলে জ্যাকলিন কয়েক মিনিটের জন্যে বেরিয়ে গেল। তারপর ফিরে এসে বলল, 'একটু বসুন, মা এখুনি আসছেন।'

আবার আদিনাথের খুব অন্তরঙ্গ স্বর শোনা গেল, 'তুমি আজ রোদ্দুরে যাও নি জ্যাকলিন ?'

'একটু আগেই ফিরে এলাম।'

ইতস্তত করছিল আদিনাথ। কি উত্তর শুনবে বুঝতে পারছিল না। কেন সংশয় নিয়ে জ্যাকলিনকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বন্ধুর নাম কি ?'

'আমার বন্ধু ?'

'আমি তোমার ছেলে-বন্ধুর কথা বলছি', আদিনাথ বলল, 'ইউ নো হু আই মীন, তুমি কি এনগেজড ?'

'না না,' জ্যাকলিন নিজেই তার আঙুল দেখল। আংটি নেই। লোকার গা এলিয়ে সে আবার বলল, 'আমার কোন বন্ধু নেই।'

একটা কথা যা এত ক্ষণ সযত্নের আলাপে বলতে চায় নি আদিনাথ, খুশির প্রবল ঢেউয়ে তা যেন হঠাৎ তার মুখ ঠেলে বেরিয়ে গেল, 'মেরি গুড।'

যৌবনে চমকে উঠল। এখন তার আরও বেশি লজ্জা করছিল। কিন্তু তার মুখ খুব প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। আদিনাথকে সে তার খুব কাছের মানুষ বলেই মনে করতে পারছিল।

'খোকা ?'

'হুঁ।'

'তোর কলেজ খুলতে অনেক দেরি। এখন মোটে এপ্রিল। ছুটির মধ্যে দুই শহরটা ঘুরে-ঘুরে দেখবি,' আদিনাথের চোখ যেন জ্যাকলিনকে আবেদন জানাচ্ছিল, 'তুমি একে হ্যাম্পস্টেড হীথে নিয়ে যেও। এলগিন-এ নিয়ে যেও। আমার ছেলে খুব লাজুক। তুমি ওর সঙ্গে একটু বেশি কথা বল,' আদিনাথ সিগ্রেটকেস নিজের হাতে শক্ত করে চেপে ধরে বলল, 'আমি ইণ্ডিয়ায় ফিরে গিয়ে তোমাকে ভাল-ভাল উপহার পাঠাব।'

জ্যাকলিন উৎসুক চোখে প্রশ্ন করল, 'কি।'

'তুমি কি চাও ?'

'শান্তি—খুব বলবার পাবের শান্তি।'

আদিনাথ যেন একটা আঘাত সামলে নেবার চেষ্টা করছিল। তার চোখ শূন্য মনে হচ্ছিল। একটু পরে তার স্বর যেন-যেন অদিনাথ বলল, 'আমি তোমাকে অনেক শান্তি পাঠাব জ্যাকলিন। ঠিক পাঠাব—'

কথা শেষ করেই আদিনাথ অস্বাভাবিক জোরে হাসল। তারপর নিজেকে সংযত করে পরিহাসের হাল্কা সুরে বলল, 'ধন্যবাদ জ্যাকলিন, যে তুমি আমাকে শান্তির কথা বললে। আমি দেশে ফিরেই তোমাকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু—' যৌবনের দিকে দেখল আদিনাথ। খুব তাড়াতাড়ি সিগ্রেট টানতে টানতে বলল, 'একে বললে এ কিন্তু তোমাকে পাঠাতে না।'

জ্যাকলিন খুব হাসছিল, 'কেন ?'

'এরফিন কিউসহেলন্-এ বসে তোমার সঙ্গে গল্প করতে-করতে সে অনেক কথা বলত, অনেক প্রতিজ্ঞা করত—কিন্তু ও সব ভুলে যেত জ্যাকলিন—'

'জ্যাকলিন শোন, যৌবন যখন দেশে ফিরে যাবার সময় তোমাকে বলে যে সে এনগেজড কিনা তার বিয়ে হয়ে গেছে—তুমি ওসব বিশ্বাস কর না,—' হাসিমুখেই কথা বলে যাচ্ছিল আদিনাথ, 'ওই বয়সের ছেলেরা দেশে ফেরার সময় হলে হঠাৎ ভীতু হয়ে পড়ে। তখন ওরা বিশ্বাস আশ্রয় নিয়ে মানুষকে

আঘাত হবে—সব কেড়ে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাব।'

আহিনাবের সব কথা বুঝতে না পারলেও জ্যাকলিন মৃদু-মৃদু হাসছিল। সৌরীনকে দেখছিল। আর আহিনাব যখন এসব বলছিল তখন খুব রাগ হচ্ছিল সৌরীনের। তার এসব কথা অসহ্য মনে হচ্ছিল।

একবার নাম ভুলে প্রতিবাদের ইচ্ছায় আহিনাবের দিকে তাকাল সৌরীন। কিন্তু সে তখন একেবারে চুপ হয়ে গেছে। সিগ্রেটের ধোঁয়ায় আহিনাবের মুখ ঝাপসা দেখাচ্ছিল। তবুও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল সৌরীন, তার কপালে তৃপ্তির আভা ফুটে উঠেছে।

শুধু তৃপ্তির আভা নয়, অনেকদিন আগে যে-স্বীকৃতি অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল, তা আবার খুঁজে পাওয়ার নেশায় চোখ দুটো রক্ত হয়ে আসছিল আহিনাবের। সব অনুক্তি অনুশোচনা অনুতাপ তার উত্তরপুরুষ মুখে ফিরছিল।

'খোকা?'

'হি?'

'কথা বল—জ্যাকলিনের সঙ্গে কথা বল।'

সৌরীন শুধু মুখ তুলে একবার জ্যাকলিনকে দেখল। তার কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল কিন্তু বাধিয়াস ছিল বলে সে কিছু বলতে পারল না।

আহিনাব ডাকল, 'জ্যাকলিন?'

'ইয়েস?'

'ইতিহাস সম্পর্কে তোমার কৌতূহল আছে?'

'খুব।'

'আমি আগামী সপ্তাহে ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু আমি আবার আসব। ঠিক আসব। আমি তোমাদের মাঝে-মাঝে দেখে যাব।'

আহিনাবকে এখন অপ্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছিল সৌরীনের। আর হয়তো জ্যাকলিন ভাবছিল, ভারতবর্ষের মানুষরা এমনই হয়। বড় ভাবপ্রবণ। সে হাসছিল।

আহিনাবের হাতে সিগ্রেট জ্বলছিল। আবছা অন্ধকারে—এই ভগ্ন-প্রাচীরে তার দুপাশের কথা মনে হচ্ছিল। শিউ-শিউ করছিল।

সাদা-কালো ফুলাবকলার আহিনাবের যৌবন, তার প্রেম—এখন কি তার বিষাদও চাপা পড়ছিল। একটা আহাজ সমস্ত কুয়াশায় আহিনাবকে লুকিয়ে নিয়ে অন্ধকার সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু তাহলেও কাপসা আলোয় কক্ষের দিকে তাকাল আহিনাব। একটা আশ্চর্য উত্তাপ মলীন দীপেও তার গায়ে এসে লাগছিল।

আহিনাব আরও ঝুঁকার উদ্গ্রীব হয়ে দেখল কক্ষের থেকে তাকে লক্ষ্য করে জ্যাকলিন আর সৌরীন রুমাল নাড়ছে।

তখন আবার মোমবাতিটা জ্বলছিল। আর কক্ষের উত্তাপ সব ব্যবধান ঘুচিয়ে দেশ-মহাদেশ এক করে দিচ্ছিল।

● জ্যাকলিন আর সৌরীন রুমাল নাড়ছে…

ইয়ং বেঙ্গল

(১৫৬ পৃষ্ঠার পর)

১৮১৩, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৩, রামতনু লাহিড়ী ১৮১৩, প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮১৪, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৮১৪, রাধানাথ শিকদার ১৮১৪। ১৮০১ থেকে ১৮১৪ সালের মধ্যে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদের জন্ম হয়। ঠিক এই সময় থেকেই রামমোহন রায়ের কর্মজীবন সুরু হয় কলকাতা সহরে। দৃশ্য ও জীবন গতি পরিবর্তন করতে থাকে।

১৮১৪ সালের ধারাবাহিক রামমোহন রায় রংপুরের কলেক্টরের অধীনে কাজ ছেড়ে কলকাতায় আসেন এবং চৌরঙ্গী ও মাণিকতলা অঞ্চলে দু'খানা বাড়ি কিনে স্থায়িভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। অনেক আগে থেকেই কলকাতার সমাজ-সংস্কার বিষয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন, কলকাতায় আসার পর প্রত্যক্ষভাবে সেই সংস্কারকর্মে ব্রতী হলেন। প্রস্তুতির পর্ব আগেই শেষ হয়েছিল, এইবার সংগ্রামের পর্ব সুরু হল। একবছরের মধ্যেই তিনি 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন এবং অনুবাদ ও ভাষ্যসহ বেদান্তগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তারপর ১৮১৭-১৮ সালের মধ্যে তাঁর বেদান্তসার, কেনোপনিষদ, ঈশোপনিষদ, উপবেদের বিভাবাদীদের সহিত বিচার, ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, কঠোপনিষদ, মাণ্ডুক্যোপনিষদ, সোমাসীর সহিত বিচার, সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়। বেদান্তগ্রন্থের হিন্দুস্থানী অনুবাদ করেও তিনি বিনামূল্যে প্রচার করেন। এক ও অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাই যে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরোপাসনা এবং এই আদর্শই যে হিন্দুধর্মের সত্যকার ঐতিহ্য ও আদর্শ, এইকথা প্রচার করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি বেদান্ত-উপনিষদ বাংলাভাষায় অনুবাদ করে জনসমাজে প্রকাশ করেছিলেন। বেদান্তসার সংস্কৃতে হাতেলেখা পুঁথিপত্র বা পূর্বে মুদ্রিতের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের কুক্ষিগত ছিল, তাকে স্বদেশের মাতৃভাষায় ভাষান্তরিত করে সাধারণ মানুষের আয়ত্তে আনার প্রচেষ্টাই সেদিনকার সামাজিক পরিবেশে বৈপ্লবিক ব্যাপার ছিল। রক্ষণশীল পণ্ডিতসমাজ এই কাজটিকে বেদের অপব্যাখ্যা বলে অপবাদ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া সৌত্তলিকতাপ্রধান অদ্বৈতবাদী সমাজে একেশ্বরাদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার আদর্শ প্রচার করা কিরূপ দুর্বলাধ্যের অপচেষ্টা বলে বিবেচিত হয়েছিল। Translation of an Abridgment of the Vedant গ্রন্থের ভূমিকায় (১৮১৬) রামমোহন লেখেন :

By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahman, have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my relations, whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depends upon the present system.

ব্রাহ্মণপরিবারের সন্তান হয়ে নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছেও তিনি এই ধর্মমত প্রচারের জন্য যে কতদূর নিগৃহীত হয়েছিলেন, তার আভাস পাওয়া যায় এই ভূমিকা থেকে।

কেবল ধর্মমত প্রচার করেই রামমোহন ক্ষান্ত হন নি। আত্মীয় সভায় বৈঠক পূর্ণোদ্যমে চলছিল এবং সেখানে বাল্যবিবাহ ও

আপনার সুন্দরতম কালো
কেশের জন্য...

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যাম্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল

ক্যাম্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে
চুল বাড়ায়—চুল উজ্জ্বল ও সরস রাখে।
এই কেশ তৈলে ক্যাম্থারাইডিনের
এন্টাইট থাকায় চুলের স্বাস্থ্য
বজায় রাখে ও চুল উঠা বন্ধ করে।

বেঙ্গল
কেমিক্যাল
কলিকাতা ● বোম্বাই
কানপুর

বহুবিবাহের দোষ, বালবিধবার পুনর্বিবাহের সমস্যা, জাতিভেদপ্রথা প্রভৃতি বিষয়ে তীব্রভাবে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে রক্ষণশীলতার পাশাপাশি অন্তত, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর মেধার সহযোগিতা-সহযোগ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। মনে হয় দেশের সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলার ফলে পারিবারিক জীবনেও নানাস্তরের সঙ্কট ও সমস্যা দেখা দেয়। তারই ফলে বহুবিবাহ-প্রথারও সমাজ ও পরিবার ক্ষয় হতে আরম্ভ করে এবং সহমরণ-সহমরণ তার একটি অন্যতম উপসর্গরূপে দেখা দেয়। রামমোহন নিজের পরিবারে এই সহমরণের নিষ্ঠুরতা লক্ষ্য করেছেন, পরিপার্শ্বে ও সমাজে তার উৎকট ও বীভৎস প্রকাশ দেখে গভীর বেদনাবোধ করেছেন। তাই প্রচীন ধর্মশাস্ত্রাদি অনুসন্ধান করে শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ, যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে তিনি সহমরণপ্রথা নিবারণকল্পে যেসব চেষ্টা করেন। কৃষ্ণনগরের সমাজের বোঝাতে এবার পর এক ঢিল পড়তে থাকে।

এই সময় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়—১৮১৭, ২০ জানুয়ারী। 'It was the very first English Seminary in Bengal, or even in India as far as I know.' (আলেকজাণ্ডার ডাফ)। ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রামমোহনেরও ছিল, যদিও স্বাভাবিক, এবং সেই পরিকল্পনার কথা তিনি পরিচিত স্কটিশ বিদ্বেষ বন্ধুদের কাছে প্রকাশও করেছিলেন। ডেভিড হেয়ার, জাস্টিস হাইড ইস্ট আরও কয়েকজন সহৃদয় বাঙালী হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। যখন সমাজের ধনিক হিন্দুপ্রধানরা পরিকল্পিত বিদ্যালয়ে কেবল হিন্দুছাত্রদের প্রবেশাধিকার থাকবে বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং সেই ইচ্ছাকেই বাস্তবে রূপ দেওয়া হয়, তখন সভাপতি রামমোহন রায়ের পক্ষে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা সম্ভব হয় নি। যিনি সর্বধর্মসমন্বয় ও বিশ্বমানবিকতার মহান জীবনাদর্শে বিশ্বাসী, তিনি কখনও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে আধুনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সমর্থন করতে পারেন না। তাই হিন্দু কলেজ আধুনিক পাশ্চাত্যবিদ্যা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হলেও, তার সংস্পর্শ থেকে দূরে সরে থাকা ছাড়া তখন আর কোন উপায় ছিল না। বস্তুত এই হিন্দু কলেজের পরিচালকমণ্ডলী যে কতদূর পর্যন্ত রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ছিলেন, সে-কথাও ইতিহাসের আলোচনাপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।

হিন্দুসমাজের কর্ণধারেরা গোড়া থেকেই হিন্দু কলেজের কর্তৃত্বার হয়েছিলেন। যে বিদ্যালয় পাশ্চাত্য দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্য স্থাপিত হয়েছিল, তার মাথার উপর গোঁড়া হিন্দুয়ানির প্রভুত্ব বাস্তবিকই বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু এই বিস্ময়কর ব্যবস্থা বেশীদিন বহাল থাকে নি, দীর্ঘকাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। কলেজ প্রতিষ্ঠার একুশ বছর পরেও দেখা যায়, জন ক্লিফটনের বেথুন যখন এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি হন, তখন হিন্দু কলেজের পরিচালকদের গোঁড়া হিন্দুয়ানির সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড বিরোধ বাধে। বিরোধের উপলক্ষ হয় একজন ছাত্রের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ নিয়ে। তাকে কলেজ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। পরিচালকদের সিদ্ধান্তের ঔচিত্য বিষয়ে সন্দিহান জানিয়ে বেথুন লেখেন (২৩ নভেম্বর ১৮৪৯): '....I cannot pass over this occasion of calling to the attention of the Committee how disadvantageously this exclusive system of the Hindu College contrasts with the liberal principles adopted in other Government Colleges.' ১৮৪৮-৪৯ সালে যখন হিন্দু কলেজের পরিচালকদের গোঁড়ামি নিয়ে প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্ক হয়, হুগলী কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ কোথাও এই গোঁড়ামির চিহ্ন ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সকল সম্প্রদায়ের ছাত্র একসঙ্গে এইসব বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করত। ধর্মগত অথবা সম্প্রদায়গত কোন নিষেধ ছিল না। বেথুন সেকথাও তাঁর প্রতিবেদনপত্রে উল্লেখ করেছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব কোনমতেই কলেজের এই নিরপেক্ষ পরিবর্তন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। রাধাকান্তের সমর্থক ছিলেন সেক্রেটারি রসময় দত্ত। তা সত্ত্বেও বেথুন জানান যে কলেজের নিয়মটি তিনি সংশোধন করবেন। কিছুদিন ধরে বেথুন-রাধাকান্তের মধ্যে এই বিষয়ে বাগানুবাদ চলতে থাকে। অবশেষে ১ জুন ১৮৪০, প্রায় চৌত্রিশ বছর একটানা কলেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার পর, রাধাকান্ত দেব পরিচালক-পদ ত্যাগ করেন। কেন যে রামমোহন রায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকালে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারেন নি, তা কলেজের পরিচালকদের এই হিন্দুয়ানির দীর্ঘ ইতিহাস থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।

তাহলে অবাক হতে হয় যে এই কঠোর হিন্দুয়ানির শাসনের মধ্যে হিন্দু কলেজের যাত্রার শুরুপর্বে সেদিন পাশ্চাত্যবিদ্যার শিক্ষালাভ করে তার উদার মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছিলেন। যাঁরা ইয়ং বেঙ্গল বলে পরিচিত, অর্থাৎ যাঁরা ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন, তাঁরা সবলেই হিন্দুসমাজের ধর্মান্ধতা, রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তরুণ বয়সে এই গোঁড়া হিন্দুয়ানির প্রতি যাঁরও কারও বীতশ্রদ্ধা এমন চরম স্তরে পৌঁচেছিল, যে তাঁরা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেন নি। এই ধর্মান্তরটি কেবল তাৎক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাস বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একথা ঠিক যে তরুণদের বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তিবাদী মনোভঙ্গি প্রবীণদের মতো গভীর হতে পারে না। কিন্তু তা না হলেও হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণকে শুধু কাঁচাবয়সের অনুকরণপ্রিয়তা অথবা খ্রীষ্টান মিশনারিদের প্রভাববৈভবের কুফল বলেও ব্যাখ্যা করলে তৎকালের হিন্দুসমাজের আসল রূপটিকেও তার দ্বারা সঠিক প্রকাশ করা হয় নি। হিন্দুসমাজের গোঁড়ামি যে কোন্ স্তরে পৌঁচেছিল, কলেজের হিন্দু কর্তৃপক্ষই তার সাক্ষী। বাইরের সুস্থির সমাজের দিকে চেয়ে দেখার দরকার ছিল না। ছাত্রদের পরিবারই ছিল সেই সমাজের প্রতিচ্ছবি এবং হিন্দু কলেজের পরিচালকরা ছিলেন তার প্রতিভূ। বিদ্যালয়ের মাথার উপরে মূর্তিমান গোঁড়ামির রক্তচক্ষু সর্বদা অনুসরণ করত। তরুণ ছাত্রদের কাছে এই ছাড়াই উত্তেজনা সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল। পরে পরে কর্তৃপক্ষের কাছে উদ্ধত হয়ে তাঁদের মাথার উপর নেমে এসেছে। প্রবীণ প্রধানরা পরে পরে তরুণ ছাত্রদের "বিধিনিষেধের বন্ধন ছিঁড়তে চেয়েছেন। স্বাধীনভাবে চলাফেরার জন্য তরুণরা পরে পরে তিরস্কৃত হয়েছেন। উচ্চতর বিদ্যাচর্চায় স্বাধীনভাবেও প্রবীণ প্রাজ্ঞরা পরে পরে হস্তক্ষেপ করেছেন। এত ছুল ও এত বেড়ির আধিক্য যেখানে, সেখানে তা ছিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। বিদ্যালয়গৃহের পরিবেশের মধ্যেই তরুণ ছাত্রদল বিদ্রোহের অনেক প্রেরণা পেয়েছিলেন। যে বাঁধন ছাত্রজীবনে তাঁদের মনে জমা হয়েছিল, বাইরের জীবনে সেই বাঁধনছেঁড়াই অভিব্যক্তি হয়।

রাজাবাহাদুর

(১২৮ পৃষ্ঠার পর)

হয়ে গেছে। টেলাস্রোতের গতিসম্বও তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

সে চিঠি তিনি লিখেছিলেন, তিনিও জানতে পারেন নি, গভীর উৎকণ্ঠার ভরা ঐ সামান্য কটি ছত্র একদিন তাঁর সমস্ত বংশ-কুলের ইতিহাস রচনা করবে। স্বভাবীর মনোরাজ্যে রোমাঞ্চীর প্রবেশাধিকার ছিল না, তাঁর গতিবিধির কোনো খবরও তিনি রাখতেন না। তাকে দিয়ে এর আগের চিঠিখানা লেখাবার জন্যে রাজাবাহাদুর কেন যে অত ধৈর্যচ্যুতি করেছিলেন, কি ছিল তাঁর মনে, তার কোনো আভাসও তিনি পান নি। শুধু মনে হয়েছিল, একটা ভিজের কালো ছায়া যেন ঘনিয়ে আসছে। একটা কোনো অবলাপের ইঙ্গিত, যার সঙ্গলাভে তাঁর পরম স্নেহ ও প্রীতিভাজন ছোটকুমার। এমনি একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা তাঁকে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল করে তুলেছিল। ভেবেছিলেন, যেমন করে হোক তাকে নিরস্ত করতে হবে।

কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে গোপনে বিশ্বস্ত ভৃত্যের হাত দিয়ে চিঠিখানা তাঁর আবেদনের পত্র লোদরোপন বেরেরের কাছে পাঠিয়েছিলেন, সেটা সিদ্ধ হয় নি। তাকে তিনি বাঁচাতে পারেন নি। তবু সুনাবের কাছে ঐ কথা কটিই ছিল তাঁর শেষ দুটি দিনের মহামূল্য সম্বল।

তাঁর মৃত্যুর পরে খোলা খামখানি তাঁর ব্যক্তিগত ট্রলার পাওয়া গিয়েছিল। সকলের অলক্ষ্যে রাজাবাহাদুর সেটি সংগ্রহ করেছিলেন। তিনিও এর জন্যে কিছুমাত্র [illegible] সেবন্ধু যথাস্থানে প্রকাশ করবে।

টেশন থেকে রাজাবাহাদুর সোজা গিয়ে উঠলেন ডাক্তার মুস্তফির বাড়িতে। তাঁকে পাওয়া গেল না। ছুটলেন মেডিক্যাল কলেজে। সেখানেও নেই। আবার তাঁর বাড়ি ফিরে এসে শুনলেন, তিনি বর্ধমানে রোগী দেখতে গেছেন। ফিরতে রাত হবে। ফিরবা পরদিন সকালেও আসতে পারেন। রাজাবাহাদুরের মুখে ক্লিষ্টতার ছায়া নেমে এল। তার পক্ষে অপেক্ষা করবার, তিনি নিজেই। তাঁর কার্যসূচীতে ডাক্তারের স্থান অনেক আগের পরের ছিল। টেলিগ্রাম পাঠাবার তাদের 'রেসের অশ্বটিকে' বন্ধ হবার কথা। ওদিকে ছোটকুমারের দেহে ইনজেকশনের ক্রিয়া সুরু হয়ে যায়। তাদের যা করবার, সুস্থিরই তার আর ভেবেন। এই ছিল ব্যবস্থা। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই ব্যতিক্রম তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

রাজাবাহাদুরের আর তর-সইছে দেরী হল না। ভাগ্যক্রমে বর্ধমানের রোগীর চিকিৎসা মুস্তফির বাড়িতেই পাওয়া গেল। সেটি সম্ভব করে ওখান থেকেই তাঁর টাক্স ফোন-এ ফিরে পড়লেন। কিন্তু আত্মসংবরণ শেষ পর্যন্ত সোজা না। সম্ভবতঃ ফিরে আসবার রোগীটি মারা গেল, সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ডাক্তার ফোনকারার হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছোটালেন রাজাবাহাদুর। এতক্ষণে মনটা একটু প্রসন্ন হল। এই দুটো ঘোরের সমন্বয়। এর মধ্যে তাঁর উৎকণ্ঠিতের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

তিন

ছোটকুমার যখন ট্যাক্সি করে বাসায় ফিরছিলেন, একটি চিন্তাই তার সমস্ত মন অধিকার করে রইল—গুরুতর কারণ না থাকলে যোগাণী তাকে এমন করে ফিরতে করত না। কিন্তু কি সেই কারণ? নিশ্চয়ই তার কোনো বিপদের আশঙ্কা করছে যোগাণী। কিসের বিপদ? সে তো কারো কোনো ক্ষতি করে নি। তার বিরুদ্ধে কার কি অভিযোগ থাকতে পারে, সুনাব কিছুতেই ভেবে পেল না। শুধু এই চিঠির পর আর তার কোনোমতেই যাওয়া চলে না। যোগাণী তাকে যেতে বলে নি, বলেছে, তুমি এসো না। তবু তার ঐ সুস্পষ্ট 'না'-এর ভিতর থেকে একটি ব্যাকুল অনুরোধ ছোটকুমারের হৃৎপিণ্ডকে করে পড়ছে! তাতেই সে অভিভূত হয়ে রইল।

বাসায় ফিরবার কিছুক্ষণ পরেই জ্বরের বেগ তার অঙ্গ এসেছে। কিছু-ই ভোলে তার পড়ল। পদ্মা ব্যস্ত হয়ে উঠল। বারবার এসে বলতে লাগল, একজন ডাক্তার ডেকে আনি। তোমার সেই যে বন্ধুটি আছে, তাকেই না হয় খবর দিই।

সুনাব নিজের কপাল, এবং পায়ে হাত দিয়ে বলল, জ্বর বেশ। বরফের জলে পটি দিলে ভাল হবে।

বিকেলের দিকে জ্বর খুব বেড়ে গেল। পদ্মা আর দেরি করতে ডাক্তার ডাকতে পাঠাল। শিয়ালদহ কাছে ওর ডাক্তার বন্ধু অমলের বাসা তার জানা ছিল। সেই একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। সুনাব তখন বেশ ঘুমোচ্ছে।

রোগীকে পরীক্ষা করতে গিয়ে ডাক্তার অমলের কয়েকটি বিশেষ জায়গায় এবং ধরণের অস্বাভাবিক লক্ষ্য করে অনেক সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। ধরণের জ্বর, ওটা রোগের লক্ষণ কিন্তু রোগ আসলে কোথায়? হয়তো ওরা ভুল বুঝে থাকবে। যাই হোক, বন্ধুটা দরকার। তার এক সপ্তাহ ছিল পাশকরা ডাক্তার তার কাছে ছুটে গেল। সে এসে তখনই ব্লাইড্ নিয়ে গেল এবং নার্ভাস-সেন্টারের কোন স্নায়ু কোথায় উঠল সন্দিগ্ধ রোগের বীজাণু দেখা যাচ্ছে। দুজনেই উঠে পড়ে অনভিজ্ঞ চিকিৎসক। নিজেদের বিদ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে, পরদিন সকালেই আরো ভয়াবহ ব্লাইড্ নিয়ে এল মেডিক্যাল কলেজের এবং বিশেষজ্ঞের জন্যে সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগল। রোগীর কাছে করবার বিশেষ কিছু ছিল না, চিকিৎসকের গতি-প্রকৃতি, এমন কি আরোগ্যও নির্ভর করছিল রোগ নির্ণয়ের উপর।

ওষানকার তিনি বিশেষজ্ঞ, কোনো

কিষাণ
লণ্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
ফোন-২২-৬৫৮০
২৩৯,৩৫ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯

কারণে তিনি তখন অনুপস্থিত। অনেক বেলাতে তিনি ফিরলেন। আরো বহু কেস্ ছিল। তাতেও খানিকটা দেরি হল। তারপর লালফিতার বেড়া পার হয়ে সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কাগজখানি যখন অবল এবং তার বন্ধুর হাতে এসে পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা হতে আর বাকী নেই। ফিসপাটে নিজেদের মতের সমর্থন লেখে তখনই ট্যাক্সি নিয়ে ছুটল কুমারের বাসায়। গিয়ে দেখল, কেউ নেই, শূন্য খাটখানা খাঁ খাঁ করছে।

পাশের ঘর থেকে ঠাকুর এসে কেঁদে পড়ল।

তার মুখেই শোনা গেল, অবল বেরিয়ে যাবার পরমুহূর্তেই রাজাবাহাদুর কোন এক বড় ডাক্তার নিয়ে এসে পড়েছিলেন। মোটা অঙ্কের ইনজেকশনও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কুমারের আর জ্ঞান ফিরে আসে নি। ডাক্তার দুপুরের মধ্যেই সব শেষ। এই কিছুক্ষণ হল, মোটরবহর করে শ্মশানে নিয়ে গেছে। রাজাবাহাদুর সঙ্গে গেছেন। শঙ্করকে তিনি নিতে চান নি। সে এক-রকম জোর করেই গেছে। কোন্ শ্মশানে, ঠাকুর ঠিক বলতে পারল না। হাত দিয়ে দক্ষিণ দিকটা দেখিয়ে দিল। অবল তার প্যাকেটটি খুলতে বলল, তাহলে বোধহয় কেওড়াতলায় নিয়ে গেছে। ওর মামাও অনেকদিন কোলকাতাতেই বাস করেন, এবং তাঁকেও কেওড়াতলায় দাহ করা হয়েছিল।

—তার কারণ, অবল ভবানীপুরের বাড়ি থেকে সেটা কাছে পড়ে। এখান থেকে নিশ্চয়ই অতদূরে নিয়ে যায় নি।

—যেখানেই নিক, শ্মশানে গিয়ে আর কী লাভ? উদাসকণ্ঠে বলল অবল। এই মুহূর্তে সে অনেকটা ভেঙে পড়েছিল।

বন্ধু বলল, তাহলেও একবার চল। হাজার-হিসপোর্ট হইল আমাদের কাছে। সেটা না দেখেই ডেথ-সার্টিফিকেট দিল কে, আর তাতে কি লিখল, একবার জানা দরকার। রাজাবাহাদুর ব্যাপার। কৌশলে গণ্ডগোলও তো থাকতে পারে।

—ওকে তুমি জান নি, তাই ওকথা বলছ। সব দায়িত্বজ্ঞান ছেড়ে এক কাপড়ে চলে এসেছিল। ওর বিরুদ্ধে কারো কোনো আক্রোশ থাকতে পারে না।

—তবু একবার আমাদের যাওয়া উচিত। কোলকাতায় শহরে হঠাৎ একটা লোক মেরে যাওয়া গেল। ব্যাপারটা suppress করা ঠিক হবে না।

ফাইলিতির এবং নিমতলার সন্ধান না পেয়ে, কেওড়াতলাতে যখন ওরা পৌঁছল, তখন সাত সাত জন চিতা জ্বলছে। রাজাবাহাদুর একযোগে চুপ করে বসে আছেন। অবলকে দেখে গঙ্গা ছুটে এল।—ওর পায়ের উপর পড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল—সাবাদিন তুমি কোথায় ছিলে ডাক্তারবাবু? আমি নিজে গিয়ে তোমায় ডেকে নিয়ে এলাম।

অবল কিছুক্ষণ তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে রাজাবাহাদুরের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিতেই তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অনুকূল শ্রোতা পেয়ে তাঁর শোকোচ্ছ্বাস তীব্র আকারে দেখা দিল।

সেই সুযোগে অবলের বন্ধুটি ডেথ-সার্টিফিকেটের হস্তান্তরণের চেষ্টা করল। কিন্তু শ্মশান-কর্তৃপক্ষ তাকে আমল দিলেন না। এরকম অজ্ঞাত ব্যক্তির এ জাতীয় কৌতূহল মেটাবার সরকারী দায় বোধহয় তাঁদের ছিল না। তখন অবল মনে মনে অনিচ্ছুক হলেও ব্যাপারটা তার সঙ্গে জড়িত অন্য দু-একটি বিষয়ের (যেমন হাওড়া কেমনে মুখ দেখানো) ওজর দিখেনা করে মৃত পরীক্ষার রিপোর্টখানা পুলিশের গোচরে আনাই তারা কর্তব্য বলে মনে করল।

ইংরেজ-আমলের পুলিশ। সরকারী কর্তব্য করতে গিয়ে চাকরির ভাবনা ভাবতে হত না। সুতরাং তৎপরতার অভাব হয় নি। সেই রাত্রেই ডেথ-সার্টিফিকেটখানা তাদের হস্তগত হয়ে গেল। তার মধ্যে কোনো একটি নারায়ণ রোগের উল্লেখ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সেটা রেস নয়। তোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই ডক্টার মুস্তফি তাদের হেফাজতে এসে গেলেন। তাঁর অফিস-কামরায় ব্রোমাইড চালিয়ে দেওয়া চিঠিপত্র পাওয়া গেল, তার সূত্র ধরে তারা প্রথমে হানা দিল নিশানাথের অবৈধপাড়ায় এবং তারপর রাজাবাহাদুরের প্রাসাদে। আরেক দল চলে গেল সেই ইনশিকিউটিউটের ডিরেক্টরের কাছে এবং বহু চাঞ্চল্যকর তথ্যাদি নিয়ে ফিরে এল। তার ফলে রাজাবাহাদুর এবং নিশানাথ একই দিনে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

সেই চিত্তরঞ্জীর ফিরিস্তি কথা আগেই উল্লেখ করেছি। অন্ত শেষ করে মামলা গাত্রে করতে পুলিশের বছদিন লেগেছিল। এই সুদীর্ঘ হাজতবাসের প্রতিটি দিন আমি রাজাবাহাদুরের নিকট থেকে নিকটতর সান্নিধ্যে এসেছি আর মুগ্ধ হয়েছি। কার্য-সূত্রে কখনই একবার সেল-গ্রুপে যাবার প্রয়োজন হয়েছে, দেখেছি, ফেলদর্পে পড়া একটি বিশাল মূর্তি কখনো বসে, কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো শুয়ে আছে। শান্ত, মৌনী, অবিচল। দেখামাত্র সৌম্য মুখখানি ভুড়ে একটি বিনম্র মৃদু হাসি, তার সঙ্গে দীর্ঘ হাত দুটি তুলে একটি ক্ষুদ্র বিনীত নমস্কার। কোনোদিন তার অন্যথা হতে দেখি নি। নালিশ নেই, অভিযোগ নেই, কিছুমাত্র বিরক্তি-প্রকাশ নেই। কুশল প্রশ্নের একমাত্র উত্তর, 'ভালো আছি।' অথচ আমরা তো জানি, এই অভিশপ্ত জীবনের অনন্যতম কৃষ্ণ—তার দিন দিন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছিল। ভালো তিনি ছিলেন না।

হাজত থেকে যেদিন তাঁকে Condemned Cell অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদের সেল-ব্লকে নিয়ে যাওয়া হল, সেদিনও তাঁর মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। পাশের ঘরেই নিশানাথ। তারও ঐ একই দণ্ড। তার চিৎকারে, আবদারে, অভিযোগে আমরা অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু রাজাবাহাদুর তেমনি নীরব, নিশ্চল। শুধু একটি দিন তাঁকে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখেছিলাম। মুহূর্তের জন্যে একটু-খানি ধৈর্যচ্যুতি। ঘটনাটির মধ্যে কিন্তু মজাও আছে। পাঠকের সেটা উপভোগ পাওনা। সুতরাং বলে ফেলা যাক।

ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে মাঝে মাঝে জেল পরিদর্শনে আসতে হয়। তখন তখানে ছিলেন একজন খেতাঙ্গ সিভিলিয়ন। বেশ কড়া লোক, তার সঙ্গে একটু বোধহয় ছিটও ছিল। রাজাবাহাদুরের সেল্-এর সামনে গিয়ে যথারীতি জানতে চাইলেন—কোনো অভিযোগ আছে? তার অনেকদিন আগে ওঁরা মামলা আপালতের রায়-এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেছেন। বিচারে, মুখে খুব তখনিনি দিন পর্যন্তধার্য হয় নি, ব্যাপারটা শুধু আকর্ষ নয়, অদ্ভুতপূর্ব। ফাঁসির আসামীর আপীল কখনো এতদিন পড়ে থাকে না। দিনের পর দিন এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কাটানো এক দুঃসহ শাস্তি। তার থেকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মুক্তি দেওয়াই হাইকোর্টের চিরাচরিত রীতি। এক্ষেত্রে এই দীর্ঘ বিলম্বের কারণ কি,—এটাই বলতে পারেন।

ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নের সেই বাঙ্গটা উহ্যই আমরা আশা করছিলাম। কিন্তু রাজাবাহাদুরের যে বিশেষ মহিমান্বিত, সেখানেও বোধহয় একটু ভাটা পড়েছিল। পরাধীন দেশের বহু ধরনের সামনে একটু

এগিয়ে এসে বললেন, আপনার যদি অসুবিধা থাকে সাহেব, একটা উপকার করলে বিশেষ বাধিত হবো। মাসের পর মাস ধরে বাথার ওপর যে-সেলটা বুলছে, তাকে নোঙর ফেলে দিতে বলুন। এছাড়া আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই।

সাহেব আমাদের দিকে তাকালেন। ব্যাপারটা তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হল। কোনো কথা না বলে অফিসে চলে এলেন, ওয়ারেন্ট এবং অন্যান্য কাগজ-পত্রাদি দেখলেন, তারপর ডিজিটালসটুকু টেনে নিয়ে বাবলার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে শেষের দিকে লিখলেন, কেসটি মহামান্য হাইকোর্টের বিচারাধীন। এবিষয়ে কোনোরকম মন্তব্য করবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু এই রাতীয় কোনো পারিস্থিতি পৃথিবীর আর কোনো সভ্য দেশে ঘটেছে বলে আমার জানা নেই, ঘটতে পারত কিনা সে-বিষয়েও আমি সন্দিহান।

জেলের সিনিয়ার সুপারে ডিজিটালিস যে মন্তব্য করেন, সুপারিন্টেণ্ডেন্টের মন্তব্য সহ তার একটা নকল স্বরাষ্ট্রবিভাগে পাঠাতে হয়। দিন-তিনেক পরে হোম্ সেক্রেটারির কাছ থেকে তাঁকে জরুরী টেলিফোন, তার মধ্যে বাবলাকে সুস্থ করে তোলা চাই—এ করেছ কি! এই কথাগুলো যদি কোনোরকমে হাইকোর্টের নজরে পড়ে, তাহলেই যে তখনই তোমাদের অফিসিয়েট হতে হবে। সিরিয়স্ কন্‌সিকুয়েন্স টু অর কোর্ট!

—কি করতে হবে? তৎক্ষণাৎ তাঁর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন সুপার।

—ডিজিটালসটুকুর ঐ পাতাটা এখনি ছিঁড়ে ফেলে দাও। অফিসে যদি তার নকল থাকে, ফেলটুয় অ্যাটওয়াল্। আমরাও তাই করছি।

যথাসময়ে, অর্থাৎ তার অনেক পরে হাই-কোর্টের রায় বেরোল। ডেথ সেন্টেন্স কনভিক্টেড টু টারম্ প্রোটেন্সন অব লাইফ্। বিশানাথেরও তাই মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। তাকায় মুক্তির আসেই খালাস পেয়েছিলেন।

'যত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, সে খবর আমার জানা ছিল না। তাহলে অবশ্যই তার রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করতাম। আমার বুদ্ধি-বিবেচনা মত যে রোগে মৃত্যু ঘটে বলে মনে হয়েছে, ডেথ-সার্টিফিকেটে তারই উল্লেখ করেছি'—

তাঁর এই উক্তি কোর্ট বিশ্বাস করেন নি।

বিশানাথ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'প্রতিষ্ঠান ছাড়া ছিলেবে গবেষণার সুবিধার জন্যেই আমি তার জন্যে যা কিছু করবার করেছি। সেখান থেকে বীজাণু সংগ্রহ করে খুনের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ-ইত্যাদি ব্যাপার যদি ঘটে থাকে, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

এ বিষয়েও সরকার তরফ তাঁকে সেলিব্রিটি অব্ ভাইটের সুবিধা দিয়েছিলেন।

রাজাবাহাদুরকে আন্দামানে পাঠানো হয় নি। ঐ জেলেই ছিলেন। তাঁর সেই পুরনো জায়গায়—একদিন ফেল-করা সেখানে বসেই একদিন, হয়তো কোনো দুর্বল মুহূর্তে—যা সকলের জীবনেই আসে—তিনি আমার কাছে তাঁর সমস্ত অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। সে কথা এই আখ্যায়িকার গোড়ার দিকে উল্লেখ করেছি। আমার মনের মধ্যে সেদিন যে অসীম আত্মপ্রসাদ উল্লাস তোলে উঠেছিল তাও

ভারতের শ্রেষ্ঠ

বেঙ্গল কেমিক্যালের

যক্ত

গ্লিসারিন সাবান

এই সাবান আপনার কোমল গাত্রত্বককে শীত ও গ্রীষ্মের রুক্ষতা থেকে রক্ষা করে। সর্ব অবস্থায় ব্যবহারোপযোগী সাবান

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা
বোম্বাই
কানপুর

সুদৃশ্য টিনের বাক্সে পাওয়া যায়

[illegible] কিন্তু সত্যই কি আমি তাঁর চোখের চাহনি কখনো দেখিনি? মনে আছে, সেদিন তাঁকে কোনো প্রশ্ন করি নি। তার কয়দিন পরে আমার লাহোরে ফিরে যে দুর্ঘটনার সেদিন, তারই একটু আভাস দিয়েছিলাম। অনেক ইতস্তত করে বলে ফেলেছিলাম—আচ্ছা, বৌরাণী এবং ছোট-কুমারের আচরণে এমন কিছু কি আপনি দেখেছিলেন যার থেকে—

মহারাজাদুর কথাটা শেষ করতে দেন নি। তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে হাতে ছিপ ফেটে বলেছিলেন, 'ছিঃ ছিঃ, ওদের সম্বন্ধে ওকথা ভাবাই যায় না। দুজনেই নিষ্পাপ, পবিত্র।

তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেছিলেন, হয়তো সেই জন্যেই আমি ঐ ছেলেটাকে কোনোদিন সইতে পারি নি। ও বড় বেশি শুদ্ধ, বড় বেশি মহৎ। ছেলেবেলা থেকে কোনো বিষয়ে আসক্তি নেই, লোভ নেই। সেই সইয়েতো বৈরাগ্য আমাকে উঁচুতে বসতে দিত। কখনো ভুলতে পারি নি ও আমার চেয়ে অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সাধ্য নেই কোনোদিন সেখানে উঠি। বিয়ে করে যাকে নিয়ে এলাম, সেও আমার নাগালের বাইরে চলে গেল। আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলাম। ওরা যেন আমাকে একঘরে করে তাড়িয়ে দিল। কি ঘরে যে আমার দিন কেটেছে, আপনাকে বোঝাতে পারবো না, মিস্টার চৌধুরী।

আবার কিছুক্ষণের বিরতি। বোধহয় সেই দিনগুলোর মধ্যে ফিরে গিয়ে নতুন করে সেই যন্ত্রণাটা অনুভব করলেন। তেমনি স্তব্ধ সুরে বললেন, তারপর যেদিন সব কিছু আমাকে পিছনে ফিরে চলে গেল, আমার কি মনে হল জানেন? মনে হল সম্পত্তি নয়, সোনা-দানা নয়, একতাল কাদা ছুঁড়ে দিয়ে গেল আমার মুখের ওপর।

—আপনি নিলেন কেন সে-সম্পত্তি?

—নিলাম, তার কারণ, না নেবার মত জোর আমার মধ্যে ছিল না। নিয়ে কি একদিনের তরেও স্বস্তি পেয়েছি, মনে করেন? কেবলই মনে হত, সে আমাকে হারিয়ে দিয়ে গেল। সে স্পর্ধা কেমন করে সহ্য করা যায় বলুন?

আরেকদিন অন্য কি একটা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমাকে লোকে বলে রূপবান পুরুষ। রূপ আমার পিতা-পিতামহের দান। ঐ সেটা পায় নি। তার বদলে এমন একটা halo ছিল তার মধ্যে, দেবতার মত হাজারটাকে অনুচর করতে, তার কাছে আমি যে কৃতদাস! তেমের ওপর একটা চোখ-ধাঁধানো আলো ঝলমল করলে বড় মায়া হয়?

চার ॥

কোলকাতা এবং তার আশে-পাশের কেসগুলোতেই অনেকদিন ধরে ঘুরেছি, লালবাঈয়ের কর্তারের সেটা মেলাতে হয় নি। যখন হল, মোটা কলমের এক খোঁচায় আমাকে একেবারে দক্ষিণ বাংলার শেষ প্রান্তে ঠেলে দিলেন। বছর ঘুরেক পরে সেখান থেকে পাঠালেন উত্তরে। তারপর গোটা পূর্বাঞ্চল ঘুরিয়ে দিলেন। এমনি করে তিন বিস্তীর্ণ দীর্ঘ পরিক্রমা শেষ করে স্বাধীনতার ঠানে 'অপটী'-রূপে (optee) আবার পশ্চিম বাংলায় ফিরে এলাম। ততদিনে মাথার চুল উজ্জ্বল ছেড়েছে ধারণ করলেও রাজাবাহাদুরের রূপ বিস্তৃতির কালিমায় ম্লান হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে অনেক ধাপ উপরে উঠেছি। এবারে একটা বড় সেইটুলে জেলার হাল ধরবার ভার এসে গেল।

চার্জ নেবার পরদিন সদলবলে 'রাউণ্ডে' চলেছি। দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের চত্বর পার হয়ে বারান্দায় পড়ে ডানদিকে মোড় নিতে যাব হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়ালাম। বুক থেকে অজান্তেই বেরিয়ে গেল—এ কে! বনবাবের সেই বিশেষ ভঙ্গিটি তেমনি আছে। কিন্তু যে স্নিগ্ধ হাসিটি সেদিন মুহূর্তমধ্যে সমস্ত মুখখানাকে উদ্ভাসিত করে দিত, আজ শুধু কতগুলো বিকৃত কুঞ্চন দিয়ে তাকে কুৎসিত ও ভয়াবহ করে তুলল। কণ্ঠস্বরের সে গাম্ভীর্যও কোথায় চলে গেছে। কেমন একটা কর্কশ খনখনে আওয়াজ বেরিয়ে এল—চিনতে পারছেন?

উত্তর দিতে ভুলে গেলাম।

আমি তখন অনেকগুলো বছর পার হয়ে সেই দিনটিতে ফিরে গেছি, যেদিন প্রথম এঁকে দেখেছিলাম। সহজ-অলঙ্কারহীন ভঙ্গিতে আমার স্মৃতিকক্ষের সব অন্ধকার গহ্বর ফিরে সামনে এসে দাঁড়াল এক দীর্ঘ, শুভ্র, তাপস পুরুষ, যাঁর দিকে তাকিয়ে গিবনস্ বলেছিলেন—Every rich an Aristocrat, তার সঙ্গে এই কঙ্কালের কোথাও কোনো মিল নেই। চিনতে যে পেরেছি, সেটাই আমার কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হল।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ চৌদ্দ বছর। কিন্তু Fourteen years' rule নামক আইনের বলে বেশিদন সাধেক চৌদ্দ বছর পার হলেই মুলাবের অতিরিক্ত নিয়ে প্রাদেশিক সরকার বেশিরভাগ লোককে ছেড়ে দিয়ে থাকেন। রাজবন্দীদের সে আইনের সুযোগ দেওয়া হয় না। তেল থেকে দয়াবীতি সুপারিশ পাঠানো হয়েছিল। সরকার রাজী হন নি। এক বছর পরে কেসটা আবার নতুন করে পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

পরের সপ্তাহে খবর এল, রাজাবাহাদুর আবার দর্শন-প্রার্থী। আফিসে নিয়ে আসতে বলে দিলাম। ধীরে ধীরে হুইলচেয়ার ঠেলতে ঠেলতে কোনোরকমে টেনে নিয়ে আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বললাম। খানিকটা ইতস্তত করে সন্তর্পণে সেটি দখল করলেন। বললাম, বৌরাণী কেমন আছেন?

—অনেকদিন খবর পাই নি।

—মাঝে মাঝে দেখা করতে আসেন না?

—আমিই বারণ করেছি। ভেবেছি, বেশিরভাগ সময় ঠাকুরঘরেই পড়ে থাকে। তাই, আর ডিস্টার্ব করতে চাই নি।

আর কোনো প্রশ্ন না করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। ইঙ্গিতটা বুঝলেও আরো কিছু সময় চেয়ে নিয়ার জড়তা কাটিয়ে উঠতে। তারপর ক্ষীণস্বরে ধীরে ধীরে বললেন, আসতে না আসতেই বিরক্ত করছি। অথচ—

বললাম, আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন। আমি কিছুমাত্র বিরক্ত হবো না।

—বেশ বুঝতে পারছি, ডাক এসে গেছে। আর বেশিদিন নেই। তাই ভাবছিলাম, শেষনিঃশ্বাসটা যদি বাপ-পিতামহের ভিটেয় গিয়ে ফেলতে পারতাম, তবু খানিকটা তৃপ্তি হত।

বলতে যাচ্ছিলাম, ওসব আপনার মিথ্যা আশঙ্কা, সাহস হারাবেন না ইত্যাদি। ওঁর শরীরের দিকে চেয়ে নিরস্ত হলাম। ঐ ভাঙাচোরা বাহুলী দাহনা অন্য কাউকে দেওয়া যেত। এঁর বেলায় নিরর্থক। শুধু বললাম, আপনার কেসটা আমি দেখেছি। আমার পক্ষে যতখানি সাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করবো না।

—জানি; সেইটুকুই আমার ভরসা।

কয়েকদিনের মধ্যেই খবর এল স্বরাষ্ট্র আসছেন। স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রথম স্বরাষ্ট্র, এবং এ জেলে তাঁর প্রথম পদার্পণ। রাজাবাহাদুরকে বলে পাঠালাম, ঐ ওয়ার্ডে যখন যাবেন, ওঁর প্রার্থনা যেন তাঁর কাছে পেশ করা হয়। তাই হল। এই দুর্ঘাত মানবার বীভৎস ইতিহাস স্বরাষ্ট্রমহাশয়ের না জানবার কথা নয়। সেই

হত্যাকাণ্ডের যে প্রধান নায়ক, তার উপরে কঠোর মনোভাব পোষণ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই লোকটার এই পরিণাম বোধহয় তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। তাঁর উপরে তার শেষ নিবেদনের বিষয়বস্তু এবং যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে সেটা ধ্বনিত হল, সবকিছু মিলে তাঁর মনে একটা অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে, বুঝতে পারলাম। ওখানে একটা সমবেদনার জবাব দিয়ে আমিসে ফিরে গিয়ে বললেন, ফিরাণ্ড ভেঙে গেছে, মনে হচ্ছে। এবার বোমহর্ষ ছেড়ে দেওয়া যায়। আপনি কি বলেন?

—আজ্ঞে আমারও তাই মনে হয়। Let him have the comfort of dying at home.

কথাটা আমার জানা নয়, ফ্রেঞ্চকোর্ট-এর কোনো একটি ধারার পুনরুক্তি। যে হতভাগ্য কয়েদীর জীবনের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু জেলের মেয়াদ বাকী, তার বেলায় ঐ আরামটুকু মঞ্জুর করবার বিধান আছে।

জজী বললেন, তাহলে একটা পিটিশন দিতে বলুন, আর তার ওপরে আপনি একটু ভালো করে লিখে-টিখে দিন। তার মধ্যে ঐ কথাটা যেন থাকে—বেরিয়ে গিয়ে আবার একটা কিছু করবার মত দেহের শক্তি বা মনোবল দুটোই চলে গেছে। অর্থাৎ পুলিশ যাকে বলে revesion to further crime, তার কোনো chance নেই।

দুদিনের মধ্যেই কাজ চলে গেল, এবং ম্যাজিস্ট্রেটের উপদেশমত আমার সুপারিশের সঙ্গে ঐ বিশেষ বক্তব্যটুকু জুড়ে দেওয়া হল।

মাসখানেক পরে রাজাবাহাদুর মুক্তি পেলেন। তার আগে, ওঁকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবার জন্যে জেল থেকে ওঁর দেশের বাড়িতে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল। দুজন পুরনো কর্মচারী এসেছিল। তারা এবং আমার কজন কর্মী ধরাধরি করে ওঁকে গাড়িতে তুলে দিল।

এর পরের ঘটনাগুলো আমার সংগ্রহ। কিছুটা খবরের কাগজ থেকে, এবং বাকী অংশ একজন পুলিশ অফিসারের মারফত, এ বিষয়ে যাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।

স্টেশন থেকে প্রাসাদে পৌঁছবার পরেই রাজাবাহাদুরকে গাড়ি থেকে ধরে নামাতে হয়েছিল। একতলার তাঁর নিজস্ব মহলের কোনো একটা ঘরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর নানা প্রশ্নের মধ্যে ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার বন্দুকগুলো সব আছে তো?

—আজ্ঞে, সবগুলো নেই। পুলিশ লাইসেন্স দিতে চাইল না। কয়েকটা আছে।

—চল তো দেখি।

—এখনি যাবেন? খাওয়া-দাওয়ার পর ধরে—

—না; তার আগেই ঘুরে আসি, চল।

লোকজনের কাঁধে ভর করে যেমনি ধীরে ধীরে আর্মারিতে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁর প্রথম যৌবনের শিকার-সঙ্গী প্রিয় রাইফেলটা বের করলেন, কয়েকটা রিভলবার নাড়া-চাড়া করে দেখলেন, গুলীর বাক্সটাও খুলতে বললেন। ম্যানেজার ছিলেন দরজার বাইরে। তাকে লক্ষ্য করে বার বার অনুযোগ দিতে লাগলেন, এ কয়েছ কী? সব যে নষ্ট হতে বসেছে।

এবার সবর বাইরে দাঁড়ানো চাকর-বাকরদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল। কে যেন বলল, যৌবরাজ আসছেন। চক্ষের নিমেষে সেই ভেঙে-পড়া অশক্ত, দুর্বল দুটো দেহটা সবেগে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল, এবং ক্ষিপ্রহস্তে, দ্রুত পরবেগে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। হাতে রাইফেল, কাঁধে গুলীভর্তি বাণ্ডোলিয়র। যৌবরাজ ওদিকের বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসছিলেন। পরণে পটবাস, হাতে ঠাকুরের আশীর্বাদী ফুল। চেঁচামেচি শুনে মাথা তুলতেই চোখ পড়ল বন্দুকের নল তাঁরই দিকে উদ্যত। চিৎকার করে একটা ধাক্কার আড়ালে সরে গেলেন। গুলী গিয়ে লাগল পিছনের দেয়ালে। ছুটে এগিয়ে গিয়ে আবার নিশানা নিলেন রাজাবাহাদুর। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা চেয়ার সজোরে তাঁর পিঠের উপর এসে পড়ল। তিনি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে গুলী ছুঁড়লেন। একজন চাকর ছুটে পালাচ্ছিল। পিঠে লাগতেই সে পড়ে গেল। ততক্ষণে দুজন লাঠিয়াল বন্দুক নিয়ে ছুটে এসেছে। রাজার হাতের গুলী চালাতে চালাতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন।

থানায় খবর দেওয়া হয়েছিল। ও-সি ও এসেছিলেন জন কয়েক পুলিশ নিয়ে, কিন্তু সেই গুলীবৃষ্টির মুখে এগোতে সাহস করেন নি। সবরে টেলিগ্রাম করে দেন কিছু আর্মড্ পুলিশ আনিয়ে তারপরে

রয়েল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ

১২, ডাঃ জেবেন্দ্র মুখার্জি রো, শিবালয়হ। ফোন: ৩৫-৫৫৮০

॥ ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ ॥

এ এম আই ই (ইণ্ডিয়া), বি ও এ টি, টার্নার, ফিটার, রেকানিক্যাল ও সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং, ড্রাফটস্‌ম্যান, ইলেকট্রিশিয়ান, রেডিও প্রভৃতি বোর্সগুলে নূতন সেসনে ভর্তি চলিতেছে। স্কুল ফাইনাল পাশ না করা প্রার্থীগণকেও বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি করা হয়। উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদিগকে উপযুক্ত সিগ্নেচার অথবা সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। ভাংযোগেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

॥ কমার্স বিভাগ ॥

টাইপরাইটিং ও শর্টহ্যাণ্ড ১, ৩, ৬ মাসে গ্যারান্টি দিয়া ফুল কোর্স শিক্ষা দেওয়া হয়। বুক-কিপিং ও একাউন্ট্যান্সী মাত্র ছয় মাসের গ্যারান্টিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরাজী বলা/লেখা বিদেশিনী মহিলাদের দ্বারা শিখুন।

॥ টিউটোরিয়াল বিভাগ ॥

এস এস, হায়ার, প্রি-ইউ ও ডিগ্রী কোর্সে বিশেষ অভিজ্ঞ প্রফেসারদের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়। এস এস পরীক্ষায় "পাশ না করিলে গ্যারান্টি ফি ফেরৎ" স্কীমে ভর্তি নেওয়া হইতেছে। সারাদিন ক্লাসে ভর্তি চলিতেছে।

॥ শাখা ॥

৪, হর্বতলা ষ্ট্রীট: ২, পঞ্চাননতলা লেন, বেহালা। ১৪৩, সাদুগাছা গার্ডেনরীচ রোড, খিদিরপুর; ৮৭/২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার; ১৭৮, সাউথ সিঁথি রোড, বরাহনগর; ৬/১, পাঁচু খানসামা লেন, শিয়ালদহ; বি সি রায় রোড, বর্ধমান; কেশন রোড, হাবড়া; এবং নূতন দিল্লী ও বোম্বে।

আসলটুকু জানতে পেরেছিলেন। তাও তাঁরা মানুষটিকে ধরতে পারেন নি, পেরেছিলেন তার কলমটিকে ধরে। তার-ও পকেটে ছিল সরকার প্রদত্ত মুক্তির আদেশের নকল, আরেক পকেটে এক টুকরো বহুদিনের পুরনো তাঁত বস্ত্র বিক্রির ক্যাশ মেমো। তার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি। পুলিশ অফিসারের কাছে দু-একটি লাইন যা শুনেছিলাম, তার থেকে বুঝেছি ওটা সেই চিঠি—'মোটা'র উকিলে বোয়ালীর শেষ সম্বাদ।

আমি রাজাধ্যাত্মকে চিনি। কোনো চিঠি তার দীর্ঘদিনকার বহুবলচিত পরিবল্পনাকে সাফল্যের পূর্ব মুহূর্তে আকস্মাৎ বানচাল করে দিয়েছিল, তাকে তিনি কোনোদিন ক্ষমতে পারেন এমন সহজেই বুঝতে পারি। সে চিঠি যার হাত থেকে বেরিয়েছিল, সে যেই হোক, এবং তার পিছনে যে মনোভাবই থাক, তার বিরুদ্ধে এই আটাশে বছরের শিক্ষিত জিঘাংসা এবং প্রথম সুযোগেই তাকে চরিতার্থ করবার প্রচেষ্টা—এ সবও আমার কাছে দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু বিচিত্র মেধাবীনার সতর্ক ও সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে ঐ কাগজটুকু কেন যে তিনি এত যত্নে এত ঘরে ঘরে নিয়ে ঘোড়িয়েছেন—সে রহস্য আজও ভেদ করতে পারি নি।

● মাথা তুলতেই চোখে পড়ল

প্রতিচ্ছায়া

(১৪০ পৃষ্ঠার পর)

ঘুরে সরকারী ডাক্তার যাবেন। বাড়িতেই পরে জল গরম করে রাখতে বলে সীতারামকে একখানা জরুরী চিঠি লিখে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আধঘণ্টার মধ্যেই ডাক্তার এসে গেলেন। বাকী রাতটা ইনজেকশন আর ওষুধ চালাবার পর সকাল থেকে শক্তিপদর অবস্থার উন্নতি দেখা দিতে লাগল। বেলা নটা নাগাদ সে প্রথম ওদিক চেয়ে দেখল। কিন্তু তার চাউনি দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল ভাউচেই সে চিনতে পারছে না। মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কথা দু-একটা বলতে শোনা গেল, কিন্তু সেগুলো অর্থহীন কথা। ডাক্তার বললেন, আর ভয় নেই। রাখবার পোকাল দেবা যাচ্ছে। ভালোভাবে পরীক্ষার জন্যে অবিলম্বে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া দরকার। ডাক্তারেরই চেষ্টায় দুঘণ্টার মধ্যে মোটর যোগাড় করে শক্তিপদকে নিয়ে কলকাতা রওনা হলাম। সঙ্গে ডাক্তার আর সীতারাম। সন্ধ্যের আগেই কলকাতা পৌঁছে ডাক্তারের পরামর্শমত শক্তিপদকে পরীক্ষার জন্যে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ির ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর রেখে প্রয়োজন মত খবর দেবার জন্যে অনুরোধও জানিয়ে এলাম।

বাড়িতে পৌঁছে দেখানকার স্বাভাবিক আবহাওয়া আর স্ত্রী-পুত্রের সান্নিধ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাণ ফিরে পেলাম। আড়ষ্ট থাকবার দরুন হাত-পায়ের অস্বস্তিগুলো সবার চেয়ে বেশীক্ষণ পাছে লেগেছিল সেগুলো থেকে বিনতি অব্যাহতি পায়। বিনতিও যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, তাই কাল পৌঁছবামাত্র দরজা থেকে সোজা বাড়ি না এসে হাসপাতালে চলে যাবার কারণ জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করল না। এজন্যে মনে মনে তার ওপর কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারলাম না। ছেলেদের সঙ্গে গল্প-গুজব ও খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে ছেলেরা যখন ঘুমিয়ে পড়ল, সংক্ষেপে শক্তিপদর সঙ্গে দিল্লীতে সাক্ষাৎ আর গতকালের ঘটনার মোটামুটি বৃত্তান্ত বিনতিকে জানালাম, অবশ্য নদীর ধারে তৃতীয় একজনের দ্বারা দেখার কথা সযত্নে বাদ দিয়ে। নিজের সহজ পরিবেশে ফিরে এসে মনে মনে ঐ অস্বাভাবিক ঘটনাটার একটা বিশ্লেষণ ইতিমধ্যেই করে ফেলেছিলাম। নিজের নির্জন প্রকোষ্ঠে একজন বিকারগ্রস্ত মানুষের সেদিন ছুটে বেরোনো, শক্তিপদর উন্মাদগ্রস্ত অট্টহাস আর হীহুৎস অট্টনাদ, নদীর ধারে তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি ও শেষ পর্যন্ত তার মিলিয়ে যাওয়া দেখে শক্ত মাটির ওপর আবার আছাড়ে পড়া, এই সম্বিলিত বিপর্যয় আর আঘাতের ফলে সেই আবছা আলোয় যা দেখেছি বলে তখন মনে হয়েছিল সেটা দেখার ভুল ছাড়া নিশ্চয় আর কিছু নয়। অতএব বিনতিকে গুবিয়ে কিছুই বলি নি। গত দু' দিনের পরিশ্রমে আর মানসিক উত্তেজনায় শরীর অবসন্ন হয়েছিল। বিনতির সঙ্গে গল্প করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অত ক্লান্তির মধ্যেও কিন্তু একটানা ঘুম হল না। মাঝ রাত্তিরে বার দিকে আউলাবে ঘুম ভেঙে গেল, বড়মত করে বিছানায় উঠে বসলাম। বেড সুইচ টিপতেই লাল আলোয় ঘর ভরে গেল। দেওয়াল ঘড়িতে পরপর তিনটি ঘণ্টা বাজল। ঘরের ওপাশে ঘুমুচ্ছে,—কোথাও কিছু গণ্ডগোলের চিহ্ন নেই। কিন্তু ঐ শীতের মধ্যেও আমার সমস্ত গা ঘামে ভিজে গেছে দেখলাম, নাক দিয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। বুঝতে পারলাম কোন দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেছে। আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ঘুম ভাঙল বেশ বেলাতে। আজ সকাল সকাল অফিস যেতেই হবে। অফিসের পথে শক্তিপদকে একবার দেখে যাওয়া উচিত। তার আগে টেলিফোনে ওর খবর নেব ভাবছি, এমন সময় টেলিফোনে ডাক এল হাসপাতাল থেকে। ওরা জানাচ্ছে যে, কাল রাত দুটোর পর থেকে শক্তিপদর অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যাওয়াতে ওরা আর ওকে ঐ হাসপাতালে রাখতে সাহস করছে না। আজ বিকেলের মধ্যেই শক্তিপদকে রাঁচির উন্মাদাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি ইচ্ছে করলে বেলা বারটার মধ্যে গিয়ে দেখে আসতে পারি। তবে পেশেন্টের বর্তমান অবস্থা যে রকম, তাতে আত্মীয়-বন্ধুর এখন কাছে না যাওয়াই বাঞ্ছনীয় বলে ডাক্তার মনে করেন। এ অবস্থায় অফিস কামাই করে হাসপাতালে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করলাম না। ডাক্তারও দেখা করতে নিষেধ করলেন। হাসপাতালের ইনচার্জকে অনুরোধ জানালাম যেন রাঁচির হাসপাতালে শক্তিপদর বন্ধু হিসেবে আমার নাম-ঠিকানা পাঠিয়ে দেওয়া হয় ও তার নিরাময়ের খবর যেন আমি পাই। খরচপত্র সবই যাবার আমারই থাকবে।

শক্তিপদকে রাঁচি পাঠাবার এক সপ্তাহের মধ্যে দুখানা চিঠি পেলাম তার পক্ষের বাড়ি থেকে। প্রথম চিঠিখানায় জানিয়েছিল শক্তিপদর অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। টাইফয়েড হয়ে আছে, যার ফলে হাত-পা বেঁধে রাখতে হচ্ছে। দ্বিতীয় চিঠিতে জানিয়েছে, অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো হলেও হুঁশের বালাই এখনো যায় নি। ভাই অত্যন্ত দুর্বল।

আরো মাসখানেক পরে বিকেলের দিকে তৃতীয় চিঠি এল। পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম, চিঠিখানা লিখেছে শক্তিপদ নিজেই। তাই প্রথম,

বাল্যবেলার যে শক্তিপদকে আমি এখন মাঝে মধ্যে মনে করি নাই। আমার কি হইয়াছে, কেবলে ঘুম ভেঙেছে তাহা একমাত্র আমিই জানি আর যাঁহারা আমার চিকিৎসার ভার লইয়াছেন তাঁহারা কিছুই জানেন না, কোনদিন জানিবেনও না। আমি বেশ বুঝিতেছি আমার মুক্তি সমাগতপ্রায়।

আপনি কি কবিতা পড়েছেন?
কবিতার রূপ
কবিতার রূপ
কবিতার রূপ
বৈরীশঙ্কর হালদার রচিত
কথাসাহিত্যে
২৩৫/১ কলেজ স্ট্রীট (২য় তল) ২৩
(আধুনিক বাংলা কবিতার একটি রূপ)
প্রাপ্তিস্থান : বিহার সাহিত্য ভবন
কলেজ রো

গত তিন বছর ধরিয়া খুঁজিয়া নক্সা কিছু কম নিই নাই। কত প্রায় শেষে হইয়াছে। সামান্য যাহা বাকী আছে তাহাও পূরণ হইবে আমার এই প্রতিশ্রুতি রহিলো। যাইবার পূর্বে একবার তোমাকে দু-একটি বিষয় জানাইয়া যাইতে চাই তাহা হইতে আশা করি তুমি বুঝিবে আমার অপরাধ যত গুরুতর হোক, সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নিতান্ত কম করি নাই।

তুমি বোধহয় জানিতে পারিয়াছ, নক্সার দুটার জন্য দায়ী আমি ঘাটশিলায় যে নদীর ধারে সে বছর আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলে—তিন বৎসর আগে অমনি একদিনে ঐ নদীর তেরোবাঁকির মোহানায় আমার জীবন সমাধি হতে। ঐ বাঁকির ধারে আমি তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিলাম। সঙ্গে ছুরি ওরি সুবাদে তা ছিল আর পকেটে একটি রেজর ছিল একপ্রকার বিষ যাহা খেলে মৃত্যু ঘটে না, কিন্তু মানুষ আচ্ছন্ন উন্মাদ হইয়া যায়। সাথে উন্মাদগ্রস্ত হইলে তাহার স্বত্ব ধন-সম্পত্তি হস্তগত করা কঠিন হইবে না, এই উদ্দেশ্য লইয়াই ঐ কাজে প্রবৃত্ত হই। তাহার কয়েকমাস পূর্বে দাদা এক বিধবা মহিলার পাণিগ্রহণ করে। মহিলাটির পূর্ব বিবাহের একটি পুত্র ছিল, তখন সে নাবালকমাত্র। দাদার সম্পত্তিতে যাহাতে তাহার স্ত্রী বা তাহার নাবালক পুত্রের দাবীর পথ না থাকে সেজন্য ব্যবস্থা-সংক্রান্ত কাগজপত্রের সঙ্গে আমার নামে নকল দানপত্র মিশাইয়া তাহাতে দাদার স্বাক্ষর পূর্বেই আদায় করিয়া লইয়াছিলাম। আমার প্রতি দাদার অকৃত্রিম স্নেহ ও অসাবধান আমার সুযোগ লইয়াই এ জালিয়াতি সম্ভব হইয়াছিল।

উদ্দেশ্য ছিল দাদাকে কোন কাজের অছিলায় বরানগর হইতে ঘাটশিলায় আনিয়া দুইদিনের মধ্যেই কাজ হাসিল করিব। প্রথমদিনে বিনা আয়াসে গল্পগুজব ও ব্যবসা-সংক্রান্ত কথার মধ্যে জাল দানপত্রে তাহার স্বাক্ষর আদায় করি। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় নদীতে বেড়াইবার কালে দাদার সঞ্চিত বিষটি মিশাইতে পারিলেই কার্যসিদ্ধি। কিন্তু সে সুযোগ আসিবার পূর্বেই দাদা বুঝি সহোদরের মনের কথা জানিতে পারিয়া ঘৃণায় ও লজ্জায় বরফকে বিদা হইতে বলিয়া আমার চোখের সম্মুখেই অদৃশ্য হইয়া গেল নদীর ঐ স্থানে তেরোবাঁকির কথা আমি জানিতাম না।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ হাতে পাইলাম। বরফটি তোমা কাহিনীর বর্ণিতে পারি না। গত তিন বৎসর তাহাকে অনেক স্থানে খুঁজিয়া ফিরিতেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাহার ছায়াও যেন আমার পিছনে ঘুরিয়া বেড়ায়। এবং শীতের একটি কিশোর সন্ধ্যে কে যেন আমাকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায় ঘাটশিলার ঐ বাগানবাড়িতে আর ঐ নদীর ধারে। তখন এ আবর্ষণকে রোধ করিবার শক্তি আর খুঁজিয়া পাই

এ ছাড়াও গত তিন বৎসর দাদার প্রেতাত্মা বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম। রাত্রে ঘাটশিলার বাড়ির ঐ ঘরে ঢুকিয়া বাহিরে কাহার পদধ্বনি শুনিতাম। তাড়াতাড়ি ভিতরে সেজন্য তাই খুঁজিতে সাহস পাই নাই। এও ঐ প্রেতাত্মার ভয়। আমার ভাবেহীতে জালকাগজের যে দাগ তোমার দেখাইয়াছি তাহার পিছনেও ঐ একই ভয় ছিল। কিন্তু কেন জানি না আজ আমার মন হইতে সে বিধা ভয় ও সন্দেহ দূর হইয়াছে। এখন আমি প্রত্যক্ষ করিলাম, ও ছায়া আমারই ছায়া। আমার দুইটি রূপ। দুইটি বিভিন্ন ও বিপরীতধর্মী সত্তা লইয়া একটি আমি। এই দুইটি সত্তার মধ্যে আজীবন সংগ্রাম ও সংঘর্ষ বাধিয়াছে। বরাবরই জয়ী হইয়াছে আমার শুভ্র রূপটি। সে আমাকে যে পথে চালিত করিয়াছে, সেই পথেই আমি চলিয়াছি বিনা দ্বিধায়। পৃথিবীতে সব চলাতেই শেষ আছে। আমিও আজ পথের শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এমন স্থানে আসিয়া ঠেকিয়াছি, যেখান হইতে ফিরিবার পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু পিছন ফিরিয়া দেখিতেছি, আমার অপর রূপটি ক্রোধদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া আছে। সুযোগ পাইলেই বাঘনাখীর মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আমাকে ছিন্ন করিতে বদ্ধপরিকর। গত তিন বৎসর সে ছায়ার মত আমার পিছনে লাগিয়া আছে এবং আমার শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লাগিয়া থাকিবে। কারণ সে ত আমারই অপর অংশ। অন্তরের প্রেতাত্মা হইলে যদি বা পলায়নের উপায় থাকিত এক্ষেত্রে তাহা অসম্ভব।

আর কিছু তোমাকে বলিবার নাই। ক্ষমাও চাহি না কাহারও কাছে। তবে যাহা লিখিলাম তাহা পড়িয়া, আমার মনের প্রকৃতিটা অনুধাবন করিয়া অন্তত একজনও যদি মনে করে কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত আমার আংশিকভাবেও সম্পন্ন হইয়াছে এবং আমি তাহা জানিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে মরিতে আমার কোনও ক্ষোভ থাকিবে না।

সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থার কথা তোমায় জানাইয়াছি। সম্ভব হইলে যাহা করিও।

একটিবার তোমাকে দেখিতে সাধ হইতেছে এবার আর চাহিবার কিছু নাই। শুধুই দেখা। আসিবে কি?

চিঠিখানা পড়া শেষ হইতেই স্থির করিলাম আজ রাতের ট্রেনেই রাঁচি রওনা হয়ে যাব। সেই মর্মে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম শক্তিপদর কাছে। সন্ধ্যে নাগাদ আছাড়াছড়ি সেরে সুটকেস গোছাচ্ছি, এমন সময় টেলিগ্রাম এসে পৌঁছল রাঁচি থেকে। শক্তিপদ হার্টফেল করে মারা গেছে আজ বেলা এগারটায়

[এবটি বিদেশী কাহিনীর ভাবাবলম্বনে]

চৈতন্যজীবনে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব

(২০ পৃষ্ঠার পর)

পণ্ডিতপ্রবরেরা শুধু বিদ্যালয় হইতে উদ্ভূত ও টোলচতুষ্পাঠী হইতে নিষ্কান্ত হইয়া বিদ্যাসাগরের অন্তর্ধানে যেন কবিতা যখন সমতলভূমিতে অবতীর্ণা হইলেন, তখন জহ্নুমুনি তাঁহাকে গণ্ডূষে পান করিয়া ও উরুদেশ হইতে উৎসারিত করিয়া ও ভগীরথ ভক্তিতে তাঁহাকে স্বীকৃত করিয়া তাঁহার জাহ্নবী ও ভাগীরথী এই নূতন নামকরণ করিলেন ও মর্ত্যলোকের সঙ্গে সুর-সুরধুনীর সম্পর্ক সুদৃঢ়ীভূত করিলেন। তেমনি চৈতন্যদেব গৌরাঙ্গিক যুগের বিশ্ব প্রেমধর্মকে যাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে নিখিলভাবে পরিপাক করিয়া উহাকে ঐতিহাসিক কালের ক্লান্তিমুক্তির মানবতার অগ্রগতির প্রেরণাশক্তির রূপ দিলেন ও স্বর্গের অমৃতকে মর্ত্যজনের মুক্তিপিপাসার নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে পরিবেশন করিলেন। সুখে-দুখে, সম্পদে-বিপদে মর্ত্যের মৃৎপাত্রে সেই স্বর্গীয় সুধার আস্বাদন সকল মানুষ অধিকারী-অনধিকারী-নির্বিশেষে এখনও করিয়া আসিতেছে। শ্রীচৈতন্য একাধারে রাধাপ্রেমের জহ্নুমুনি ও ভগীরথ।

একটি বৈতযুগীয় প্রেম

আশা দেবী

প্রাতঃ একটি সকাল। চারদিকে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে। বিহঙ্গকুল বৃক্ষ শাখায় শাখায় নৃত্য করে ফিরছে। ভোরে সবেমাত্র গাত্রোত্থান করে রাবণের অন্তঃ হা-পিত্তেশ করে তাকাচ্ছে। রাবণের শিখাটি পর্যন্ত কোথাও দৃষ্ট হচ্ছে না। সীতা দেবী তখনও সোদন পরিচর্যায় লিপ্ত হন নি। তিনি কিন্তু কলের জল পান করছিলেন। রামচন্দ্র বাইরে একটি ইষ্টকখণ্ডের ওপর উপবেশন করে আছেন এবং একটি ভাঁড়ে করে কিছু তপ্ত ইক্ষু রস পান করছেন ও প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করছেন।

ইতিমধ্যেই দু-একটি ঘুঘা লুকোচুরি খেলা সুরু করে দিয়েছে কিন্তু রামচন্দ্র নাতা কৈকেয়ীর দুর্বুদ্ধির কথা স্মরণ হয়ে চিন্তা করছিলেন। কাজেই ঘুম তাঁর চোখে পড়ে নি, কিম্বা চোখে পড়লেও ঘুমবার স্পৃহা ছিল না। সীতা দেবী সোদন পরিষ্কার এবং সোদন দিয়ে পিষ্টকাকারে খুঁটের চাপড়ি দিয়ে ঘামে নেলেন এবং সরলীকে আরশি করে তিনি সাজ-সজ্জা সুরু করে দিলেন। লোধ্রেণুর পাউডার প্রলেপ—নয়নে অঞ্জন ইত্যাদি দিচ্ছেন। কিন্তু এখন নিশ্চয়ই আপনাদের মনে হবে, পরম ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণচন্দ্র কোথায়?

তিনি তখন গভীর জঙ্গলে কাঠ আহরণ করতে গেছেন। শরীর অত্যন্ত দুর্বল, তেল মাখা নি সন্ধ্যা বা বালাম তেল খেয়ে পেট নিশ্চয়ই খারাপ হয় নি, কিন্তু রামচন্দ্রের ভেবেছিল তো 'বর লক্ষ্মণ' বলে ভেবেছিল কলে তা তো খাওয়ার পারমিশন ছিল না। তাই শুকিয়ে একেবারে বরা আলের মত হয়ে গেছেন। তিনি ঘুরে বেরাচ্ছেন কাঠের সন্ধানে।

ঠিক এমনি সময়ে আকাশে কারের তীব্র কোলাহল। যেন মনে হলো বনের সবক গাছ-পালা ভেঙে কে যেন আসছে। লক্ষ্মণ এতক্ষণ একটু অন্যমনস্ক ছিলেন; ভালো করে সামনে তাকিয়ে দেখেন নি। হঠাৎ কোন গাছের মগডালে একটা কাঠাল পেকেছে তাকেই কাকেরা ছলাছলি করে খাচ্ছে, আর চেঁচাচ্ছে। লক্ষ্মণ ঘুরে সেদিকে যেতেই পথ আগলে দাঁড়ালো এক বিকট রাক্ষসী, যার সারা অঙ্গে খলখল করছে গহনা। বড় বড় নখ কদিন কাটা হয় নি। কিন্তু তাতে আঙুলে লেগেছে হীরের আংটি—মুড়ো আঙুলের ঘুটো কিঞ্চিৎ চল চল করছে। তাতে দুটি মানুষের দাঁত বসানো। গলায় নরমুণ্ডের মালা, অবশ্য সে মুণ্ডে প্রচুর চুল—কারো মাথারই টাক নেই। আবার হাতের বালায় টাক মাথার মুণ্ডের ওপর কাঠ-কয়লার কালিতে মীনা করা—সুন্দরী একটি বিষ ভুরু কেলান দিয়ে লীলাচ্ছলে একটি বাবার গাছের ডাল ধরে নাড়ছেন আর মৃদু মৃদু হাসছেন। আর গান গাইছেন—'এই যে ছিল কোথায় সেল কমলদল-বাসিনী।'

লক্ষ্মণ বাবার ঔষধ হলে কি হবে, স্বাস্থ্যটা বরাবরই খারাপ। কাজেই শক্তিশেলে মরণ করতে পেরেছিল রাক্ষসেরা। সে যাক—এমনিতে অহর্নিশ খাই নি তার ওপর একটু অতিরিক্ত ভীতু। চমকে উঠে বললেন: আপনি কে ঠ্যাঁ—? করু?

উত্তর এলো এমুখ বিকট-বদনের 'ফিস্' করে হাসির সঙ্গে।

—আমি—?

: হ্যাঁ, কে আপনি—নাম কিনিছিলি?

: আমার নাম সূর্পণখা—আমি রাবণের ভগ্নী—

: ও:—বলেই লক্ষ্মণ চুপ করে রইলেন। তা এখানে কেন?

এবার সূর্পণখা লজ্জায় বেগুনি হয়ে গেলেন। নরের মত নাকের বড় বড় ফুটো দিয়ে ঘোড়ের এ্যাঙ্গলের মত হাওয়া পড়তে লাগলো। মনে হলো কিছু একটা হয়েছে ব্যানো-ট্যানো নির্ঘাৎ!

: আপনি এমনি করে হাঁপাচ্ছেন কেন—ব্লাডপ্রেসার আছে নাকি? লক্ষ্মণ বিব্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

: লক্ষ্মণ হোক—বলেই লীলাভরে সুন্দরী গ্রীবা ঘোরালেন:—

লক্ষ্মণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

হঠাৎ সামনে স্থির সূর্পণখা জিজ্ঞাসা করলেন: বিস্কারিত নেত্রে কি দেখছো এমন অবাক হয়ে!

: আপনার কেশরাশি—যেন কালী পুজোর কালীর চাহিনিকে ভাকিনী যোগিনীর মাথার কালো রঙে রাঙানো শণের নুড়ি!

: কি বললে? আমার চুল শণের নুড়ি? ঘোড় মহামাস তেল দিয়ে কেশবিন্যাস করি—আর তুমি বলছো শণের নুড়ি? আহা এই চুল দেখেই কত রাক্ষসের চুলা বিদীর্ণ হয়ে যায়, তা তুমি জান?

: না জানি না—এমন ঘুমানো আমার 'জিজ্ঞাসু—হে অর্বাচীন, ওই অনুচ্চারিত প্রশ্নটি নিয়ে আপনার এই নির্নিমেষ অবলোকনের হেতু কি?

: হেতু—? কি বলবো তোমাকে, আমার সন্দেহ হয়—

উঁহু—বাবা:। তা সুন্দরী আমার নয় পেইরোলা নাকাশকের ওপর তোমার দৃষ্টি পড়লো কেন? মনে তো আছে: অনেক আশ্রম আছে—যত মুনি ঋষি আছেন—যত, জাবালীর মত রসিক লোক আছেন যিনি শিষ্যাই রসিকতার মূলা দিতে পারেন—বাল্মিকীর আছেন—ঘরোয়া-ঘরোয়া-শালিনতাপি মুনিরা, তাঁরা সমবেতভাবে তোমার সেবা করতে পারবেন। তাঁদের সবাইকে ছেড়ে আমার ওপরে নজর কেন?

: কি নিষ্ঠুর তুমি—তুমি আমার বন্ধুবর—আমি তোমার বন্ধুবতী।—আমি তোমার জন্যে সব ত্যাগ করে এই বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি—তুমি তো জানো না—তোমার ওই কাজল মুখ ওই ভাসে ছল্ ছল্ চোখ দেখে আমার মনের মধ্যে প্রেমের যমুনা বয়ে গেছে—। তোমার ওই—ধনুরাজ জিনি নাসা—

: এই মরেছে—ঘরে তো দেখছি আমার; বলেই একটা ঘন ইটের ওপর বসে পড়লেন লক্ষ্মণ।

: শোন লক্ষ্ম, তুমি আমার বন্ধুবর—আমি তোমার বন্ধুবতী—তুমি আমার চাঁদ আমি তোমার চকোর—বলেই রাবণের একটা কাটাপাহাড়ের গুঁড়ির ওপর বসে পড়লেন।—তারপর সব—কথা কোটে না, পানতুয়ার মতো গোল গোল চোখ যেন দুটোকের পটা করে তাকাচ্ছে সূর্পণখার।

লক্ষ্মণ বললেন: তুমি আমার চাঁদ; আমি তোমার কাঁদি,—তুমি আমার নাক, আমি তোমার নরুন,—তুমি আমার পিঠ আমি তোমার বিরাশি শিক্কার ঘুঁষি,—তুমি আমার মন আমি তোমার নুকের আহার—বল—বল বলে যাও—থামলে কেন?

: একি নাথ, অমন অলুক্ষণে কথা বললে যে আমার বুক ফেটে যায়—সূর্পণখা আহতা হলেন।

: ফেটে গেলে ওষুধ দিয়ে সেলাই করে দেব বেবী—তুমি আমাকে ছাড়ো এবং স্থানান্তরে যাও।

: অসম্ভব। সূর্পণখা উঠে দাঁড়ালেন। আমি যে কি ব্যাপারে আমার তা তোমাকে কি বলবো। আমার সঙ্গে রাবণ,—সে তো নাকে তেলে ঘুমে বেড়ায়—খোঁদি মন্দোদরী—রূপের মোহেই বাঁচে না—আমার যে বয়স হোতে যাচ্ছে তা কেউ খেয়ালই করে না। খোঁদি চুলুভাবে ঘুরে বেড়ায়। দাদা তো পরের ঘরের মেয়ে—বলেই জিভ কাটলো সূর্পণখা: আর্যপুত্র, তোমার স্ত্রী উর্মিলার কথা বলছি. সে অত্যন্ত দজ্জাল। সে তোমাকে কখনও সেবার করেছে বলে মনে হয় না: নইলে তোমার মুখের ওই শুভ্র বর্ণের ওপরে তাঁকে কালির ছাপ মেন মাখে? তোমার মাথার রুপ চুলে দুটি-একটির শুভ্রতা কেন সে উৎপাটন করে না—তোমার সারা গায়ে যে ধুলোর প্রলেপ,—কেন সে ভাইকের দিয়ে ঘুষে দেয় না?—আর একজন তোমার জন্যে সাগরের মত বুকছে—। তোমার চরণের পদ্মে বুক বিঁধিয়ে দিচ্ছে যাতে তোমার ন. পায়ে ব্যথা লাগে। তুমি তাকে অবহেলা করছো? আমি তোমার জন্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি—তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি—বল, বল তুমি আমার হবে—

! মানে?—লক্ষ্মণ একটু খুব-খুব করে কাশলো: : তোমার হবো সুন্দরী?—কিন্তু তোমার গায়ে নাসুরপড়া গন্ধে আমার অন্নপ্রাশনের ভাত উল্টে আসছে। তার ওপর বিয়ের কথায় একটু আপত্তি আছে আর উর্মিলাকে তুমি যা ভেবেছ সে তেমন নয়— কিন্তু সে কথা থাক। আমার পারিবারিক প্রশ্ন জেনে তোমার লাভ কি? তাছাড়া তাবছি নেজদার কথাও। আমার এই বিয়ের খবর পেলে এক কথায় বরবার মতো আমাকেও বরাশায়ী করে বেবে। সে আবার ভারি গোঁয়ার আর নারকুটে।

: এ বিয়ে আমাদের আদ্দিক বিয়ে হবে। তুমি আর আমি ছাড়া কেউ এ খবর জানবে না—শুধু জানবে দাদা, কারণ তার সঙ্গে আমি পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে নিতে চাই। আহা, তারপর—কি আনন্দ! ও বাড়ির সঙ্গে আমার শুধু সম্পর্ক বেটানোর পালা। খৌদির জন্যে আমার কোনো বলতা নেই কিন্তু পাবার একলক্ষ পুত্র আর সোয়ালক্ষ নাতিদের ছেড়ে মন একটু কে[illegible]বে—কিন্তু তুমি যদি পাশে থাকো তাহলে—

: শাট আপ। আমি পাশে থোটেই থাকতে পারবো না। কারণ বাড়িতে আমার বিস্তর কাজ। আর তুমি আমাকে দেখে মুগ্ধ হলেও আমার তোমাকে দেখে ঘৃণা করে—তোমাদের তো ধর্মের ভিত্তি নেই—ভোগাতেও বিশ্বাস নেই]

: প্রিয় স্বামী আমার তুমি আমার সিঁথি বাড়িয়ে দিয়েছ সিঁদুর দিয়ে—

: নাইটির আর কি;—ওসব থাকে কথা। আর যদি জানানো করবে তবে আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবো আর দাদা এসে কি হবে বুঝতেই পারছ—দেখছিলাম একটু লাই দিলে তুমি কত মাথায় উঠতে পার—

সূর্পণখা উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সাপের মত ঘাড় বাঁকা করে বললেন: ভয় দেখাচ্ছ? কে তোমার দাদা? তাকে আমি আমার ফুঁচিয় নতো চিবিয়ে ফেলব। সে আমার কি করতে পারে? যদি আমাকে বিয়ে না করো আমি বাঘনটি চেড়ী সঙ্গে এনে তোমার মাথা দিয়ে মুডিঘন্ট বেঁধে খাব—মনে থাকে যেন। আজ আমি যাচ্ছি, তোমাকে ভাববার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়ে কাল আবার আসবো।—তখন তোমার জন্যে একেবারে মালা নিয়ে প্রস্তুত হয়েই আসবো। মনে রেখো।—সূর্পণখা চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ শোনেন কিবললেন—শোনো। কাল যদি এ বনে আর না আসো তবে মনে রেখো আমরা মায়াবী রাক্ষসী। যেখানে যাবে সেখানেই তোমার কাছে যাব, নিস্তার নেই।—বলেই পানতুয়ার মত চোখ দিয়ে একবার লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন। শুধু যেখানে বসেছিলেন; সেখানে একটা পচা নারকের চিপসে গন্ধ হাওয়ায় ভাসতে লাগলো।

ঘটনা-সকল দেখে লক্ষ্মণ হাঁ করে কিছুক্ষণ সেই বৃক্ষতলেই দাঁড়িয়ে রইলেন। নিতান্তই অনাহারে আছেন, তাই তাঁর পেটের ভাত চাল হয়ে গেল না। শুধু সংস্কৃত ভাষায় একবার বললেন, 'অহো—কিমিদম্?'

কিন্তু বস্তুটি যাই হোক, ব্যাপার অতীব মারাত্মক। এই কামাচারী জীবটির হাত থেকে তো সহজে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। লক্ষ্মণ যেখানেই যাবেন সেখানেই তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করবে। আগেকার যুগে গায়ে জোরটোর থাকলেও না হয় কথা ছিল, একটি চপেটাঘাতে রাক্ষসীকে তিনি চিত্রগুপ্তের দপ্তরে চালান করতে পারতেন। কিন্তু অনাহারে কৃচ্ছ্রসাধন করে একেবারে মাটি হয়ে গেছেন।—'অহ-ধ, কিং করবামি?'

অনেকবার ভাবলেন, কথাটা শ্রীরামচন্দ্রকে বলবেন। কিন্তু তাকে দেখে রাক্ষসীরা

সূর্পণখা মোহিতা হয়েছেন এবং তাঁকে ছলে ভুলে নিতে এসেছেন—একথাটা যে তাঁর কাছে বলা যায় কি করে? অবশ্য সাধারণত জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূরাই এসব ব্যাপারে মন্ত্রণাদাত্রী হন। কিন্তু সীতা দেবীর সঙ্গে যে আমার সম্পর্ক অন্য ধরনের। লক্ষ্মণ সীতাকে মাতৃসমা জ্ঞান করেন। না—; তাঁকেও একথা বলা যায় না।

অগত্যা সমস্ত রাত লক্ষ্মণ বোনটির দুঃস্বপ্ন দেখে কাটালেন। একবার মনে হলো যেন ভেড়ার মালা পরিয়ে সূর্পণখা তাঁকে বরণ করতে আসছেন, আবার দেখলেন, তাঁর বিবাহ উৎসব উপলক্ষে তাঁকেই খণ্ড খণ্ড করে কাটা হচ্ছে—রাক্ষসদের প্রীতি-ভোজ হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অরণ্য আকুল করে উৎসবের যখন চতুর্দিকে রক্ত কুক্কুটের ডাক উঠলো তখন লক্ষ্মণের মস্তিষ্কে সমাধানের একটি উপায় আবিষ্কৃত হলো।

প্রত্যূষ চীৎকারনাদি সমাপ্ত হলে রামচন্দ্রের দেওয়া ফলমূল আহার করে এবং যথাস্থানে রেখে দিয়ে লক্ষ্মণ অত্যন্ত কাচাঘরে নির্গত হলেন। কিন্তু আজ অস্ত্র শস্ত্রের সংগ্রহে তাঁর রুচি ছিল না। তিনি খুঁজে খুঁজে দুইটি বস্ত্র লক্ষ্মণ উৎপাটিত করলেন; দুস্থে সুক্ষ্ম কয়েকটি রক্তবর্ণ নবপল্লব ছিন্ন করে চর্বণ করতে লাগলেন এবং অতঃপর করজোড়ে শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম স্মরণ করে সেই লক্ষ্মণ দুইটি কুক্ষিতে রেখে বৃক্ষতলে শয়ন করে রইলেন।

অকস্মাৎ বনভূমি তমসাবৃত করে সূর্পণখার আবির্ভাব ঘটল। লক্ষ্মণকে ভূতলশায়ী দেখে সূর্পণখার দুশ্চিন্তা এবং বিস্ময়ের অবধি রইল না।

সূর্পণখা সামনে এসে দাঁড়ালেন—লক্ষ্মণ বিটবিট করে দেখতে লাগলেন।

সূর্পণখা বললেন: প্রভু, তুমি শায়িত কেন? সাপেটাপে কামড়েছে নাকি? আমি বিষহরণ মন্ত্র জানি, এখুনি নিরাময় করে দিচ্ছি।

লৌমিত্রি গোঙাতে গোঙাতে বললেন,: না সুন্দরী, এ সর্পাঘাত নয়। আমি অত্যন্ত জরাক্রান্ত হয়ে পড়েছি। শরীর এত খারাপ যে বাঁচবো বলে মনে হয় না।

সূর্পণখার বিশ্বাস হলো না। তিনি গায়ে হাত দিলেন। বন্য রজনের ঘ্রাণ আছে। একেবারে একশো ছাঁচিশ্রী উঠে আছে বলে মনে হলো।

কিন্তু বুদ্ধিমতী সূর্পণখা দুই হাত কচলেন। বললেন: নাথ, এ তোমার প্রেমজ্বর—। আমাকে বিয়ে করলেই একেবারে ছিয়ানব্বুই ডিগ্রীতে নেমে যাবে।

লক্ষ্মণ বললেন: না জানিনি, যত লোভা হেরেছ তা নয়। কালির সঙ্গে আবার কাল কাল কি যেন হেরেছে;—বলেই পড়ে করে খানিকটা থুতু ফেললেন। কৃত্রিমপত্রে রক্তবর্ণ এতক্ষণে বিশেষ কার্যকরী হয়ে উঠেছিল।

দেখেই সূর্পণখা লাফ দিয়ে তিন হাত সরে গেলেন।

: আ রে রাম, রক্ত উঠছে যে!

লক্ষ্মণ বললেন: উঁহুঁ প্রায়ই উঠছে। সেদিন আবার রক্তবমিও হয়ে গেল খানিকটা। তা সুন্দরী, কাছেই পরি দেখেছো—একটু কাছে এসো,—মুখের রক্ত মুছিয়ে দাও,—মাথায় একটু নলিনীপত্র বীজন করো—কপালে চন্দন প্রলেপ করে ঘর শান্তি করো!

সূর্পণখা আরো দুপা পিছিয়ে বললেন: আ-মরি, ঢং রেখে যে আর বাঁচি নে!

লক্ষ্মণ কাতরস্বরে বললেন: সুন্দরি, রসিকতাকে সদ্ব্যবহার জানা তো এরকম নয়। কাল তোমার মুখ থেকে যে মধুধারা ঝরা করছিল সে গেল কোথায়?—এসো—এসো কাছে এসো—প্রেমিকের জন্যে প্রিয়া নাকি প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে—

সূর্পণখা মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন: হয়েছে, আর বলতে হবে না। তোমার গুটিকো সিঙ্গাপিটির মত চেহারা দেখে আসেই আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল। কি সর্বনাশ—এ শুধু টি বি নয়, প্যালপিটেশন টি বি বলে হচ্ছে। জীবন ঘোরাচ্ছে। কাছে গেলেই মারা যাবো।

লক্ষ্মণ আবার বললেন: রসিকে প্রবীণে—প্রবীণে—বলিনী পত্রের বীজনে কুরু—

: আঃ, গেল যা মুখপোড়া—সূর্পণখা রাক্ষসী-প্রাকৃতে বললেন: ঘাটের মড়া, ঘরের ঘোরে পা বাড়িয়েছে—এখনো মরীনিস্ নেলা না।—বলতে বলতেই দেখলেন অনেক দূরে রাম-সীতা দুজনে প্রস্রবণ গিরির সানুদেশে বনমধ্যে বিচরণ করছেন। রাম একটি বিকশিত লতা থেকে পুষ্প-মঞ্জরী আহরণ করে সীতার কবরী সাজিয়ে দিচ্ছেন সযত্নে।

দেখেই লক্ষ্মণের বৈনাতুর ভুলে গেলেন দৈত্যনন্দিনী।

: আহা, দুরে ও কে। এই নবজলধর শ্যাম-বরণ-কান্তি পুরুষশ্রেষ্ঠ—অহ—হ—।

লক্ষ্মণ আবার দুস্বপ্নের রঞ্জিত নিষ্ঠীবন বেগে নিক্ষেপ করে বললেন: যানিনি, ভুলে যাবার আগে বলে যাই—রামচন্দ্র। ও দিকে যেও না—বিপদের সুদিন হবে না কেবলই তো—সঙ্গে ওঁর পত্নীটিও আছেন—তুমি বরং আমাকেই অনুগ্রহ করে একটু দেখো—বলে করে লক্ষ্মণ আওড়াতে লাগলেন: টি বি গরল খণ্ডনং—মম জীবন শোভনং—

: কি আমার কপি রে!—সূর্পণখা ভেংচি কাটলেন:—তোকে দেখলে ঘেন্না হবে—তুই মরা পা। কিন্তু তি যেন বললি ওর বৌটার নাম? জনকী? ওই মোরের পুতুল জনকীকে আমি সাবাড়িতে করে মধু খেয়ে মত খেয়ে ফেলবো। তারপর—তারপর—ওই রামচন্দ্র হবে আমার প্রাণেশ্বর। আহা কি রূপ! 'নবি বঁধু তি রে খেলান! দেখলাম তো নবিরোধ না কেন?'—বলেই সূর্পণখা বেগে রামচন্দ্রের দিকে ধাবিত হলেন, আর নৈঋতেয়ী রক্তের মধ্যে বিলীন হতেই কুক্ষিগত লক্ষ্মণ দুস্বপ্নে নিক্ষেপ করে লক্ষ্মণ আনন্দে তাণ্ডব নাচ নাচতে লাগলেন।

তারপর যা হলো, তার বিস্তৃত-বিবরণের জন্য রামায়ণ দ্রষ্টব্য।

কারো পৌষ মাস

(২৮ পৃষ্ঠার পর)

হয়েছিল। জার্মান জাতিকে এর হাত থেকে উদ্ধার করার জন্যে হিটলারের অভ্যুদয় হয়। সেপ্টিমাল ডেনক্রাটদের উপর লোকের অশ্রদ্ধা হয়ে যায়। সেপ্টিমাল ডেনক্রাটরা নিজেরাই ডিসক্রেডাইটেড হন।

কিছুদিন থেকে ভারতের ডেনক্রাটিক সেপ্টিমেন্টালিস্টদের আস্তাবলে ঘোড়া ঢুকছে। মাটি খুঁড়ছে আগুনের। কিন্তু কোনোদের সঙ্গে সঙ্গে কাঁটাও চাই। আগুনদের সঙ্গে সঙ্গে জলও চাই। তবে দুর্নীতির কারখানাগুলো যদি থেকে যায় মানুষগুলোকে নরকের কষ্ট খুব বেশি ভোগ হয়ে না। প্রয়োজন অনুভবের সিনে যত বৃদ্ধি হচ্ছে কোনো কালেই এত বৃদ্ধি ছিল না। ইচ্ছে ইচ্ছা ডেপ্রিসেশনের আমলেও না। দুর্নীতির উৎসমূলে যেতে হবে প্রয়োজন যাতে না আসে তার উপায় খুঁজে বার করতে হবে। 'চোখ না ফুটলে ধর্মের কাহিনী।' বিড়ালের সামনে থেকে শিকে সরাতে হবে। ভোগের ক্ষেত্রে অত্যধিক প্রলোভনের ক্ষেত্রে অত্যধিক সতর্ক হতে হবে।

'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়।'

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

(খাদ্যকথা)

ইন্দুপ্রসাদ মিত্র

অনেক শিল্পের মত লেখার বাঁধুনিও খাদ্যশিল্পের কাছে ঋণী বিবরণ। যে ১৩৭২ সালের ঘটনা তাঁর কাব্যের নাম 'কাশীর কিঞ্চিৎ' আসলে ভূমিকার কারণে 'ছয় ঋতুর' হয়েছিল। কেশবচন্দ্র তাঁর সেই 'কাশীর কিঞ্চিৎ'তে লেখেন—

কাশী সেই কাশীই আছে—বাঙালীও 'চড়দিন মাসুরী হজমকরে হাজে ক্রমে হাঁটে।

এই লেখার প্রায় আট বছর আগে, ১৩১৪ সালের সাধনা-যুগের 'সাহিত্য' পত্রিকায় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাশী-ভ্রমণের কথা লেখেন সেটি পড়েছিলেন। 'উত্তর-মধ্যাঞ্চলে' সেই বছর বৈশাখে তাঁর 'বারোয়ারী-তলার' নামে এক প্রবন্ধ বেরোয়। এবং ১৩১৫র শ্রাবণের 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর 'ইতিবৃত্তের' শেষটি ছাপা হয়।

'সাহিত্য' পত্রিকায় ললিতকুমার তাঁর সেই কাশীভ্রমণের দীর্ঘ বিবরণ তুলে ধরেছিলেন। দশাশ্বমেধ ঘাট, বৈদ্যনাথের ধর্মশালা, সারনাথ-স্তূপ, গিরীশ ভবন, এমন কোম্পানির বিস্তারিত ইত্যাদি অনেক দর্শনীয় ব্যাপারের সঙ্গে বড়াদৌড়ার এবং কুচিবিলাসের নাম ছিল। তারই সঙ্গে এই কথা ছিল যে,—কাশী ব্যাঙ্গীর পক্ষে যেমন, ভোজীর পক্ষেও ঠিক একই রকম ঘোরা জায়গা।

সাহিত্যের রস আর আহারের রস, দুইই আস্বাদনের বিষয়। কিন্তু অন্নরসের সাহিত্যে আস্বাদ আলোচনার বিবরণ কি কমই করে আসছে? রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র তো বটেই—তাঁদের পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্র ও উপন্যাসে আহারের দৃশ্য বা প্রসঙ্গ ছুঁয়ে যেতে দ্বিধা করেন নি। ছন্দের আলোচনাতেও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'পাখনা বয়ে বাটো পিঠে তাহলা বাহুটির, টাটুরা হেলে ফেলে লাও হয়ের আর জিরে'। 'অন্নপরিবেশ' মুখের কথা লিখে গেছেন তিনি। যখনে ফুল, ফুলকো ফুলের সন্দিহানেরা সবাই এর জাগিয়েছেন,—এবং অবাকও নিয়ে গেছেন! সুখে-দুঃখে-পার্বণে, পরিহাসে আহার যে মানুষের নিত্য-অনিবার্য এক অভিজ্ঞতা, তাতে সন্দেহ হবে কেন? ন্যায়ের কলকেতু ব্যাধের আহারেই মনোরমের সাহিত্যে একমাত্র আহারের দৃশ্য ছিল না। শ্রীচৈতন্যের চরিতকথাও এ হতে বঞ্চিত নয়। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনে যত, চণ্ডীদাসের বাঁশিকে সেই 'চিকন কালো' হয়ে পড়ার দুঃখও কে না জানেন? আর পড়ুন বসে প্রাক্তনীপন্যাসেও মৌলা-মাছ আর নলতে চা পাউরুটির বিবরণ ছিল। সে শুধু বিবরণ নয়,—মূল্যায়নের সানন্দ ভোজন!

আজ ভিন্নকালের এই প্রেক্ষাপটে আমাদের কালোত্তরের দুর্ভোগে আমাদের কালোত্তরের পেটের সমাচারের কথা মনে এলো। অবশ্য সেকালের সব খাদ্য ঠিক সুখাদ্য ছিল কিনা জানি না। মধ্যযুগ অনেক দূরের। তারই শেষ প্রান্তে,—বর্তমানের সীমান্ত ছুঁয়ে আছেন ভারতচন্দ্র। তিনি হাঁরা মালিনীর বেশভূষার বর্ণনা করেছেন, আবার অন্নপূর্ণার রান্নার তালিকাও দিয়েছেন—'বড়া বড়ি কলা মূলা নারিকেল তালা—দুগ্ধচাউ তালনা, গুড়পানি ঘৃত তালা,'—আবার 'আর ঘিয়া শৌলনাছে ঝোল চচ্চড়ী'। মনে পড়ে—'নাহের ভিনের বড়া ঘৃত বের ভাত'! আজকালকার ছেলেরা 'শ্যাংলা' নানে যা পাওয়া যায়, সে কি ভারতচন্দ্রের 'শলদা'? কথা সরস হয়ে ওঠে। —নিজের মনে মনে বলি—

'বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাঁচিয়ের ভিন
পঞ্চাকল তার নাম অমৃত অমীর।
কচি ছাস মৃদু মাংসে ঝোল কাল ঘন্টা।
কালিয়া মোলনা বাসা সেকতী লবসা।'

একালের ঈশ্বর গুপ্ত তো তাঁরই কাছে প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাঁর পাঁঠা, আনারস, তপসে মাছ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। তাছাড়া চপ, কাটলেট, রোস্ট, তারিখ চচ্চড়ে। মধুসূদন, দীনবন্ধু, কালী প্রসন্ন সিংহ ছিলেন। কালী প্রসন্ন বড়বাজারের হোটেলের কথাও বলে গেছেন, আবার 'বোতল বোতল ভাবশিন, সোনা সোনা সোলাবি খিলির' কথাও ছিল।

মনোরমের বহুউক্তির আলোচনাতেও পলান্নের কথা উঠেছিল। প্রতিদিনের অন্ন-ব্যঞ্জনেও আমাদের সাহিত্যিকদের অনুরাগ ছিল। সমাজের নানা মানুষের এবং নানা বৃত্তির সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন কাঁঠাল, বুনড়া, বুনো-নারকেল ইত্যাদি উপমা ব্যবহার করেন, তার অনেক পরে ললিতকুমার করেকটি 'চুটকি' লেখেন। সেসব 'ভারতী'তে বেরিয়েছিল—১৩১২ সালে। তারই একটিতে তিনি লেখেন—'বিজ্ঞপ-প্রেরণাত্মক কাব্য সাহিত্যক্ষেত্রে পাশরলাজা', কথাটি ব্যাখ্যা করে বলা হয়—'ব্যক্তিরূপ জিনিসটারও সামাজিক কদাচার, পারিবারিক কুৎসা, ব্যক্তিবিশেষের কুৎসিত চরিত্র ইত্যাদি কদর্য উপকরণ। সেই কাঁচা অবস্থায় ঐসব কুৎসা শুনিলে ভদ্রলোকে কানে আঙুল দেন, শুনিতে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে; কিন্তু যখন সাহিত্যে সিদ্ধহস্ত হালুইকরের আঁচরূপ ঘিয়ে ভাজিয়া সেই পদনিন্দারূপ কদর্য মাল পাঠকের পাতে দেওয়া হয়, তখন সেটা বড় উপাদেয় লাগে।'

আর এক 'চুটকি'তে তিনি কাব্য-সমালোচনার কঠিন কাজটির গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে,—গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত সেই কোনো-এক রাজাকে পাকা আমের স্বাদ বোঝাবার জন্যে কোনো এক মন্ত্রীর লম্বা দাড়িতে গুড় আর তেঁতুল মাখিয়ে নিয়ে

অবোধ মানুষটিকে তা কেন করবার প্রস্তাব শেষ করবার গাটি উল্লেখ করেন।

শশিভূষণের এবং কথার সঙ্গে কালের রুচি। এবং বোধ হয়, একালের চোখে একটু ভুল মনে হবে। সেই রুচিবশেই তিনি লিখেছিলেন—'আজকালকার প্রেমের কবিতাগুলিকে বাজারের খাবারের সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা করে।'

'বাজারের খাবার' মানে? মানে ঐ যে,—আগের আমলের জিবি, পাচালী, কবিকথা, কীর্তন ইত্যাদিই তাঁর ভালো লাগতো। শেষ আলোচনে,—তিনি নিজেই লিখে গেছেন,—'তত রকম ছিল না, কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি ও পরিপুষ্টি হইত।' কিন্তু শশিভূষণ তাঁর নিজের কালে দাঁড়িয়ে, তখনকার মাসিক পত্রিকায় প্রেমের সাহিত্য পড়ে অসন্তোষে দুলেছেন!

বাংলা সাহিত্যের হাসির মাঝেই শুধু নয়, অন্যান্য অঙ্গেও আহারে বিরাগ ছিল না বোনোবিন। কেবল হাস্যরসের রচনাকার সেনের পান্তুয়া-রসগুল্লাই নয়, একালের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি-আটপৌরে মুড়ি, নারকেল, বড়াইচাঁটি বা আর একটু গুরুপাচ্য খাওয়ার মনে পড়ে। সৈয়দ মুজতবা আলি অবশ্য নানা লোভনীয় ভোজনে প্রলুব্ধ করেছেন। বস্তুরসের দিকে বসে পাঠানের পর্যাপ্তভোজন—'তিন থালা আলুগোস্ত, তিন থালা শিক-কাবাব, তিন থালা মুর্গী-রোস্ট, তিন থালা পিলা-কলিজা, তিন থালা পোলাও'—কিংবা কাবুল থেকে কলকাতায় ফিরে হাওড়া কৌশনে বাঙালী অফিসারের উদ্দেশে সেই স্বগতোক্তি—'আমার নাম কমলাকান্ত'—এবং ফাউন্ট-সর্ট পেরিয়ে,—'দেশে পৌঁছে মাকে কিছুদিন এক মুটকেশগুদ্ধ বাদাম, পেস্তা—অষ্ট পণ্ডা পরসা বন্ধ করে কাবুল সহরে কেনা। মা পরমানন্দে পাড়ার সবাইকে বিলোলেন। পাড়াগাঁরে যে বোনটির বিয়ে হয়েছিল সেও বাদ পড়লো না।'

মুচকুন্দ ফল দিয়ে সরবৎ তৈরির সুখানুভূতি ছিল মনোজ বসুর আদিপর্বের লেখাতে। এইরকম আরো অনেক কিছু, আরো অনেকের জানায়। কিন্তু আমাদের একেবারে হাদ-আমলের রুচি যেন অনেকটাই আহারবিমুখ। সবই কত যে বদলে যাচ্ছে।

বোধ হয়, এরকই অবস্থার কথা। মানুষ অবস্থার দাস, কালের পুতুল। পরস্পরাবের সঙ্গে ক্ষুধানিবৃত্তির নিশ্চয় কোনো নিগূঢ়-সম্পর্ক আছে। একালে অবশ্য চোখের ওপর, রুচির ওপর নতুন নতুন কিছু কিছু লোভ দেখতে পেলেও দুবাতের ঝুলি বিশেষ ভরে না; কারণ হবার উপায় নেই। মনে বৃত্তি নেই লেখকদের। রুচির খাওয়া তো নেই-ই, পাবার অবস্থানও নেই। ১২৬৪এ শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর সম্পাদনায় বেরিয়েছিল 'মহা-নবরস' গ্রন্থখানি। তাতে সবই অন্নাহারের কথা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছিলেন 'কাব্যনাগ।' সে আহার-ঘটিত এক অদ্ভুত কাহিনী। তখনকার নবীনদের মধ্যে নরেন্দ্র দেব, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়,—এঁদেরও মধ্যে সরোজকুমার রায়চৌধুরী, প্রবোধকুমার সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে এরকম গল্প লিখেছেন সে সময়ে।

সে সব দুঃখের কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। জীবনে প্রাপ্তিও আছে, অপ্রাপ্তিও আছে। হাঁ-ও আছে, না-ও আছে। আমাদের সাহিত্যে রসের ভোগানে মুর্গা-রোস্ট ভোজ্যরসের কিছু কিছু সুখস্মৃতি এখনো টিকে আছে। সাহিত্যে এবং সাহিত্যের আসরে,—দুই ক্ষেত্রেই দেখেছি সুখের দিন। সেই রকম একটি বিবরণ এখানে নিবেদন করি—

শ্রীধরবিজয়ের কবি চুণীলাল বসু মশায় বিজেন্দ্রলাল রায়ের কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, দিলীপকুমারকে—

'সে সময়ে তোমার বাবার সঙ্গে আমার খুব ভাব। কী আনন্দে লোক যে ছিলেন—আর আমাদের জন্যে কীরকম দরাজ হাতে খরচ করতেন যে। বেশ মনে আছে—বড় বড় অনেক লোককেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সে কী কাণ্ড! আমরা বিকেলে গেছি।' সত্যেন্দ্রনাথ তোমার মা ও বাবা এসে বললেন অসুবিধা হয়েছে।

'এত খাওয়াচ্ছি?'—

'চলুনই তো!'

'গিয়ে দেখি টেবিলে সাজানো রয়েছে লুচি, স্যাণ্ডউইচ, কেক, চকোলেট ইত্যাদি। ভাবলাম বোধ হয় high tea'র পরেই সাপার কিছু।

'একটু খাওয়া শেষ হতে না হতেই—

'চলুন চলুন ওপরে!

—'কী ব্যাপার?'—

'আরে চলুনই তো

'ওপরে ঘরে গিয়ে দেখি কি, মাটিতে বসে সত্যেন লুচি পোলাও মাছ মাংস ইত্যাদি খেতে বসেছে, একটু খাওয়ার পরই ডাকে—'চলুন, চলুন, ওপরে।' আমরা অবাক হতে চাইলে।—'সে কি হয়—you must be a sport কী জানি পাশের ঘরে গিয়ে দেখি টেবিলে সব সাজ গোছে সাজানো। বলা হচ্ছে যে কোনো খাওয়াটাই বন্ধ হল না।'

দুলালবাবু হেসে বলেছিলেন—'অত বাবার একটু একটু করে খেলেও যে বহাগত প্রাণ হয় 'দলীপ' সেটা ওরকে না? সে অনেকদিন বাদুরটি যেখানে host।'

মনে পড়ছে সেই বিজেন্দ্রলালের আরো নানা কথা। একালের অভাবের দিনেও সেকালে উঁচু তাঁরই কথা প্রথম মনে পড়ে—

বিভব সম্পদ ধন নাহি চাই
যশমান চাহি না
(শুধু) বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই—ভালো
এক পেয়ালা চা-চা-চা-চা।

সীমারেখা

(১১ পৃষ্ঠার পর)

ছিল, প্লেট যেন খুঁজে যেতে চাইল। আর সেই সার্কাসে বাঘের তীব্র উগ্রগন্ধের চোখের সামনে থেকে যেন ছবির পর্দাই সরিয়ে নিয়ে গেল, এই ধরণী তার সব আলো—সব ছবি, সব কান্নাহাসি নিয়ে আমার কাছে অতিমাত্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠল।

আমি বললুম, এত খাবার কেন? চা-ই এখন যথেষ্ট।

মোহনলালের স্ত্রী বললেন, ডাক্তার একটু বেড়ি হবে—এটুকু খেয়ে নিন।

ওপরের রতনলাল এসে বলল, নানা গান চলছে জানেন, উপরে পড়তে পারলে লক্ষ্য কৌতুকের টুকরো। বিয়ের আগে ক্রিসমাস-পর্ব কত সস্তা ছিল, ভাবা যায়। ভোরের দুর্গতির কথা—বাদুর সিনেমা পর্ব কিন্তু যেমন করে বদ্ধ হয়ে থাকত, তাই নিয়ে বেলনালকে একটা উপহার।

হাত বাড়াল, ঘরের কোণের ছেঁড়িয়োটা কে যেন খুলে নিলে। কলকাতা কেমনে রবীন্দ্রনাথের একটা মাউথ হচ্ছিল, সেটা শেষ পর্যন্ত বাদ গেছে শুনলুম আমরা, অভিনয় নিয়ে ভালো-মন্দ রসিকতা কিছু চলল। মোহনলালের স্ত্রী বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলেন। তিনি কিছু স্মৃতিরঞ্জন করলেন, বললেন, শৈলজারঞ্জন মজুমদারের কথা, আচার্য নন্দলালের কথা, সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কৌতুক নিয়ে গোটা ঘরের হাসির গল্প। তারপর খাওয়ার ডাক এল ঘাটে লন্টার।

বাহ্য-বাংলের প্রচুর আয়োজন ছিল, খেতে খেতে আর গল্প করতে করতে আরো এক ঘণ্টা। হলঘরে বসে একটা সিগারেট শেষ করে যখন দোতলার একটা শোবার ঘরে শুতে এলুম, তখন সেই নক্সাকাটা পুরোনো ঘড়িটার সাড়ে এগারোটা বাজল।

ছুটো খোলা জানলা দিয়ে আকাশভরা নক্ষত্র, ছাওয়ার দোল-লাগা অরেকটা গাছের মাথা। স্বচ্ছ নেটের মশারির ভেতর দিয়ে সব আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলুম। সেই তারা আর গাছগুলো দেখতে দেখতে আবার আমার মনে পড়ল, তখনো বালাটার ভেতরে তিনটে বীভৎস মৃতদেহ—উল্টে গাড়িটা কাঁচা রাস্তার ভিজে ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলেছে, একটা অসহ্য ক্রোধ আগুনের চাকার মতো ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মাথার ভেতর। ঘড়িতে দম দিয়েই আমি বলেছি: সরব—

"কার কাছে ঘড়ি? কোথায় সে বাড়ি? সেই যে শিবকিঙ্করীর মাথার ওপর একটা সোনার ত্রিশূল জ্বলছিল—

আশ্চর্য—!

আমি এসব কী ভাবছি! জোর করে চোখের পাতা ছুটো টেনে বন্ধ করে ফেললুম, আবার সেই একটা দুর্বোধ্য ছায়াচ্ছন্নতা আমাকে গ্রাস করতে লাগল, আমি খুব ভোরে না সেই ছায়ার আড়ালে ধীরে ধীরে মগ্ন হয়ে গেলুম তা টেরও পেলুম না।

তিন

খুব ভালো ভোরের আগেই, জানলার ওপরে কুলাঙ্গির ডাক শুনে। ঘুঁটি নেড়ে নেড়ে যেন এখনকে আমাকেই কী সে বলে চলেছিল। আমি ধড়মড়িয়ে তুলে বসতেই উড়ে পালাল।

জানলার সামনে এসে দাঁড়ালুম। কাল রাতে চোখে পড়ে নি, ডাক্তার ওপাশেই একটা পার্ক তারই একধারে কিছুটা কোপানো জমিতে অনেকগুলো জোয়ান পুরুষ আনমনে কুস্তি লড়ছে; তার পাশেই বাচ্চাদের একটা স্কুল—লাল ফুল-ইউনিফর্ম পরা একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে গায় গায় দিয়ে দাঁড়িয়ে কী গান গাইছে সমস্বরে—বোধ হয় প্রাত্যহিক প্রার্থনা। আকাশের সূর্যের প্রথম মুখ—পৃথিবীটা অপরূপ স্নিগ্ধ আর সুন্দর হয়ে আছে। আমি আরো দেখলুম, পার্কে ছুটি শিউলিগাছ রয়েছে—ফুল ঝরে ঝরে তাদের তলায় ছুটি অমল শুভ্রতার আসন বিছানো হয়ে গেছে।

ধরলায় কে যেন টকটক করে মৃদু টোকা দিলে কয়েকটা।

জানলা থেকে ঘরে এসে আমি দরজা খুলে দিলুম। একমুখ হাসি নিয়ে রতনলাল।

—খুব তাড়িয়ে বিরক্ত করলুম নাকি?

—না না, আমি আগেই জেগেছি। মোহনলাল উঠেছে?

—দাদার এখন বাকরাত। আটটার আগে তার ঘুম ভাঙে না। আমি অবশ্য এই সময় একবার চা খাই। ভাবলুম, আপনারও যদি অভ্যেস থাকে, তা হলে—

—চায়ের অভ্যেস ঠিক নেই, তবে পাঁচটার পরে আমি আর শুয়ে থাকতে পারি না। আর চা যদি পাই, তবে সে তো আরো ভালো।

রতনলাল হেসে বললে, তা মুখহাত ধুয়ে নিন, চা আসছে।

পাশেই বাথরুম। হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে আসতে না আসতেই রতনলাল একটা ট্রেতে দু' পেয়ালা চা আর খানকয়েক বিস্কুট এনে হাজির করল।

—একি! তুমি কেন?

রতনলাল বললে, তোদের চা-টা আমার একার জন্যে নিজের হাতেই তৈরি করি—বলে বলে বাহবলছ। বৌদির সেই চা-জলখাবার তৈরি হতে তো সাতে সাতটা। অতক্ষণ কে ধৈর্য ধরে বসে থাকে, বলুন?

হেসে বললুম, খুব খাঁটি কথা।

আমার ঘরে যে ছোট টেবিলটা ছিল, তার ওপরে চায়ের ট্রেটা নামিয়ে রাখল রতনলাল। বললে, আজ আমার তৈরি চা খেয়ে একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে আমাকে।

বললুম, নিশ্চয়—নিশ্চয়।

একসঙ্গেই বসে চা খেলুম দু-জনে, রতনলালকে একটা যৌথিক সার্টিফিকেটও দিতে হল। রতনলাল হেসে বললে, বৌদির সামনে ওটা আর একবার ঝালিয়ে নেবেন কিন্তু। তা এখন তো বাজে সওয়া ছটা—বেড়িয়ে আসবেন নাকি ঘণ্টাখানেক?

বললুম, চলো না। সে তো ভালোই হয়।

বাড়ি তখনো ভালো করে জাগে নি, শুধু উঠোনে দাঁড়িয়ে সূর্যপ্রণাম করছিলেন মা। বললেন, ওকে নিয়ে সাত সকালেই কোথায় চললি বলত? কখন ফিরবি?

—একটু গঙ্গার ধারে ঘুরে আসব, মা। বেশি দেরি হবে না।

দু-জনে বেরিয়ে পড়লুম। বাচ্চাদের স্কুল ছাড়িয়ে, বাহারী এলাকা পার হয়ে একেবারে উজান গঙ্গার ধারে। কাল কিকেলের সেই গঙ্গা—সেই ফুলভরা সেরুয়া জল—ওপারে নতুন ধানের সেই ঘন সবুজ পাড় বসানো। কাল দেখি নি, আজ চোখে পড়ল এপারে ছুটি-একটি করে কাশফুলের ঘুম ভাঙতে সুরু হয়েছে, এইবার একটু একটু করে চর আসতে সুরু করবে।

ঘাটে মানুষ স্নান করছে—উপুড় হয়ে পড়ে থাকা জেলেডিঙির ওপর বসে পাতন করছে কেউ কেউ। মেয়েরা কলসী করে গঙ্গাজল নিয়ে ফিরে চলল। সেই চিরকালের ছবি, চিরদিনের মানুষ। গঙ্গার আলোভরা বুকখানির জলের দিকে তাকিয়ে আমার আবার

PHONE : 34-1785

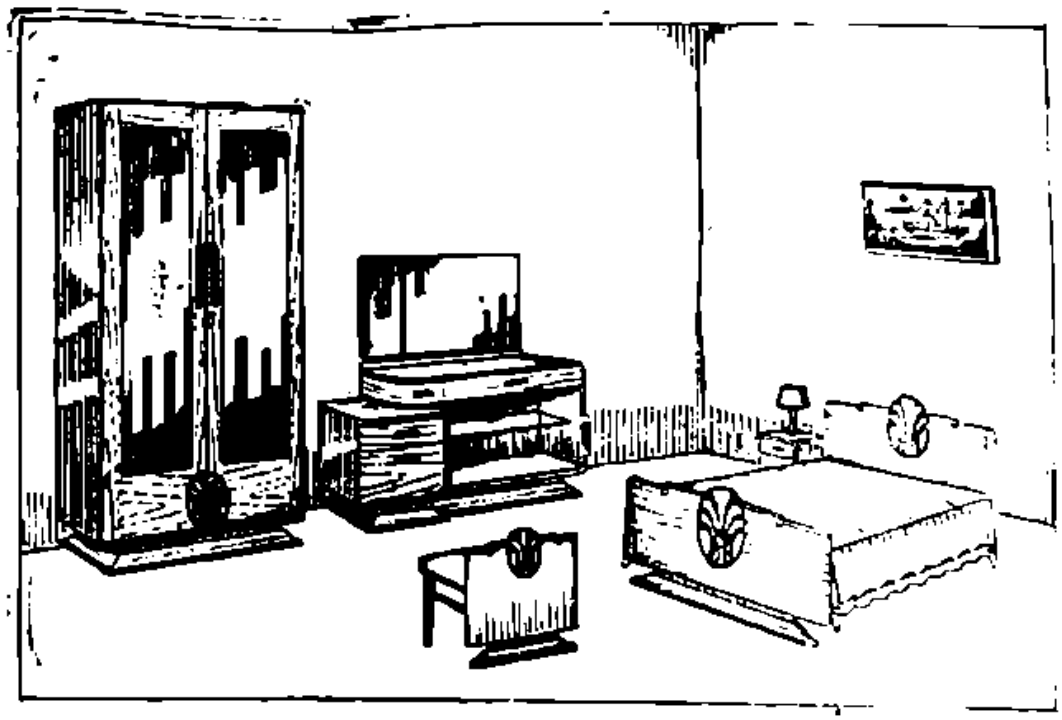

Calcutta Furnishing Stores (Private) Ltd.

CABINET MAKERS, GOVERNMENT CONTRACTORS
AND GENERAL ORDER SUPPLIERS

Workshop
211A BIPIN BEHARY GANGULY ST.
CALCUTTA-12

দু' চোখ ভরে যেন ঘনিয়ে আসতে লাগল।

হঠাৎ আমি বললুম, রতন, বাঁকিরে ওই ঈগলের মুখ নীলমূর্তিটা ছিল না?

রতন আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে, নীলমূর্তি?

আমি হেসে চললুম, হা-হা-হা, স্বপ্ন আর জনকন—পারেলাল—

—কী বলছেন বিমলেন্দুদা?

ব্যাপারটাকে একবার কী বুঝিনি বিলুন আমি। না, কাল সন্ধ্যায় মতো কোনো মোহ আমার আচ্ছন্ন করে নি, কোনো অবসরে আমার চেতনা আবিষ্ট হয়ে যায় নি—যদি কিছু দেখিনি। এই উজ্জ্বল সকালে—এই উদার প্রসন্ন ঘরে আমি পরিপূর্ণ জাগ্রত হয়ে আছি, এর চাইতে বেশি সত্য, এর চেয়ে প্রত্যক্ষতর-ভাবে সকাল এর আগে আমি কোনোদিন পাইনি। শুধু অবচেতনার স্মৃতির সীমানাটা বিস্ময়করভাবে প্রসারিত হয়ে গেছে, আমার জানা, অজানা বুকির সীমা ছাড়িয়ে দূরে দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে—আমি অনেক, অনেক বেশি মনে করতে পারছি।

বলুন, তুমি জানো না রতন, ওখানে একটা নীলমূর্তি ছিল। ছোটো প্রকাণ্ড বাগান-বাড়ি, ঢুকল তার সামনে, তাতে জনকনের খোড়া বাঁধ থাকত, আর—আর—

একটা কিসের যেন বেদনা বাজছিল, হঠাৎ কাতর হয়ে গেল।

রতন বললে, আপনি কোনো বইয়ে-টইয়ে পড়ে থাকবেন মনে হচ্ছে। হা-হা-হা, ওলেন্ডিলুম বটে আগে একটা নীলমূর্তি ওদিকে কোথাও ছিল। কিন্তু সবাই তাকে ভেঙে নিয়েছে অনেকদিন, আমরা তার একটুকরো ইট-কাঠও দেখি নি।

আমি চুপ করে লিফ্টের বাইরে তাকিয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। স্মৃতিটা আবার প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। একটা কিসের কাপড়া হয়ে গেল, আর একটা যেন একটু একটু করে ফুটে উঠছে। যেন অনেক-দিনের ঘুমানো সুরে গিয়ে একটা সুদূর ভবিষ্যৎ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

আমি বললুম, রতন, চুয়াদি কত দূরে?

—চুয়াদি?—রতন সন্দেহভাবে আমার দিকে তাকালো: আপনি এদিকে কখনো আসেন নি, অন্তত এদিককার অনেক কিছুই তো জানেন দেখছি। চুয়াদি এখান থেকে বাইশ চাকের হবে—সেখানে একটা এগ্রিকাল্চারাল বিসার্চ ইন্স্টিট্যুট হয়েছে।

অধৈর্য হয়ে আমি বললুম, এগ্রিকাল্-চারাল ডিপার্টের কথা জানি না। কিন্তু চুয়াদির জঙ্গলে একটা ইমারত পাওয়া যায়? বাঁধ আছে? মনের মধ্যে সাল-তমালের যে বন 'হল, সেটা এখনো সেইভাবেই আছে?

রতনলাল পরম কৌতুকভরে হা-হা করে হেসে উঠল।

—আপনি অবশ্যি আগেকার পুরানো বইয়ের কথা বলছেন বিমলেন্দুদা? চুয়াদির ত্রিসীমানাতেও কোথাও কোনো বন-জঙ্গল নেই, বাঘ-ভালুক কোত্থেকে আসবে? তবে সাল-তমালের মন্দির আছে বটে, খুব বিখ্যাত। প্রত্যেক বছর অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে সেখানে মস্ত মেলা হয়। এবারে আসুন না ও সময়, খুব ভালো লাগবে আপনার।

আমি জবাব দিলুম না। হঠাৎ মনে হল, মাথাটা যেন ঘুরতে সুরু করেছে। এই গন্ধ, চারদিকের এই মানুষগুলো, আজকের এই প্রকাণ্ড সুন্দর সকালটা, সব যেন একটা উজান স্রোত বেয়ে কোন্‌দিকে এগিয়ে চলল। সেখানে উঁচুতে গাড়ি চলছে, হুইলের চাঁপার দল মানুষ মারবার জন্যে ওৎ পেতে বসে রয়েছে—সেখানে আলো-ছায়ার ঝলমলা মনের ভেতর হরিণ ছুটে চলেছে, চোখের ভেতরে ছুটো আগুনের শিখের মতো জ্বলে উঠছে বাঘের চোখ। আর একটা দুটিল দুরন্ত ঘোড়ার চড়ে আমি পাগলের মতো ছুটে যাচ্ছি—শিরায় শিরায় আমার অন্ধ হিংসার স্রোত বইছে, একটা বীভৎস কিছু করতে না পারা পর্যন্ত আমার আর নিষ্কৃতি নেই!

রতনলাল জিজ্ঞেস করল, কী ভাবছেন?

বললুম, কিছু না। শুধু সেই পুরানো বইটার নাম আমার মনে আসছে না।

রতনলাল বললে, এ-সব খবর আর লেজেটিয়ার ছাড়া কোথায় পাওয়া যাবে—তাই থেকেই পড়ে থাকবেন।

—খুব সম্ভব।

—চলুন বেরা যাক এবার।

—চলো।

ফিরতে ফিরতে শুধু একটা কথাই আমার রতনলালকে বলতে ইচ্ছে করছিল। জীবনে কোনো লেজেটিয়ার আমি পড়ি নি, কোনোদিন তাদের চেহারা পর্যন্ত দেখি নি। শুধু আমার মাথার ভেতর কে যেন একটা অ্যালবামের পাতার পর পাতা উল্টে চলেছে—অনেকগুলি ছবি তাদের চেনা, অনেকগুলো আবছা, অনেকগুলো ঝাপসা-লেপা একাকার। তাদের কোনো অর্থ নেই, শুধু একটা অর্থ আছে—আর আমি কিছুতেই সেটা ধরতে পারছি না।

চার

বাড়ি ফিরতে ফিরতে মাথাটা আবার পরিষ্কার হয়ে এল। আমি বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, স্টেট্‌স গভর্নমেন্টে মাঝারি গোছের একটা চাকরি করি, ব্যাঙ্কের গৃহস্থ। অবসর সময়ে ছুটো-একটা গল্প-কবিতা লিখি, যাদো দেশের কোনো-কোনো পত্রিকায় তা ছাপা হয়। আমার বাইকে ঝোঁক আছে, টাইপ-র‍্যাবিটোরের অভিজ্ঞতা নেহাৎ কম করি না, ব্রীজ খেলতে ভালোবাসি, ক্রিকেট বুঝি না, কিন্তু মোহনবাগানের ফুটবল খেলা নিয়মিত দেখে থাকি। আমার স্ত্রী এবং একটি ছেলেকে নিয়ে মোটামুটি গার্হস্থ্য-জীবনে আমি সুখে আছি।

অফিসে অনেক দিনের ছুটি জমে ছিল, তা থেকে এই যে দিনটা নিয়ে বের করে নিয়ে আমি মোহনলালের সঙ্গে বেড়াতে এসেছি, এর মধ্যে আর কোনো অতিরিক্ত ছিল না। হুহুবাদ কলকাতার বাইরে খানিকটা খোলা হাওয়া, যতদূর চোখ যায় অবারিত আকাশ—মন ছুটিয়ে দেওয়া খানিকটা বন সবুজ, এর বেশি আমি আর কিছুই চাই না। শরীরে মনে কিছুটা তাজা হয়ে কলকাতায় ফিরে যাব, আবার নতুন করে ভিড়ে যাব প্রতিদিনের কাজের চাকায়; আর যদি এর ভেতরে একটা গল্পের প্লট কোথাও মিলে যায় সে তো উপরি-পাওনা।

কিন্তু গল্প তৈরি করা দূরে থাক, আমি নিজেই যে একটা গল্প হয়ে উঠছি। বাড়ি ফিরতে ফিরতে মনে হল, মোহন-লালের ব্যাখ্যাটাই ঠিক। ছেলেবেলা থেকেই অজস্র বাজে বই পড়ে আসছি। ব্যাকরণ কৌমুদীর নীচে 'বকের বন'; হল আর কিংডেলস জিরোমেট্রির তলায় 'লালমূর্তি' কিংবা বেলকোঠের গ্রামারের নেপথ্যে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'রহস্য-লহরী' সিরিজ দিয়ে সেই যাত্রারম্ভ। তারপর থেকে নির্বিচার-ভাবে কী না পড়েছি। ভ্রমণ-কাহিনী, অ্যাডভেঞ্চার ইতিহাস-নাটক-উপন্যাসে অনেক-জীবন দেখ করার আগেই বিশ্বায়র হয়ে উঠেছিলুম। তাদের পনেরো আনাই অবলুপ্ত হয়তো অবচেতনের অন্ধকারে, এক আনা লুকিয়ে থেকে আজ এমন অদ্ভুতভাবে আমাকে স্মৃতি-সচেতন করে তুলছে। তুলোর যাক—এ-সবের কোনো মানে হয় না।

কোনো মানেই হয় না। সেই কথাটা মনে হতেই ফিরে এসে বাড়িতে।

তখন জলখাবার তৈরি, চায়ের কেটলি ফুটছে।

একটা তোয়ালে দাঁতে করে অন্যদিকে আনালো মোহনলাল।

—ওই যে বেঁচকায় আপেল ছিল?

—হ্যাঁ, গঙ্গার ধার দিয়ে ঘুরে এলুম খানিকটা।

—তা ভালো।—মোহনলাল হাসল: প্রাতরাশটা খুব সংক্ষার ছিলিস। কিন্তু বিকারের লোভ হয়েও ওটা আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারলুম না।

—তুমি জানো না, তুমি কী চমৎকার—বলে আমিও হাসলুম, উঠলুম এসে বসলুম চায়ের টেবিলে।

আবার খাওয়া, গল্প, টুকরো টুকরো হাসি, পর পর অনেকগুলি সিগারেট। আজ আর চায়ের বাজারে গেল না, অতিথির সম্মানে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মোহনলাল।

তখনো মন স্বাভাবিক, তখনো রাতের আচ্ছন্নতা আর গঙ্গার ধারের আর্দ্রস্মৃতি আমার কাছে একটা ফুল-পাওয়া বইয়ের অক্ষরগুলি হয়ে আছে। মোহনলালের যুক্তিতে আমি আস্থা হারিয়েছি, ভাবছি হয়তো মোহনলাল যা বলেছিল তা-ও অসম্ভব নয়—কোনোদিন কোনো একটা স্টেশনারির দোকানে আমি পড়ে থাকব। কিন্তু—

রাতে দেখা হয় নি, দিনের বেলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আবার দেখছিল মোহনলাল। ওর শোবার ঘরে ঢুকে আমি পাশটিতে দাঁড়ালুম। দেওয়ালের গায়ে লম্বা একটা কাচের শো-কেসের মতো, তার ভেতরে—

দেখামাত্রই চিনতে পারলুম। 'হরপ্পা' ভাবের মতো বাঁকা খুঁদে—রূপোর নক্সা-কাটা তার গায়ে। দীর্ঘ লম্বা নল—অদ্ভুত ধরণের বন্দুক একটা।

বললুম, ওটা কি হে?

মোহনলাল বললে, ওটা? ওটা ঠাকুর্দার আর বরলে পর্সবের সঙ্গে শিকারে গিয়েছিলেন। একটা বাঘ নাকি হাতীর হাওদার ওপর প্রায় লাফিয়ে ওঠে, হাতী তখন পেছে ছুটতে থাকে—এদিকরা নার্ভাস—পর্সবের প্রাণ নিয়ে টানাটানি। তখন পাশের হাতী থেকে এক গুলীতে ঠাকুর্দা বাঘটাকে শেষ করেন। পর্সবি খুশি হয়ে বন্দুকটা ঠাকুর্দাকে উপহার দিয়েছিলেন। দেখবে ওর গায়ে একটা রূপোর প্লেটে কলকে-করা লেখা আছে। কিন্তু বন্দুকটা—

বললুম, কি হয়েছে বন্দুকটার?

—এখন আর ইউজ করা যায় না। ওর ব্যাক-স্লেটেড বলে নয়, ওর মেকানিজমেও কি গণ্ডগোল হয়েছে—

আমি বললুম, দেখি একবার?

বন্দুকটা বের করে আনল মোহনলাল। আমি লোভীর মতো ওর হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে বললুম, ম্যাডলক। ইউজ করা কিছু শক্ত নয়। খারাপ হয় নি, শুধু এই ফুটো একটু ঢিলে হয়ে গেছে আর সামান্য একটু ক্লীন্ করলেই আবার ঠিক হয়ে যাবে। এ বন্দুক নিয়ে আমি চুটিয়ে জঙ্গলে—

—বিয়লেস্।—মোহনলাল প্রায় আর্তনাদ করে উঠল: কী বলছ তুমি? তুমি আবার ঘরে ফিরবে কখনো? কোন্ চুলোয় জঙ্গলের কথা বলছ? চুলোয় জঙ্গল তো পঞ্চাশ বছর আগে নির্মূল হয়ে গেছে।

আর সেই মুহূর্তে আমি স্পষ্ট ফিরে পেলুম। আমার সেই অদ্ভুত আচ্ছন্নতা আমাকে ফেলে রেখেছে। যে আমি ভাবনে বসলে বন্দুক স্পর্শও করি নি—সেই আমি বাতলব বন্দুকের মেকানিজম্ ঘাঁটা করে ফেলেছি। আর অদ্ভুত কাণ্ড! আজ সকালের রচিত একটা অদ্ভুত মনভূমি, যেখানে এখনি

উপন্যাস : প্রকাশিত

বড়ের সংকেত	৩৫০	প্রবোধকুমার সান্যাল
লালনিক	৩০০	অমিলভূষণ চট্টোপাধ্যায়
অকূল সমুদ্র	২৫০	বিমলাক্ষ রায়
আকাশ প্রদীপ	২৫০	সৌরীন্দ্র দে
কৃষ্ণচূড়া	২৫০	সৌরীন্দ্র দে
দুইবাড়ি	২৫০	সৌরীন্দ্র দে
আলোয় আলোয় পৃথিবী	৪৫০	কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বিতীয় পৃথিবী	৪৫০	পার্থ চট্টোপাধ্যায়

[প্রচ্ছদপটগুলি এঁকেছেন বৈদ্যেরী মুখোপাধ্যায়]

উপন্যাস : প্রকাশ প্রতীক্ষায়

সুন্দরী মঞ্জুলেখা — বাণী রায়

গল্প সংকলন : প্রকাশিত

ব্যাকুল বসন্ত ৩০০০ — বিমলাক্ষ রায়

[বৈদ্যেরী মুখোপাধ্যায়ের আঁকা প্রচ্ছদপটগুলি শুটিয়ে প্রকাশিত]

গল্প সংকলন : প্রকাশ প্রতীক্ষায়

রাতজাগা পাখী — সৌরীন্দ্র দে

ভ্রমণ কাহিনী

হিমালয় (সচিত্র) ২০০ — রায় জলধর সেন বাহাদুর

অনুবাদ

এ পিলগ্রিমেজ ৩০০ — মূল লেখক : জন বেয়ার্ড
অনুবাদ : অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা : প্রকাশ প্রতীক্ষায়

প্রজাপতি — কবিশেখর কালিদাস রায়

গীতা-লহরী [মূল গীতা কাব্যে অনূদিত] — কবিশেখর কালিদাস রায়

বিজ্ঞানের জন্য :

ইংরাজী বর্ণপরিচয় শেখার জন্য একখানি সুন্দর বই :
DING DONG 1·50 | Written and Designed by : MAITREYEE MUKHERJEE

বাংলা বর্ণপরিচয় শেখার জন্য দুখানি সুন্দর বই :
ক্রমবর্ণী (১ম—১·২৫ | ২য়—১·৫০) — বিভাসিন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীভারতী পাবলিশার্স
৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট । কলিকাতা-১২

একটা বন্ধুর হাতে করে তোমার ফেরত দিচ্ছি—।

মোহনলালের বিস্ফারিত চোখ দুটোর দিকে তাকে আমি শুধু হাসি হাসলুম। বললুম, কিছু না ভাই, কিছুই না। আমি ঠাট্টা করছিলুম তোমার সঙ্গে।

বলেই, মোহনলালকে আর একটা প্রশ্নও উচ্চারণ করবার সুযোগ না দিয়ে, দ্রুতপায়ে নেমে এলুম নিজের ঘাটের দিকে এগিয়ে চলে গেলুম।

না—আমার কথা আর কাউকে বলা যাবে না। কেউ বুঝবে না।

যে মুহূর্তে একটা সুদূর সীমান্ত থেকে থেকে আমার মনের সামনে ফুটে উঠেছিল, একটা দুরন্ত-ভাসা ছবিটুকির মতো—সেই মুহূর্তে নিজেও নিজেকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারি নি। এখন মনে হচ্ছে সেটা নিশ্চিত একটা বুঝের মধ্যে এসে স্থির হয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি, এগুলো শুধু চেতনে নয়, বচনে নয়, কোনো ভুলে-যাওয়া বইয়ের পাতায় অবচেতনা-নিহিত অক্ষরেই অভিব্যক্ত নয়। আমি জেনেছি—কতকাল আগে বলতে পারব না—এই মাটি, এই আকাশ—এখানকার ইতিহাসেরও একটা অতীতের মধ্যে আমি নিশ্চিহ্নভাবে ছিলুম; বহু বছরের ওপার থেকে আমার সুপ্ত অস্তিত্ব অবচেতনার মধ্যে ফিরে আসছে—অবশ্য সম্পূর্ণ ফিরে আসছে না। যে জগৎটাকে সেদিন আমি একান্তকরে চিনতুম তার রূপ বদলে গেছে, যে-জীবনের মধ্যে বাস করে গেছি—সে আজ আর কোথাও নেই, যে-আমি সেদিন বেঁচেছিলুম—সে আমি অন্য শিক্ষা, অন্য সংস্কার, অন্য অভ্যাস আর অন্য মনের নতুন ফিরে সেদিনের সেই আমার সঙ্গে একটা দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছি। অথচ—

কী অদ্ভুত অসংগতি—কী অর্থহীন যন্ত্রণা।

কতকাল পরে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছি, আত্মীয় পাচ্ছি তার, স্বর্গ পাচ্ছি, অথচ সে আমার নয়; যে জীবনের মধ্যে ফেরে উঠেছিলুম—সে একটা শবদেহের মতো সামনেই পড়ে রয়েছে, অথচ আমার আত্মাকে নিয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি জাতিস্মর, কিন্তু আজকের এই জন্ম-রহস্যের সামনে একটা অন্ধ পর্দার মতো দাঁড়িয়ে আছে তার ওপর থেকে থেকে কতগুলো 'সিম্বলে'র ছায়া-আত্মা, পরস্পরহীন, খণ্ড খণ্ড চলচ্চিত্রের মতো।

ওই নাটকটাকে আমি জানতুম—ওর আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত আমার মুখস্থ ছিল—কিন্তু আমার সত্তাই আজ আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে অনেকটা ছায়ামূর্তির মতো প্রতিভাত হয়েছে, আমি জন্ম-জন্মান্তরের ওপার থেকে শুধু নিরুপায় দর্শনার ভাবেই সিকে তাকিয়ে আছি!

একথা কাউকে বলা যাবে না, কেউ বুঝবে না! বরং লোকের আমাকে পাগল বলে মনে হবে।

সারাটা দিন নিজের ভেতরে ডুবিয়ে থাকলুম। মোহনলাল দু-একবার ম্যাচলক বন্দুকটার কথা বলতে এসেছিল, হেসে উড়িয়ে দিলুম আমি। প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশি কথা বলতুম, অকারণে প্রগল্ভ হয়ে উঠতুম, সামান্য হাসির কথায় উচ্চহাসি হাসতুম। তারপর বিকেল এল, দুপুরের ঘোর ছায়া হল, তখন ভেতরকার ঘনানাটা আমাকে প্রায় পাগল করে তুলল।

চা খাওয়া শেষ করেই আমি বেরুবার জন্যে তৈরি হলুম।

মোহনলাল বললে, বেড়াতে যাবে? দাঁড়াও—আমি মিনিটের মধ্যেই রেডি হয়ে নিচ্ছি।

—তুমি রেডি হতে থাকো, আমি আসছি।

—কোথায় চললে?

—কোথাও নয়—দু' প্যাকেট সিগারেট কিনে আনব কেবল।

—তার জন্যে তুমি বেরবে কেন? চাকরটা এনে দেবে এখন দোকান থেকে।

—দরকার নেই, আমি একুনি ফিরব।

বাড়ি থেকে বেরিয়েই জানলুম, সিগারেট আমার দরকার নেই। তার চাইতেও একটা অন্যতর আকর্ষণ আমায় টানছে। এই ছায়ামূর্তির টুকরো টুকরো অভিনয়, নিজের সত্তার এই প্রক্ষেপ—জন্মান্তরের পার থেকে যাকে আমি নিস্পৃহ দর্শকের মতো দেখছি, তা আমার কাছে একেবারে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। কিন্তু একটা করতেই হবে, এই নাটকের একটা সুখলাভের অধিকার আমায় করতেই হবে—নইলে আমি পাগল হয়ে যাব।

দরজার বিয়েই সাইকেল-রিক্সা দাঁড়িয়ে ছিল একটা। সেটাকে থামিয়ে আমি বললুম—কিংবা আমার ভেতর থেকে সেই অবচেতন অতীত বলে উঠল: লাল মহলকা ঘাট।

—লাল মহলকা ঘাট!—রিক্সাওলা অবাক হয়ে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, লালমহল। পথ চেনো তো?

—চেনি। ওইসা কোই ঘাট নেহি হিঁয়াপর।

দ্বিতীয় ক্রোধে আমি দাঁতে দাঁত চাপলুম। হারিয়ে গেছে, লুপ্ত হয়ে গেছে—কেউ মনে রাখে নি, কেউ চিনবে না। আমার রিক্সাওলাটাকে আঘাত করতে ইচ্ছে হল একটা। বললুম, চুপচাপ জানতে চাও?

—জরুর। আগ্রিকালচার অফিস যে জাইয়ে গা? বো জগেয়া মেনে হোগা।

চুলোয় যাক এগ্রিকালচার—মনে মনে আমি গর্জন করলুম। তারপর বললুম, ঠিক হ্যায়—চলো।

রিক্সা চলল, আর উঠে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরের জগৎটা সম্পর্কে যেন আর কোনো কৌতূহল আমার রইল না। আমি সব দেখেছি, অথচ কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় চলেছি—কেন চলেছি, সে ভাবনাও আমার মন থেকে মুছে গেছে। আমি যেন আবার ঘুমিয়ে পড়লুম।

এতদিন তো মেনেছি, জীবনের এই ছোট বৃত্তটুকুর ভেতরে—যেখানে আমি শুধুই বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—যেখানে আমি আফিসে আসি-যাই, বাজার করি, নাটকে অভিনয় করতে ভালোবাসি, মোহনবাগানের মাঠে গিয়ে চিৎকার তুলি, অবসর সময়ে ছুটো-একটা গল্প লিখি, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে মোটামুটি সুখে থাকি—সেইখানেই আমার যা কিছু পরিচয়। যখন থাকব না, একেবারেই থাকব না। অন্ধকার আকাশ থেকে একটা উল্কার মতো করে পড়েছি জন্ম-চেতনার, আবার মৃত্যুর ঘুর্ণিতে একটা হাউইয়ের মতো উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওই রাত্রির আকাশেই মিলিয়ে যাব। যে অসীমের ভরসে একটা বুদ্বুদের মতো ফুটে উঠেছিলুম—তারই অতল শূন্যতায় আবার পরিনির্বাণ লাভ করব।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমি মৃত নই। একটা আদি-অন্তহীন শিকলের আংটার মতো জন্মের পর জন্মের নালা গেঁথে চলেছি, কোথায় সুরু করেছিলুম ভুলে গেছি, কোথায় গিয়ে সারা করব তা-ও জানি না। যদি এইচ জি ওয়েলসের টাইম-মেশিনের মতো একটা যন্ত্র আমি পাই—যদি রকেটে চেপে ফেলে-আসা আমার পদচিহ্নগুলোকে আবার আমি অনুসরণ করতে পারি, ঘুরতে পারি একটি একটি করে অতীত জন্মের ঘাট, তাহলে হয়তো একদিন গিয়ে দাঁড়াব বিশ্বয়ের সেই 'সম্রাট উপত্যকায়'—যেখানে সিংহ-নাকীর

দুর্বোধ্য দুর্গম রাস্তাতে নীল নদের বালি খুঁড়ে খুঁড়ে পেত একটা মুড়ুক পথ; হাজার হাজার বছর আগে তৈরি কোনো একটা গোলোক-ধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পৌঁছুব অজানা কোনো পিরামিডের তলায়—যেখানে সোনা আর প্লাটিনাম-খচিত দরবারে শুয়ে আছে আনাদই শবদেহটা। হয়তো সেখানে মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে চির-অভিশপ্ত সালোমের সঙ্গে—যে অকারণ হিংসায় অন্তর্কাল ধরে ফিরোপাত্রাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আমার চমক ভাঙল। যেন পরিচিত একটা গন্ধের উচ্ছ্বাস হঠাৎ আমাকে টেনে ধরল, যেন চারধারের মাটিটা আমাকে ডাক দিয়ে বললে, 'এখানে—এখানে।' আমি চিৎকার করে বললুম, এই বিকৃশা, ঠাহরো, ঠাহরো। হিঁহাই উতার যাউঙ্গা।

অবাক হয়ে বিকৃশাওলা থেমে পড়ল।

—বাবু, চুহালি তো আভি দূর হ্যায়।

—যানে দেও চুহালি।

দু মাইল পথ এসেছি কিনা সন্দেহ, ছুটো টাকা ছুড়ে দিলুম ওর দিকে, তারপর বিকৃশা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লুম। হতভম্ব বিকৃশাওলা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে, তারপর গ্যাড়াল ঘুরতে ঘুরতে আবার উল্টো দিকে ফিরে চলে গেল।

এই তো—এই তো!

সেই বাঁক—সেই ঝুরিনামা ঘটগাছটা। আর সেই বাঁকের মতো বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে একটা ধ্বংসস্তূপ—লালমহল! আজ আর তার সামনে হাট নেই—আশেপাশে জন-বসতি নেই, শুধু বাথালদের কয়েকটা গরু-বাছুর দারাদিনের চরা শেষ করে মাঠের ঘাস দিয়ে ধীরে ধীরে ফিরতে সুরু করেছে। শুধু সন্ধ্যা হল হল করছে, শুধু দীর্ঘশ্বাসের একটানা শব্দ উঠছে বটগাছের পাতায় পাতায়।

মৃত, নির্জন—একটা শ্মশানের শূন্যতা দিয়ে ঘেরা।

যে ফটকের ওপর ছুটো সিংহ বসে থাকত, আজ তা একটা ইটের পাঁজা। যে লালমহল লোকে-লস্করে গমগম করত তা আকাশবাসীন এক অরণ্যানরতা। আজ দিনে-দুপুরেও সাপের ভয়ে লোকে হয়তো এর ত্রিসীমানাতেও আসে না। অথচ—

আমি বাড়িটার সামনে মাঠের ঘেসের ওপর চুপ করে বসে পড়লুম। আজ শ্মশান, সব মৃত, সব নিঃশব্দ, অথচ, অথচ ঘাট-সত্তর কিংবা একশো বছর আগে—

পাঁচ

দুই ভাই। কিশোরীনারায়ণ আর চন্দ্রনারায়ণ।

জাতে বাঙ্গালী। কোন্ মোগল বাদশাহের আমলে পূর্বপুরুষ এসেছিলেন বিহারে, পেয়েছিলেন জমি-জায়গীর, তারপর দুরন্ত লাগাটে প্রায় রাজার মতো বাস করছেন এখানে। সেই রক্ত আর সেই উত্তরাধিকার কিশোরীনারায়ণ আর চন্দ্রনারায়ণের।

দুই ভাই-ই শিকারী, বেপরোয়া, উদ্দাম। না আছে জীবনে শৃঙ্খলা, না আছে চরিত্রে।

লেখাপড়া শেখবার প্রশ্ন ছিল না, সাহেব হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। সদর বাড়ির বাই নাচে, মহুর ঝনঝনে, প্রতিবেশী জমিদারের সঙ্গে তরোয়াল আর বন্দুকবাজী করে, অবাধ্য প্রজার গ্রামে আগুন ধরিয়ে, দুর্গাপুরের জঙ্গলে বাঘ-হরিণ শিকার করে, কখনো কখনো বাবা কাল ভৈরবকে পুজো চড়িয়ে। ইংরেজের পক্ষে কয়েকটা খুন-টুন করে আরো নাচতাজ হয়েছিল ছোট ভাই চন্দ্রনারায়ণের—আরো দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিল সে। নিরিবিলিতে নাচুনে খুন করতে পারত, দিনে-দুপুরে লোকে নৌকোর ধাইজী নিয়ে যে গঙ্গা-বিহারে বেরুবে পড়ত।

তবু দু-ভাইয়ের মধ্যে সদ্ভাব ছিল। এক মেজাজ, এক চরিত্র। আশপাশের লোক বলত, 'জোড়া শয়তান।' একজন অন্যজনের সঙ্গে মদ ঢেলে দিত, বাইজীর নাচে একজন সারেঙ্গী ধরলে আর একজন বাঁয়া-তবলা টেনে নিত।

এমনিই চলছিল, এমনিই হয়তো অনেক-দিন চলত। কিন্তু চারদিকের মানুষের যত অভিশাপ, যত ঘৃণা, যত দীর্ঘশ্বাস নিয়ে গড়ে উঠল এক বিষকন্যা। কিশোরীনারায়ণের স্ত্রী বাপের বাড়িতে গিয়ে একবার সঙ্গে করে একটি অল্পবয়েসী দাসী নিয়ে এল।

সুরু হল সুরু-উপসুরু বাহিনীর আর এক নতুন পর্যায়।

দাসী কায়াথের মেয়ে—কিন্তু এমন রূপ কোথা থেকে পেয়েছিল কে জানে! তার আগুনের মতো রঙ, ঈষৎ পিঙ্গল উজ্জ্বল চোখের তারা, পাতলা ঠোঁট ছুটি যেন আফিং ফুলের পাপড়ি, সারা শরীর নবীনা নাগিনীর মতো। দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ, হাসিতে ছুরির ধার, মাথার চুলে দুপুর অন্ধকার। নাবকন্যা বাইজীরা পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায় তার কাছে, দাসীপুত্রের মেমসাহেবকে পর্যন্ত ফিকে মনে হয়। দিনী যে নয়—বিলিতী ছুঁড়ির মতো এ যেন বিদেশী মেম।

নাম—চন্দ্রাবলি।

কিশোরীনারায়ণের প্রথম দৃষ্টিতেই মেঘ লাগল, জমাট হয়ে রইল। চোখ—হায়—কেউটে সুরৎ।

চন্দ্রনারায়ণ যেন চমকে উঠল, আগুনরঙা চোখ মেলে একবার চেয়ে নেবার মতো ভাইয়ের দিকে। এই প্রথম নজর বড়ো ভাইয়ের থেকে অন্যত্র নিবদ্ধ আর দুর্বহ বলে মনে হল।

ফাটল ধরল।

সারেঙ্গীর সুরের সঙ্গে আর তালে তাল না রাখবার সঙ্কেত: একজনের গ্লাস যে দিতে গিয়ে আর একজনের হাত উঠে আসে একজন আর অবিশ্বাস করতে সুরু করল।

তীব্র বক্রতা দিয়ে চন্দ্রাবলিকে ধরতে চাইল চন্দ্রনারায়ণ—কিশোরীনারায়ণ তাকে মেহের পাত্রে পরম রাখতে চাইল। এই বিদ্বেষ অবশ্য অন্তরঙ্গ নারী-সুলভ অধিকার

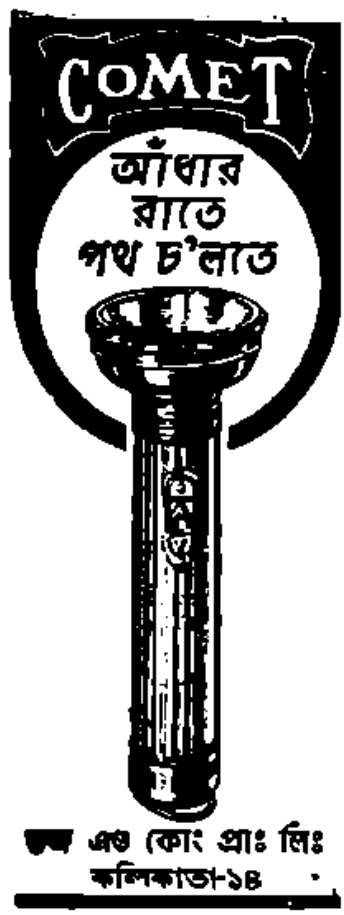

ভদ্র এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১৪

...করবার আগে দুই আঙুলের ফাঁকের ধূমায়িত সিগারেটটা ফেলে দিল।

'তবু চাবেলির নিজেকে জানল, তাকে কেমন করে কিভাবে নিজে ভোগ করতে হবে তার কায়দা সে হয়তো শিখে নেয় নি। কটমট চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ওপর কটাক্ষ হানিতে সমস্ত শরীরে চমক তুলে দুজনকে। কিছুটা ধীর-স্থির কিশোরী অপেক্ষা করে চলল অসীম ধৈর্যের ওপর ভর দিয়ে আর দুর্বার চন্দ্রনারায়ণ দাঁতের চাপে নিজের ঠোঁটটাকে রক্তাক্ত করে তুলল।

তবু সব কিছুর একটা সীমা আছে। একদিন হঠাৎ অন্ধকারে লালমহলের ছেলেদের বাগানে চন্দ্রনারায়ণের হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে গেল চাবেলি। চাঁদনির সেই বনে হরিণ এবারে বন্দুকের পাল্লায় ছেলের এসে পড়েছে, এমনি মনে হল চন্দ্রনারায়ণের। হাতের মুঠো নিষ্ঠুর মুঠোয় সে চাবেলির হাত চেপে ধরল।

চাবেলি চেঁচিয়ে উঠল। সে চিৎকারে ধ্বনিত ভয় ছিল, অন্যায় ছিল তার চাইতেও বেশি। একটু পরেই হয়তো সম্পূর্ণ চুপ করে যেত, হয়তো একটা প্রতিবাদও শোনা যেত না তার গলায়। কিন্তু—

কিন্তু কোথায় যে ছিল কিশোরীনারায়ণ—মনে আকাশ ফুঁড়ে নেমে এল। কটোর গলায় ডাকল : চন্দ্র!

চন্দ্র চাবেলির হাত ছেড়ে দিল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল তার। মদে মুখ থেকে ঝাঁঝ ছুটে বেরুচ্ছে সাপের মতো দুটো নির্নিমেষ বিষাক্ত চোখে সে অপলকভাবে চেয়ে রইল কিশোরীর দিকে।

তখন সাক্ষাৎ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মতো একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিলে কিশোরী।

'ছাড়—ছাড়, বহুৎ সমঝে যাও। তোর জাতীয় বাপের বাড়ির কি, আমাদের আশ্রিতা। এমন করে তার গায়ে হাত দিতে আছে? মেয়েদের ইজ্জৎ তো ছেলে-খেলার জিনিস নয়। বাঈজী নিয়ে তুমি যা খুশি করতে পারো, তাই বলে চাবেলির

...পাশে মেয়ের মর্যাদা ইজ্জৎ অপমান করতে চাও? তোর ঘরে দুটো আঙুর খাবার...তোর আমাদের কি আর ঘরে নেই যে তোমার উপর খাবার তখন? তুমি কি বলতে আসেন বন্ধু হয়ে না চন্দ্র? ছুঁচোটাই যে কাজ লাগানো চালিয়ে—'

বক্তৃতা থামবার আগেই চন্দ্রনারায়ণ ঘরে থেকে সামনে থেকে, ঘরের মেঝের প্রতিটি তার ছিল না। ক্রোধ, সন্দেহ, নিরাশা আর হিংসায় তার মস্তিষ্কের ভেতরে যেন বিপর্যয় চলছিল তখন। ঠিক তাই—ছুঁচোবাঈকে কাছে লাগানো—চাবেলি বাঈজীর মতো একটা খেলনা নয়। কিন্তু—কিন্তু—বিদ্যুৎ চমকের মতো চন্দ্রনারায়ণের মনে হল, বাগানের এই নিরালা কোণটায় সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহলে কিশোরীই বা কী করছিল? কোথা থেকে অমন করে—সময় বুঝে এসে পড়ল সে?

তবে কি—

চন্দ্রনারায়ণের উৎক্ষিপ্ত মস্তিষ্ক যেন একটা বন-বেড়ালের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতে লাগল। সমস্ত রাত সে জেগে কাটাল, উত্তাপের মতো খুব বেড়াল পরের দিনটা, অন্ধকার বন্ধ-বেলাতে খুব একটার পর একটা বন্দুকের গুলি ছুড়তে লাগল। কিন্তু মন্ত্রণা গেল না, আরো উগ্র, আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

তারও পরের দিন হঠাৎ খবর নিয়ে সে একমাসের জন্যে নয়ন খুঁজতে বেরিয়ে গেল। কিশোরী খুশি হয়ে বলল, 'কাজকর্ম করা তো ভালোই, জমিদারীটাও তো দেখতে হয়।'

চন্দ্রনারায়ণ এবারও উত্তর দেয় নি।

একমাস পরে নয়, সেই রাতেই সে লালমহলে ফিরল। ওই ফটকাছটার নীচে নৌকো বাঁধল, তারপর সিংহদরজা দিয়ে নয়—ধারোয়ান-দরওয়াজকে জাগিয়েও নয়—গিরগিটির মতো পেছনের পাঁচিল বেয়ে চলে এল ভেতরে।

একতলা-দোতলার সব ঘরগুলোতে কারুনেলা অন্ধকার। শুধু ভেতলার আয়েজি-কেতার ঘর দুটোতে আলো জ্বলছিল।

পা টিপে টিপে উঠল চন্দ্রনারায়ণ। ঘরের দরজা ভেজানো, চন্দ্রনারায়ণ বাড়িতে নেই বলে খিল দেওয়ারও দরকার বলে করে নি কিশোরী। কপালে সড়াচ্ছে মদের বোতল। আর তাই একপ্রান্তে পড়ে আছে চাবেলি আর কিশোরীনারায়ণ।

চন্দ্রনারায়ণ তৈরি হয়েই এসেছিল। বের করে আনল ছ-নলা পিস্তলটা।

শুধু একটা ঘরে ঢিৎকার করবার সুযোগ পেয়েছিল কিশোরী। শুধু সিংহল যাবার চোখ মেলে একবার বলেছিল, 'ভাই—'

আর বলতে পারে নি। চন্দ্রনারায়ণ পর পর দুবার ঘোড়া টেনেছিল পিস্তলের। দরকার ছিল না, প্রথম গুলিটাই কিশোরীর কপাল ফুটো করে একদম মগজ শুদ্ধু ছিটকে বেরোলে গিয়ে লেগেছিল। আর বেঁচে গিয়েছিল চাবেলি। পিস্তলটার আবার চোটা ঘরের আগেই সে ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল।

তার পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। একবছর পরে ছাপ্পা জেলে ফাঁসি হয়ে গিয়েছিল চন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর।

.....থামি চমকে উঠলুম। আমার চেতনা সেই রহস্যময় পর্দাটার সামনে—যেখানে ছায়ানাট্যের মতো আমারই অতীতের প্রক্ষেপ চলেছে—যেখানে এতক্ষণে একটা নাটক সুস্পষ্ট পরম্পরায় বয়ে যেতে পড়ল—আমার চেতনা সেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নাটকের আমি একজন প্রধান অভিনেতা—কিন্তু কে? ছুটো ছায়ায় একই আদল দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু চিনতে পারছি না—কিছুতেই চিনতে পারছি না। আমি কে? কোন্ জন?

আমি কে? কিশোরীনারায়ণ, না চন্দ্রনারায়ণ? দু-নলা পিস্তলের গুলীতে আমার কপালটাই কি ফাঁক হয়ে গিয়েছিল, খানিকটা ঘিলু গিয়ে ছিটকে লেগেছিল সামনের দেওয়ালে? না, ছাপ্পা জেলের ফাঁসির দড়িতে আমিই তাজা ঘাড় দিয়ে সুরতার ওপর ঝোল খাচ্ছিলুম?

কে আমি? হত, না ঘাতক?

প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করলুম। এ নিছক অলস-কল্পনা, এ কোনো পুরোনো পড়া বইয়ের অবচেতনা-নিহিত কয়েকটা ছেঁড়া পাতার উৎক্ষেপ। কিন্তু ভাবতে পারলুম না। বিশাল ভাঙা-বাড়িটার এই অন্ধকার মৃত-মূর্তিটার দিকে শুধু ওই ছায়াগুলোর ভেতর থেকে নিজেকে আমি চিনে নিতে চাইলুম, তীব্র যন্ত্রণায় মনে হল, ওই বাড়ির একটা ভাঙা ইট তুলে নিজের মাথায় আঘাত করি—বিস্মৃতির এই শ্যামাঙ্গ রাহুমুক্ত সরিয়ে দিই। কিন্তু কিছুই পারলুম না, যেখানে ছিলুম সেইখানেই নিশ্চল হয়ে রইলুম ছায়ার সামনে গঙ্গার জলটা সন্ধ্যার রোয়ায় মুক্তির সংকেতের মতো কালো হয়ে এল।

Some Valuable Text & Help Books

FOR STUDENTS OF H. S., P. U. & INTERMEDIATE Courses

Rs. 10·00

INTERMEDIATE & HIGHER SECONDARY PHYSICS
(In 3 Volumes) Per Set — Rs. 20·00

Prof. J. Chatterjee & Prof. H. Biswas.

NUMERICAL EXAMPLES IN PHYSICS
(Solution) — Rs. 6·00

Prof. P. Dey's (Panchanan Dey)

TEXT BOOK OF INORGANIC CHEMISTRY — Rs. 8·50

***Dr. S. Ghosh**—Presidency College.*

Also we are selling Agents & Stockists of Publication of
A. Mukherjee & Company Private Ltd. Calcutta.

B. CHAND & CO.,

1/2, RAMANATH MAZUMDAR STREET, CAL-9

Gram : LEVERFILE **Phone : 34-4708**

যজ্ঞেশ্বরী

(১৮ পৃষ্ঠার পর

তুই মেয়েই মন খারাপ করিস নে মনু। তুইই সবচেয়ে ভালো, আর সবাই ভালোবাসে নিজে—'

মনু বলল, 'সত্যিই মনটা আমি ছোট্ট, তাই না মা?'

মা সস্নেহ দৃষ্টিতে বললেন, 'মোটে বলে ছোট্ট আমি ছিনিয়ে নেব এনে আর আমি তুনিয়ার সেরা কি বাহা।'

মনু বলল, 'অমন দেখ, ওদের জন্য আমি বড় ধাঁধা।'

'ধাঁধাই তো। অফিসের ঘরে তো ওদের ওখানেই থাকিস। কত গল্পগুজব হাসিঠাট্টা। অবশ্য কাজও করে নিস। ছেলেটার অঙ্কের বইয়ের কত হাতের কাজ তোর ধরা। সবই তো দেখেছি।'

মনু বলল, 'কিন্তু অত দেখেশুনে থাওটা ওর ব্যাপারে হয়ে উঠল না। সব আমি বুঝি। হঠাৎ প্রত্যাখ্যানে ওইভাবে মাইকে বলল বিয়েটিয়ে যেতে যেতে না। এখন একা কিছুতেই ছাড়বে না বাবাকে। তুমি যে সঙ্গে থাকবে তারও উপায় নেই। আমি সব বুঝতে পেরেছি মা।'

সুনয়নী বললেন, 'কই আর বুঝতে পারিস। ওদের কি আর অত বোঝা যায়। তোকে আমি যে কত দিনের করেছি।'

'কিন্তু মানুষ তো ওদের মা কাকো বাড়িতে যাবে। তবে না কারো সঙ্গে এসব কথা বলবে। হাসিঠাট্টা করবে। এতদিন এই ঘরঘর ঘরে আছি। কিন্তু অমনকে আর কারো বাড়িতে যেতে দেখেছ? কারো সঙ্গে মেতে আলাপ করতে দেখেছ? ওর নিজেরাই তো আমার সঙ্গে আলাপ করতে। বাড়িতে ডেকে নিয়ে যেতে প্রথমদিন নিজেই আবার সঙ্গে যেতে কথা বলেন। উনিও অফিসে যেতেন আমিও যেতাম। বাড়ি ফেরা হলে, পাশের সীট খালি থাকলে ওঁকে বসতে বলি। উনি জোর করে দুজনের টিকিট কাটেন। কোনদিন আমিও কাটি। আমুদে মানুষ। কথা বলতে বলতে গল্প করতে করতে যান। তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি মা, এর চেয়ে বেশি কোন সম্পর্ক ওঁর সঙ্গে আমার নেই।'

মা বললেন, 'আমি তা পারি বাছা। তোমার মন আমি জানি। নইলে কি আর আমি তোমাকে বিশ্বাস করতাম?'

মনু বলল, 'শুধু বাবাকি মাঝে মাঝে কী যৌতুকের কথাই না বলে। অথচ নিজে থেতে কত সুন্দর, লম্বা চেহারা, কর্মী ছেলে। নাক মুখের ছাঁদ সবই সুন্দর। দুই ছেলের মা হয়ে চলল তবু আমাকে ভয়।'

সুনয়নী বললেন, 'তুই যে ডিরেক্টার করিস।'

মনু মার দিকে মুখ ফিরিয়ে রাগে আক্রোশে আর ঘৃণায় বলে উঠল, 'আর বাবারি নিজে কি করল আজকে? অমন ছলনা আমি করতে পারতাম? কখনো পারতাম না। ভালো মনসিজ করেছে? বইলে তো কিকবাবার ভাগ করতে হত।'

মনু ঠোঁট কামড়ে হাসল।

মা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'থাক বাছা। ওসব পরের কথা নিয়ে মন খারাপ কোরো না। কি দরকার আমাদের।'

বেরে উঠে মনু এঁটো পরিষ্কার করে নিল। মুখটুক ধুয়ে এসে মাকে জোর করে খাওয়াল। অল্প একটু দুধ সাগু খেয়ে মা তিনেক বাতাসা দিয়ে জলযোগ করলেন সুনয়নী। খেতে খেতে হঠাৎ বললেন, 'তোকে একটা কথা বলি মনু।'

'বলো।'

'তুই একটা বিয়ে-টিয়ে কর। একাবে থেকে আর—'

মনু একটু হাসল, 'সেই পুরোন কথা। অনেকদিন তো ভুলে ছিলে মা। আবার বুঝি আজ মনে পড়ল।'

সুনয়নী বললেন, 'মনে আমার রোজই পড়ে। তুই বিরক্ত হোস, তাই আর বলি নে। কিন্তু আমি ভাবি, আমি চোখ বুজলে তোকে কে দেখবে? আমি থাকতে থাকতে তুই একটা—'

মনু বলল, 'কিন্তু মা, আমার বয়সও তো তিরিশ হল। লোকের কাছে তুমি বয়সও কমিয়ে বলো। কখনো পাঁচবছর কমাও, কখনো সাত বছর কমাও। কিন্তু কমালেই তো বয়স কমে না। তা বছর বছর ঠিক বেড়েই যায়। আমার এই চেহারা, এই বয়স। এই নিয়ে কার পায়ে ধরে সাধাসাধি করতে যাব বল তো?'

মা বললেন, 'অমন করে বলিস কেন? তুই কি কেলনা? অফিসে চাকরি করিস। ভালো টাকার মত পাস। খব করে অফিসার করিস। তাতেও কত সুখ্যাতি। কাগজে নাম ছাপা হয়। তুই কি কেলনা?'

মনু হাসল, 'না মা, আমি তোমার সাত্ত্বনার মন এক মানিক।'

শুতে যাওয়ার জন্যে মনু উঠে পড়ল। এ ঘরের দেয়ালে যাবার একখানা ফটো

Phone : 34-5186

CALCUTTA CABINET CO. PRIVATE LTD.

High Class Cabinet Makers and Govt. & Rly. Contractors.

Managing Director :

I. B. BASU

Registered Office :
37/9, S. N. ROY ROAD, CAL-38
Phone : 45-2514

66, Bipin Behari Ganguli Street,
(Bowbazar Street)
CALCUTTA-12

Workshop :
249, Bipin Behari Ganguli Street,
CALCUTTA-12

টানানো। সেই ফটোখানার দিকে তাকালো মধু। মোটাসোটা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেয়ারে বসে আছেন। যখনই মনে আকাঙ্ক্ষিত কোন আঘাত লাগে, দুঃখ হয়, বাবার ফটোর দিকে তাকায় মধু। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে বাবাকে সে আর দেখে নি। মার কাছে শুনেছে, তার যখন ছ'মাস বয়স, তখন বাবা মারা যান। তার পর থেকে মার জীবন সংগ্রাম। দুঃখের জীবনের সুরু। এখন মা সেই দলাই এসেছে। এখন সংসারের ভার মধুর হাতে। আগে নাকি অনেকগুলি ভাই-বোন হয়েছিল মধুর। আসানসোলে তাদের কবর আছে। বাবার ফটো তোলার সখ ছিল। কিন্তু দাদা-দিদিদের কেউ আর বেঁচে নেই মধুর। থাকলে এমন অসহায় নির্বান্ধব হয়ে থাকতে হত না।

নিজের ঘরে এসে দোর বন্ধ করে দিল মধু। এই দু'খানা ঘর মীরা বউটি অনেকদিন তার কাছে চেয়েছে। 'তোমার তো একখানা ঘরেই চলে যাবে মধু। তুমি আমার ঘরে এসো, আমি তোমার ঘরে যাই। এসো আমাদের ফ্লাট আমরা বদলাবদলি করি।'

প্রভাসদা বাথরুম থেকে চেঁচিয়ে বলেছেন, 'মধু যদি আরো কিছু বলতে চায় পাবলে।'

মীরাদি সঙ্গে সঙ্গে মুখঝামটা দিয়ে উঠেছেন, 'আমি না পারলেও তুমি তো পারবে। তুমি সবই পার।'

মীরাদি যত চটে, যত রেগে কথা বলেন প্রভাসদা তত তাকে ক্ষেপাতে ভালোবাসেন। প্রভাসদাও একজন ক্ষয়ে অভিনেতা নয় কৌতুকরসের অভিনেতা।

মধু আর ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না। কোন সম্পর্ক না। কথাও বলবে না ভেবে ছিল। ঘর বদলাবার কথা এক-একবার ভেবেছিল মধু। ওদের একটু উপকার করার কথা ভেবেছিল। আর কখনো ভাববে না। পৃথিবীতে কারো উপকার করতে নেই। কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নেই।

শুয়ে পড়লেও কিছুতেই ঘুম এল না মধুর। বিশ্রী একটা জ্বালা হচ্ছে বুকের মধ্যে।

বিছানা ছেড়ে উঠে এল মধু। মেঝেতে ঠেস দেওয়া মোট একখানি চৌবদ। তার ওপর কিছু বই-পত্র, পাইজামার ফোটো, চুলের কাঁটা। সব এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। কি ভেবে চুলবাঁধা টানল মধু। খোলা চুলের। খোলাই থাকে। কেউ বলে দেয় না। যে আসবে, সেই ত চলে যাবে। মধুর কারো জন্যে কিছু এসে যাবে না। শুধু নিজের কাছে ছাড়া।

চুলবাঁধা আয়নাটা অনেকদিনের। জায়গায় জায়গায় পারা উঠে গিয়ে ঝাপসা হয়ে গেছে। মধুর মুখটা ঝাপসা দেখাচ্ছে। চুলবাঁধা শেষ করে মধু একটু হাসল। ফিক করে। হাসিটা ঝাপসা হয়ে গেল। আয়নার পারা উঠে গিয়ে। মধুর মুখের

দেশপ্রেমিকের দৃষ্টিতে ভারতীয় চলচ্চিত্র

॥ কল্পতরু সেনগুপ্ত ॥

আমি ফোলোডুমে কেরোসিন উৎপাদনে নই, ওষুধ হইস্কি আমার বিরক্তি লাগে, আমার খুন এসে যায়, কাজেই পারতপক্ষে আমি ছবি দেখতে যাই না।'—সম্প্রতিকালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে উপরোক্ত উক্তি করেছিলেন। এই উক্তি তাঁর ব্যক্তিগত, কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষিত ও রুচিসম্পন্ন ভারতীয় তাঁর সঙ্গে একমত হবেন। এইরূপ বলার পেছনে শিক্ষিত ব্যক্তিরা যত বেশি ইংরেজী ছবি দেখেন, তত বাংলা ছবি দেখেন না। যত বাংলা ছবি দেখেন, তত হিন্দী ছবি দেখেন না। আঞ্চলিক ছবিগুলি যত আসছে কেন যায়, হিন্দী ছবি দেখার বয়সে সে উৎসাহ থাকে না। তুলনামূলকভাবে আমাদের ছবির এখন পর্যন্ত প্রধান দর্শক অর্ধ-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মানুষ।

অন্ত গত বছর (১৯৭০) কলকাতাতে ১২০টি ভারতীয় ছবি মুক্তিলাভ করেছে। তার মধ্যে ৩৩টি বাংলা ছবি। চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্রে ভারতের স্থান হলিউড বা জাপানের পরে, চিত্রনির্মাণে ভারত সারা বিশ্বে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানের অধিকারী। ভারতে বছরে গড়ে শোনে তিনশত কাহিনী-চিত্র নির্মিত হয়। হলিউডের ইউনিয়নের পরে একমাত্র ভারতে আঞ্চলিক ভাষার চিত্রনির্মাণের রীতি আছে। হিন্দী, বাংলা তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, পাঞ্জাবী, কানাড়ী, মারাঠী, রাজস্থানী, ওড়িয়া, অসমিয়া, ভোজপুরী, গুজরাটি ইত্যাদি ভাষায় আঞ্চলিক জীবন-চিত্র নির্মাণের চেষ্টা হয়ে থাকে। সারা ভারতে ৩৭টি স্টুডিও; চলচ্চিত্র-শিল্পে মূলধন নিয়োজিত রয়েছে ৮৪ কোটি টাকা। স্টুডিও এবং ল্যাবরেটরিতে কর্মীসংখ্যা ২০ হাজার; সিনেমাগুলিতে প্রায় ৩০ হাজার। প্রযোজনা এবং পরিবেশন-সংস্থার কর্মীর সংখ্যা কম নয়। বেসরকারী এক সমীক্ষায় প্রকাশ, নয়াদিল্লীর শিল্পগুলির মধ্যে চলচ্চিত্র-শিল্পের স্থান

● ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম উদ্যোক্তা দাদাসাহেব ফালকে।

দ্বিতীয়; এবং মজুরী দেওয়ার দিক থেকে এই শিল্পের স্থান চতুর্থ। সুতরাং অর্থনৈতিক দিক থেকে চলচ্চিত্র-শিল্প নেহাৎ উপেক্ষণীয় নয়; সমাজে লোকশিক্ষার ভূমিকা হিসাবে এই শিল্পের গুরুত্ব অসীম। এই শিল্প থেকে প্রমোদ কর, উৎপাদন কর, সেন্সর, আমদানি ইত্যাদিতে সরকারের আয়ের অঙ্ক কম মোটা নয়। বছরে প্রায় দুই লক্ষ টাকার মত বিদেশী মুদ্রা ভারতীয় ছবি অর্জন করে থাকে। একদিকে সরকারী তহবিলে আয়ের জন্য, আর একদিকে জনশিক্ষার মাধ্যমরূপে চলচ্চিত্র-শিল্পের গুরুত্ব উপেক্ষা করা যায় না।

এই কারণে রাশিয়াতে নভেম্বর বিপ্লবের পরে এবং নিরপেক্ষনামায় চলচ্চিত্রকে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছিল। লেনিন বলেছিলেন,—'চলচ্চিত্র এক শক্তিশালী শিক্ষাধান, এবং জনসাধারণের শিল্প।' এই শিক্ষাধানকে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে লাগানো হয়েছিল; নতুন এবং প্রাণবন্ত ভঙ্গিতে সোভিয়েট চলচ্চিত্র জগতে বিস্ময়কর করেছিল। চলচ্চিত্রে প্রয়োগরীতি ও কলাকৌশলের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন করে দিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশে চলচ্চিত্র জনসাধারণের শিল্প। ছবি সেখানে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের উপকরণ নয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক [illegible]

সমাজতান্ত্রিক দেশে চলচ্চিত্র মুনাফা উপার্জনের পথানাত্র। হলিউড প্রভৃতিতে প্রযোজকদের চলচ্চিত্র নির্মাণের একমাত্র উদ্দেশ্য—মূলধন মূলধন অর্জনের জন্য স্থির থেকে কিছু দর্শকশ্রেণীর স্বার্থে প্রচারণা ও বিকৃতির সৃষ্টির ফলে সুযোগসন্ধানীরা ফায়দা লুটে যায়। তাই হলিউড ও সমাজতান্ত্রিক দেশে

● প্রমথেশ বড়ুয়া

● দেবীকারাণী। তাঁর স্বামী শিল্পী স্বেতোস্লাভ রোরিখ ছবি থেকে নেওয়া।

ছবির প্রধান অবলম্বন নারীদেহ; বিষয়বস্তুতে জীবনের ব্যক্তিগত দিক। বর্তমান জগতে দুই সমাজ-ব্যবস্থায় চলচ্চিত্রের দুই রূপ।

বিংশ শতকের সুরুতে যখন ভারত বৃটিশ উপনিবেশ মাত্র। এই উপনিবেশের মানুষের কাছে ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের বার্তা এসে পৌঁচেছে। ফরাসী বিপ্লবের চিরন্তনী এখানকার শিক্ষিতমনে সাড়া জাগিয়েছে স্বদেশ-মন্ত্রে জেগে উঠেছে। আমাদের দেশের মানুষ তখনো সম্পূর্ণভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল, দারিদ্র্য, অশিক্ষায় সমাজজীবন স্তিমিত। সঙ্গীত, এবং নৃত্য জনজীবনের পরিবর্তে কাহিনী থেকে প্রেরণা আহরণ করে, শিল্প এবং মানুষ রাজাদের প্রাসাদের মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে। এমন এক সময়ে ভারতের রাজনীতি ও শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র এই কলকাতায় হীরালাল সেন (১৯০৩) চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁর পরে ১৯১৩ সালে বোম্বাইতে দাদাসাহেব ফালকে 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' নামক পৌরাণিক কাহিনীচিত্র নির্মাণ করেন। ভারতে এটি প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয়তার আহ্বানে ১৯২১ সালে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন জনমনে দেশপ্রেমের ভাবকে এনে দিল। ঐ সময়ে বাণিজ্যের মাধ্যমে বিদেশীর ধনী আমদানিকারের মত একশ্রেণীর শিল্পী মানুষের জীবনে প্রেরণা ও নতুন আবেদন জাগিয়ে তোলেন। তাঁদের আনুকূল্যে প্রেরণা থেকে বহুবিধ চলচ্চিত্র-শিল্প গড়ে তোলার দিকে কিছু অগ্রসর হোক এগিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতিন বসু, সতু লাহিড়ী, হিমাংশু রায়, দেবকী বসু প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্র তখনো পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীতে সীমাবদ্ধ; কেবল বঙ্কিমচন্দ্রকে অবলম্বন করে সামাজিকচিত্রের দিকে এগিয়ে আসার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। ১৯২৮ সালের দিকে বোম্বাইতে গান্ধীজীর চিন্তাধারা ও জীবনদর্শন উদ্ভূত (বিষয়) একটি ছবি নির্মিত হয়েছিল; কিন্তু ছাড়পত্র না পাওয়ায় মুক্তিলাভ করতে পারে নি। এতে সমাজচেতনা নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ-চিন্তার প্রথম আঘাত আসে। চলচ্চিত্রের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়।

১৯৩০ সালে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আবার দুর্বার হয়ে ওঠে। একদিকে গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন, আর একদিকে সশস্ত্র বিপ্লববাদের আদর্শে ভারত দেশের যুবকসম্প্রদায়ের অসন্তোষ এক বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদে আত্মপ্রকাশ করে। এই জাতীয়তাবোধে নির্মাণের চলচ্চিত্রশিল্প এক চলচ্চিত্র-শিল্প গড়ে তোলার প্রয়াস করে। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে বোম্বাইতে 'হরিশ্চন্দ্রের অন্তর্যজ্ঞ', 'সত্য তুকারাম' নামক ধর্মমূলক 'আওরত' ও 'রোটি', শান্তারামের 'অমর জ্যোতি', ফ্রান্সেসকার 'দুর্গার', বাসন্তের দেবকী বসুর 'চণ্ডীদাস', প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস', বিমল রায়ের 'উদয়ের পথে' ইত্যাদি ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিকাশের পথে এক নতুন পদক্ষেপ করে। এই সময়ের চিত্র-পরিচালকদের মধ্যে ফ্রান্সেস বর্ণনে প্রত্যয় আনে দাগ কাটে। বিদেশী সরকারের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যে সময় বহু জাতীয়তাবোধের ছবি নির্মিত হয়েছিল, সেই ছবিগুলি ছিল তাঁর নির্মাণ সম্ভারে সমৃদ্ধ।

স্বাধীনতালাভের পরে আরো বিকশিত হবার, জীবনের বিভিন্ন দিক প্রকাশ করার সুযোগ লাভ করে। এই সময়ে 'চাঃ কোর্টনির্স' 'নীচ নগর' 'বিরাজ বৌ' 'দো বিঘা জমিন' 'বাঁসী কি রানী' 'টুটে পরিস' 'মির্জা-গালিব' প্রভৃতি হিন্দী এবং "হুমায়ুন"

'ত্রিশ বছর' '৪২' 'সাগর' 'পরিবর্তন' এবং 'চাঁদ এবং পৃথিবী' ছবিতে দেশের মুক্তি-সংগ্রামের ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালীন রূপকে তুলে ধরে, আর একদিকে সমাজ-সচেতন চিত্র নির্মাণের দিকনির্দেশ করে। বাস্তবধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণে এই দুই এর নতুন সংযোজন।

যুদ্ধোত্তরকালে স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্যবাদের অবসানে জনমনে প্রেরণা জাগায়। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বলি হবার বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত হয়ে ওঠে। শান্তি-আন্দোলনের প্রভাবে এবং নতুন জীবনবোধের আলোকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের শিল্প ও সাহিত্যে নতুন রূপ লাভ করে। সাহিত্যের মত চলচ্চিত্র বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ায়। জীবনের রূঢ় সত্যের রূপ তুলে ধরে ইতালীতে নয়া বাস্তবতার। এই নয়া বাস্তবতার ঢেউ আমাদের দেশে এসেও পৌঁছয়। এবার আমরা পেলাম সত্যজিৎ রায়ের মত জাতশিল্পী পরিচালককে। বাংলার শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসকে 'তিনি উপস্থিত হলেন 'পথের পাঁচালী' নিয়ে। গত ন' বছরে সত্যজিৎ রায় 'অপরাজিত' 'অপুর সংসার' 'জলসাঘর' 'পরশ পাথর' 'দেবী' 'তিনকন্যা' 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' 'মহানগর' 'চারুলতা' এবং 'রবীন্দ্র সংগীত' ছবি নির্মাণ করে ভারতের চলচ্চিত্র-শিল্পে বাস্তবতার এক বলিষ্ঠ রীতি প্রবর্তন করেছেন। এই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বৈশিষ্ট্যের জন্য সত্যজিৎ রায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছেন। এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র বিশ্বের চলচ্চিত্রকারের স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র পর সত্যজিৎ রায়ের 'পরশ পাথর', 'দেবী', 'মহানগর' উল্লেখযোগ্য, যে ছবি জীবনবোধ ও প্রখর সমাজচেতনাসম্পন্ন। ১৯৫২ সাল থেকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের আত্মসচেতনতার সূত্র আমরা পাচ্ছি; কয়েকটি ভাল ছবি পেয়েছি: 'জাগতে রহো' 'কাবুলিওয়ালা' 'হীরামোতি' 'অমানিক' 'মেরে চাচা কাকা' 'লো আঁখে ভর আয়ে' 'বাইসে শ্রাবণ' 'প্রতিনিধি' 'অনর কলি ইয়ে প্যার' 'মুক্তাভা' প্রভৃতি।

ত্রিশ থেকে ষাট দশকের ছবির তালিকা সাজালে সমাজচেতনাসম্পন্ন অনেক ছবির নাম পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক পুরস্কারের তালিকাও আমাদের অপ্রাপ্য নয়। এই ছবিগুলি নিয়ে আমাদের গর্বের সীমা নেই। বাঙালীরা তো বাংলা ছবির গর্বে বাঁচে না। কিন্তু বছরে নির্মিত শো'য়ে তিনশত কাহিনী-চিত্রের মধ্যে সত্যিকার ভাল ছবি কটি? হিন্দী তো নয়ই, অধিকাংশ বাংলা ছবি কি দেখার যোগ্য? বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিকের ছবিতে সেই একই কঙ্কালসার: প্রেম বড়লোকের মেয়ে+গরীবের ছেলে. অথবা গরীবের মেয়ে+বড়লোকের ছেলে। মধ্যখানে এক ষষ্ঠ। পটভূমি—শহর। জীবন সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা। ত্রিশদশকের 'অজুরকর্তা' থেকে আজকের 'দেবী' পর্যন্ত, হিমাংশু রায় থেকে সত্যজিৎ রায় এত যে উদ্যোগ, জনসাধারণের এত সমর্থন, সংবাদপত্রে এত প্রশংসাবাদ, তার মূল্য কোথায়?

● সুচিত্রা সেন

যুদ্ধোত্তরকালের জীবনবোধ ও পথের নির্দেশ প্রযোজকরা ধরতে পারেন না; স্বাধীন দেশের প্রযোজকের কর্তব্য তাঁরা পালন করলেন না। তাই আমাদের চলচ্চিত্রে সমাজ-ছবি নেই, নেই সমাজ-চিন্তার প্রতিফলন। জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রকাশ নেই, বক্তব্যের সীমাবদ্ধতার মধ্যে যা সম্ভব হয়েছে, ছবিতে সেটুকু জীবনবোধও আস্বাদন করা যায় না। বহুজাতির দেশ ভারতের বর্ণরঞ্জিত রূপ চলচ্চিত্রে ফুটে ওঠে না। বর্তমানের ভারত-চিত্র চলচ্চিত্রে অনুপস্থিত। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস কত গৌরবোজ্জ্বল ঘটনায়, কত নজরবীর আত্মত্যাগের মহান কাহিনীতে সমৃদ্ধ। কিন্তু প্রযোজকরা সে

● সত্যজিৎ রায়

সব কাহিনীতে উৎসাহিত নন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বার বার এদেশ লাঞ্ছিত হয়েছে। বিদ্বাক্ত ক্ষতের মত সাম্প্রদায়িকতা সমাজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিদেশী দালালও তাই তার সুযোগ গ্রহণ করছে। বহুরূপী, চোরাকারবারী ও স্বার্থসেবী ক্ষুদ্র নেতা এবং আমলাতন্ত্রের দাপটে দেশ আজ বিপন্নপ্রায়। এদের মুখোস উদ্ঘাটনকারী চলচ্চিত্র কোথায়? সরকারী বিশ্ব ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এদেশের ছবির জন্য তো টাকা দেয় না। গান্ধীজীর জীবন-চিত্র নির্মাণের জন্য বিদেশীরা এগিয়ে আসছে, কিন্তু কোন ভারতীয় প্রযোজক উদ্যোগী হয় নি। অধিকাংশ প্রযোজক স্বদেশ-চেতনাহীন মানসিক আবর্জনাগ্রস্ত ব্যবসাদারী মাত্র।

অবান্তর, অশ্লীলতাদুষ্ট, নেতিবাচক ছবির জঞ্জাল আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। সরকার এবং দর্শকদের পক্ষপোষকতা করতে হবে খাঁটি শিল্পের। আজ দেশের পক্ষে প্রয়োজন খাঁটি শিল্পভিত্তিক ছবি। সেই শিল্পই খাঁটি, যার দর্পণে জীবন প্রতিফলিত। তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে জীবনের সংগ্রাম, জয়-পরাজয় এবং প্রেরণা। জীবনের প্রতি ভালবাসা, মানুষের জীবনের সব কটি দিক, যা মানুষকে জীবন-সংগ্রামে বিভ্রান্ত করে না, আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর করে তোলে না। খাঁটি শিল্প জীবন সম্পর্কে মানুষকে মিথ্যা ধারণা দেয় না। সত্যের আলোয় পথ দেখায়।

Our respectful Greetings
on the occasion of the
DURGA PUJA

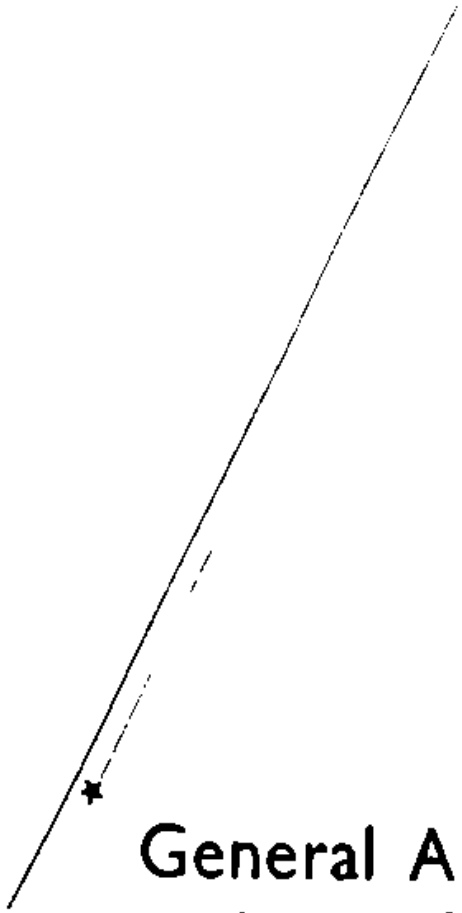

General Auto Service

Automobile & Electrical Engineers
Specialist in Fuel Injection Equipments
7 IC, SIR DEVAPRASAD ROW
CALCUTTA-14
PHONE 24-2672

ক্যাকটাসের ফুল

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

ইন্দুপুর-হরিণডাঙা-শেয়ালডাঙা আর কিছু। যে ঘরে এসেছি, সেখানে বসেই বাকি সব কিছু দেখা যায়। বসে বসে ভাবতে লাগলাম, কেমন করে বিকিয়ে যাব।

বাঁচা উৎপলের মেজ মেয়ে মেঘনা ১০... কথায় কথায় বলে সরকারী চাকরি করবে।

সহর ছাড়িয়ে অনেকদূর দূরে যেতে তবে মিলবে পাহাড়। পথে পড়বে ঝিলমিলা গ্রাম। এ গ্রামের পঞ্চানন মুচি নামকরা চাষী। তাঁর আছে দুশ বিঘে জমির চাষ। বিঘেপিছু ফলন ওঠে তিরিশমণের। ঘুরে ঘুরে দেখেছেন কিভাবে নতুন নতুন কায়দায় বিঘে পিছু ফলন বাড়াচ্ছেন। কেমনভাবে সঠিক সময়ে চাষ দেয়া যায় কিংবা দু'বার চাষ আর তিন বার মুড়ি। মাটিকাটার পায় ভাত, মুড়ি, বাহার খোরাকী ধান আর কাপড়।

উত্তরে শুকনির পাহাড়। তার কোলে সাঁচ সাহেবের বাড়িটা অনেক দূর থেকে চোখে পড়ে। সাহেবের জমি আছে হাজার বিঘের ওপর। সরকারী ফার্ম, হয়েছে হালে। তোমার এই বিঘে কাজীদের দেওয়ান কীর্তিপদ মুখুয্যের জমিজমা। তাদের এক ম্যানেজ ছিল এক ডাক্তার। তিনি এখানে লোকজন বাড়ি আনেন, চাষের খামার করেন। জমিদারি উচ্ছেদের পর তাঁর ওয়ারীশরা এটা সরকারের হাতে তুলে দেন। সরকারী ফার্মও খুব বেশিদিন হয় নি।

ম্যানেজার, এগ্রিকালচারাল ওভারসিয়ার, এগ্রিকালচারাল ডিমনস্ট্রেটর, ফার্ম সেক্রেটারি, ক্লার্ক, কৌর কাঁসার, লালোয়ান, পিওন, ক্যাটল্ কাঁসার—এই নিয়ে এখানকার কাজ।

তাছাড়া পঞ্চাশজনের মত লোক এই ফার্মে থাকে নানা জন্তুজানোয়ার কাজ পায়। চাষের জন্য ছুন, ধুলাই, আগষ্ট। এই ধরণের কাজ

...সবের জন্য,
আর কাজের
আছে উৎসাহ

...সবের, মুহূরের পাতা ও ডালের বাহ... যে কোন সময় কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু ধানি আছে আরামের অধ্যায়। আর যেন খানিকটা অসামাজী পাঁচিত পড়ে আছে।

এসব সত্ত্বেও জমির ওজনের হিসেবে ধানি হল সবচেয়ে ভালো। যেমন জমি হল 'দোঁশ বা বেলে'। হালোর থেকে তেড় হাজার টাকা দিয়ে। মাঝারি ভাল হল 'আলকী'। আইশো টাকা দিয়ে। যদি জলের ভাল ব্যবস্থা থাকে, তাহলে 'ধার' জমিও ভাল। এ জমির ধান বিক্রি দু'বার পাওয়া যেতে পারে। একেবারে ওঁচা জমি হল 'ভাটা' জমি।

সাঁচ সাহেব এখানেই হয় জন। বৈশাখ মাস হয়, আমনের চাষ পড়ে। আগের ধান আমন হয়ে গেছে। ...এ উঁচু ক্ষেতে এবারে আখ, এবং নীচু ক্ষেতে ধান হবে। তাতা জমিতে হবে আলু। বিঘের মাঠ বড়। আউশ-আমনে মোট বারোমাস বিঘে ৩ হাজার মণের ওপর। এখন ছাড়াও গরু খাবে ১০... মণ খড়, মণ, মণ, ভুষি, চটকলাই, কাড়ুবাদাম আর থাকে। থাকে বিঘে জমির খাজনা।

সে বছর চাষবাস থেকে আয় ... লাভ করেছিল তেত্রিশ হাজার টাকারও বেশি।

পরের দিন বিকেলেই আমরা বিষ্ণুপুরের রাস্তায়।

বিষ্ণুপুর এবারেও আমার দেখা। শুধু নতুন বিল্ডিংগুলোই আমার দেখা হয় নি। সত্যি বলতে কি, পুরনো স্মৃতির চেয়ে নতুন জমিনই আমাকে বেশি করে টানে। কী ছিলাম চেয়ে কী হচ্ছি, কী হবে।

বিষ্ণুপুর পৌঁছতে দুটো বেজে আমার মনে

একজনের পেটে ছুরির খবর ছড়িয়ে আসে। হাসপাতালের বারান্দায়। গোবা পন্টনদের হাত ধরে সে এসে উঠেছিল শালবনীর ঘাটে। এখানে পুলিশের দালালের মাতব্বর আলতাপরা পা ঝুলিয়ে বসে বুড়ো পল্টনীদের ঠিকুজি বের করে নিয়ে সে বলেছিল, 'ভালো? সমাদের মুখে আমি আগুন দিই।' বলেছিল ও বাড়ি বিষ্ণুপুরের কোন্ এক কালোবাজারের মেয়ে

আরেকজনের সঙ্গে দেখা তার দশ বছর পরে। বিষ্ণুপুরেরই এক জমাদার। বাইরের এক মাইফের দলের সঙ্গে সে এসেছিল। সাইফেলের চাকা ঘুরিয়ে সে পাওয়ার জেনারেটর করতে জানত। মোগাপটকা চেহারা। কবিরা ভালবাসে। পরে সে মশানজোড়ে ট্রাক্টর চালাত।

বিষ্ণুপুরের রাস্তায় তোমাই আমার সেই মুখ দুটো মনে পড়ে।

বিষ্ণুপুরে না গিয়ে...গেলাম ঝিলা হয়ে থাকিগে। যৌবনে মানিকলালার বন।

...বাসের কাছ হবে। বড়দা ভোর বিয়ে ...ছেলেটির বয়েছে মাথে ম্যাপ। এক ঝাপ পরে চা খেয়ে-পড়েই সবাইকে বেশ চাঙ্গা হয়ে গেল।

বনের ভেতর দিয়ে মোহ গরুর গাড়ির এবড়োখেবড়ো রাস্তা। ...দিকে মাইল লম্বা বন। মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম।

রাস্তাও তেমনি রাস্তা। ঝাঁপ বলে তাই। নইলে আর কোনো গাড়ির পক্ষে এ-রকম জঙ্গলী রাস্তা তৈরোনো সম্ভবই হত না। জীপটাকে এক জায়গায় রেখে এবার আমরা কোপবাঁধের ভেতর দিয়ে হাঁটাপথ ধরলাম।

বন হরিণ শালবন। মাঝে মাঝে পরিষ্কার। সিরিয়াস? এক জায়গায় দেখলাম কয়েকটা ডিহিতর। মাঝে মাঝে গাছের ডালে রঙবেরঙের নাম-জানিনা পাখি। পরাগে জমিতে সাঁওতালদের ছোট ছোট গ্রাম। মাঝে মাঝে পাটাকলে রঙের কোপরা পাথর। কোথাও কোথাও শুধু কাঁটাঝোপ। মনসাকাঁটা। সিঁদুরে। মাঠের পর মাঠ।

যে লোকটা আমাদের সঙ্গে ম্যাপ আর কম্পাস নিয়ে চলেছে, সে টুসেরিয়ারই বাসিন্দা। সবে মাত্র ঢুকেছে পঞ্চাশটা টাকা মাইনে। আছেন বছরখানা একজন সাহেবের। বাঁধের ওপারেই চাকুরে। খাওড়ার বাড়ি। আর আছেন

পরিবার পরিজন পরিবেশে বসে কাটানো ছানার যাবতীয় মিষ্টান্নের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

লক্ষ্মী নারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

৪৭/৫, বি. টি. রোড (সি বি জংশন)

● আমাদের স্পেশাল শোলপাপড়ী ও ঘি পরীক্ষা করুন ●

৺পূজা এসে পড়েছে।

তাই নূতন নূতন ডিজাইনের

পছন্দমত শাড়ী কেনার জন্য

সকলের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

অন্যত্র কেনার আগে একবার দেখে যাবেন—

নিউ শাড়ী মিউজিয়াম

১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

(বহুবাজার)

...ঘাটে ফিরে এল মাটির। সবার থেকে ...ঘাটে ফেলে রেখে মাটির ঘরে

পাঁচদুয়া থেকে বেরিয়ে যখন ভরা পৌঁছলাম, বেলা তখনই পড়ে এসেছে। ...মাইল রাস্তা পার হয়ে যখন বাঁকুড়ার এলাকা তখন স্বচ্ছন্দে বলা যায় বিকেল হয়েছে।

তিন বছর পর এবার আর এদিক ওদিক নয়। সটান চলেছি বাঁধ দেখতে।

যে নদীতে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, তার নাম কংসাবতী। লোকে বলে 'কাঁসাই'। পুরুলিয়া শহরের তিরিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পাহাড় অঞ্চল জয়রামবাটি থেকে বেরিয়ে বাঁকিপুরের ঘুমো উনত্রিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এই নদী মেদিনীপুর জেলায় নন্দীগ্রামের পুবে হলদী নদীতে এসে পড়েছে। কুমারী নদী কংসাবতীতে এসে পড়েছে অধিকানগরের কাছে। তারপর হরিণখালা থেকে এসেছে ভৈরব-বাঁকী আর তারাকেশী এসে কাঁড়গ্রামে পর্যন্ত যাবার পথে আরও কিছু পার্বত্য ঝোরা। মজনার কাছাকাছি টাংরাখালির ধারে আরেকটি যে প্রধান নদী এসে মিলেছে, তার নাম কানিলাবাই। সেখান থেকে হলদীর মুখ পর্যন্ত এই নদীর নাম রসুলি।

পশ্চিম বাংলার একেবারে পশ্চিমের যে অঞ্চলটায় ওপর দিয়ে এই নদীটি গেছে, সে অঞ্চলে গড়পড়তা বৃষ্টিপাত বছরে পঞ্চাশ ইঞ্চি। এ-তল্লাটে অঞ্চলের তুলনায় বলতে গেলে কিছুই নয়। চতুর্দিকে খোয়াই আর উঁচু নীচু খাবলানো মাঠ। বৃষ্টি হলে কোথাও জল তিন দিন ধ'রে চাষ হয়, কোথাও মাস পর্যন্ত জমায় না। বাঁকুড়া আর উত্তর-মেদিনীপুরের এই এক কথা। এদের অঞ্চলে কোনোকালে শিল্পবৃদ্ধি নেই। একালে যেটুকুও বা কুটিরশিল্প ছিল, তাও বন্ধ হতে বসেছে। না এসেছে বিদ্যুৎ-শক্তি, না হয়েছে বাঁধা। স্বাভাবিক দিয়েই অঞ্চলের যেন একটা জীন-বিধিবিধির অবস্থা।

এ অবস্থা একদিনে হয় নি। শত শত বছর ধ'রে ক্রমে ক্রমে গেছে মাটি। কেটে কেটে উজাড় হয়েছে বন। গাছ বত কমেছে, তত্তই খরা গেছে কেটে চৌচির হয়েছে মাটি। জল-ধারণও গেছে কমে। গরমের সময় এখন সন্ধ্যেবেলা গরম, শীতের সময় কনকনে ঠাণ্ডা।

মাটি যাতে ঝরে না যায়, চাষের ক্ষেতগুলো যাতে জল পায়, বন্যা এলে যাতে ঠেকানো যায়—অনেকদিন ধ'রে তারই ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রায় সব দিকে জায়গা জুড়ে ঘর বাঁধ হয়ে গেছে। তার মধ্যে যে আয়তনে আর যতখানি জমি পড়েছে তার অনুপাতে হয়ে গেছে জল-ধারণের মত। এর জন্যে ডিসেম্বরটি ছেড়ে নতুন ফসলের উঠে যেতে হয়েছে প্রায় পৌষ শীত মাঘের মত লোকদের।

যে জমি জলের তলায় যাবে, যার প্রায় তিরিশ ফুট জমি পাবে সেচের জল। তাছাড়া যাবে ছ'মাস যখন জল জমে থাকে, জলের তলায় জমিরও তিন আনার বেশি আবাদ হয় পড়বে। পশ্চিমপাড় চর জমিতে চাষের খরচ পড়বে কম, ফলনও হবে বেশি। একরে পঁচাত্তরটি টাকা অন্য দিকেও এমনকার হিসেবে চাষের খরচ পঞ্চাশ টাকার মত বাঁচবে।

এখন তো দোন আনার ঘরো পনেরো আনারও বেশি জমি এক-ফসলা। সেচের জল পেলে চাষীদের হবে পাই আর আনের মধ্যে জমিগুলো ফসলোপ্রায় চৌগুণ বাড়বে। এমনিতেই তো এসব অঞ্চলে পাট, ধান, সর্ষে, তিল, তিসি, মুগ, মুসুর, ছোলা, মসলাই, অড়হর, আলু, মরসুমি তরিতরকারি আর যাবোমাসের আখ চাষ হয়।

সমস্ত সিনে জমিতে জল পেলে এসব প্রতি বাড়তি ফসল থেকে চাষীরা আমন ধান আর গমে পাবে ১৬৮৲ টাকার মত আর পাটে পাবে ১৮৭৲ টাকার মত। সেচের জলে পতিত জমি আবাদ ক'রে এসব প্রতি নীট লাভ হবে আমন ধানে ঘুমো টাকারও বেশি আর পাটে সাড়ে চারশো টাকারও বেশি। বাঁধের দৌলতে যেসব জমি জল পাওয়ায় জলে, এসব প্রতি বাড়তি ফসলের দাম পাওয়া যাবে: গমে ৭১৫০ টাকা, মরসুমি তরিতরকারি ৩৭১০ টাকা, আলুতে ৩১৪৲ টাকা, আখে ৩২৪৲ টাকা।

এই পুরোটাই কেউ হিসাবের একটা আনুমানিক হিসেব। হিসেবগুলো হচ্ছে আজ থেকে বছর দশেক আগেকার বাজারদরের হিসেবে।

ভবিষ্যতের ছবিটা যে অবিকল এমনিই হবে, তা নয়। এ হল আগামী দিনের মোটামুটি একটা আন্দাজ। কাছাকাছি হলেও বা ক্ষতি কী।

বাঁকুড়া শহরের এক প্রান্ত দিয়ে বেরে গেছে কংসাবতী নদী। ঝকঝকে তকতকে। এ দিক বছরে নদীর কাছে পিঠে সুন্দর সুন্দর কয়েকটা বাগান উঠেছে। ঝিরু পেরিয়ে

পি. দাস এণ্ড কোং

গ্যাস অক্সিজেন এবং কার্বাইড কন্ট্রাক্টর

৭৮, গোবাল হোসেন সর্দার লেন

শিবপুর, হাওড়া

Let us remember **JAWAHARLAL NEHRU'S**
advice to the nation.

**"SO LET US GET ON WITH WORK—HARD WORK
LET US PRODUCE, BUT WHAT ARE PRODUCING
IS NOT FOR SOME INDIVIDUAL POCKET
BUT FOR THE NATION**

**TO RAISE STANDARD OF THE PEOPLE AND COMMON MAN,
AND IF WE DO THAT, THEN WE SHALL SEE
INDIA PROGRESSING RAPIDLY."**

★

With best compliments :—

"SHAW ENGINEERING WORKS"

Offer MACHINERIES to PACKAGING INDUSTRY.

For Particulars enquire at :—

227/5, Manicktala Main Road, *CALCUTTA—11.*

Gram : "SHAWMACHIN" Phone

...ঁ ডাক্তারখানা রাস্তাঘাট। এখান থেকে দশটি মোটরের রাস্তাগুলি বেরিয়ে গেছে।

এবার নিচে চলে যাই বাঁ দিকে খাড়া সারসার মাইল রাস্তা ওখানে থেকে হাজারটা বাঁক।

রাস্তার ধারে বস্তিঘর একটানা চলে গেছে বাঁকের মুখে মুখে টোলখাওয়া টিনের আর টুকরো-টাকরা কাঠের। দুপুরে রাস্তাঘরে কয়লার আগুনে রান্না হয়ে যায় দুবার। সারাদিন ধরে ঘুঁটে দেওয়ার ঘরোয়া ব্যস্ততা।

রাস্তাটা যেখানে উপুড় পাশ্ববর্তিনী সেখানে ধারেকাছে বড় গ্রাম। সেখানে মোটরগাড়ি দাঁড়াবে না। গ্রামের মেজ মোড়লটির ঘর আসবাবপত্রে ভরা। ঘরের চেয়েবেঞ্চিতে আর ধারেকাছে। ভাতের হোটেল চলে একটা। তৈরি জামাকাপড় কেনে কবির মোকান। বৈদ্য বলা পান সিগারেটের সঙ্গে খাটিয়াওয়ালা চানাচুরওয়ালা সেকান। মিষ্টির দোকান, চায়ের দোকানও অনেক। বইয়ের দোকানে, মোহাম্মদের দোকানে সিনেমা ছবির ছবি। বাজারে ঢোকে বিড়ি ছুঁচে বাঁদরওলা আর বেদেনী। একটা সাইকেল মেরামতের দোকানের সামনে ভিড় লাগার বেশি। বাঁধা এক সাইকেলে চড়ে ঘুরে ঘুরে মেড়ে মেড়ে আসিয়ালের গান গাইছে।

বহুরে বাঁকের ওরকমপ। মোটা চাকা ছুটে চলার খোয়ার সব খাটাখাটুনি, ঝক্কি, ট্রাইয়ের ভার বলাভাবে। সকাল-বিকাল গ্রাম বাঁচা চলতে থাকে। ইলেকট্রিক আলোয় বাঁধিয়ে যাবে চোখ। বড় বড় চটির চাকার ঘুলো উড়িয়ে দেখা দেবে ঘোড়ার।

কাছে দূরে ডাইনে বাঁয়ে অনেকক্ষণ পাহাড়। বাঁয়ে বাঁকানো আর পোড়া পাহাড়। ডানদিকে পরে পর চলে গেছে বুকডাঙা, চড়াই আর নেমেছোড়। দুরাজোড় বাঁধ পেরিয়ে আরও এগিয়ে গেলে শিরোল-পাহাড়ী আর দখন।

গোকানের ঘরে দেওয়ালে পাঁজিপত্রের এক টুকরো দাগটি। কোথে তোরে রাখছে ঘরের বৌ-মেয়ে-মালুষ।

ঘাটা, দাটি হওয়া, হাজা তৈরির পাশাপাশি ঘাঁটে চলছে মাকিন মেরামত। মোটরগাড়ির মালিক ড্রাইভার কারও হয় বন্ধ বাড়ছে।

ছাত্রবস্থায় কী ছিল, মনে? পাখা। আর কী? দুর? আরও অনেক। আর কী? গুন।

পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা ঘুরতে ঘুরতে যখন খুব পাঁচিয়ে উঠেছিল। ওপাশে স্পীডমিটার। এপাশে ঢিক ঢিক করছে আমাদের হৃদি। সামনে বাঁধ বরাবর মাটি-ফেলা রাস্তা। এপাশে ইউক্যালিপটাসের অনেকগুলি ঝোপা। ওপাশে ঘাস আর পাঁচির পাহাড়।

পাহাড়ের একজন মালিক কয়েকটি ভবনের সুন্দর সৌমদর্শনের জন্য ক্রমে জমাট বাঁধল। ভিন্ন ভিন্ন দিনে অর্থানুকূল্যের কুসুম ঝরাল। নাম নাম করছে বলের গন্ধ। ছুটে ছুটে নীচে ওপরে অনেকগুলি টেলিফোনের বাড়ি। বৈদ্যুতিক ফ্যান লাইট জেলে কাজ চলছে।

ঘাটের ঘোষ টেলিফোনে ঘিরে ঘিরে অনুচরদের দিকে মুখ করে বসলেন। এই ছোট্ট পরিবর্তনের ভার যাঁর ওপর, তিনি আমার পাশে বসে।

দু বছরের কয়েকটি বাঁধ, স্পীলওয়ে আর ধারে ধারে ছাদ ছাড়ার প্রথমে ঘেটে প্রায় সম্পূর্ণ। এই বছরে পরই সুরু হবে জল ছাড়া। নাটগুলো বৃহৎ চাষের মত ছড়িয়ে আছে। এক-কথা পঞ্চাশ হাজার ঘোট টাকা। কাজ শেষ হতে এখনও পাঁচ-ছ বছর লাগবে। আরও আঠারো-উনিশ কোটি টাকা খরচ হবে। যেখানে ক্যাটেলি-শহরের একেবারে। টাকার (ষাটের মাপে আর আমু) কিনছেই লাখে আট হাজার কাঁচা টাকা— সেখানে বছরে আড়াই তিন কোটি টাকা খরচ হওয়া কিছুই নয়।

কাগজে শুধু তাদের বেলায় যারা ট্রাক্টর চালায়; যারা মাটি কাটে, পাথর কাটে, পাহাড় টলায়; যারা ঘেমে পুড়ে ঘুঁটে ভিজে তলারক করে; যারা কলকৌশল, বুদ্ধি যোগায়। ঠিকেদারদের মধ্যেও আছে ভাল লোক। যারা ভাল। তারা টাও নামে বটে —কিন্তু উঁচুতে বসে কাজও দেয়।

কাজও এখানে সারা বছর সমান তালে হয় না। নবরবের কাঁপানো যোগ পড়লে হাজার লোক কাজ করে। চাষের সময় কাজের লোকের সংখ্যা হাজার-খানেকে এসে ঠেকে। চাষের কাজে আয় বেশি কী, দান আর দু টাকা আরেই টাকা যোগ। আর বাঁধের কাজে বছরই পাঁচ সিকে থেকে দেড় টাকা। কৃষণে করলে আরেই টাকা থেকে তিন টাকা। চাষের কাজ ছেড়ে বাঁধের কাজে যেতে হ, তার আসবে?

এখন একটা চেষ্টা হচ্ছে দিনমজুরদের নিয়ে কো-অপারেটিভ তৈরি করার। ঠিকেদারের যে ছোট কাজ দেওয়া হয়, কো-অপারেটিভদেরও সেই ধরনের কাজ দেওয়া হবে। কো-অপারেটিভের কাছ থেকে কোনো অনার টাকা নেওয়া হবে না। কো-অপারেটিভ যাতে দাঁড়াতে না পারে, এখন সেটাই হবে ঠিকেদারদের চেষ্টা।

বাঁধ ছাড়া এ অঞ্চলের লোকদের আরেকটা বড় রকমের অভাব ঘুচবে। সে অভাবটা হল খাবার জলের। গরমকালে গ্রামের পুকুরগুলো যখন শুকিয়ে যায়, তখন লোকে যে জল পায় সেই জলই খায়। বাঁধের বাড়তি জল যাতে ক্যানেলের ভেতর দিয়ে গিয়ে গরমকালে পুকুরগুলো ভর্তি রাখে সে চেষ্টা হবে। এটা হলে রোগ-মহামারী এদিকার বড় বড় ছড়াতে পারবে না।

বাঁধ আর ব্যারেজের সঙ্গে লাগাও খেলার মাঠ হবে সেখানে হবে মানুষের চাষ। বাগানগুলোও হবে মানুষের বড় বড় বাঁটি।

দুধারে হবে পার্ক আর পিকনিকের জায়গা। তৈরি হবে বৌ-ঝরনা আর মাছ-শিকারের ব্যবস্থা। তৈরির চারপাশ ঘিরে থাকবে মোটরের বেড়াবার রাস্তা।

শুনতে শুনতে এমন মশগুল হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম আমার সামনে অন্ধকারের কোল-আলো-করা সেই ভবিষ্যৎকে।

আমার পাশে যিনি বসে ছিলেন, কথা বলতে বলতে কখন তিনি মেবে গেছেন জানি না। তাকিয়ে দেখলাম দূরে অন্য দেখায় অন্যমনস্ক তাঁর দৃষ্টি।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আজ বাড়িতে বাড়িতে তাঁর ক্যাকটাসের ফুল ফোটার কথা।

আমি এরকম আজ ভেবে বলেই এখানে তাঁকে ধরে এনেছিলাম।

সংবৎ আশ্বিক ২৩৭

(গত পৃষ্ঠার পর)

বিধী ঔষধে নৃপেনের সমস্ত কথা শেষ হোল। সমস্ত রোগের পরিমাণ যে বলতে না। কিন্তু মনে মনে নিজের সমস্ত কথাই সে স্থির করে ফেলেছে। নৃপেনের কথা যে অযৌক্তিক তা সে মনে করে নি, কিন্তু যে আদর্শ দীপ হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন সে হয় সন্তোষজনক ভাবে তা হয়ত মুখে বলতে পারে।

সেই রাত্রে নূতন বৎসর পরেশবাবুদের ভাব বাড়ে বিলয়, বিটা রোগনে বকেট বোটটি বার করে এবাই বীণটি রেখাকে দেখা গেছল দেখিয়ে বলনা হয়ে পড়লো।

মীলা গ্রহের আকাশ তখন বলাবৃষ্টি জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। সে আলোয় বীণটি খুঁজে বার করতে বিটার কোনো অসুবিধেই হোল না। বকেট বোটটি বীণের ওপর নামাবার আগে শুধু বারেকটি মুহূর্ত তার স্থির হোয়ে ছিলো। নূপেন স্পষ্ট কোনো আদেশ করে যায় নি, কিন্তু এ রকমের একক অভিযান তার সমর্থন নিশ্চয় পাবে না।

এখন আর দেরীর কথা ভাবাই হয় না। বীণের কেন্দ্রে বকেটটি নামিয়ে তার ভিতর থেকে বাইরে যাব হওয়ার পর বিটার মনে বিপদাশঙ্কার আর কোনো রেখা রইলো না। বীণের সব কিছুই যেন নতুন আবিষ্কার ভিতরে ঢুকেই যেমন একটা মহান আশ্চর্যের মোহে বিটা অবাক হয়ে গেল। বীণটা কি তাহলে কাঁপা ছিল। দূরে যা কাঁপানি বলে মনে হয়েছে সেখানে সেই নিশ্চল গায়ের একটা সূক্ষ্ম রেখা দেখা যাচ্ছে। অ্যাটম পিরামিড লক্ষ করে বিটা সেদিকে এগিয়ে গেল। ইতিমধ্যে বীণটার চারিধারে সে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেছে আসলে বীণটি মনে হয়েই ছোটো। পৃথিবীর বড় বড় মন্দিরে যে সব পড়ে তার এ বীণটির তুলনায় অনেক বড়ো হবে এখানে ওখানে কয়েকটি ঐ অদ্ভুত গাছের মূল ছাড়া বীণটিতে আর কিছুই নেই। গাছগুলির কাছে এসে বিটা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। কাছে থেকে বেশে বোঝা গেল যে, কাঠামোর আকৃতির সঙ্গে এগুলির সামঞ্জস্য নিতান্ত আকস্মিক। তাছাড়া নয়, যেন কতকগুলি [illegible]

Estd 1926. Phones { 34 1093 / 21—2181

S. C. ACHARYYA & Co.

55. EZRA STREET. CALCUTTA-1

Authorised

PHILIPS MAIN LIGHT DEALER.

Authorised dealers of

GILLANDERS ARBUTHNOT & Co. Ltd., VOLTAS Ltd., A.E.I. (India) Pvt. Ltd., BIRD & Co. Ltd.

Suppliers to :

TRAMWAYS, JUTE MILLS, COLLIERIES & TEA GARDENS.

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

অরণ্যনিশি

সমরেশ বসু

আজ এই চিঠিখানি তোমাকে লিখছি, অরণ্যের গহিনীমার এসে, সাদ্‌টা রেঞ্জের ধারণ্যের কাছাকাছি, এক বন্ধুর বাসায় বসে। এখানে কাছেই রেললাইন, আশেপাশে লোকালয়ই, কাঠ চেরাইয়ের কারখানা, অনবরতই ভারী ট্রাকের যাতায়াত ও গর্জন। রেললাইনে এখনই শোনা যাচ্ছে ডিজেল ইঞ্জিনে টানা মালগাড়ির শব্দ। এখন আমি সত্যভার আস্তানায় ফিরে এসেছি। আমার আশেপাশে সবকিছুর মধ্যেই আধুনিক জগতের স্পর্শ। আমার চক্ষুকর্ণে এখন ভেসে উঠছে, আমার প্রকৃতিও তাদেরই জানা। কিন্তু এরাই আমার বহির্জগতের সীমার। অন্তরের মধ্যে বিস্তৃতটা পড়ে আছে, সিমিত অরণ্যে যে আমার জানিকের আনাগোনা, সেখানে ফিরে, চোখে পড়ছে, তাহিলবর্ষের অরণ্যভূমির বৃহৎ প্রাচুর্যের অন্তরে সারসা বিলীন। ইঞ্জিনের উচ্চারণে যেটা লোকের কাছে এখন উচ্চারিত সাধারণ শব্দ। সাধেশ্বর ভিন্নতর।

এর আগের চিঠিটা তোমাকে লিখেছিলাম, অরণ্য প্রবেশের আগে। আঠারো দিন পরে, পলাশবাসা ঘাটে ফিরে এসেছি। এই ফিরে আসাটা তোমার সাহিত্যের ভাষায় কি বলা যাবে, আমি জানি না। আগের চিঠিতে তোমাকে অনেক উচ্ছ্বাসভরে জানিয়েছিলাম, 'পলাশ বাবতীয় সাজসরঞ্জাম নিয়ে চলেছি, যে সাজসরঞ্জামগুলোকে তুমি বলতে পার পানপাত্র। সারসা অরণ্যের সকল সৌন্দর্য সেই পাত্র পূর্ণ করে, আমি আকণ্ঠ পান করে ফিরব।'...এবং তাই হয়তো ফিরেছি, আকণ্ঠ পান করেছি। কিন্তু তার নেশা যে এত সত্বর হবে, তখন বুঝতে পারি নি। বুঝতে পারি নি, পানীয় যাচ্ছেই মিঠে লাগে, তাতে ছিপ্ত বাঁধ মেশানো আছে অব্যক্ত মিশ্রিত্রের স্বাদ। নেশা নিজেই ফিরেছি, এবং জানি এই সত্যভার মেকি জগতের বহিন মেয়েরা যাদের চুকে খোয়ারি কাটবে ঠিকই। তবু আপাতত নেশা অত্যন্ত গাঢ়, খোয়ারি ভাঙা তো দূরের কথা, তৌল যাবারও লক্ষণ দেখি না।

ইতিপূর্বে অনেক যাতায়াতে মাটিতে মুখ ঘষে ঘষতে দেখেছি। সেই কান্নার মধ্যে কখনো একজন যাতায়িক মানুষের ব্যথাকে আবিষ্কার করতে পারি নি। এখন বুঝতে পারছি, সেই কান্নাটা লোক দেখাবার কান্না ছিল না বলেই মানুষটা কেঁদে লোকের কাছেই হাস্যাস্পদ হয়েছিল। তাই সাহিত্যিক, সত্যি বলতে কি, আমিও এখন সেইভাবেই মুখ ঘষছি, যদিও সেটা চোখে পড়বার মত নয়। একেবারে নয়, তা বলছি নে। এখন যে বন্ধুর আশ্রিত, সে নিশ্চয়ই তা দেখতে পাচ্ছে, এবং ঠিক যা মনে করা উচিত, তাই মনে করছে, একমাত্র ভণ্ড আখ্যা ছাড়া। বুঝতে পারছি, এত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এই সারসা অরণ্যের সকল সীমা থেকে আমাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া। আমাকে সত্যভার কিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, যেখানে এই অনেক যাতায় গন্ধ কৃত্রিম কোন কিছুই আর আমাকে স্পর্শ করবে না। তার ব্যবস্থাও সব পাকাপাকি। হয়তো আজ রাত্রেই আমাকে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। আমাকে নাকি এই বিশাল অরণ্যের লিখতে পেরেছে। বন্ধু-পত্নীর বিশ্বাস আর একটু এগিয়েছে, তাঁর ধারণা, আমাকে ডাকিনীতে পেয়েছে। আর এই জঙ্গলের মেয়ে ডাকিনীর আবির্ভাব মোটেই তৃপ্তিকর নয়। বরং অতীব সুদৃঢ়।

তুমি আবার এই নিতান্ত ব্যবসায়ী প্রবাসী বন্ধুটির সংবাদ আদৌও জানো। নামটাও আশা করি মনে আছে। বন্দোবস্তের নামটা নিতান্ত দেহাতী হলে, এ যুগে সেটা এত বেশি বটঙ্কীর মুখে যাচ্ছে যে, ওর নামটা ভোলা মুশকিল। [illegible]

[illegible] যে আমাদের মধ্যে আমার [illegible] চরিত্র হয়ে ওঠবার চরিত্র [illegible] এই অরণ্যের মোহিনী, তিনি এবার বিদায়ের দৃষ্টি নিয়ে এই জঙ্গলের দেশে, 'পিপড়াবাসা' জঙ্গলের ঠিকেদারী করতে [illegible] বিকট হাসি হেসে উঠেছে। মুক্তারি হয়তো ঠিক বলেছে। গত হপ্তার অনেক বছর, ব্যবসাস্থত আমার দুটির এক টুকরো ছেড়ে ওর ভাল লাগে নি। বলেছিল, 'আমার কাছে আয়, পুরুষ আর পশুদের আর একবার ভাল করে দেখে যা। এই সব বা দুটি দেখানে ঠিক মানুষের মত, এরা একবার ভিজলে শত শত আটা-কিউটিকেলই দুলবে, সহজ মানুষের মন বোঝে না।' মনোমোহনের কথাটা সেই থেকে মনে ছিল। মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলাম, মনোমোহনের মত জঙ্গলের ঠিকেদারও আমার মত শিক্ষিতদের দেখতে বসে! ও আর্টের কি বোঝে?

কিন্তু এখানে এসে সেই বিরক্তিটা কাটল শুধু নয়, মনোমোহনের ওপর বিশ্বাস বেড়ে গেল। মনে হল, আর্টের একটা মূল জিনিস ওরই ও বলে আছে, সেটা হল, জীবন যত সুন্দর, তত নিষ্ঠুর। যত নমুর, তত ভিক্ত। দুঃ আবেগময়, তত চরমান্তিক ওরা। অথচ যে আপন বেগে ছুটেছে, জীবন অপ্রতিরোধ্য। তাই এখানে এসে, ওর বাড়ির বোকেয়োড়ের ওপর, অদূরে চিরির ওপরে, একেবারে পরিপূর্ণ একটি বক্তাভ গাছের দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতরে ধাক্কা দিল, যে পরিপূর্ণ রক্তাভা দেখে বুকের রক্ত চলকে ওঠে, মনে হয়, সকলের গায়ের ওই রংয়ের প্রতি রোমকূপে কুপে চুমুকে চুমুকে যেন নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে, চোখের দৃষ্টিকে মাতাল করে তুলছে, তখন মনোমোহন হেসে বলল, 'গাছটার নাম কুসুম, কুসুমের রস আছে গায়েরার ভেতরে। গত বছর ওই কুসুম গাছটার নীচে, একটি যুবক শিকারে কুসুমকে হেরে ফেলেছিল!'

কথাটা শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। মনোমোহন বলল, 'গাছটা দেখে অনেকদিন রবি ঠাকুরের অনেক কবিতা পড়েছি ছুটির পাশে শুয়ে শুয়ে। এখন খালি মনে হয়, এই এখানে গাছটার ওপরে অজয় সাপটা কবে থেকে আস্তানা নিয়েছিল? জঙ্গল তো সুরু হয়েছে আরো আধ মাইল দূর থেকে। গাছটাকে এখন প্রায় অলৌকিক ঝরের দেখে থাকি। তবু এই ফাল্গুনে, যখন এই কুসুম পাতা লাল হয়ে যায়, তখন চোখ ফেরাতে ভুলে যাই। সর্বনাশের সৃষ্টিটা [illegible] তা নয়, আর কিছু হতে পারে না।'

কেন, সেটা অবশ্য জঙ্গলের ঠিকেদারী করতেও, আসে জানতাম না। কিংবা বলা ভাল, মনোমোহনের কাছে যেটা কিনে নিয়েছিল সেটা বেচে দিয়েছে। আমি বললাম, 'চলো, এবেলা দিনের আলো আছে, এই গাছটাকে একটি ঝলক, তোর আমার একটা পাড়িয়া।'

মনোমোহন খাবা নিয়ে বলল, 'দাঁড়ো, আর একটু দাঁড়ো। আগে নিয়ে যাই কুসুমের মনে, আগে তোকে নিয়ে যাই এই গায়েরার ভিতরে। তারপরে যত খুশি আঁকিস। এই গায়েরার আছে দাত বংএর পাথর, দাত বংএর মাটি, দাত বংএর গাছ। যাও।—'

—আর?

মনোমোহন একটু হেসে বলল, 'দাত বং এর মনও আছে এখানে। তবে বিপ্রান্তই প্রাকৃতিক, সভ্যজগতের তৈরি করা নয়।'

বুঝতেই পারছ, সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে বিস্ময়ে আবিষ্ট করে তুলেছিল। দাত্টা বাংলোর বাইরে থেকে, যে পাখিরা অরণ্যকে তখন আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, তার রং নীল। অনেকটা ফুকনীল। ফাল্গুনের দুপুর আকাশের গায়ে, পূর্বদিগন্ত জুড়ে, উঁচু নীচু রেখায় সে যেন নিজের গভীর নিষ্ঠুরপ। মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও রক্তের ছোপ লাগার মত, ছড়ানো ছিটানো রক্তাভা।

কিন্তু এ কথা থাক। দূর থেকে দেখার কথা তো তোমাকে আগের চিঠিতেই লিখেছি। কিন্তু যেদিন ঢুকলাম, সেদিন আমার জীবনের এক পর্ব শুরু। মনোমোহনের একটা ট্রাক আছে। সপ্তাহে জঙ্গল থেকে কাঠ বোঝাই হয়ে, ট্রাক পৌঁছে দিয়ে যায় লাত্টার লোহা কারখানায়। আমরা যেদিন গেলাম, সেদিন ট্রাকে প্রচুর খাবার-দাবারের ব্যবস্থা। খাবার-দাবার বলতে চাল আটা তেল মসলা ইত্যাদি। কিন্তু বিশেষ করে চালের পরিমাণ ছিল অন্তত পঁচিশ জন লোকের বারখানেক চলবার মত। শুনতে পেলাম, যেখানে যাচ্ছি, সেখান ইতিমধ্যেই গাড়িকাটা কুলি বোঝাই চলে গিয়েছে। সাবরিক পাতায় ঘেরা তৈরি হয়েছে পাহাড়ি নদী কোকেয়ার ধারে। পাতার সেই ঘরকে এদেশের লোকেরা বলে ওইয়ো। পাহাড়ি নদীকে বলে গাড়া। আরো জানা গেল, কোকেয়া পাঁচার যেখানে আমাদের ওইয়োর আস্তানা হয়েছে, সেখান থেকে সবচেয়ের সব থেকে নিকটতম গ্রামের দূরত্ব বাইশ মাইল। সভ্যজগৎ বলতে প্রায় হাটবাজার দোকানপাটের কথা বলছি। তাই মনোমোহনের এত খাবারের আয়োজন। ওর কুলি বেজাদের খাবারের ব্যবস্থাও ওকেই করে নিয়ে যেতে হয়। দাত্টা সন্ধ্যুর দিকেই পৌঁছের নিয়ম।

ফাল্গুনের সকালে ট্রাক ছুটল। আমরা আমি আর মনোমোহন ছাড়া, একজন ড্রাইভার, আর একটি লালবরণী যুবা চাকর। নাম তার সোবরা। শুনলাম, সোবরার জন্ম হলে ওই নামের অধিকার সে অর্জন করেছে। আরো জানলাম, সাবরার সুবিধাল অরণ্য সুচীভেদ্য। অথচ গাড়ি নিয়ে যেতে হলে তাই। 'প্রবেশের সমস্ত মুখে, চেট করা আছে। সেই চেটকে এদেশের লোকেরা বলে নাকা। নাকার সঙ্গে আবার একটি ঘরে আফিসও আছে। অনেক হিসেব-নিকেশ দিয়ে তবে ভেতরে যাবার অনুমতি, তবে ঘরমা মোলা পাওয়া যায়।

কিন্তু সে হিসেব-নিকেশ থাক। গাড়ি গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে লাগল। আমাদের অরণ্য এই আমার প্রথম দেখা। আগে ধারণা ছিল, জঙ্গল মানেই সবুজ। সব আলাদা ঢুকবন। কোথায়, তা নয়। কখনো হলদে ফুট উঁকতে উঠছি, নামছি কখনো। এবং সবসময়েই একটি আশ্চর্য পাহাড়ি নদী চলেছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। সেই কোকেয়া। যতই ভেতরে ঢুকতে লাগলাম, ততই শত শত বছরের বিশাল মহীরুহের ঐশ্বর্য যেন আমাদের গ্রাস করতে লাগল। দিনের বেলাতেই অন্ধকার ঘনিয়ে এল। সূর্য যে আকাশের কোন সীমানায়, তার হিসেব গেল হারিয়ে। মনে হল, পৃথিবী ছাড়িয়ে চলে এসেছি। ট্রাকের গর্জন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল বনের গভীরে, পাহাড়ে পাহাড়ে। এক সময়ে মনে হল, সেই গর্জনকেও সাবরার নিস্তব্ধতা গ্রাস করে নিয়েছে। কেবল বিঁঝিকের বিচিত্র রকমারি চীৎকারের ঐকতান ছাড়া আর কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছি না।

সোবরা মাঝে মাঝে বলে উঠছিল, 'আমরা পারোঙি ছাড়িয়ে এলাম। ওই দূরে ডোকলই গাঁ, এই চলেছি রিংবিডি, তারপরে মাকরাণ্ডা। এবার আমরা ঢুকছি নোয়াডিহির মুলুকে।'...

নোয়াডিহিতে যখন গাড়ি চলেছে, তখন আর কোন কথা আমার কানে গেল না।

রোটাস ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ
অশোকা সিমেণ্ট লিঃ
ROHTAS
শোন ভালী পোর্টল্যাণ্ড
সিমেণ্ট কোং লিঃ
জয়পুর উদ্যোগ লিঃ
মজবুত গাঁথুনির জন্য
সাহু সিমেণ্ট

...হয়তো ট্রাক চলেছে। কখন কখন যে 'বিশ্রী' বন্যপশুর আর রাতজাগা ভীরু একবারে সমবায় মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার হয়ে গেছে, মনে নেই। মনে আছে, দিনের আলো এসে গায়ে লাগছে।

মোহন তার প্রচুর নির্ভরতা আমাকে দান করে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর মাথা আমার কাঁধে। ওর মুখে মিষ্টি গন্ধ। ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, ওর বয়স আরও কম। ওর ঠোঁটের ওপর সবে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। ওর ঘুমন্ত মুখে কোথাও কোনো ভয়ের চিহ্ন নেই

পাইপের গন্ধও। তারপরে চাপা গলা। আর হাতে ট্রাঙ্কের খাঁজগুলি লাগলো। ঘটনার কোথাও ভাঁজে বসল। আমি আবার হাঁফালাম, আর কৌতূহলে আমার চোখে নিশ্চিন্ত ঘনাইল। গানের ভাষা একবর্ণও বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু গানের নেশায় দুই চোখের চোখে মুখের রক্ত লাল উপরে পড়তে চাইছিল। মাজারি চোখ তুলে আমার দিকে একবার তাকাল।

সোমরা আমাকে বলল, 'গান শেষে শেষে ভোকে বলছে যে বাবু। বলছে, তুই বাবু, তোর চোখ আছে খাঁচুনের ছেলের মত। জিজ্ঞেস করছে, 'তোর কি কেউ নেছে? তুই কি তোর (দুর এবং কম, দুইই বোঝায়) বাবি? কিন্তু তাই যদি তোর অবস্থা, তবে সিলাবেটে বাঁধিয়ে, অমন নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিস কেমন করে। আর তাই যদি তুই ছাড়ছিস, তবে আবারের নাকে কেন গন্ধ আসে? আবারের কি নাক নেই, আবারও কি তখন ধোঁয়া ছাড়তে পারি না?' তুই বাবু তখের দুটো সিলাবেট দে।'

সোমরার কথা শুনে বিস্মিত চোখে আমি অকারণেই সিগারেটের টিন বাড়িয়ে দিলাম তখের দিকে। কে জানত, তখা গান গেয়েও গল্প বানাতে পারে। কে জানত, তখা সিলাবেট খেতে চাইবে। টিন বাড়িয়ে রয়েছি, প্রথমে মাজারি অনেকক্ষণে একটি তুলে নিল। তারপরে চাপা। তাতে যেন বাকিটা অসহায় হাতে ছিনে তাকাল। তাকে সোমরা বলছে, সেও একটি সিলাবেট তুলে নিল। আর তিনজনেই আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে নিল। মনোমোহন গম্ভীর হয়ে, আড়চোখে তাকিয়ে বসেছিল। যেন সে এসব কিছুই দেখছে না।

মাজারির সিগারেটটা ধরিয়ে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। কিন্তু কিসের সীমাহীন ঘৃণা উঠল, যখন মাজারি সিগারেটে আগুন নেবার জন্যে অকারণেই আমার কাঁধের ওপর হাত দিয়ে ঝুঁকে পড়ল।...সাহিত্যিক, সোমরার বুদ্ধিজীবী, তখা কিছু আমি হুনি নি। তবু এসব সকল সহজ অসঙ্কোচ ব্যবহারকে সহজভাবে গ্রহণ করি, সে সাহস বা মন কোথা থেকে আমরা উত্তরাধিকারে পাই। আমার রক্তে সোমা নেই।...তুমি জান, এই একটা জায়গায় আমি কী ভীষণ। অনেক জনের সঙ্গে বসেছি, হাতেখড়ি পাইনি। অনেক দূর ও যে এসেছি, নিবিড় সাহিত্য আসর আমার।

একটা কথা বলবার চাইলেও বলতে পারি নে, আমরা মধ্যবিত্ত ঘোরের না আড়ালটাকে নৈতিকতা দিয়ে ঘুচিয়ে, নিজেদের চিনে হাসবার ধাক্কা মেরে উদ্ধার করেছে। আমার আসলে কোথাকার কী উঠতে লাগল। মাজারি দুঁ দিয়ে কাঁপি 'ধরিয়ে, সেলাইটা নিয়ে নিল হাত থেকে। তারপরে বিস্মিত চিত্তে তাকিয়ে হাসল। মাজারি নিজে সিগারেট ধরিয়ে, চাপাকে আর তাকেকে সিগারেটের আগুনটি দিল। সেলাইটা আমার কোলের ওপর ছুঁড়ে কি একটা বলে উঠল। বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি বলল?'

সোমরা জবাব দিল, 'বলছে, তুই লোকটা ভাল।'

দুই বোন হেসে উঠল। এবং মাজারি আবার গান ধরল গুনগুন স্বরে। সোমরা বলে উঠল, 'আ রে, দুঁচিটা বেজাতে আছে বেখছি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি গাইছে?'

সোমরা বলল, 'গাইছে, বাঁচুটার ছেলে যেন মকলের নেলা,' মানে মেলা যে বাবু। বলছে, 'কিন্তু চাঁদ দেখি না।' সোমরা বেখি না, হুকাশে চুমুক দিল যেন? তবে কি মকলে আছে ওর সিলাবেটে? বাঁচুটাকে কি বাগিয়ায় পেয়েছে?'

—বাগিয়া কি?

—বাগিয়া মেরা। যে যে লোকদের ভুলিয়ে নিয়ে যায়, ভুল রাস্তায় নিয়ে গিয়ে, কোথায় যে টেনে নিয়ে যায়, কেউ বলতে পারে না। কেউ বলতে পারে না, বাগিয়ের পাওয়া মানুষ বাঁচবে না মরবে।

আমি মাজারির দিকে ফিরে তাকালাম। হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এ সব কোথা পাইলে?'

চাপা সোমরার হয়ে বলে উঠল, 'বাঁচুটাকে জল মেরেছে।'

সোমরা হেসে উঠল, তারপরে সকলেই। কেবল মনোমোহন ছাড়া। হেসে পারছিলাম না, সে সব নিতান্তই বলবার কি না। যদি বলবাও হয়, তবু আজ না হয়ে পারি নে। আর সেই অন্ধকার ঘরটার সঙ্গে, আমার সমস্ত প্রাণের ঘরে যেন আজও এক ব্যাকুলতা বাসা বুঁধিল।

মনোমোহন কোথায় যেন গিয়েছিল, আমি যে, তুমিও জান কি না। সোমরা ঘোরের ঘরে, একটি উপরতলে পাতার ঘর তৈরি হয়েছিল। আমার আর মনোমোহনের ঘর এক। আমার ঘরটায় সোমরার একটা বাঁধার চাদর। চারদিকে গভীর বন, ঝোপের জঙ্গল আর ঝিঁঝির তাক যেন বিশ্বপ্রকৃতির প্রহরে বসবার বাজছে। মাঝে মাঝে বনের ঝড় ভেঙে আসছে, সব মুহূর্তের মত বনের মুঁটিয়ে মুঁটিয়ে নিজের অন্ধকারে অন্ধকারে চলে আসছে। দূরে বনের একক ডাক শোনা যাচ্ছে। অন্ধকার, সন্ধ্যারাত্রি আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয়ে। হরিণ আসতে পারে। অন্য জানোয়ারেরও অভাব নেই।

মনে করেছিলাম, অনেক দূরে ঘুমাব। কিন্তু প্রকৃতির কোলে যেন ঘনাচ্ছন্ন নিস্তব্ধতা যত এগিয়ে পড়ে ততই। যে তুলিতে আমাদের এই অসংখ্য প্রকৃতিকে বলতে পারব বলে 'ঘুমাব হল না'। সেই সঙ্গে মাজারি। যে ঘরের ছাদে ওর সারাদিনের গান কাটায় ঘুরে, সেই ছাদ যখন ঢাকার পরে নীলাকাশ হয়ে ঘোমর ঘরে নামতে আরম্ভ করে, তখন মনে হয়, আমার পরিচিত জগৎকে একেবারে তুলে পরিচি। আত্ম-পরিচয়টুকু মনে আছে কি না সন্দেহ।

পরিষ্কার, দূরে দূরে অনেক বাঘের আগুনের আলোয়, সবকিছু স্থানের ঘন লাগে, সেই অন্ধকার রাত্রির ঘুম ভাঙতে পারি নে। তখন নিস্তব্ধ আকাশ ফুলের গন্ধে, আমি যেন ঘুমিয়ে পড়ার বিরাট আছি হয়ে, মনে মনে একটা শব্দ শোনবার চেষ্টা। নিস্তব্ধের ডাকে। কখনো কখনো শব্দের গভীর নাদে, বোঁ-হুঁয়ার (barking deer) শব্দ চীৎকার ভেসে আসে।

সেদিন, ভোর পাখির কোলাহল প্রায় থেমে এসেছে, আমার ঘুমের অবিচ্ছিন্নতায় টেনে নিয়ে গেল। মাজারির হাত থেকে অবশ্যই ভিজে-এর গায়ে চুমুক দিচ্ছিল। সে আমার ঘোরে পৌঁছে দিল আমার ঘুম, সে আমার নাকের ডাক বন্ধ হল। উঃ, গায়ের ওপর দুম হলে, পা দিয়ে এমন মারত...তখের প্রথম মৃত্যু হলের মেয়ে-পুরুষের যেমন হুলস্থুল ব্যবহার। হাতেখড়ি দিত। কিন্তু ঘোর যেমন এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারে না, আমি আর মাজারিও তেমনি পারলাম না। মাজারির অকারণ প্রাণোচ্ছলতায় হেসে ফেলাম। ঘরের নাকের আসর ছেড়ে, ভিজে-এর সঙ্গে চুমুকে অন্ধকারে পালিয়ে যেতাম। মাজারি, সবলা [illegible] যেন আমাকে যৌবনের রঙিন [illegible] ঘরের লোকদের কালো মুখ [illegible] ছড়ার ঘরে

(১৮১ পৃষ্ঠার পর)

উঠল। মনোমোহনের চোখে কৌতুক ফুটিয়ে তুলে বলল, 'আর প্রমাণ দেব?'

'বড় সোনেন, আর কোনো দরকার নেই। বিশ্বাস হচ্ছে। কিন্তু আমি কি করব? কোথায় যাব? আমার নিজেরই কিছু ঠিক নেই। ফিরে যাবার উপায়ও ছিল না, এখনো নেই। ফিরতে হলে আমাকে শুধু যৌবনের খোলকটাই ছাড়তে হবে।'

মাত্রিমনের আশ্বাসে সেদিন রাতেই মনোমোহন অস্থির হয়ে উঠল। ও আজান্ত আটোতে চাইল। আদি বেঁকে বসলো। মাত্রাদি শুধু আশ্বাস দিল, 'তুই কি চাস আমার কাছে? আর কি দিবি?'

আদি বলল, 'তোমাকে নিতে চাই।'

—কোথায়?

—আমার কাছে।

—কিন্তু সঙ্গের তো আমি যাব না।

—তবে আমি তখনে যাব।

—তুই বলিস না, তোরা কখনো তখনে যাবিনা। তোকে আমার যা দেবার তা দিয়েছি, এবার চলে যা।

বিশ্বের কর্ণধার হয়ে থাকি? এ কোন্ ছলের স্বামী, কি কথা বলে। ধর্মী নেই? প্রেমিকাদের প্রার্থনা নেই? কর্তব্যবোধের বালাই নেই? সাহিত্যিক, বঙ্কিমবাবুর কথা মনে পড়ছে। ও যা দিয়েছে, তার বদলে যা পেয়েছে, সেটাই ওর কাছে পাওনা! এ কথা কি কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে। এমন সঙ্গকে ছেড়ে দিলে যে কষ্টের হয়, প্রাণের আবেগ তাহলে অবুঝ হত।

কিন্তু ওর ছলনা-চোখের, ওর দিদি আর দিদির মতো সত্যজগতের বাইরে এসে আদি না শুধু নয়। তাই, যাবো বলল, মাত্রাদির জন্য স্নানের ঘিয়ের ফোঁকে, দুটি বলল, একটি নহিল, চারটে মুরগী পথ দিয়েই যেন ঘিরে ফেলে।

আদি-বাড়ী। ছলনোমোহন হঠাৎ ফেরায় সবাই বিস্মিত। গত কাটা বন্ধ করে দিল সে। সবাইকে ঘিরে যাবার হুকুম জারী করে দিল। ছোটদের আবাকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। ও মনোমোহন কিন্তু আদায়ে। যে ঘরটা বাছাই হল, তার পরদা হল। নাচ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বহুদিন আগেই। সন্ধ্যার পরে সভার ঘর থেকে কেউ বেরুত না। আদি অন্দরমহলে যেতাম মাত্রাদির জন্যেরোতে। ঠিক পেয়েছিলাম, ছোটো মনোমোহনকে তখন আর পাওয়াই এনে সেখানে চাঁদিতে নিয়ে ছলনা মাত্র মাত্রাদিটার জন্য সেনেরার আর কোনো উপায় নেই।

মনস্থির করতে মনের ছেরি হোলো না। বিদ্যুৎবেগে মনোই ছলনাবেশ চাদিয়ে নেই বাঁশের উপর যতখানি উঁচুতে সম্ভব নিজেকে তুলে ধরে অবজারভেশন-ডেকের ছলনীকদের সাহায্যে সে যা দেখলো, তাতে আর বুকের ভিতরটা এক মুহূর্তে যেন ঘিন ঘুরে গেলো। অতি ঘন্টা ছলনেও বুঝি এমন দৃশ্য দেখা যায় না। কিন্তু অভিনবীয় ভয়াবহ চেহারার অনেকগুলি প্রাণী সেই বাঁশের ওপর কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। প্রাণীগুলি ঠেলে অর্থাৎ পি আর বাইরে সমাধীন পৃথিবীর অক্টোপাস-জাতীয় প্রাণী আরো অনেক বৃহদাকার হয়ে মাথাগুলি ঘন্টে ওপরে উঠতে পারত তাহলে বুঝি এই রকমই দেখাতো। এই প্রাণীগুলির শরীরের উর্ধ্ব অংশ থেকেই ছোটো ছোটো সাদা সাইফনের মতো এ নীলাভ আলো বার হচ্ছে।

কিন্তু তারা করছে কি? বিটার বকেট ছোটাই যে কোনো উপায়ে তারা বাঁশ থেকে সমুদ্রের জলে নামিয়ে দেবে। কিন্তু বিটা তো ওর মধ্যে নেই, সে কোথায়?

ভালো করে দেখবার জন্যে নতুন সার্চ-লাইট ফেলে দিলে। আর সেই মুহূর্তে বাঁশের অন্য একপাশ থেকে মাথা-পৃষ্ঠ অক্টোপাস গোছের একটা সে দেখতে পেলো। বিটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার উপায় নেই। তার অভাব কৌতূহল ও ছলনাদের শক্তি-ই হারে সে পেয়েছে।

সমস্ত সন্ধ্যাটা বিজ্ঞানের বিভিন্নিকার ফোলো এই যে, প্রাকৃত শিবরক্ষা ও আত্মরক্ষার বিশ্বাসযোগ্য ফেত্রে অলৌকিকে ফোলো প্রকার সাহায্যের চেষ্টা করা হবে না। ইতিহাসবিদের শিক্ষাদীক্ষার ফলেই এ সমস্ত ফেত্রে আত্মরক্ষার জীবনের চেয়ে বেশি।

নূতন কিছু ঘিরা করলে না। বিশাল মহাকাশযান এই অজানা বিপদের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে আরো নীচে নামালো ও সেখান থেকে অ্যাটমিক অস্ত্রে তাদের কাছ থেকার চেষ্টা বিশ্বকর্মা-ফেলেও অভিজ্ঞ-আদর্শ-কর্তব্যনিষ্ঠ নক্ষত্র যন্ত্রবিদ্‌। ফলে, আকাশযানটি বাঁশের প্রান্তদেশের কাছে নামিয়ে এসে মনোমোহনের নেতৃত্বে আটটি অভিযাত্রী দল খুলে বাঁশের ওপর অ্যাটমিক পিস্তল হাতে লাফিয়ে পড়লো। জীবিত ফোক, মৃত ফোক বিশ্লেষণ উদ্ধার না করে সে ফিরবে না।

ওর বন্দুকটা হাতে সতর্ক প্রহরীর মত বসে থাকতে হত।

আঠার দিন পরে মনোমোহন আবার [illegible] খুলে নিয়ে [illegible] আসে, [illegible] ফেলেই [illegible] সেই ঘি। ও ঘরে ঢুকল না। চাদর আর কাপে ফোন [illegible] পারল না। একটা দুঃসহ পাপগন্ধে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল শ্বাসটা ঘরে।

ছলনোমোহন। টাকে ফেলে [illegible] ঘরে গাড়ি সবে-বার নিয়েছে, দেখলো এক আত্মোল গাছের তলায় মাত্রাদি দাঁড়িয়ে রয়েছে। নামতে দেখলো, তাড়াতাড়ি, মনোমোহন হাত ধরে, বলল, 'মেলাঙ্কলিক হয়েছে, এখনি খোয়াড়ি ভাঙ্গি।'

মাত্রাদি হাঁড় ফুলল, [illegible] আবেগ উপস্থিত, ওর চোখে জল। কিন্তু ও গুনগুন করে গান করছিল, আমি তার মানে বুঝতে পারি নি। আশ্চর্য! মাত্রাদিরা সব সময়ে গান করে। জানে কাঁদতে, তখনো।

[illegible]

[illegible]

সোনো বলল,—ও গাইছিল, 'কিসের কাঁদ, কল নিবি? সমস্যা বাগানের ধারে পাকিয়ে, ফল নিয়ে যায়।'...

খোয়াড়ি কাটে কি, বন্ধ সাবটা বাগোর (বিস্ময়ের ঘোরটা কাটতেই আদি, মাত্রাদির হাত নিয়ে আসবে। কবিও মনোমোহন আবাকে আজই কলকাতার পাঠাতে চাইছে, শুধু মাত্রাদির হাতের ফুল নিতে আবার আসবে। নইলে, একটা মনের মোরে কাঁদবে, ভাইনোর কোনো মানে হয় না। [illegible] হাঁসের জন্যে ব্যথা করিল। [illegible] হলনি, তুই কি একটা সিটোল গল্প তৈরি করতে পারবি?—ভালোবাসায়—।

পত্রলেখিকা—মনস্বিনী সেন। বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্‌ কলিকাতা-১২. বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীহেমেন্দ্রকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।